বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ

বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ

ড. ক্ষুদিরাম দাস

প্রকাশ

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্

কোলকাতা-৭০০ ০১২

VAISHNAVA-RASA-PRAKĀSH
by DR. KHUDIRAM DAS

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০০০

প্রকাশক

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি, উবুদশ

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্, কোলকাতা-৭০০ ০১২

অক্ষর বিন্যাস

মুদ্রাকর, ১৮-এ রাধানাথ মল্লিক লেন্, কোলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি, ইউডি প্রিন্টার্স

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্, কোলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ সিদ্ধার্থ বসু

পিতৃ-স্মরণে

বইটি শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলন ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে লেখা। পটভূমিতে যেমন তত্ত্ব, তেমনি ইতিহাস ও সমাজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণে প্রবেশ করলেও দু একটি সন-তারিখের অদল-বদল ছাড়া বিশেষ পরিবর্তন কিছু করা হয়নি।

ছাপার ভুল দু'চারটে থেকেই গেল, এজন্য নিজেকেই দায়ী করছি। দাম বেশি করলে ছাত্রছাত্রীরা কিনতে পারবে না এ কথা আমি প্রকাশকদের জানিয়েই দিয়েছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সংস্কৃত বাঙলা যাবতীয় গ্রন্থের আলোচনা সহ এর দ্বিতীয় খণ্ড লেখার পরিকল্পনা স্বপ্নেই থেকে গেল দেখছি।

—গ্রন্থকার

প্রবৃদ্ধে বিষয়িস্বার্থে লোকধর্মবিনিগ্রহে।
ফণৎকারে চ ভোগানাং শ্রয়ে গৌরং মহাবলম্‌॥

গ্রন্থের নামকরণ

'বৈষ্ণব' আখ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। যে বৈষ্ণব ধর্মে সম্বন্ধ বা উপাস্য হলেন কৃষ্ণ, যার অভিধেয় বা উপাসনার মুলে অহেতুকী রাগভক্তি এবং যার প্রয়োজন হ'ল কৃষ্ণপ্রেম উদ্‌বোধন—সেই বিশিষ্ট ধর্মই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। গৌড়দেশে এই নবধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল, শ্রীচৈতন্যের লৌকিক জীবনেই এই ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিল। স্বরূপ-রূপ-সনাতন-জীব-প্রমুখ ভক্তি-সিদ্ধ পুরুষ বহু গ্রন্থের মধ্যে এই ধর্মের রহস্য বা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে একে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দান করে গেছেন। এ ছাড়া সহস্রাধিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাজন, সাধক ও কীর্তনগায়ক একে বাঙালির অনন্যদৃষ্ট ভাবসংস্কৃতিতে পরিণাম দান করেছেন। 'রস' বলতে এই বিশিষ্ট ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য চিৎ-প্রকর্ষ ও দ্রবীভূত হ্লাদময় মানসিক বৃত্তিকে জ্ঞাপিত করা হয়েছে। 'প্রকাশ' বলতে এর সাহিত্যিক রূপ নির্দিষ্ট হয়েছে। ঐ তিনটি বিষয়ই সংক্ষেপে এ গ্রন্থের আলোচ্য।

নিবেদন

আচার্য ক্ষুদিরাম দাসের পাণ্ডিত্য সুবিদিত। তাঁর সারস্বত সাধনার পুরস্কার তিনি জীবদ্দশায় পেয়েছেন। রবীন্দ্র পুরস্কার ও বিদ্যাসাগর পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ভূষিত হয়েছেন আরও অনেক পুরস্কারে। তাঁর গুণমুগ্ধের সংখ্যা কম নয়। তাঁদেরই আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রকাশক বহুকাল অমুদ্রিত অবস্থায় থাকা এ গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। প্রয়াসটি অভিনন্দনযোগ্য।

প্রকৃত অর্থে আচার্য দাস ছিলেন একজন জ্ঞানতাপস। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর অধিকার ছিল ঈর্ষাযোগ্য। অন্যদিকে ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, বৈষ্ণব সাহিত্য, রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর। অগাধ আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি কলম ধরতেন। তাঁর আলোচনায় তাই কোনও জড়তা ছিল না। মনটি নৈয়ায়িক। চিন্তা-ভাবনায় মৌলিক। কথনের ভঙ্গিটি ঋজু। পদে পদে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিতেন।

'বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ' বোদ্ধা পাঠকদের স্বীকৃতিধন্য। এক কথায় অসাধারণ গ্রন্থ। দীর্ঘ দিনের চিন্তা-ভাবনার ফসল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করেই গ্রন্থটি রচিত। তত্ত্বের পাশাপাশি ইতিহাস ও সমাজ সমান গুরুত্ব প্রাপ্ত।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব কালে সমাজ-পরিবেশটি কেমন ছিল তা প্রথম অধ্যায়ে আচার্য দাসের অনুপুঙ্খ আলোচনায় জানা যায়। 'শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সহায়ক ধর্মীয় পূর্বভূমি' চিত্রণে তাঁর প্রজ্ঞা আমাদের বিস্মিত করে। 'মহাপ্রভুর লৌকিক ও দিব্য জীবন' প্রসঙ্গে তাঁর মতামত যুক্তিশাসিত।

'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা' অধ্যায়ে আচার্য দাসের সুগভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'রস' বলতে তিনি ভক্তিরসই বুঝিয়েছেন এবং তার পরম্পরা ব্যাখ্যা করেছেন 'রস অর্থাৎ ভক্তিরস' অধ্যায়ে। 'মধুর রস-বৈচিত্রী' অধ্যায়ে আচার্য দাস যুগপৎ

দার্শনিক ও রসবেত্তা। 'শৃঙ্গার রস-বিভাগ' অধ্যায়ে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় লভ্য। 'কীর্তন গান ও রসপর্যায়' শীর্ষক আলোচনায় তিনি অভিনবত্বের দাবি করতে পারেন। তাঁর আগে এভাবে কীর্তন গানের বিচার-বিশ্লেষণ কেউ করেন নি। পরিশিষ্টে সংযোজিত 'শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি— পুরাতন নবদ্বীপ বা নদীয়া' অধ্যায়টিতে তিনি এমন কিছু নতুন সূত্র দিয়েছেন যেগুলি নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে।

পূর্বরাগ, অভিসার ও প্রেমবৈচিত্ত্যের এমন তীক্ষ্ণ আলোচনা এর আগে কেউ করেছেন বলে মনে হয় না।

'বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ' অতুলনীয় এক গ্রন্থ।

গ্রন্থটিতে আচার্য দাসের বিদ্যাবত্তা মননশীলতা ও রসানুভূতির প্রমাণ পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে গ্রন্থটি দার্শনিকতা সমৃদ্ধ।

উচ্চ স্তরের এক দার্শনিকতা এ গ্রন্থের মুখ্য অবলম্বন। সম্পদও।

মানস মজুমদার

সূচিপত্র

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে সমাজ-পরিবেশ

আজ আমরা খ্রিস্টাব্দের বিশ শতকীয় শেষপাদ অতিবাহন করছি। বিগত কয়েক দশকে বাঙলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজ-জীবনে অ-পূর্বদৃষ্ট চাঞ্চল্য অনুভূত হয়েছে। বহুশতবর্ষব্যাপী প্রতিষ্ঠিত-স্বার্থের ভিত্তিমূল কম্পিত হয়েছে। শোষিত অবহেলিত জনসাধারণ

পূর্বকথা

শীঘ্রই সামাজিক অসাম্য চূর্ণ করে মনুষ্যত্বের মর্যাদা লাভ করবে এমন সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিপ্রবাহে প্রতীয়মান যে-শক্তি মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসের রূপকার, সেই শক্তিই ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলার নিয়ামক এ-সত্যে যেন আমাদের সন্দেহ না থাকে। জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা সীমিত, কখনো বিচ্ছিন্ন কখনো একীভূত, বিচিত্র মানুষজীবন-ধারা ঠিক কোন্ লক্ষ্যে চালিত হচ্ছে তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য না হলেও মানব-সমাজের পূর্বতন ও অধুনাতন অবস্থা-বিচারে এ যে প্রকাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে তা বুঝতে কষ্ট পেতে হয় না। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ অগ্রগতি-পশ্চাদ্গতির মধ্য দিয়ে ধাবমান মানুষকে লক্ষ্য ক'রে বিস্ময়বোধ করতে হয়। এই চলার মুখে আশ্চর্যভাবে ব্যক্তি সমাজসত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে পড়ছে এবং সমাজ নতুনভাবে ব্যক্তিমহিমার স্ফুরণ ঘটাচ্ছে। এ দুয়ের সম্পর্ক যেখানে নির্দ্বন্দ্ব নয়, সেখানেই সমস্যা পূরণ করতে আবির্ভাব ঘটেছে বৃহত্তর সামাজিক মানুষের, আমরা যাঁদের আখ্যা দিয়ে থাকি মহামানব বা অবতার। সমাজ-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম নিয়মেই এঁদের আবির্ভাব হয়, এঁরা ব্যক্তিমানুষ এবং সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করেন, উগ্র স্বার্থময় 'ধর্মের গ্লানি' দূর করেন। গীতায় কথিত অথচ 'ধর্ম' শব্দটাকে অভিপ্রেত অর্থে না নিয়ে অর্ধসত্যরূপে উচ্চারিত সেই মহাবাক্য স্মরণ করা যাক—

> যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্মই জীবন, স্বতস্ফূর্ত জীবনই ধর্ম। ধর্মের কোন্ গ্লানি খ্রীস্ট-পূর্ব হাজার শতকের সমাজকে অভিভূত করেছিল, যার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের? স্পষ্টই দেখা যায় দুর্যোধন-দুঃশাসন এবং তাঁদের সমর্থকেরা ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যসঞ্চয় এবং ভোগসুখকেই পরমার্থ বলে নিশ্চয় করেছিলেন। গীতার মতে তাঁরা আসুরী সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের উগ্র স্বার্থবাসনা লোকধর্ম এবং লোকযাত্রাকে নিতান্ত পীড়িত করছিল। যুধিষ্ঠির আপামর জনসাধারণকে নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। কৃষ্ণ নিয়েছিলেন লোক-পরিচর্যার

ভার। যুধিষ্ঠির অনন্যোপায় হয়ে তবেই যুদ্ধে সম্মতি দিয়েছিলেন। দুর্যোধন যদি উগ্র স্বার্থ শিথিল ক'রে লোকধর্মের স্বীকৃতি হিসাবে পাণ্ডবদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দিতেন তাহ'লে রক্তক্ষয় ঘটত না। লোকধর্ম-রক্ষার প্রতিভূ বাসুদেব কৃষ্ণ ঠিকই বুঝেছিলেন উগ্র শ্রেণী-স্বার্থের সমূলে বিনাশ ছাড়া রফা-নিষ্পত্তিতে ধর্ম রক্ষিত হবে না।

রামায়ণে রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে কীর্তিত হয়েছেন, তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ সাধন করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ত্যাগের অর্থাৎ ব্যক্তিস্বার্থের সম্যক্ বিলোপের দৃষ্টান্ত এমন আর দেখা যায়নি, আবার উগ্র স্বার্থ এবং লোভের বিরুদ্ধে তিনি কালান্তকসদৃশ আচরণ করেছিলেন বলে চিরস্মরণীয় হয়েছিলেন। রামের বালিবধ, লঙ্কা-অবরোধ এবং রাবণবধকে যাঁরা দাক্ষিণাত্যে আর্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হিসাবে দেখেন তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। রাম নিষাদদের সঙ্গে এবং বানর বলে আখ্যাত অনার্যদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে প্রায় চোদ্দ বছর তাদের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। ঐশ্বর্য, প্রতাপ এবং লোভের প্রতিমূর্তি রাবণের বা তার অনুচরদের সঙ্গেই তিনি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন। এরা অধর্মচারী বলেই বোধ করি রাক্ষস আখ্যায় অভিহিত হয়েছে। রামায়ণে রাবণ ব্রাহ্মণবংশজাত। আর যদি অনার্য হয়েও থাকেন তিনি মানবকল্যাণের নীতিকে আত্যন্তিকভাবে লঙ্ঘন করেছিলেন ব'লেই তাঁর সবংশে নিধন প্রয়োজন হয়েছিল। কাহিনীবদ্ধ সংক্ষিপ্ত রামচরিত রামের জীবৎকালে রচিত এবং গীত হয়ে থাকলে বুঝতে হবে নবমানবধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আর্য-অনার্য সম্মিলিত সাধারণ মানুষের কাছে প্রবলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ ইতিহাসের দিক দিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের দুটি কাহিনীকেই শ্রেণীস্বার্থময় আর্য-দর্পের বিনাশ এবং আর্য-অনার্য মিলিত মানবধর্মের প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তরূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

বুদ্ধদেবেব আবির্ভাবের হাজার বছর পূর্ব থেকেই ভারতে আর্য-অনার্য যদ্যপি মিশ্রিত হয়েছিল, ক্ষাত্র-পরিপুষ্ট ও শাস্ত্রসম্বল ব্রাহ্মণ্য মহিমা জনসাধারণকে পীড়িত করে তুলেছিল। বুদ্ধদেব সাধারণ মানুষকে যুক্তিমূলক সহজধর্মের অধিকার দিয়ে ব্রাহ্মণ্য গর্ব চূর্ণ করলেন। এ শুধু ধর্মবিপ্লব নয়, জীবনবিপ্লবও, কারণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মস্বার্থরক্ষণে প্রযুক্ত হয়ে শূদ্রদের পশুব্যবহার করত এবং স্বল্প কারণে শূদ্রহত্যা করতেও দ্বিধা করত না। বৌদ্ধধর্ম-প্রকাশের মুখ্য কারণ এখানে, এর জীবন থেকে অতিরিক্ত কিছু দার্শনিক মূল্য পরে তাত্ত্বিকদের দ্বারা গ্রথিত হয়ে থাকবে। তখনকার কালে বুদ্ধের মত ও পথনির্দেশ যে-সর্বতোব্যাপী বিপ্লব নিয়ে এসেছিল আজকের দিনে তার স্বরূপ নির্ধারণ কঠিন হতে পারে, কারণ, যথার্থ বিপ্লবের সঙ্গে আমরা বহুদিন অপরিচিত। ভারতীয়দের জীবনে ও চিন্তায় এ-ধর্ম আমূল পবিবর্তন এনেছিল। প্রিয়দর্শী অশোক রাষ্ট্রসহায়ে অন্তত কয়েক শতাব্দীর জন্যও এই মানবমুখী বিপ্লবকে স্থায়ী করতে পেরেছিলেন। ব্যাপকতার দিক থেকে হয়ত বা আজকের বিশ্বের শোষণ-বিরোধী সাম্যধর্মী রাজনীতিক মনোভাবের সঙ্গেই এর তুলনা চলে।

ধর্ম যে পরিমাণে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে থাকে, তত্ত্ব সেই পরিমাণেই গতিশীল জীবন থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। হীনযান, মহাযান, অস্তিবাদ, নাস্তিবাদ, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক প্রভৃতি কূটদর্শনের কবলিত হয়ে পঞ্চশীল পালন এবং করুণা মৈত্রীর সহজ পথ নিরুদ্ধ হয়ে পড়ল। অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর মত পরম বান্ধবও কুমারিল-শংকর প্রভৃ

আঘাত থেকে একে রক্ষা করতে পারলেন না। গুপ্তরাজত্ব এই মিশ্র-ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার কাল। এখন থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম এমনকী বিরোধী শৈবধর্মও তান্ত্রিকতার আবরণ নিয়ে কাশ্মীরে তিব্বতে-বাঙলায় কোনোমতে আত্মরক্ষা করতে লাগল। আর মহাযানীদের শূন্যদেহের উপর গড়ে তোলা হল নির্গুণ ব্রহ্মের নিরাকার মূর্তি। শ্রীশংকরের অদ্বৈত মতে সমস্ত মানুষকে ব্রহ্মের মহিমা দেওয়া হল। কিন্তু সোঽহংবাদ দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে নিবদ্ধ থাকায়, অসহায় সাধারণ মানুষের সহায়-শরণ না হওয়ায় এবং কঠোর নিদিধ্যাসন ও সন্ন্যাসের দ্বারা লভ্য হওয়ায় সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিলাষ থেকে দূরে পড়ে রইল, তত্ত্বপ্রিয় বুদ্ধিজীবী দার্শনিক এবং মুমুক্ষু কতিপয় ব্যক্তির আশ্রয় হয়ে জনসমাজ থেকে নির্বাসিত রইল। তা ছাড়া, দার্শনিক তত্ত্বকথায় তো আর রাষ্ট্র চলে না, রাষ্ট্র চলেছিল রাজনীতিতে এবং ব্রাহ্মণ্য মীমাংসা-স্মৃতির সহায়ে।

ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং নব্য ব্রাহ্মণ্যের এই সব দর্শন ও যুক্তিতর্কের উচ্চবর্ণীয় কোলাহলের অন্তরালে সুবিপুল সাধারণ মানুষ, বলা যেতে পারে পতিত আর্য বা আর্যীকৃত অনার্য, আনুষ্ঠানিক কর্ম অথবা জীবনবিরোধী জ্ঞানের পথে পরিতৃপ্ত না হয়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চের অলক্ষ্য সূত্রধারের উদ্দেশ্যে দৈন্য ও কাতরোক্তি নিবেদন করতে থাকলেন স্তবে, গানে, স্মরণে ও চিন্তায়। এঁদেরই জন্য গীতায় কর্ম ও জ্ঞানের পথ বর্ণনা করে পরে ভক্তির পথও নির্ধারণ করা হয়েছে, এমনকী ভক্তিকে প্রাধান্যও দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর যাঁরা উপাসক তাঁরা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব আখ্যায় অভিহিত হলেও ভক্তিধর্মের পথিক ছিলেন না। কৃষ্ণ-উপাসকেরা, যাঁরা কৃষ্ণে অবতারত্ব এবং লীলায় বিশ্বাসী, তাঁরাই আধুনিক অর্থে প্রকৃত বৈষ্ণব। ভারতের নানাস্থানে গোপ-কৃষ্ণ বা বাসুদেব-কৃষ্ণের এই উপাসক সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের পরিচয় মহাভারতের পূর্বকাল থেকেই মিলছে। ভাগবত গ্রন্থ যদি খ্রীস্টীয় কোনো শতাব্দীতে রচিত হয়ে থাকে তাহলেও ভক্তিধর্মের পূর্ব-প্রবলতার বিষয়ই প্রতিপন্ন করে। অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিতে কৃষ্ণের গোপীসহ লীলার বিবরণ রয়েছে। কালিদাসের কাব্যেও আছে। খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে আলবার সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং বিস্তৃতি ভক্তি-ধর্মের ইতিহাসে একটি উল্লেখ্য বিষয়। খ্যাতনামা অন্ততঃ বারোজন আলবার প্রীতিময়ী শ্রদ্ধা ভক্তি অবলম্বন করে কৃষ্ণোপাসনা করেছেন। গোপীসহ প্রেমলীলার বিষয় ভাগবতের সমকালে এঁরাই প্রথম বর্ণনা করেছেন। ভাগবত গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যেরই সৃষ্টি।

এঁদের ঠিক পরেই দাক্ষিণাত্যে আচার্য উপাধিধারী ভক্তিবাদী তাত্ত্বিকদের আবির্ভাব ঘটে। যমুনাচার্য, ভাস্করাচার্য, রামানুজাচার্য প্রভৃতি তত্ত্ববাদীরা অদ্বৈত মতের সঙ্গে ঈশ্বরভক্তির সমন্বয় সাধন করে ভক্তির ধারাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। এ সময় অর্থাৎ একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে উদ্ভূত বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধ দ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাতাদের প্রবলভাবে সাহায্য করেছিল, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থানে এবং বিস্তারে কোনো অংশ গ্রহণ করেছিল কিনা সন্দেহ। দার্শনিকতার সঙ্গে অসম্পৃক্ত স্বত-উৎসারিত সাধারণ জনের জীবনের পূর্ণতম বিকাশের আগ্রহই এজন্য দায়ী। এই অভিলাষের ঘনসাবমূর্তি নাম-প্রেমদাতা মহাবাউল শ্রীমন্‌মহাপ্রভু।

পঞ্চদশ শতাব্দীর সমাজ-মানস পর্যালোচনা করা যাক। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে

অধুনা-পূর্বকালে সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের যোগ স্থাপিত হয়নি। রাজা-মহারাজার আসা-যাওয়ায়, মোগল-পাঠানের উত্থান-পতনে সমাজ-জীবনে ঘটনার এক-আধটু স্পর্শ যদি বা লেগেছে, বিপর্যয় আসেনি। ইংরেজ শাসনের সময়েও জনসাধারণ উদাসীনই ছিল বলতে হবে, অন্ততঃ দেশের শতকরা নব্বই জন, পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষে কৃষিই যাদের জীবিকা। স্বাধীনতার পর, আমাদের নিজেদের উপর দেশগঠনের দায়িত্ব যখন অনায়াসেই এসে পড়ল, তখন নিদ্রিত জনসমাজের একবার নিদ্রাভঙ্গের মত হল বটে, কিন্তু সে বোধ হয় মুহূর্তের জন্য। শিক্ষাহীন নির্জীব জনসমাজের বিমূঢ়তার সুযোগে স্বার্থস্ফীত এবং অধর্ম-পরিপুষ্ট মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবিশেষ এক একটি গোষ্ঠীতে সংহত হয়ে জনসমাজের দুর্বিপাক ঘনীভূত করে তুললে। জনসমাজের সে মোহনিদ্রা এখন ঘুচছে বলে যেন মনে হচ্ছে। যে যাই হোক, জাতিবর্ণের নিয়মে শাসিত আমাদের সমাজ রাষ্ট্রীয় অধিকারকে এযাবৎ প্রাধান্য দেয়নি। সামাজিক অসাম্যের দুর্ভোগ নীরবেই ভুগে এসেছিল। রাষ্ট্রবুদ্ধির জাগরণ এবং অধিকারবোধ পশ্চিমী শিক্ষা থেকেই সম্ভব হয়েছে এ ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। পশ্চিমী শিক্ষায় শতকরা কতজন শিক্ষিত হয়েছিল? আজ শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিরও রাষ্ট্রের সহায়তায় সামাজিক সমান অধিকার লাভের প্রবল অভিলাষ জাগল কীভাবে? 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—যে জীয়ন্তে-মরা তার অধ্যাত্ম সম্পদ অর্জন করাও সম্ভব নয়। এই কারণেই বিবেকানন্দ দেশবাসীর কানে গীতার উপদেশ বর্ষণ না করে দেহ-মনে শক্তি সঞ্চার করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। আজকের দিনে সামাজিক বিপ্লবের মর্মে মানুষের শক্তি অর্জন সম্ভব হলে, পরে জীবনের মধ্যে অধ্যাত্মের অর্থাৎ ভাব ও আদর্শের প্রকাশে মনুষ্যত্ব-দেবত্ব একীভূত হতে পারে। সেই সুদিনের স্বপ্ন স্থগিত রেখে বর্তমানে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী এবং বৈপ্লবিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাব-বিস্তারের ভিত্তিভূমি লক্ষ্য করা যাক।

চৈতন্যাবির্ভাবের অব্যবহিতপূর্ব সমাজ

বাঙলায় কৌলীন্য বিধির প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা যেভাবেই ঘটুক তা যে সমাজ-জীবনের জড়ত্বের প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পালরাজাদের সময়কার বাঙলার সমাজ-জীবনের বিশেষ পরিচয় ইতিহাস না দিলেও এটুকু বোঝা যায় যে প্রকট বর্ণবৈষম্য বা জাতিগত শ্রেণী-সংঘাত তখনও সমাজে তেমন উপলব্ধ হয়নি। উচ্চবর্ণের উন্নত সম্পদ্‌ভোগের অধিকার তখনও রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করেনি। শ্রেষ্ঠী বা বণিক সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় দু'চারজন নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসাবে শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এবং সমাজের অর্থের ভাণ্ডার এঁদের হাতে থাকলেও প্রজাকল্যাণ বিঘ্নিত হয় এমন অপরিমিত ধনসঞ্চয় বা সম্পদ্‌ভোগ এঁরা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া এঁদের সংখ্যা নগণ্য ছিল। 'শূর' ভূম্যধিকারীরা এবং 'সেন' বংশীয় রাজারা বৈদেশিক রুচি এবং জীবনচর্যা নিয়ে এসেছিলেন বলে পশ্চিম অঞ্চলের উচ্চবর্ণের উপর শ্রদ্ধা পোষণ তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্র-সামাজিক সুবিধার্থে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেলেন তার ফল বাঙলা দেশে সুদূরপ্রসারী হল। তাঁরা নতুন করে এবং কঠোরভাবে স্মৃতির অনুশাসন প্রবর্তন করলেন এবং জাত-বর্ণের অংরও বিভাগকে একেবারে অলঙ্ঘনীয় করে তুললেন। বৃত্তি, ভূমি এবং গ্রাম দান করে কুলীন বলে যাঁদের বংশপরম্পরায় প্রতিষ্ঠা দেওয়া হল তাঁরা অভিজাত

শ্রেণী হিসাবে গণ্য হলেন। স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়ে বাঙলা দেশে নতুন সামাজিক নিয়ম, নতুন ধর্মের বিধান তাঁরাই প্রবর্তন করলেন এবং তাঁদেরই সুবিধা অনুসারে নতুনতর জাতি ও বর্ণের বিভাগ সৃষ্টি হল। শিক্ষা-দীক্ষা, রাজপদ, জোত-জমি বিনা-উপার্জনে তাঁদের অধিকারভুক্ত হল এবং নিম্নবর্ণের মানুষ তাঁদের আনুগত্যের দ্বারা জীবননির্বাহ করতে থাকলেন। সহজেই পাঠান-মোগল আমলেও এঁরাই ভূম্যধিকারী এবং খেতাবধারী হয়ে উঠলেন। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমাজে এঁদের সংখ্যা ছিল যৎসামান্য। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে এঁরা সংখ্যায় আর তেমন নগণ্য রইলেন না, ফলে অন্তঃশীল শ্রেণী-সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। নিম্নবর্ণের মানুষ দলে দলে সূফী-সাধকদের শরণাগত হয়ে ইসলাম ধর্ম বরণ করতে থাকলেন। আমরা পূর্বোপাত্ত বিষয়টি পাঠকদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। অধুনা-পূর্ব ভারতে, বিশেষতঃ অনার্যরক্তময় বাঙলায় সাধারণ জনের দিক থেকে জীবন ও ধর্মসংস্কার নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। ভারতে জীবন বিপ্লব ধর্মবিপ্লবেরই রূপ নিয়েছিল। যেমন ফুটেছিল উচ্চ-নিম্ন জাতিবিভাগে শ্রেণী-বৈষম্যের ধারা।

নবম-দশম-একাদশ শতাব্দীতে কিছু মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, কিছু বৈশ্য এবং অগণিত অনার্যরক্ত-চিহ্নিত শূদ্র গৌড়ের উত্তরের সমতল, পশ্চিমের অরণ্যবেষ্টিত মালভূমি এবং পূর্বদক্ষিণের নিম্নভূমি ব্যাপ্ত করে বিদ্যমান ছিল। এদের সঙ্গে একত্রিত ছিল কিছু কোল-মুণ্ডা ও পার্বত্য জাতি। এই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয় চর্যাগীতিকাগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ রক্ষিত হয়েছে। বাকি অনুমেয়। নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠী এবং রাজপুরুষদের জীবনধারা সাধারণ থেকে স্বতন্ত্রই ছিল। কিন্তু যেমন রাষ্ট্রনীতি এবং যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো সম্পর্ক ছিল না, তেমনি মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের সঙ্গেও তাদের বাহ্যতঃ প্রবল কোনো সংঘাত উপস্থিত হয়নি। কিন্তু অন্তঃসংঘাত একেবারেই যে ছিল না এমন নয়। সেই বিষয়ের এখন অবতারণা করছি।

এক এক বিশিষ্টরীতির ধর্মবিশ্বাস সেকালকার জীবনযাত্রার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন আমরা প্রাচীন সাহিত্যকে 'ধর্মীয়' সাহিত্য বলি তখন একথা ভেবে দেখি না যে আমাদের ব্যক্তিক জীবন এবং সমাজ-জীবন সুনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ্য নীতির দ্বারা মোটামুটি চালিত হলেও লৌকিক দেবতা এবং উপদেবতার বিশ্বাস, বার-ব্রতের অনুষ্ঠান, পর্ব-পালন নিত্যকর্মের মধ্যে গণ্য ছিল। পুরুষাপেক্ষা নারীরাই এই ধরনের ধর্মের অনুসরণে অধিকতর আগ্রহবতী ছিলেন; আর তখনকার সাধারণের সমাজে নারীদের প্রাধান্যও ছিল যথেষ্ট। সুতরাং ভেবে দেখলে বলতে হয়, যাকে ধর্মীয় সাহিত্য বলছি তা-ই আমাদের পক্ষে জীবনধর্মী সাহিত্য। ফলে প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে কেবল ধর্মকথা অর্থাৎ দেবতার স্তবস্তুতিই পাচ্ছি না, যথার্থ সাহিত্যও লাভ করছি, বাঙালির মানস-পরিচয়ের মূল্যবান ইতিবৃত্তও পেয়ে যাচ্ছি। মঙ্গলকাব্যের কিছু কাহিনী আনুমানিক পালবংশের রাজত্বকালেই ছড়ার আকারে গড়ে ওঠে। সাধু বা বণিকদের সমাজনেতৃত্ব, শৈবধর্মাশ্রয় এবং মঙ্গলধর্ম-বিরোধিতা একালেই সম্ভব। উচ্চতর সমাজে লোকায়ত মঙ্গলধর্মের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ধনপতি ও চাঁদসদাগর শিবের উপাসক ছিলেন। প্রথমে উচ্চ সম্প্রদায়ের নারীরা এবং পরে পুরুষেরা মনসা-চণ্ডীর পূজা গ্রহণ করেন। বণিক্ সম্প্রদায় স্বীকার করলে তবেই এইসব লৌকিক দেবতার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হত। এই নিয়ে যে দ্বন্দ্বসংঘাত তা-ই

মঙ্গলকাব্যগুলির মূল কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কাহিনীগুলির উদ্ভব এবং নিতান্ত গ্রাম্য কাব্যরূপ প্রথম প্রথম শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন নিম্নতম বর্ণেই প্রচলিত হয়। এই সমাজের কাহিনীকার ও কবি অভিজাত শৈবোপাসকদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিপাতিত করে বাস্তব অবস্থার বিরুদ্ধে অজ্ঞাতে প্রতিশোধ নিয়েছেন। নেতৃস্থানীয় ভিন্নধর্মান্বিত অর্থাৎ ভিন্নতর জীবনলক্ষণাক্রান্ত কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে জনসমাজের সংঘাত এবং পরিশেষে সামাজিক মানুষের বিজয়ের এই ইতিবৃত্ত প্রায়শই সাহিত্যের ইতিহাসে লেখকদের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে গেছে।

লৌকিক দেবতা ও ধর্মবিশ্বাস, বৃক্ষপ্রস্তরাদির পূজা ও মানত থেকে উন্নীত হয়ে প্রথমতঃ ব্রতপালন, ব্রতকথা আবৃত্তি, আচার ও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় অবস্থায় ধরা যাক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, কোনো প্রসিদ্ধ ঘটনাকে অবলম্বন করে লোকমুখে কাহিনীর প্রচলন হয় এবং কোনো কবি তাকে সুরে আবৃত্তিযোগ্য পাঁচালিতে পরিণত করেন। এই অবস্থায় নারীমহল থেকে পুরুষের মধ্যে মঙ্গলধর্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় অবস্থায় ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলন এবং উচ্চতর সম্প্রদায় কর্তৃক লোকায়তধর্মকে স্বীকৃতিদান। এই অবস্থায় শৈবধর্মের সঙ্গে মঙ্গলধর্মের মিলন রচনা এবং ধর্মের ও কাব্যকাহিনীর পৌরাণিক আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা। এ আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর ঘটনা। এরপর মোটামুটি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই কবিরা পুরাণমিশ্র লৌকিক কাহিনী নিয়ে লৌকিক শিব, চণ্ডী, মনসাকে পৌরাণিক পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ করে, জনসমাজে পূর্বপ্রচলিত নাটকীয় কাহিনী অবলম্বন করে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করলেন, পঞ্চদশ শতকের শেষে লেখা যার পুঁথি আমরা পাচ্ছি। বলা বাহুল্য, কবিদের হাতে পড়ে কাহিনীর আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় উদ্দেশ্য খানিকটা ব্যাহত হতে থাকল এবং জীবনচিত্র, বর্ণনার উৎকর্ষ ও ভাবের লীলাই কাব্যগুলিতে মুখ্য স্থান গ্রহণ করলে।

বর্ণনির্বিশেষে মঙ্গলধর্মের ব্যাপ্তির ফলে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। প্রথমতঃ অনার্যমূল ও বৌদ্ধতান্ত্রিক বহু দেবতা এবং উপদেবতা উচ্চতর বর্ণকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়ে গ্রামের অথবা অরণ্যের বৃক্ষতল আশ্রয় করে রইলেন, কেউ বা অন্য প্রধান দেবতার আবরণ-দেবতা হয়ে কথঞ্চিৎ জীবনরক্ষা করে, একটা ফুল একটু জল পেয়ে বেঁচে রইলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল ঘুরলে আজও এদের চিহ্ন দেখা যাবে। তবু চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে এই সব উপদেবতা, যেমন ভৈরব, পঞ্চানন্দ্ মাদানা, জিনাসিনী, কুদ্রাসিনী, রঙ্কিনী, বাশুলী প্রভৃতির প্রভাব নিম্ন থেকে প্রারব্ধ হয়ে উচ্চতর সমাজ পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল, চৈতন্য-ভাগবতের 'মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে' প্রভৃতি উক্তিই তার প্রমাণ। এইসব পূজা-উপহারের দ্বারা এবং বশ্যতার দ্বারা পরিতোষণীয় উগ্র দেবতারা ক্রমে টিঁকে থাকার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনটি প্রধান দেবতাকে সমস্ত স্থান ছেড়ে দিতে লাগলেন। সেই প্রধান লৌকিক দেবতাত্রয় হলেন মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ। উচ্চবর্ণ ও অভিজাতেরা যখন নিম্নবর্ণসমূহের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের-ধর্মবিশ্বাস এবং পূজার অনুষ্ঠান গ্রহণ করলেন তখন দ্বিতীয় যে অবস্থার উৎপত্তি হল তা সমাজের পক্ষে গুরুতর। পূর্বে আমরা বলেছি শৈবধর্মের সঙ্গে তথা পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবতার সঙ্গে লোকধর্ম এবং লোকদেবতাকে একীকৃত করা হল। বোধহয় এর থেকেও গুরুতর পরিবর্তন আনা হল ধর্মের অনুষ্ঠানে,

পূজাপদ্ধতিতে। উচ্চবর্ণ পূজার ব্যাপারটিকে আত্মসাৎ করে ফেললেন। পুরোহিত নিযুক্ত হল, সংস্কৃত মন্ত্র প্রস্তুত হল, নতুবা, পুরাতন পৌরাণিক মন্ত্রতন্ত্রকেই অল্পস্বল্প পরিবর্তন করে কাজে লাগানো হল, সাড়ম্বরে বহু অর্থব্যয়ে মন্দির মণ্ডপ নির্মাণ করে পূজা এবং গানের অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হল। আর ঐ পূজানুষ্ঠানের প্রবর্তক হয়ে উঠলেন কোনো 'নায়ক' (তু° 'নায়কের করহ কল্যাণ'), যিনি নিশ্চিতভাবে ভূম্যধিকারী বা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন রাজতুল্য ব্যক্তি। মঙ্গলকাব্যগুলিও এঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হতে থাকল। ক্রমে লোকায়ত ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের কুক্ষিগত হয়ে পড়ল, তাঁর মতানুযায়ী নির্বাহিত হতে থাকল তাঁর রোষ অথবা সন্তোষের উপর নির্ভরশীল হল এবং ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে ব্যক্তি বা শ্রেণীই পূজিত ও সম্মানিত হতে থাকলেন। আর যাঁরা এ ধর্মের মূল উপাসক ও প্রবর্তক তাঁরা ভক্ত অথবা ভৃত্য হয়ে বহির্দ্বারে করজোড়ে কৃপাভিক্ষু হয়ে রইলেন। এরকম ব্যাপারের মধ্যে যে মর্মান্তিক মানবিক বেদনা নিহিত রয়েছে তা নিয়ে আধুনিক মহাকবির রচিত "প্রথম পূজা" ('পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ) কবিতাটির কথা পাঠকদের স্মরণ করতে বলি। মন্দির-নির্মাণ এবং পূজানুষ্ঠান ও গাজন প্রভৃতির নির্বাহ রাজা-জমিদারদের প্রজা আয়ত্তে রাখার তখনকার এক কৌশল।

প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ অথবা ভূম্যধিকারীরা লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান এবং গাজন উৎসবকে কিভাবে সীমিত করে নিজ মহিমান্বিত ব্যক্তিপ্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসবের মধ্যে পাওয়া যাবে। 'শূন্যপুরাণ'-এর মধ্যে যে ধর্মপূজার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে এর প্রাচীন এবং আধুনিক দুই রূপই গ্রথিত রয়েছে। বস্তুতঃ 'শূন্যপুরাণ' দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ধর্মোৎসবের পার্বণবিধির একটা খসড়া মাত্র। ধর্মমঙ্গলের মধ্যেও প্রথম লক্ষণীয়—ধর্মের সঙ্গে শিবের (তথা বিষ্ণুর) সমন্বয়। ধর্মের গাজনেও চড়কের অনুষ্ঠান প্রচলিত। ধর্মের দেউলের পাশে শিবের মন্দির স্থাপন অনিবার্য ছিল। তা ছাড়া গাজন উৎসবে ভক্তদের 'বোল্' বা উচ্চকণ্ঠে দেবতাকে আহ্বানের মধ্যে ধর্মের সঙ্গে শিবকে আহ্বানের প্রথা প্রায় সর্বত্র।[১] ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসবে প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যে-সব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় তার মধ্যে সর্বত্র রাঢ়ের সামন্ত ভূপতি বা ভূম্যধিকারীর স্বতন্ত্র মহিমার প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বল্মুকায় আবির্ভূত রামাই ডোমের ধর্মঠাকুর যার মঙ্গলগান রচনায় রূপরামকে সমাজ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল এবং মাণিক গাঙ্গুলি জাতিনাশের ভয় করেছিলেন, তিনি রাজমহিমালিপ্ত হয়ে পরিণত হয়েছেন উচ্চজনপূজ্য ধর্মরাজে। ধর্মরাজের বাহন অশ্ব, পরিধান মুকুটসহ রাজবেশ, মাথায় রাজচ্ছত্র। তিনি কখনও মন্দিরমধ্যে অবস্থান করেন, কখনও দর্শন দিতে বহির্মন্দির বা সভা আশ্রয় করেন। সভায় আসীন অবস্থায় মণ্ডপ প্রজায় পরিপূর্ণ হয়। রৌপ্যদণ্ড হাতে প্রতিহারী দাঁড়িয়ে থাকেন, দুপাশে দুজন তাঁকে চামর পাখা নিয়ে বাতাস করেন, ঐ সময় ধর্মরাজ বিচারে বসেন। গাজনের সময় শত শত ভক্ত (যাঁরা সৈন্যসামন্তের প্রতিরূপ) বেত্র আন্দোলন করতে করতে ধর্মের ঘট পাহারা দিয়ে অশ্বারূঢ় ধর্মঠাকুরের পশ্চাদ্‌বর্তী হন। সমস্ত রাত্রি ধ'রে চলে বাণ-ফোঁড়ার বিচিত্র শোভাযাত্রা আর ধর্মরাজের যাত্রা-সমাপ্তি ও অবস্থানের (camping) স্থান থেকে মন্দির পর্যন্ত অগণিত ভক্তের 'দণ্ডসেবা' (সাষ্টাঙ্গ

১. এইসব লৌকিক দেবতার পূজাপদ্ধতি এবং উৎসব-অনুষ্ঠান লেখকের আবাল্য বহুদৃষ্ট।

প্রণিপাতের ভঙ্গিতে শুয়ে এবং উঠে দাঁড়িয়ে সমস্ত পথ অতিবাহিত করা) অথবা 'গড়ান' দেওয়া। নারীরা বিভিন্ন মানতের জন্য সমস্ত পথ মাথায় ধুনোর খোলা জ্বালিয়ে অতিক্রম করতে থাকে। আর উৎসব শেষে ভক্তেরা (ভক্ত্যা) মনুষ্যবাহিত চতুর্দোলায় চড়ে শিবির-সন্নিবেশ স্থান থেকে (যেমন হয় যুদ্ধজয়ের পর) মন্দির পর্যন্ত আসে। সামন্ত নরপতিদের যেমন ধর্মকর্ম বিচারকার্য নির্বাহের জন্য আম্নায়িক ধর্মাধিকরণিক প্রভৃতি থাকে, ধর্মরাজেরও তেমনি আছে আমনি, ধামাইতকন্নি প্রভৃতি। সামন্ত নরপতিদের যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে ধর্মমঙ্গল কাব্য। যুদ্ধে সৈনিকের কাজে নিযুক্ত হত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এমনকী কোল অর্থাৎ সাঁওতালেরাও। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কালু ডোম, লখাই ডোম, কানাড়া, কলিঙ্গা। ধর্মরাজের গাজনেও দেখি বাণ-ফোঁড়া ভক্তেরা সবাই অন্ত্যজ নিম্নশ্রেণী থেকে আসেন, আর দণ্ডসেবা গড়ানসেবার ভক্তেরা সাধারণভাবে সমস্ত জনসমাজ থেকেই। আরও দেখা যায় ধর্মের ভক্তেরা বিভিন্ন বর্ণের হলেও উৎসবের কয়েকদিন তাম্রবলয় অথবা অভাবে পইতা গ্রহণ করে এক শ্রেণীতে পরিণত হয়ে পড়ে। এর মূলে ধর্মপূজার প্রাচীন ঐতিহ্য হিসাবে নিম্ন বর্ণের প্রভাব কিছুটা কাজ করতে পারে। বস্তুতঃ এটুকু বোঝা যায় যে ধর্মপূজা-পদ্ধতি ও উৎসব-অনুষ্ঠান মূল থেকে বহুদূর সরে এসেছে। নিম্নবর্ণের জনসমাজের ধর্মবিশ্বাস এবং মানসিকতার অবশেষ কিঞ্চিৎ-এর মধ্যে থাকলেও সমস্ত ব্যাপারটি নতুন করে ঢেলে সেজে উচ্চবর্ণের ব্যক্তি-প্রাধান্যের প্রতীক রূপে দাঁড় করানো হয়েছে।

মনসা-পূজা উচ্চবর্ণে তেমন প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি, যদিও শৈব ধর্মের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার ফলে দেবতার স্বভাব-চরিত্রে'কিছু পরিবর্তন নিশ্চয়ই দেখা দিয়েছে। কিন্তু চণ্ডীর পূজা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে মঙ্গলচণ্ডীরূপে সাধারণ নারীসমাজে কিছু প্রতিপত্তি রেখে নবাগত দুর্গা পূজার মধ্যে নিঃশেষে আত্মদান করেছে। পৌরাণিক মহাশক্তির সাড়ম্বর আরাধনা আরণ্য চণ্ডীকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে এবং তিনি এখন নতুনতর শক্তি-পূজার কিঞ্চিৎ অবশেষ লাভ করে লোকচক্ষুর অগোচরে গ্রামীণ নারীসমাজে কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করছেন মাত্র। দুর্গাপূজা যে এদেশে বৃহৎ জমিদারদের দ্বারা প্রারব্ধ এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত ভূ-স্বামীদের অনুসৃত এ সকলেই জানেন। এঁরা উচ্চতরবর্ণের মানুষ, অর্থপ্রতিপ্রত্তিশালী এবং সংখ্যায়ও অতিস্বল্প। চণ্ডীপূজার বিবর্তনেও আমরা দেখছি প্রথমে কিরাত-শবর-ব্যাধ পূজিতা পশুরক্ষয়িত্রী দেবতা আরণ্য চণ্ডী, পরে উচ্চবর্নের নারীদের পূজিতা মঙ্গলদাত্রী মঙ্গলচণ্ডী, পরে পৌরাণিক শিবদুর্গার সঙ্গে অভিন্নভাবে পূজিতা চণ্ডী। এই সমন্বয় ও চণ্ডীপূজার পরিণাম পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং আমাদের প্রাপ্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে এই সমন্বয়ের অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি। ষোড়শ শতাব্দীতে রিপুদলনী দুর্গার পূজাপ্রতিষ্ঠার পর যেমন ধীরে ধীরে মঙ্গলচণ্ডীর বিনাশ, তেমনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরও অবলুপ্তি। এই ধারায় উল্লেখ্য মুকুন্দ কবিকঙ্কণ ও শেষ কবি সমতটের দ্বিজ রামদেব এবং এদিককার অকিঞ্চন চক্রবর্তী।

এককালে সারা বাঙলায় অনুষ্ঠিত জনপ্রিয় মঙ্গলধর্ম ও মঙ্গলকাব্য ব্যক্তিস্বার্থে সীমাবদ্ধ হয়ে জনসমাজে ঐশ্বর্য, প্রতাপ ও অমঙ্গলের ছায়া বিস্তার করেছিল। এরই ফলে ধীরে ধীরে প্রেমের আখ্যান সংবলিত কৃষ্ণলীলার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ. যথার্থ ধর্মের

ও নবজীবনের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা এবং অবতাররূপ মহামানবের আবির্ভাব কামনা। এরই ফলে "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্মসংস্থাপনার্থায়" মহাপ্রভুর আবির্ভাব। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ আকস্মিক নয়, কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ। তিনি সাধারণ মানুষের জীবনের মহত্তম মূল্য নির্ধারণ করলেন, ঐশ্বর্য এবং প্রতাপের আস্ফালনকে বশীভূত করে মূল্যহীন প্রতিপন্ন করার পথ দেখালেন, স্বার্থসর্বস্ব ও বুদ্ধিকৌশলে চালিত জীবনযাত্রাকে তিরস্কৃত করে, ভাবলোকে নিমজ্জিত করে পরমানন্দময় নবজীবন দান করলেন। অদ্বৈতাচার্য এই পীড়িত জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে তাদের বাসনাকেই প্রকাশ করেছিলেন। তারপর প্রায় দু'শতাব্দী ধরে সে কী ভাবের আলোড়ন, কী জীবনোচ্ছ্বাস, কী আশ্চর্য সূক্ষ্ম বিচিত্র বাসনার স্ফুরণ, কী সে উদার জীবন্মুক্তি! এই মুক্তি নিঃসন্দেহে বুদ্ধি থেকে ভাবের; আসুরী বৃত্তি থেকে দৈবী সম্পদের; দম্ভ, প্রতাপ, ঐশ্বর্য থেকে করুণা, ক্ষমা ও প্রেমের। এই পরিস্থিতি তার দু-হাজার বছর আগেকার বুদ্ধ-আবির্ভাবের পরিস্থিতির সঙ্গেই তুলনীয়। একটি মন্ত্রেই মহাপ্রভু মূর্ছিত, দীন অসহায় জনতাকে দেবতার মর্যাদায় উন্নীত করে দিলেন—সে হল নামমন্ত্র। পূজা নয়, অনুষ্ঠান নয়, ভীতভাবে কোনো শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ নয়, শুধু নামে রুচি ঘটলেই আচণ্ডাল সকলেই দেবজীবনের অধিকারী হতে পারবে, জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তুর দ্বারা আপনা থেকে উন্মুক্ত হয়ে যাবে—বুদ্ধদেবের পর এ আর এক আশ্চর্য নব মানবধর্ম। ঐশ্বর্যে ও বুদ্ধিকৌশলে সমাজে যারা উচ্চাসন লাভ করেছিল তাদের হাতে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত মনুষ্যত্বকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত যিনি করলেন তিনি যে নরদেহধারী আর্তের ঈশ্বর এবিষয়ে সন্দেহ কী?

ধর্মের গ্লানির অন্য পৃষ্ঠা হল জীবনের গ্লানি—উগ্রস্বার্থনিষ্ঠ বৈষয়িকতা। তখনকার নবদ্বীপ এবং মোটামুটি শহর-অঞ্চল একশ্রেণীর ধনী ও বিলাসী মানুষের জীবনযাপনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এঁরা সম্পদ্‌বিত্ত সঞ্চয় করলেন কীভাবে তা বুঝতে হলে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তুর্কির অশ্ব ও তরবারি কিছুকাল ধরে বাঙলার গুরুত্বপূর্ণ নগর, বিহার এবং রাজশক্তির কেন্দ্রস্বরূপ দেবালয়গুলির উপর আস্ফালিত হয়ে শ্রান্ত হলে পর এবং বিদেশী শাসকদের পারস্পরিক কলহ ইত্যাদি কতকটা প্রশমিত হলে পর যখন স্থায়ীভাবে দেশ-শাসনের প্রয়োজন অনুভূত হল তখন প্রতিষ্ঠাবান হিন্দুদের ডাক পড়ল। ঐতিহাসিকরা ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বের প্রারম্ভ থেকে বাঙলার আপেক্ষিক স্বাধীনতা ও শান্তি-শৃঙ্খলার সূচনা ধরেছেন। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম-উত্তরে বিভক্ত গৌড়-বাঙলার যথার্থ শাসনকার্যের প্রারম্ভ কিছু আগে থাকতেই ধরা যেতে পারে। সে যাই হোক খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই তুর্কিআফগানদের সঙ্গে সঙ্গে বহু হিন্দুও রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকেন এবং বৈদেশিক শাসনের সহায়ক হন। জায়গীর-জমি এবং খেতাব নিয়ে এঁরাই ক্রমশঃ গ্রাম-সমাচ্ছন্ন বাঙলার নেতা হন এবং সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিদ্যা প্রভৃতির ধারক ও রক্ষক হতে থাকেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এঁদের মহিমা আরও বিস্তৃত হলে, সাধারণ জনের অনুপাতে সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হয়েও, সেকালকার উচ্চ মধ্যবিত্ত বলে একটি শ্রেণীর সৃষ্টি এঁরা সম্ভব করেছিলেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এরকম কিছু ভূম্যধিকারী এবং রাজকর্মচারীর পরিচয় আমরা পাচ্ছি, যাঁদের কেউ কেউ স্থানীয় এলাকার শাসনের কাজও করতেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত এঁদের

কয়েকজনের নাম হল পুরন্দর খাঁ, সুবুদ্ধি রায়. শতানন্দ খাঁ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, রামচন্দ্র খাঁ, হিরণ্য, গোবর্ধন : স্বয়ং রূপ, সনাতন, এঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাকলার জমিদার এবং আরও বহু ভুঁইয়া ও মুল্লুকপতি। রাজা এবং প্রজার মধ্যবর্তী এরকম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পূর্বেকার ইতিবৃত্তে তেমন পাওয়া যাচ্ছে না, যদিচ ধনবান্ বণিক, শ্রেষ্ঠী এবং রাজকর্মচারীর কিঞ্চিৎ অস্তিত্ব তখনও অনুমান করা যায়।

কতকটা যেমন এখনকার কলকাতা, তেমনি সেকালে নবদ্বীপ পণ্ডিত ও ধনী ব্যক্তিদের প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল। অনুমান, নবদ্বীপ ছাড়া অন্যান্য নগর-কেন্দ্রেও অনুরূপ পরিস্থিত গড়ে উঠেছিল। নূতন শাসন ব্যবস্থায় সংবর্ধিত লব্ধভূমিবিত্ত এই সব ব্যক্তি রাজদরবারের বিলাসিতার অনুসরণ করতেন, বিবাহে অন্নপ্রাশনে যৎপরোনাস্তি ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতেন আর ধর্মের নামে চণ্ডী-মনসা-ষষ্ঠীপূজা সাড়ম্বরে নির্বাহ করতেন। জীবিকা-ব্যপদেশে অথবা আরও নানা কারণে এঁদের পিছনে বিশ-পঞ্চাশজন হীনবিত্ত মানুষ সব সময়েই ঘুরতেন। দোলায় অথবা ঘোড়ায় চড়ে ছাড়া এঁরা রাস্তায় বের হতেন না। নিঃসন্দেহে এঁদের মধ্যে দয়ালু ভালো মানুষ কিছু কিছু ছিলেনই, কিন্তু রূপ সনাতনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত ("জীব পশু মারি সব বাকলা কৈল খাস") নিষ্ঠুর দর্পী ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। সমাজদর্শী বৃন্দাবন দাস এদেরই বর্ণনায় বলেছেন—

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে॥**

বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার।**

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।**
জগৎ প্রমত্ত মিথ্যা ধনপুত্র-রসে।**

তারে বোলে সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে
দশ বিশ জন যার আগে পাছে লড়ে॥**

নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ-গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥ ...ইত্যাদি

সমাজ-জীবনে যে পরিমাণে কামকাঞ্চনময় বৈষয়িকতার বৃদ্ধি, সেই পরিমাণে ধর্মের অবনতি। শহরাঞ্চলে অভিজাত শ্রেণী এবং তাঁদের অনুকারী সাধারণ মানুষ, আর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাহীন, ভূমিবিত্তহীন এবং ধর্মের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত অগণিত নর-নারী—এই হল পঞ্চদশ এবং প্রথম-ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলার অবস্থা। এ নিয়ে বহু উল্লেখই পাওয়া যায় সাহিত্যে। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এক কবির লেখনীতে পাচ্ছি—

"সুবর্ণের খাটে কেহ শুইয়া নিদ্রা জাঅ
আমি থাকি চর্ম উরিয়া"॥

ধর্মের গ্লানির তৃতীয় পরিচয় হল সেকালের বিদ্যার ঐশ্বর্য। বহিরঙ্গদৃষ্টিতে বিদ্যাবুদ্ধির দীপ্তি প্রশংসনীয় কিন্তু অন্তরঙ্গে তা ভয়ংকর, যেহেতু বিদ্যার প্রতাপগু লোককল্যাণ-বিরোধী। পূর্বে আমরা দেখলাম তুর্কি আক্রমণের প্রাথমিক সংঘাতের অবস্থা অতিক্রান্ত হলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা রাজ্যশাসনের কাজে প্রবেশাধিকার পেতে লাগলেন। এর অনিবার্যফলরূপে নব ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির : পুনরুজ্জীবন ঘটতে লাগল। বাঙলার প্রধান নগর ও জনপদগুলিতে সংস্কৃত শিক্ষা এবং ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত, ব্যাকরণ, অলংকার, কাব্যের চর্চা নতুন করে প্রারব্ধ হল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাগীরথী-পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে রাজা অথবা ভূম্যধিকারীর অনুগ্রহে পুষ্ট বহু চতুষ্পাঠী গড়ে ওঠে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে জ্ঞানচর্চার পীঠভূমিই ছিল বারাণসী-মিথিলা-নবদ্বীপ। বাঙলায় নব্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ-গদাধর এবং মীমাংসক ও স্মার্ত রঘুনন্দন সেকালের বহু অধ্যাপকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক এক জন ছিলেন মাত্র। অদ্বৈতবাদী সার্বভৌম ভট্টাচার্য, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিদ্যাবাচস্পতি, তাঁদের পিতা খ্যাতিমান্ বিশারদ, কাশীবাসী মধুসূদন বাচস্পতি প্রভৃতি সেকালকার বিশ্রুত বাঙালি পণ্ডিত। এঁদের ঐতিহ্য ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাহিত হয়েছিল তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ এবং অদ্বৈতসিদ্ধির নির্ণেতা মধুসূদন সরস্বতীর পাণ্ডিত্যে। লক্ষণীয় এই যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুষ্পাঠীগুলি পাণ্ডিত্যের সঙ্গে দাম্ভিকতারও আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যার উন্নাসিকতায় পণ্ডিতবর্গ নিজেদের জনসাধারণ থেকে উচ্চশ্রেণীর জীব বলে মনে করতেন, এমনকি গঙ্গার ঘাটে নিজেদের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটলেও কেউ কারুর সঙ্গে শিষ্ট সম্ভাষণাদি না করে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন, এঁরাও অর্থবান ব্যক্তিদের মতই বিদ্যার ঐশ্বর্যে প্রতাপবান ছিলেন। অথচ বৃত্তি-পঞ্জী-টীকা-ভাষ্য ছাড়া আর কিছুই জানতেন না, শুষ্ক পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধির কসরৎ অবলম্বন করে জনসাধারণ থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রেখে জীবন কাটাতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর কৈশোরে ও তারুণ্যে বিদ্যার যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতেন, সে ঐ পণ্ডিতদেরই চারিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অজ্ঞাত অনুকরণে। তাঁর দিগ্বিজয়ী-পরাভব সত্য ঘটনা না হলেও এরকম ঘটনার বাস্তব সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর এই নোতুন সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে, এই অমানবীয় বিদ্যাশক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে জনসমাজ পূর্বে পরিচিত ছিল না। নিঃসন্দেহে একে সামাজিক গ্লানি বলা চলতে পারে, আর যেহেতু জীবনাচরণে নীতিহীন অমানবীয়তাই অধর্ম, সেইহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভূমিকায় এবং চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে পুনঃপুন কথিত ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান নিরোধের জন্য ঈশ্বরস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের তত্ত্বটিকে ঐ অবস্থার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে দেখা যায়। বৃন্দাবনদাস এইভাবেই চৈতন্যাবতারের কারণ নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যে, সমাজের এই অসহনীয় অবস্থাই অদ্বৈত আচার্যকে ঈশ্বরাবির্ভাব ঘটানোর জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত করেছিল।

এই ধর্মের গ্লানি বর্ধিত হতে হতে কিভাবে দরিদ্র এবং সৎ ব্যক্তির জীবনকে আহত করছিল তার পরিচয় মহাপ্রভুর পারিবারিক অবস্থার মধ্যেই পাওয়া যাবে। জীবনীকার প্রত্যক্ষদর্শী মুরারী গুপ্ত এবং পরোক্ষদর্শী বৃন্দাবন দাস উভয়েই চৈতন্য-জনক জগন্নাথ মিশ্রকে 'সুদরিদ্র' বলে বর্ণনা করেছেন—"ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ"। গৌরাঙ্গ-অগ্রজ বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর চিন্তিত হয়ে যখন মিশ্র-পুরন্দর গৌরাঙ্গের পড়াশুনা বন্ধ করে

দিলেন তখন তিনি শচীদেবীর অনুযোগে জবাব নিম্নলিখিতভাবে দিয়েছিলেন—

পাণ্ডিত্যে পোষয়ে কেবা কহিল তোমাত।**
সাক্ষাতেও এই কেনে না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার ঘরেত নাহি ভাত॥

শ্রীচৈতন্য নিজে আগ্রহশীল হয়ে যে-লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন তিনিও অতি দরিদ্রের কন্যা। সম্বন্ধ নির্ণয়ের কালে লক্ষ্মীদেবীর পিতা ঘটককে বলছেন—

সভে এক বচন কহিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাই॥
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরীতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সভে তুমি আনিবে মাগিয়া॥

প্রথম বিবাহের পর শ্রীচৈতন্যের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ সম্ভবতঃ অর্থাহরণের জন্য। শ্রীহট্টের পুরুষানুক্রমাগত পূর্ববঙ্গীয় শিষ্যদের গৃহে তিনি গিয়েছিলেন এই অনুমান হয়। যেসব পরিকর নিয়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের কীর্তনবিলাস ও ভক্তিধর্মের প্রকাশ তাঁরা কেউই ধনী ছিলেন না, অধিকাংশই স্বল্পবিত্ত। খোলাবেচা শ্রীধর অথবা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর মত নিতান্ত নিঃস্ব ব্যক্তি মহাপ্রভুর সর্বাধিক অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। হরিদাস ঠাকুর জাতিতে মুসলমান হলেও মহাপ্রভু তাঁকে শ্রেষ্ঠ সমাদর প্রদর্শন করেছিলেন। জগাই-মাধাই তখনকার নবদ্বীপের বিষয়ী এবং অর্থবান ব্যক্তিদের প্রতিনিধি-স্থানীয় ছিলেন এমন মনে করা যায়। মানবতাময় ভক্তিধর্ম, যাতে 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ' পরিগণিত হয় তার বিরোধিতা যে কুসংস্কার-সম্বল প্রতিষ্ঠিত-স্বার্থ বিষয়ীরা করবেন তাতে সন্দেহ নেই। আর যে সব বিত্তবান ব্যক্তি মহাপ্রভুর পার্ষদ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, যেমন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রঘুনাথ দাস, রূপ-সনাতন, রায় রামানন্দ, তাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করেই প্রেমধর্মের পথিক হতে পেরেছিলেন। মনে রাখতে হবে মহাপ্রভু সাক্ষাৎদানের দ্বারাও রাজা প্রতাপরুদ্রকে অনুগ্রহ করেননি। প্রতাপরুদ্র সম্পর্কে তাঁর উক্তি হল—

যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান্।
তাহারে মলিন করে এক রাজ নাম॥ (চৈতন্য-চরিতামৃত)

মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গী রায় রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজকার্যে গুরুতর ক্রটির জন্য মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হলে এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য কর্তৃক পুনঃপুন অনুরুদ্ধ হলে তিনি এবিষয়ে প্রতাপরুদ্রকে অনুরোধ করা ধর্ম-বিরুদ্ধ বলে মনে করেছিলেন এবং তীব্র বিরক্তি ও আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন। মনে পড়ে, মহাপ্রভুর স্বরূপে আত্মপ্রকাশে নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ যেদিন উল্লসিত এবং আচার্য অদ্বৈত নিঃসংশয়, সেদিন আচার্য মহাপ্রভুকে কী নির্দেশ দিয়েছিলেন বা তাঁর কাছে কী প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—

অদ্বৈত বোলেন 'যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মুর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥

সে সব পাপিষ্ঠ দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গাইয়া॥'
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুংকার।
প্রভু বোলে 'সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥'
এ সব বাক্যের সাক্ষী সকল সংসার।
মুর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইল তাঁহার॥
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগ্রামে।
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্তী সভে নিন্দা জানে॥

(চৈতন্যভাগবত, মধ্য—ষষ্ঠ)

বাঙলার সমাজ-পরিবেশের এই যে ভূমিকা প্রস্তুত করা গেল এ থেকে এমনতর সিদ্ধান্তে যদি কেউ আসেন যে পূর্ণভগবান কৃষ্ণের লীলাবাদকে আমরা উপেক্ষা করেছি, তাহলে সে সিদ্ধান্ত সমীচীন হবে না। লীলাবাদের তত্ত্ব এখানে উল্লিখিত হল না, যথাস্থানে হবে, এই মাত্র। ঈশ্বরীয় নিজ লীলাবিলাস তাঁর যুগধর্মপালন থেকে স্বতন্ত্র নয়। একটি থাকলেই অন্যটি থাকছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ যদিও কৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদনের আগ্রহকেই তাঁর নরদেহ গ্রহণের মুখ্য কারণ বলেছেন এবং নামপ্রেম-প্রবর্তনের দ্বারা যুগধর্ম রক্ষাকে আনুষঙ্গিক কার্য বলে অভিহিত করেছেন, তবু আনুষঙ্গিক কার্যের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা সম্যক্ স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ লীলার মুখ্য এবং গৌণ ভেদ তত্ত্বের দিক থেকে করা হয়েছে মাত্র। ব্যবহারিক দিক থেকে, ভক্তের সাধনভক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেমানুভবের দিক থেকে এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। পরব্যোমেই হোক আর মর্ত্যেই হোক, লীলাময় কৃষ্ণের নিগূঢ় 'নিজ কার্য' তাঁরই মধ্যে সীমিত, এ জেনে আমরা তাঁর নিত্যস্বরূপের একটা পরিচয় পাই মাত্র, কিন্তু যে লীলায় তিনি মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই-ই আমাদের আয়ত্তগম্য, আমাদের কাছে তাই-ই তাঁর সর্বস্ব। এর অতিরিক্ত যা, তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভগবানের নরদেহে অবতীর্ণ হওয়ার দুটি কারণের মধ্যে অসুর সংহারের দ্বারা ভূ-ভার হরণের চেয়ে মানবিকতাময় নবধর্ম প্রচারের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে এইমাত্র। ধর্মপ্রবর্তনকে নিতান্ত গৌণভাবে দেখা হয়নি, যেমন—

যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরসনির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥**
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যৈছে ছাড়ি ধর্মকর্ম॥**
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম-সংকীর্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাঅল সংসারে॥**
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ ইত্যাদি, চৈ-চ

বস্তুতঃ বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণের রাগাত্মিক ধর্মের প্রচার এবং নবদ্বীপচন্দ্রের নাম-সংকীর্তনের দ্বারা আচণ্ডালে প্রীতিময়ী ভক্তির সঞ্চার তাঁদের স্বকীয় লীলার সঙ্গে একত্র জড়িত, সুতরাং পৃথক দেখার অবকাশ নেই। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বিচিত্র অভিনিবেশ, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরোধ, জীবধর্ম ও প্রজ্ঞান, স্থূল ও সূক্ষ্ম নিয়ে চলেছে যে বৃহৎ মানুষজীবন তা-ই ধর্মের আশ্রয়ভূমি। সৃষ্টি নিয়ে তাঁর যে লীলা তার মূলে রয়েছে জীব, তাঁরই বিশেষ শক্তি। সুতরাং নরলীলায় তাঁর অন্যতম সম্পর্ক মানুষেরই সঙ্গে, আর এতে মানুষের পক্ষে পরম পুরুষার্থ হল প্রেমভক্তিলাভ। যে অবসরে এই নবধর্ম প্রবর্তন করার জন্য নরদেহে তিনি অবতার করেন, সেই ক্ষণটিকে দুই শ্রেণীর মানুষের সংঘাত এবং স্বার্থস্ফীত উগ্র ব্যক্তিত্ববাদের দ্বারা সমাজ-স্থিতির নিগ্রহ বলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আমরা দেখছি। জীবনের গ্লানিতেই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান অনুভব করছি।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সহায়ক ধর্মীয় পূর্বভূমি

বৈষ্ণব মহাজন বহুনিন্দিত কলিযুগকে নমস্কার করেছেন 'প্রণমহোঁ কলিযুগ সর্বযুগসার' বলে। কলিযুগের একটি বিশেষ অবস্থাতেই যদ্যপি মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশ ও 'আপনি আচরি ভক্তি' জীবকে শিক্ষাদান, তবু পূর্ব থেকে তাঁর আগমনের প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল, প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই পর্বকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। (১) আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বেকার অর্থাৎ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের সীমিত ভক্তিভাবুকতা ও ধর্মের গ্লানি বিষয়ে ভক্তবৃন্দের আক্ষেপ, (২) দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে স্ফূর্ত বাঙলা ও বহির্বাঙলার ভক্তিরসিকতা ও দার্শনিক চিন্তনের ধারা, (৩) তারও পূর্বেকার দাক্ষিণাত্য সহ ভারতীয় কৃষ্ণ-ভক্তি।

(১) চৈতন্যভাগবতের বর্ণনাক্রমে মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের পূর্বে অর্থাৎ ঈশ্বরপুরীর কাছে প্রেরণা গ্রহণ করে গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে নবদ্বীপে একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র-বিরুদ্ধ ধর্ম আচরিত হত। এই গোষ্ঠীর কেন্দ্রে ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তিনি গীতা-ভাগবত পাঠ করতেন ও কৃষ্ণভক্তির অনুকূলে তা ব্যাখ্যা করতেন। ভক্তির আবেগে তাঁর দেহে বিভিন্ন বিক্রিয়া দেখা যেত। জীবন ও ধর্মের তাৎকালিক গ্লানি অনুভব

অদ্বৈত শ্রীবাস মুরারি

করে তিনি মর্মপীড়া বোধ করতেন এবং নরদেহে অবতীর্ণ হবার জন্য কৃষ্ণের কাছে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা জানাতেন। তিনি যে বর্ণাশ্রমবিরোধী ভক্তিধর্মের সুদৃঢ় স্তম্ভ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর হরিদাস ঠাকুরকে স্বগৃহে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে। মুসলমান হরিদাস ঠাকুর চৈতন্য-পূর্ব হরিভক্তির একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। নামে-অনুরক্তির এত বড় পরিচয় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরেও দেখা যায়নি। তিনি সূফী ভাবুক ছিলেন। ফলে তাঁকে আশ্রয় দিয়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজ থেকে প্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন আচার্যকে হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি ঐ সমাজকে ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান দেননি। এদিকে নবদ্বীপে কীর্তনভজনেরত লক্ষ্মীনারায়ণের প্রৌঢ় সেবক শ্রীবাস, শ্রীচৈতন্যের আবাল্য সঙ্গী মুকুন্দ এবং গদাধর পণ্ডিত, আর রামোপাসক মুরারি শ্রীচৈতন্যের পূর্বেই সাধারণ ভক্তির পথ অনুসরণ করেছিলেন। মহাপ্রভু যখন ব্যাকরণেই নিমগ্ন আছেন এবং মুকুন্দ ও মুরারিকে ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে বিব্রত করছেন তখনই তাঁরা ধার্মিক ও ভক্ত। তাঁর উপরের ক্লাসের ব্যাকরণপাঠের সঙ্গী মুরারিগুপ্ত যোগ-বাশিষ্ঠ মতের রামের সেবক ছিলেন। ফলতঃ দেখা যায়, মহাপ্রভুর পূর্বে রামায়েত সম্প্রদায়ের ভক্তি-ভাবুকতাও এদেশে প্রচলিত ছিল। বিগ্রহ হিসাবে কৃষ্ণের পূজা না করে এরা রামের পূজা করতেন, কিন্তু ভক্তিভাবের দিক দিয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন না। এঁদের সকলের সহজ ভক্তিভাবকে নবদ্বীপের ঐশ্বর্যবাদী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সুনজরে দেখতেন না এবং নানাভাবে বিঘ্নিত করারও চেষ্টা করতেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলায় প্রেমভক্তির অন্য একটি সংকীর্ণ নির্ঝর ও সকলের অগোচরে ধীরগতিতে প্রবাহিত ছিল। এই নির্ঝরের জন্ম শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরী থেকে। শ্রীচৈতন্য এঁকে ভক্তিরসের আদি সূত্রধার বলে উল্লেখ করেছিলেন। যে সব অনুভাব, দৈহিক বিকার ও চেষ্টা (গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে 'সাত্ত্বিক ভাব') অন্তরস্থ প্রেমভক্তির অনুমাপক, সেগুলি মাধবেন্দ্রপুরীর মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্য-চরিতামৃত উভয় গ্রন্থেই লিখিত আছে যে মেঘ-দর্শনে কৃষ্ণবিরহভাব উদ্দীপিত হওয়ায় তিনি মূৰ্ছিত হয়ে পড়তেন।[১] পুরী সম্প্রদায়ের ঈশ্বরপুরী এবং পরমানন্দপুরী এ দুই ভক্তিভাবুক তাঁর শিষ্য ছিলেন। এছাড়া তিনি কেশবভারতী, অদ্বৈত আচার্য ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে প্রেমভক্তি বিষয়ে মন্ত্রদীক্ষা দেন। প্রভু নিত্যানন্দের দীক্ষাগুরু না হলেও তিনি তাঁকে প্রেমভক্তি বিষয়ে প্রবল প্রেরণা দিয়েছিলেন; আর এই সব মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেই প্রেমভক্তির একটি আবহাওয়া বাঙলা দেশে যথাসাধ্য সঞ্চারিত করছিলেন। ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে শ্রীচৈতন্যের গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-হরিদাস-শ্রীবাসাদির সঙ্গে মিলিত হলেন নিত্যানন্দ এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। পরমানন্দপুরী নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। দেখা যায়, এতদিন একটি কেন্দ্রবর্তী ভাবসূত্র ও মধ্যমণির অভাবে বিক্ষিপ্ত মণিখণ্ডগুলি সংগ্রথিত হয়ে দিব্য মাল্যে পরিণত হতে পারছিল না। শ্রীচৈতন্যের উন্নতোজ্জ্বলরসময় সীমাহীন ভাবপ্রকাশ স্বর্ণসূত্রের কাজ করেছিল। কোনো একটি পদে মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী প্রেমিকরূপে নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করা হয়েছে—'প্রেমনদী নিতাই হৈতে, অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে, চৈতন্য-বাতাসে উথলিল'। বাঙলায় প্রেমের অভ্যুত্থান সম্পর্কে এও যথার্থ কথা। নিত্যানন্দ অদ্বৈতের যে প্রেম-প্রবাহ নিজগণের মধ্যেই সীমিত ছিল, গৌবকৃষ্ণের আত্মপ্রকাশে তা সীমার বন্ধন ভেঙে মানবভূমিকে প্লাবিত করেছিল। শ্রীচৈতন্যের ভাববিলাস প্রকাশের পূর্বেই অবধূত শ্রীনিত্যানন্দে প্রেমের আবির্ভাব। তা ছাড়া বাঙলা দেশকে মত্তহস্তী নিত্যানন্দই প্রেম সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখি তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গী হয়ে নীলাচল গিয়ে কিছুদিন অবস্থানের পর মহাপ্রভুর নির্দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য বাঙলায় ফিরে আসছেন।[২] বাঙলায় সহজ অনুভবযুক্ত রাগানুগা ভক্তির ধর্ম তিনিই স্থাপন করেছিলেন, দীনহীন সমাজে পতিত চণ্ডাল থেকে বিপ্র সকলকেই প্রেম ধর্মেদীক্ষিত করে মর্যাদায় মণ্ডিত করেছিলেন।[৩] এই দানের মৌল আদর্শ শ্রীচৈতন্যের হলেও এর বাস্তব অধিকার নিতাই-এরই ঘটেছিল। এইভাবে দেখা যায়, মহাপ্রভুর স্বরূপে প্রকাশেব পূর্বে বাঙলায় (এবং বহির্বঙ্গেও), সীমিত আকারে হলেও ভক্তিধর্মের একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল।

মাধবেন্দ্রপুরী

১. মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশন মাত্রে হয় অচেতন।। (চৈ-চ)

২. মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণে যাত্রা এবং প্রত্যাবর্তনের মাঝখানেও সম্ভবতঃ নিত্যানন্দ বাঙলায় চলে এসেছিলেন।

৩. সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা দান।। (চৈ-চ)

এ ধর্ম সহজ-অনুভব বা হৃদয়ভাবুকতার ছিল বলে সেকালকার সাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন হয়েছিল। 'গীতগোবিন্দ', চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' বিদ্যাপতির 'রাধাকৃষ্ণ লীলা' বিষয়ক পদ-এর অবিসংবাদী প্রমাণ, এ ছাড়া সম্ভবতঃ আর্য রামায়ণ অবলম্বনে প্রবর্তিত কৃত্তিবাসের রামলীলা-গীত এবং মালাধর বসুর ভাগবতানুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ভক্তিভাবুকতা প্রসারের সহায়ক হয়েছিল। বর্ধমানের কুলীনগ্রাম কৃষ্ণভক্তির জন্য পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রশংসাকালে মহাপ্রভু কুলীনগ্রামের কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে প্রসিদ্ধিরও উল্লেখ করেছেন।[১] ভাগবতের অপর বিখ্যাত অনুবাদক হলেন মহাপ্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ রঘুনাথ আচার্য[২]। দক্ষিণভ্রমণের পর বৃন্দাবনপথে ভক্তসঙ্গে মিলন-বাসনায় মহাপ্রভু যখন গৌড়ে এসেছিলেন তখন প্রত্যাবর্তনের পথে বরাহনগরে রঘুনাথ আচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর ভাগবতব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভাগবতাচার্য আখ্যা দেন। অন্ততঃ দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই সাহিত্যে অনুরাগমিশ্রিত কৃষ্ণভক্তির দীপ্তি লক্ষিত হলেও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতেই এর বিস্তার ঘটেছিল নিঃসন্দেহে। 'গীতগোবিন্দে'র রাধাসহ প্রণয়বিলাসে যে-প্রেমধর্মের ভিত্তি সাহিত্যিক বাঙলায় স্থাপিত হয়েছিল তা আরও দৃঢ় হল চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির 'বিবিধ মতে' বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলায়। জয়দেব তাঁর গীতারম্ভে 'হরিস্মরণ' করেছেন এবং গ্রন্থমধ্যে ভাগবতের দশমস্কন্ধের রাসলীলাকে পূর্ণতর করার অভিলাষও ব্যক্ত করেছেন, ''কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধশৃঙ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥" এই সূত্র ধরেই রাধা সহ প্রেমলীলার বিস্তৃত চিত্র প্রদর্শনে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতিও ভক্তিধর্মে নবীনতার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। রাধাপ্রেমের সূক্ষ্ম ভাবমুহূর্তগুলি প্রথম এঁরাই ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁর অন্ত্যলীলায় জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির লীলাগীতি শ্রবণ করে তাঁর চিত্তের বিরহক্লেশ অপনোদন করতেন।[৩] চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি যে লৌকিক প্রণয়-বিরহ চিত্রিত করেননি, পূর্ণভগবান্ এবং অবতারী কৃষ্ণের শক্তিসহ লীলাবিলাসই বর্ণনা করেছেন এবিষয়ে বৈষ্ণব রসিকগণও একমত। তবে কবিরা ঠিক ঐ তত্ত্বকে অগ্রে স্থাপন করে কাব্যরচনা করেননি। এ তত্ত্ব তাঁদের আয়ত্তে না থাকা সত্ত্বেও অনায়াসে স্থাপিত হয়েছে।

আধুনিক একশ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচকের মতে জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস (কৃষ্ণকীর্তনকার) ধর্মভাবুকতা নিয়ে রাধাকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের অবতারণা করেননি, তাঁরা সাধারণ প্রেমের কাব্যই লিখে গিয়েছেন, নায়ক-নায়িকা হিসাবে কৃষ্ণ-রাধিকাকে অবলম্বন করেছেন মাত্র। তাঁদের এরকম ধারণার মূলে দুটি উপাদান কাজ করেছে—এঁদের পদসমূহের কাব্যকলাগত রম্যতাসহ লৌকিক আবেদনের প্রবলতা এবং সমালোচকদের পরিচিত এবং

---

১. কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥

২. নির্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্‌ভাগবতাচার্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥ (চৈ-চ)

৩. চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥ (চৈ-চ) পৃ. ২১

প্রত্যাশিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব অতিসূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্যসহ ধর্মীয় তাৎপর্যের প্রতিপদে অবিদ্যমানতা। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, জয়দেব-বিদ্যাপতির রচনায় কাব্য এবং ধর্ম পরস্পরকে উপচিত করে একাত্মভাবে বিদ্যমান। বৈষ্ণবধর্ম নিতান্ত হৃদয়ভাবের ধর্ম বলেই, 'রম্যা কাচিদুপাসনা'র ধর্ম বলেই পূর্ণ কাব্যমূর্তি লাভ করেছে: এ ধর্ম মূলে রোম্যান্টিক কাব্যলক্ষণাক্রান্ত। বংশীধ্বনি শ্রবণে পূর্বরাগ, রূপবিহ্বলতা, অপ্রাপ্তিতে এমনকি প্রাপ্তিতেও তীব্র বিরহ, কৃষ্ণভাবনায় শ্রীমতীর কৃষ্ণস্বভাবপ্রাপ্তি, কুলগৌরব লজ্জা আত্মমর্যাদা সব কিছু ত্যাগ করে পথে যাত্রা—এ যেমন রোম্যান্টিক কাব্যের বিষয় তেমনি বৈষ্ণব ধর্মেরও। উপরি-উক্ত তিন কবি শৃঙ্গাররসের বিস্তার ঘটিয়েছেন বলেই তাঁদের কাব্য কেবল লৌকিক পর্যায়ে পড়বার যোগ্য নয়। দেখতে হবে যে এঁরা যেমন ধর্মানুপ্রাণিত ছিলেন, তেমনি উচ্চ কবিপ্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। রম্য প্রেমধর্ম এবং রম্যকাব্য যুগপৎ তাঁদের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়েছিল, আর সুকবি ছিলেন বলে রসের বিষয়টিকে তাঁরা এত বৈচিত্র্যের সঙ্গে বর্ণনা করে মানবিকতারও চূড়ান্ত করেছেন। তাঁদের চিত্তে ধর্মপ্রেরণা না থাকলে তাঁরা লৌকিক কাব্যই লিখতেন, কিন্তু 'কানু বিনা গীত নাই' বলে বাধ্য হয়ে তাঁরা 'কবিওয়ালা'দের মত কৃষ্ণকথা অবলম্বন করেছিলেন এ অভিমত শ্রদ্ধেয় নয়। সত্য বটে, মহাপ্রভুর এবং বিশেষভাবে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের ও 'চরিতামৃতে'র পরবর্তী মহাজন-পদাবলীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের যেমন পরিস্ফুট প্রভাব দেখা যায়, ঠিক তেমনটি এঁদের ক্ষেত্রে ঘটেনি, কিন্তু তাই বলে ধর্মপ্রেরণার অভাবও কল্পনা করা যায় না। সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব এবং বৈষ্ণবীয় রসবিবেচন তখন ছিল না বলে তাঁদের রচনায় যা পাওয়া যায় তা সাধারণভাবেই পাওয়া যায় এবং এজন্য প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের অনুগত রচনার নিদর্শনও তাঁদের মধ্যে দুর্লভ নয়। অপরপক্ষে, যাঁরা প্রতিপদে ধর্মীয়তা দেখতে চান তাঁরা কি জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের রচনাতেই তা সর্বত্র পাবেন? এঁদের এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের পদকারদের অনেক রচনাকেই স্বচ্ছন্দে ধর্মসম্পর্কহীন লৌকিক রচনার পর্যায়ভুক্ত করা যায়। অথচ, যেহেতু এঁরা চৈতন্য-পরবর্তী সেজন্যই সম্ভবতঃ কাকতালীয় ন্যায় অনুসরণ করে উক্ত সমালোচকেরা এদের বিশুদ্ধ মানবিকতা নির্ণয় করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। দেখা যায়, রসের পোষকতার জন্য চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মতই পরবর্তী বহু মহাজন পূর্ববর্তী সংস্কৃত কাব্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। এমনক্ষেত্রে যদি পূর্ববর্তীদের ধর্মের অভাবের বিষয় চিন্তা করতে হয়, পরবর্তীদের ক্ষেত্রেও তো তা-ই করণীয়। অলংকারে, রাগবৈচিত্র্যে বিদ্যাপতি আমাদের মন হরণ করেছেন বলেই তিনি একেবারে লৌকিক কবি, এমন ধারণা সমীচীন নয়, যেমন নয় রাজসভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বলেই তাঁর কাব্যে অলংকার ও রীতিগত চমৎকারিতার অনুমান করা। আসলে এ ধরনের সাহিত্য-সমালোচনা পক্ষপাতহীন রসবিচারের ফল নয়, মনগড়া আত্মমাত্রলীন বিবেকহীন দর্শনের ফল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর উচ্ছল কাব্যরসিকতা নিয়ে প্রথম জয়দেব-বিদ্যাপতির ধর্মীয়তা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন। পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় এবং নানান আলোচনায় মহাজনপদের কাব্যিকতা বিষয়ে উচ্ছ্বসিত অভিমত ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ পদাবলীর ধর্মীয়তাকে অস্বীকার করেননি, নিজভাবে দেখেছিলেন এইমাত্র। তাঁর অনুভবে মানবীয় প্রেমই মহৎ ধর্ম, ভালোবাসাই পূজা, মানবিক নিঃস্বার্থ

জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস

আকর্ষণের মধ্যেই ধর্মের বীজ নিহিত রয়েছে এবং এই প্রেমের সীমান্ত বর্ণনা করে বৈষ্ণব কবিরা অপূর্ব কাব্যধর্মের নিদর্শন দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় ধর্মমতের অনুকূলে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র, পদাবলীতে ধর্মানুভব নেই একথা বলেননি। যাই হোক, এই সব মতামতের প্রভাবে এবং নূতন কিছু বলার চাপল্যবশতই—বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ কাব্য নির্মাণ করেছেন, গীতগোবিন্দে গীত মাত্র আছে গোবিন্দ নাই—এরকম অভিমত সাম্প্রতিক এক শ্রেণীর সমালোচকের মুখরোচক বুলিতে পরিণত হয়েছে, বৈষ্ণব সাহিত্যের তদ্গত অনুভব অবহেলিত হয়েছে।

কবি জয়দেব যে নিছক কাব্য নির্মাণ করেননি তা তাঁর গীতগুলির 'ভূমিকা-শ্লোক থেকে স্পষ্ট, তা ছাড়া বিভিন্ন কারুকার্যের সংকেতসহ যাঁরা গানগুলিকে যথার্থভাবে শ্রুতিপথ থেকে মর্মে নিয়ে যেতে সমর্থ তাঁরাই দেখবেন যে লৌকিকের মধ্যে অলৌকিক সর্বদা স্ফূর্তিলাভ করছে। বাঙলায় কবি জয়দেবই রাধাপ্রেম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ভাগবতের রাসলীলায় প্রচ্ছন্ন কৌতুকের সঙ্গে গোপীমুখে রাধার কথা উল্লিখিত হয়েছে এমন মনে করা গেলেও,[১] রাধাসহ প্রেমলীলার বৈচিত্র্য বর্ণিত হয়নি। রাধা-কৃষ্ণ নিয়ে লোককথার সৃষ্টি বহুকাল আগেই ছিলা অনুমান হয়, দশম-একাদশ শতাব্দীতেও জনসমাজে রাধাকৃষ্ণপ্রণয় নিয়ে কিছু উপকথা ও কথার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এরকম জনশ্রুতি কিছু সংগৃহীতও হয়েছে দেখতে পাই। ব্রহ্মবৈবর্তের সঙ্গে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের মিলও দেখা যায়। তা ছাড়া বর্ণনরীতি এবং ভাষাভঙ্গির দিক থেকে লীলাশুকের কৃষ্ণকর্ণামৃতের গীতাত্মক রচনাগুলির সঙ্গে গীতগোবিন্দের আত্মীয়তা স্পষ্ট। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণলীলার সবচেয়ে বিস্তৃত বর্ণনা উপস্থাপিত করেন। বিভিন্ন পুরাণে গ্রথিত কৃষ্ণকথা ও রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রচলিত লৌকিক কাহিনী মনে রেখে কল্পনাশক্তিতে সেগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ের কৈশোর-যৌবন সমন্বিত একটি মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র তিনি গঠন করেন। স্থানবিশেষে জয়দেবের কবিকৃতির অনুসরণ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। এই প্রণয়ের প্রারম্ভ থেকে পরিপাকাবস্থা বর্ণনা করতে এই বিখ্যাত চণ্ডীদাসকে জনপ্রিয় এবং সেই সঙ্গে নিজ মনোমত চমৎকারজনক কয়েকটি অধ্যায় নির্মাণ করতে হয়েছে। এর মধ্যে দানখণ্ড এবং নৌকাখণ্ড প্রায় মৌলিক। বংশীখণ্ডের বাঁশি-চুরি নিয়ে প্রেমরহস্যের চারুতাময় গ্রন্থনও কম চাতুর্যের বিষয় হয়নি। আর পরিশেষে নির্বিষয় রাধা-বিরহভাবুকতায় কৈশোর প্রেমচাপল্যের সমাধান বর্ণনা করে তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় নিয়েই নোতুন পুরাণ রচনা করেন। স্পষ্ট বোঝা যায়, চণ্ডীদাস একটি আদর্শ অনুসারে চলেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন রাধা যদিও লক্ষ্মীর অবতার, নিজস্বরূপ সম্বন্ধে তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন বলে কৈশোরারম্ভে তিনি কৃষ্ণের প্রতি বিমুখ ছিলেন, নিজসংসারে আসক্ত ছিলেন, আর কৃষ্ণ প্রণয় নিবেদন করে, ঐশ্বর্য দেখিয়ে প্রয়োজনে অর্ধাঙ্গিনীর উপর বলপ্রয়োগে তাঁকে উন্মুখী করবার চেষ্টা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিঃসীম ভাবের রাজ্যে তাঁকে সমুত্তোলিত করতে সমর্থ হয়েছেন। কৃষ্ণকীর্তনকারই প্রথম দেখালেন যে, মূলে যে-রাধা স্বকীয়া (লক্ষ্মী), তিনি নরলীলায় পরকীয়ারূপে প্রতিভাসিতা, তাঁর সাংসারিক কৌলীন্য এবং গুরুজন স্বামী সবই আছে, এমনকি লৌকিক

১. 'অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ' ইত্যাদি।

গ্রাম-সম্পর্কে তিনি কৃষ্ণের অনধিগম্যাও বটেন। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার ভাগিনেয়-মাতুলানী বাহ্যসম্পর্ক কৃষ্ণকীর্তনকারের নির্মিত নয়, পুরাণ অনুসারে গ্রথিত। তা ছাড়া এরকম সম্পর্ক নির্ধারণে চরম পরকীয়ত্বই ব্যঞ্জিত হয়েছে। লৌকিক প্রণয়ের ব্যাপারে বিষয়টি রসাভাসে দাঁড়ায়। (মুনি-গুরুপত্নীগত প্রণয় হলে রসাভাস হয়, তবে তাতেও কাব্যের নিতান্ত হানি ঘটে না), কিন্তু এক্ষেত্রে পরকীয়া-প্রীতির স্বরূপ প্রতিপাদক ধার্মিক কবির কোনো উপায় ছিল না। যাঁরা কৃষ্ণ-কীর্তনের এই গায়ের-জোরে প্রণয় এবং বিরুদ্ধ সম্পর্কের ব্যাপারে নাসিকা কুঞ্চন করেন তাঁরা ধর্মসম্পর্কে কথা বলেন, অথচ লোকাচারকেই প্রাধান্য দেন, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে? কৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ এবং প্রণয়রীতিবিরুদ্ধ লোক-সম্পর্কই প্রমাণ করে যে কাব্যটি মূলতঃ লৌকিক নয়। কৃষ্ণ-বলরাম নারায়ণের এবং রাধা লক্ষ্মীর অবতার এই পৌরাণিক বিষয়টি ধরে নিয়েই কৃষ্ণকীর্তনের প্রণয়রসানুসরণে প্রবৃত্ত হতে হবে, বৃদ্ধ চণ্ডীদাসেরও তা-ই অভিপ্রেত। আর গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রণয়তত্ত্ব কৃ-কীতে নেই (নেই কি?) এমন আক্ষেপ নিষ্ফল, কারণ পূর্বেকার (মূলে স্বকীয় লীলায় পরকীয়) রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ে তা থাকা প্রত্যাশিতও নয়। মোটের উপর একথা অস্বীকার করা যায় না যে বৃদ্ধ চণ্ডীদাসধর্মকে মূল রেখে তার উপর কাব্যানুগত প্রণয়কলাবিলাসের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন। মহাপ্রভু যে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহভাবের পদ আস্বাদন করে তৃপ্তি পেতেন এ বিষয়ে সন্দেহ কি?

কবি বিদ্যাপতিও যে ধর্মের বিষয় স্মরণে না রেখে শুধু কাব্যের জন্যই কৃষ্ণরাধাকে অবলম্বন করেছিলেন, এমন ধারণায় বাধা আছে। বাধা তাঁর মাথুর, ভাবসম্মিলন প্রভৃতির পদে এবং অনিবার্যভাবে তাঁর প্রার্থনার পদে। আমাদের মনে হয়, বৃদ্ধ চণ্ডীদাসের নবীন সমসাময়িক কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়লীলা নিয়ে কাব্যরচনায় উৎসাহিত হন। সেকালে পশ্চিমবঙ্গ-গৌড়-মিথিলা ভাষা ও সংস্কৃতিগত সম্পর্কে পরস্পর খুবই নিকটবর্তী ছিল এবং চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার এবং পরে বিদ্যাপতির মানসিক পরিবর্তন নিছক জনশ্রুতি নাও হতে পারে।

অতএব, বাঙলা-মিথিলার এই তিন কবির দিক লক্ষ্য করে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে কাব্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়েও তৎকালীন ধারায় বৈঞ্চবধর্মের বিস্তৃতি ঘটছিল।

একালে শাস্ত্রানুগত ভক্তিভাবুকতার সঙ্গে সহজ অনুরাগের পথ কবি এবং ভক্তিসাধকদের আকর্ষণ করেছিল। এ বিষয়ে সূফী সাধকদের দান অবশ্য স্মরণীয়। ইসলাম ধর্মের সূফী শাখার সাধনার সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্ক আরও পূর্বেকার। এমনও মনে করা যেতে পারে যে খলিফাদের রাজত্বের সময় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ধরে ভারতবর্ষের সঙ্গে আরব ও তুরস্কের যে বিস্তৃত বাণিজ্য সম্পর্ক এবং ভাবগত আদান-প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তার ফলেই ইসলামধর্মে বৈরাগ্যমূলক জীবনাদর্শ ও রহস্যভাবুকতার স্পর্শ লাগে এবং পৃথক আচার-আচরণ নিয়ে সন্ন্যাস আশ্রয় করে সূফীরা ধীরে ধীরে প্রায় নতুন ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে পড়েন। এই সময়েই দাক্ষিণাত্যের আলবার সম্প্রদায়ের প্রেম-ভক্তির স্পর্শও তাঁরা লাভ করেন। কিন্তু সূফী সাধকেরা সকলেই যে বিশুদ্ধ ভক্তিপথের পথিক ছিলেন এমন নয়। এঁরা অনেকেই অদ্বৈত জ্ঞানের পথও নির্বাচন করেছিলেন, আবার কেউ কেউ

সূফী ধর্মসাধনা

দেহতত্ত্বগত সাধনাতেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। মোটের উপর সমগ্রভাবে এঁদের সাধনার ধারা লক্ষ্য করলে প্রথম দিকে ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনের খণ্ডছিন্ন রূপ এবং মিলন-মিশ্রণই দেখা যায়। পরে অনুরাগ ও প্রেমের পথ প্রাধান্য লাভ করে। নবম শতাব্দীর বিখ্যাত সূফী সন্ন্যাসিনী রাবেয়া শ্রদ্ধা ভক্তির পথ প্রদর্শন করেন। ঐ শতকেই হল্লাজ, শামসুদ্দীন তাব্রিজী, সাধুশ্রেষ্ঠ বায়াজিদ্ প্রমুখ সাধকগণ মধ্য-প্রাচ্যের ধর্মস্রোতে নব ভাবুকতার জোয়ার এনেছিলেন। এই ভাবুকতা কাব্য-কবিতায় সঞ্চারিত হতে বিলম্ব হয়নি এবং দাক্ষিণাত্যের আলবার সম্প্রদায়ের মত এক শ্রেণীর সাধক-কবি দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে পারস্যদেশে আবির্ভূত হয়ে পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজ্যগুলিতে তাঁদের ধর্ম ও সাহিত্যকীর্তির প্রভাব বিস্তার করেন। এঁদের মধ্যে শাস্ত্রীয় ধর্মাচরণের বিরোধী এবং রাগময়ী ভক্তির পক্ষপাতী জালালুদ্দীন রূমী, সাদী, নিতান্ত ঈশ্বরপ্রেমিক হাফিজ, সুন্দরের উপাসক জামী প্রভৃতি বিখ্যাত। রূমীর বহু কবিতার ভাবানুবাদ উর্দু-হিন্দীর মধ্য দিয়ে বাঙলা পদেও অনুসৃত হয়েছে।

মনে হয় ভারতে তুর্কি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই সূফী ফকির-দরবেশেরা এদেশে আসতে আরম্ভ করেছিলেন, তবে দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকেই এঁদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আসাম পর্যন্ত বহু নগর জনপদে এঁদের সাধনপীঠসমূহ গড়ে ওঠে। নৃত্যগীতে মনের ভাব উৎসারিত করতেন এমন চিস্তি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক খাজা মৈনুদ্দীন মহম্মদ-ঘোরীর সঙ্গেই এসেছিলেন। এই সব সিদ্ধ পীর-ফকিরদের ঈশ্বরাসক্তি এবং অলৌকিক কার্য (কেরামত্) দর্শনে যেমন বহু হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি এঁদের রাগভক্তির প্রভাবে বৈষ্ণবদের পূর্বপ্রচলিত বৈধভক্তির ধারাও দ্রুত পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করছিল। মাধবেন্দ্রপুরী ও নিত্যানন্দের অশ্রু কম্প মূর্ছাদি বিকার তৎকালীন ভক্তিসাধনায় এক অদ্ভুত বস্তু। এঁদের প্রত্যক্ষ সূফী সংসর্গের কথা জানা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায় যে তাঁরা তীর্থভ্রমণে বহির্গত হয়ে এই অলৌকিক সম্পদের স্পর্শ লাভ করেছিলেন। হরিদাস ঠাকুর সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ সূফী সংসর্গ থেকেই এসেছিলেন।

বৈষ্ণব রাগমার্গভক্তির সাধনার সঙ্গে সূফী সাধনার কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য মিল দেখা যায় এবং অনুমানে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, যে-সূফীধর্ম মূলে ভারতীয় ভাবসাধনা থেকে জন্ম ও পুষ্টিলাভ করে তা-ই আবার পরিপুষ্ট হয়ে বাঙলায় উৎপন্ন নব ভক্তিধর্মকে প্রবৃদ্ধ করেছে।

সূফীরা Pantheism এবং পরিণামবাদে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের শুদ্ধসত্তা সম্বন্ধেও অবশ্য তাঁরা আস্থাবান। তাঁদের তমজ্জুলাৎ, হুবিয়াৎ, অনীয়াৎ, ওয়াহিদিয়াৎ প্রভৃতি তত্ত্ব ঈশ্বরের নানাত্বের মধ্যে একত্বের নির্দেশক। 'লতাইফ' বা যোগাবস্থা অবলম্বন করে, এবং 'ঝিক্‌র' বা স্মরণ-মননের যোগে তাঁরা 'তজল্লী' অর্থাৎ ব্রহ্মাবোধ অনুভব করেন। পরমসত্তায় বিশ্রামলাভই সূফীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কেবল 'ফনা' অর্থাৎ অদ্বৈতানুভবজাত মুক্তি বা নির্বাণই তাঁদের কাম্য নয়। 'ফিল্লাহ্' অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে নিজ অস্তিত্বের অনুভব, 'বজদ্' ভাবসম্মিলনজাত আনন্দ-আবেগময় অবস্থা এবং 'বকা' অর্থাৎ দিব্যরসাবস্থাই তাঁদের সাধনার অভিপ্রেত শেষ অধ্যায়। সূফীদের 'হাল' এবং প্রেমাধীন বৈষ্ণবের দশাপ্রাপ্তি একই

ব্যাপার। সাধনভক্তির পর্ব শেষ হলে ঈশ্বরকৃপায় আপনা থেকেই প্রেমের উদ্ভব ঘটে (তুঁ 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥')। সূফীদের 'হাল'ও সাধনা-নিরপেক্ষ ঈশ্বরের দান। ভক্তের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন 'হাল' নয়। সূফীদের এই সব ভাবাবস্থার পরিচয় অবশ্য শ্রীমদ্‌ভাগবতেও রয়েছে। যেমন একাদশ স্কন্ধে—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

কিন্তু সাধকদের চরিতে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় সূফীদের মধ্যেই প্রথম পাওয়া গেল। আবার শ্রীমদ্‌ভাগবতে কথিত শ্রবণাদি সাধনভক্তির বিবিধ পথগুলির প্রয়োজনও সূফীধর্মে স্বীকৃত হয়েছে দেখতে পাই, যেমন নমাজ (বন্দনা), তিলাবৎ (অধ্যয়ন ও শ্রবণ), ঝিক্‌র (স্মরণ, জপ), মুরাকাবা (ধ্যান), ঔরাদ্ (অভ্যাস) প্রভৃতি। সূফী আউলিয়ারা তীর্থভ্রমণের উপর জোর দিয়ে থাকেন, তা ছাড়া এই পথে গুরুর (শেখ বা পীর) প্রয়োজনও তাঁরা স্বীকার করেন। তাঁদের গুরুও অলৌকিক শক্তিবলে শিষ্যের দেহে শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ। সূফীদের সঙ্গে রাগভক্তি পথের সাধকদের ঐসব সাধনপথ ও চারিত্রিক সাদৃশ্যের বিষয়টি আলোচনা করে গবেষণার দ্বারা সত্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আমরা বিষয়টি সামান্যভাবে এখানে উপস্থাপিত করলাম মাত্র।[১]

(২) দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভক্তিধর্মের দার্শনিক আলোচনার প্রসার ঘটে। অষ্টম শতকের পূর্বে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ দর্শনের সূক্ষ্ম তর্ক-বিতর্কের কাল। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে শংকরাচার্য বৌদ্ধ শূন্যতাবাদ খণ্ডন করে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করেন। তাঁর মতে ব্রহ্মই সত্যবস্তু এবং ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় অপর কোনও সত্য নেই। বৌদ্ধ শূন্যতাবাদে অস্তিত্ব আছে এমন কোনো চরম পদার্থ স্বীকৃত হয়নি। শংকর সেই স্বীকৃতি দিলেন, বৌদ্ধদের সঙ্গে তাঁর দার্শনিক অনুভবের এই গুণগত পার্থক্য। কিন্তু সদ্‌বস্তু বলে কোনো সত্তা আছে এই বিষয়টি স্থিরীকৃত হলে পর শংকরাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তার যে স্বরূপ নির্ণয় করলেন এবং যেভাবে সৃষ্টি এবং জীবের ব্যাখ্যা করলেন তাতে ভক্তিভাবুক দার্শনিক সম্প্রদায় সন্তুষ্ট না হতে পেরে স্বতন্ত্রভাবে এগুলি সম্পর্কে নিজ মনন প্রকাশ করলেন, শংকরাচার্যের অভিমত খণ্ডন করতেও প্রয়াসী হলেন। এইভাবে বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত প্রভৃতি অভিমত গড়ে উঠল। এই অভিমতগুলির পারস্পরিক নগণ্য কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও এদের সবগুলিই অদ্বৈত থেকে বিশেষভাবে পৃথক্ এবং এইখানে এগুলির একাভিমুখীতা।

শংকরাচার্য ও তৎসম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদীদের মতো জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সৎ, অন্য যা-কিছু অ-সৎ। এ জ্ঞান শুদ্ধ, নির্বিশেষ, নির্গুণ। চরম সত্যের দিক থেকে সৃষ্টিও অসৎ, দৃষ্ট অদৃষ্ট যাবতীয় বস্তু ব্রহ্মই, অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে অসৎ বিষয়ে আমাদের সদ্‌বুদ্ধি আসে, বস্তু ও জীবময় বিশ্বকে আমরা সত্য বলে মনে করি। সৃষ্টজগৎ ব্রহ্মের 'বিবর্ত'। বিষয়টিকে তিনি রজ্জুতে সর্পভ্রম বা শুক্তিতে রজতভ্রমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবপক্ষে অজ্ঞান বা ভ্রমযুক্ত জ্ঞানকে লক্ষ্য করে 'অবিদ্যা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর ব্রহ্মপক্ষে সৃষ্টির দিক

১. ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Islamic Mysticism–Iran & India প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

থেকে 'মায়া' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। শংকর সম্প্রদায়ের মতে অবিদ্যার দুটি বৃত্তি—আবরণ এবং বিক্ষেপ। আবরণবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ জীবের শুদ্ধজ্ঞানকে আবৃত করা হচ্ছে আর বিক্ষেপের দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান জন্মানো হচ্ছে। জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি জীবকে ব্রহ্মই বলেছেন। অবিদ্যাজাত উপাধির জন্যই জীব নিজের পৃথক অস্তিত্ব অনুভব করে। এ বিষয়ে শ্রীশংকর প্রতিবিম্ব এবং পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন একই আকাশ ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে ঘটাকাশ আখ্যা গ্রহণ করতে পারে, তেমনি একই ব্রহ্ম বুদ্ধি বা অবিদ্যাজাত উপাধি দ্বারা সীমিত হয়ে জীবরূপে প্রতিভাত হয়। আবার অবিদ্যা বা বুদ্ধির দর্পণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়লে যা হয় তাকেই বলা হয়ে থাকে 'জীব'। তাঁর মতে জীবের মধ্যে অবশ্য চিৎ রয়েছে, কিন্তু তা উদাসীন সাক্ষীভাবে আছে। তার সঙ্গে রূপাদি-বিষয়ভোগের কোনো সম্বন্ধ নেই। ভোক্তা হল উপাধিজন্য বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণ। লৌকিক ব্যবহারিক জ্ঞানও এতেই সীমিত। তবে অন্তঃকরণের জ্ঞানরূপ বৃত্তি ঐ সাক্ষীস্বরূপ শুদ্ধ চিৎ-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে। অন্তঃকরণের সর্বদা অবিদ্যাজাত উপাধির যোগ থাকে বলে শুদ্ধ চিৎ প্রত্যক্ষীভূত হয় না। ঐ উপাধির বিনাশেই অন্তঃকরণের বিনাশ এবং জ্ঞানের স্বপ্রকাশে মুক্তি। তখন জীব ব্রহ্মবিৎ হয়ে ব্রহ্মই হয়ে পড়ে।

শংকর—অদ্বৈত

বেদান্তের অদ্বৈতানুগ ব্যাখ্যায় 'মায়া'র উপস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাংখ্যের 'প্রকৃতি'র মত জড় হলেও মায়াকে শংকর ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলেন না, কারণ তাহলে দ্বৈততত্ত্ব এসে পড়ে। আবার ব্রহ্ম থেকে অপৃথকও বলছেন না, কারণ, বিজ্ঞানের আবির্ভাবে মায়া আর থাকে না। মায়াকে সৎ বা অসৎ কোনো অভিধা দ্বারাই নির্দেশ করতে পারা যায় না। মায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক 'তাদাত্ম্য'। মায়া অনাদিও বটে। মায়াই জীবপক্ষে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কাজ করে। মায়ার আশ্রয় এবং বিষয় উভয়ই ব্রহ্ম হলেও ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, যেমন হন না যাদুকর ইন্দ্রজালের দ্বারা। শংকর কিন্তু লৌকিক সংসার এবং ব্যবহারিক জ্ঞানকে ডাহা মিথ্যা বলেননি। প্রাতিভাসিক সত্য বলেছেন। এ থেকেই পরমার্থে পৌছানো যায় এমনও মনে করেন। শুধু অবিদ্যার বিনাশ ঘটলেই হল। শংকরমতে ব্রহ্ম বিশ্বের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান কারণ—দুই-ই, কিন্তু যথার্থভাবে দেখতে গেলে কোনো সৃষ্টিই হচ্ছে না, তাঁর মায়ার স্ফুরণে রূপরসগন্ধময় বিশ্ব সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। জলের যেমন তরঙ্গ বুদ্বুদ ফেনা, তেমনি সৃষ্ট পদার্থনিচয়ের ভিন্ন নাম, কিন্তু তত্ত্বতঃ সব একই বস্তু।

নির্গুণ ব্রহ্ম জীবের আয়ত্তগম্য নয় বলে, ধারণার অতীত বলে, ধার্মিকদের ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজনে শ্রীশংকর সগুণ ব্রহ্মেরও স্থাপনা করেছেন। ইনি মায়ামুক্ত, উপাধিগত ব্রহ্ম। ইনি ঈশ্বর, মায়াস্পৃষ্ট হয়ে সৃষ্টি পালন লয়ের কার্য করেন। জীব এই ব্রহ্মকে ধারণা মধ্যে এনে তার ধর্মরসতৃষিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করে। অবিদ্যাবিমোহিত জীবের এই পর্যন্ত সীমা।

শ্রীশংকর-ভাবিত মূলতত্ত্ব এবং অন্যান্য তত্ত্বগুলি পরবর্তী ভক্তিবাদীরা গ্রহণ করেননি এবং যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে ভিন্নমত স্থাপনের প্রয়াস করেছেন। এ সম্পর্কে প্রথম এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিমত হল একাদশ শতাব্দীর দাক্ষিণাত্য ভক্তি-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রীরামানুজাচার্যের। আলবার সম্প্রদায়ের উচ্ছ্বসিত রাগভক্তিপ্রবাহ নিরুদ্ধ হয়ে

আচার্য বা তাত্ত্বিকদের উদ্ভব হয়। এঁদের মধ্যে নাথমুনি, যামুনাচার্য, ভাস্কর প্রসিদ্ধ। এঁদের ভক্তিতত্ত্বে পরিপুষ্ট হয়ে শ্রীরামানুজ নিয়মানুগভাবে অদ্বৈতমতখণ্ডনে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ অস্বীকার করে শ্রী-ভাষ্য বলে প্রচলিত বেদান্তভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রবর্তন করেন। তাঁর অভিপ্রায় সংক্ষেপে বিবৃত হচ্ছে।

রামানুজ শংকরকথিত জ্ঞানের স্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ, মায়া এবং জীবস্বরূপ প্রায় সমস্ত কিছুকেই তাঁর বিচারের অন্তর্ভুক্ত করে এই ধারণায় আসেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ, কেবল জ্ঞানস্বরূপ বস্তু নন। তিনি সগুণ, তিনি বিশিষ্ট, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে ও জীবজগতে পরিণত হয়েছেন। শ্রীপাদ রামানুজ শ্রীশংকরের মতই উপনিষদের মন্ত্রসমূহ উদ্ধার করে এবং ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যা করে স্বাভিমত স্থাপন করেছেন তাঁর শ্রীভাষ্যে। এছাড়া 'গদ্যত্রয়', 'বেদার্থ-সংগ্রহ' প্রভৃতি নিবন্ধেও তাঁর বিবিধ বক্তব্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

রামানুজ—বিশিষ্টাদ্বৈত

রামানুজ শংকরের জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন। তাঁর মতে শুদ্ধজ্ঞানের অনুভব সম্ভব নয়। নির্বিকল্প শুদ্ধজ্ঞান কল্পিত তত্ত্বমাত্র। তাঁর মতে জ্ঞান সর্বদাই সবিকল্প, বিশিষ্ট, কারণ জ্ঞেয় পদার্থ ছাড়া জ্ঞান থাকতে পারে না। জ্ঞান নিজেকে জানতে পারে না। জ্ঞান অন্যাপেক্ষী। আবার জ্ঞানকে তিনি জ্ঞাতা আত্মা বা ঈশ্বরের গুণ বলে মনে করেন। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এ দুয়ের মধ্যে জ্ঞান একটা সম্বন্ধের কাজ করে মাত্র। শংকর এই বিশিষ্ট লৌকিক জ্ঞান নিয়ে শুদ্ধ জ্ঞানকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করছেন তা বোঝা যায় না।

শংকর-মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ, শুদ্ধ চিৎ, শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম অদ্বৈত। শংকর এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে উপনিষদ থেকে 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' প্রভৃতি বাক্য প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করেছেন, এবং ঐভাবে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছেন। রামানুজের মতে ব্রহ্ম অদ্বৈত, কিন্তু নির্বিশেষ নয়, সর্বদাই সবিশেষ, সগুণ। বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি ব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং সগুণত্বই উপলব্ধি করেছেন। তা ছাড়া 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'রসো বৈ সঃ। রসো হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি' প্রভৃতি বহু শ্রুতিবাক্য তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপিত করেছেন। বিভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে যে-সব উক্তি আছে তার অনেকগুলিই পরস্পর-বিরোধী। যে-যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলেছে তারাই আবার স্থানান্তরে তাকে সবিশেষ বলেছে। দার্শনিকেরা স্বমতের অনুকূলে সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রথিত করেছেন। রামানুজাচার্যের মতে জীবাত্মা এবং জড়বস্তু নিয়ে এই যে বিশ্ব এ হ'ল ব্রহ্মের দেহ। ঈশ্বর এবং সৃষ্টি মিলে তবেই একটি সমগ্র সত্তা। বিশ্বের যাবতীয় পৃথক্ পদার্থ তাতেই নিহিত। চিৎ সত্য, অচিৎ সত্য, ঈশ্বর সত্য। ঈশ্বর এই হিসাবে অদ্বৈত যে তাঁর বহিরঙ্গে পৃথক্ বস্তু কিছু নেই। কিন্তু অন্তরঙ্গে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। তাঁর দেহই বহু বিচিত্র। সৃষ্টির সঙ্গে ঈশ্বরের দেহ-দেহী সম্বন্ধকে তিনি আর-এক ভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। একে তিনি একাত্মকতার সম্বন্ধ বলেননি, বলেছেন অ-পৃথক্‌সিদ্ধি। সুতরাং শ্রীরামানুজ ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের 'ভেদ নিয়ে তবেই অভেদ' এরকম সম্পর্ক স্থির করেছেন। এখানে স্পষ্টতই পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক Hegel-এর সঙ্গে তাঁর উপলব্ধির মিল দেখা যায়। Hegel-এর Absolute শুধু Being নয়, Becoming-ও। বিচিত্র নিয়ে বিরোধ নিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করাই এই অদ্বৈতের স্বধর্ম।

শ্রীরামানুজ বিশ্বের সঙ্গে ঈশ্বরের যে সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন তাতে মায়া বা প্রকৃতিকে সৃষ্টির পৃথক্ কারণরূপে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে ঈশ্বরের স্বরূপে যে চিৎ এবং অচিৎ রয়েছে তা থেকেই জীব ও জগৎ পরিণাম লাভ করেছে। সৃষ্টি বিষয়ে মায়ার কর্তৃত্ব স্বীকার না করায় শংকরের মায়াবাদ বা বিবর্তবাদকে তিনি মেনে নেননি। 'বিবর্ত' শব্দের অর্থ ভ্রান্তি। ভ্রান্তিরতস্মিস্তদ্‌বুদ্ধিঃ। এ বিষয়ে শংকরের বিখ্যাত দৃষ্টান্ত 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' বা 'শুক্তিতে রজতভ্রম'। রামানুজ বলেছেন, ভ্রমের কোনো ব্যাপারই নয়, এ সব সত্য। 'ভ্রান্তি'র বিষয়টি আলোচনা ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে ভ্রমের মধ্যেও সত্য উপলব্ধির স্পর্শ থাকে। সৃষ্টি বিষয়ে বিবর্তের স্থানে তিনি পরিণামবাদ অঙ্গীকার করেছেন। দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণয় হয়, কতকটা তেমনি স্বাভাবিকভাবেই বিকারী সগুণ-ঈশ্বর স্বীয় সত্তাকে অবিকৃত রেখেও জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। যেমন মৃত্তিকা থেকে ঘট হলেও ঘটের মৃত্তিকাগুণের পরিবর্তন হয় না। শ্রীশংকরের মতে এরকম হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়, না সমগ্রের পরিণাম, না কল্পিত অংশের পরিণাম। সমগ্রের পরিণাম হ'লে ব্রহ্ম বলতে কিছুই থাকে না, প্রত্যক্ষ জগৎই ব্রহ্ম হয়ে পড়ে, আর, ব্রহ্ম অংশের দ্বারা বিভক্ত হবেন কিরূপে? শ্রীরামানুজ যুক্তির দিকে না গিয়ে বরং শ্রুতির ব্যাখ্যার দ্বারাই বিষয়টি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। পরে আমরা দেখব, বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ কিভাবে শক্তিতত্ত্বের আশ্রয়ে বিষয়টির সমাধানমূলক ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। শংকরের কল্পিত মায়াবাদের উপর রামানুজ অবশ্য যুক্তির দ্বারাই রূঢ় আঘাত হানতে প্রয়াসী হয়েছেন। শংকরমতে মায়া অনির্বচনীয়। অর্থাৎ সৎ কি অসৎ এই বিশেষণে বোঝা যায় না। রামানুজের মতে মায়া ঈশ্বরের বাস্তব শক্তি, সৃষ্টি-পালন-লয়কর্ত্রী। অবিদ্যা বলতে তিনি জীবের অজ্ঞানকে লক্ষ্য করেছেন। শংকরের মতো তিনিও মনে করেন যে পরজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞানে অবিদ্যার বন্ধন ছিন্ন করা যায়। কিন্তু অবিদ্যা, জ্ঞান, বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ধারণা শংকর থেকে ভিন্ন। মায়াবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ যে সব আপত্তি তুলেছেন তা একরকম ভক্তিবাদী বিভিন্ন সম্প্রদায় সকলের সপক্ষেই প্রযোজ্য। (১) মায়া বা অবিদ্যার আশ্রয় কোথায়? যদি ব্রহ্মে হয় তাহলে ব্রহ্মের শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপের হানি ঘটে, ব্রহ্ম সগুণ হয়ে পড়ে। (২) যে অবিদ্যা জীবের অজ্ঞানের কারণ, তা আবার কার্যরূপে জীবে থাকে কিভাবে? যে অবিদ্যা জীবের আশ্রয়, তার আশ্রয় আবার জীব এ স্ববিরোধী কথা। (৩) জ্ঞানের আবির্ভাবে অবিদ্যার বিনাশ ঘটে ব'লে অবিদ্যাকে শ্রীশংকর 'সদসদ্ভিরনির্বাচ্যা' বলেছেন। কিন্তু সৎও নয়, অসৎও নয় এমন বস্তু যুক্তিতেও সিদ্ধ নয়। অবিদ্যা 'সৎ' হলে অসত্তাবাচক অর্থাৎ নেতিবাচক হবে কেন? যদি অসৎ হয় তাহ'লে ব্রহ্মে বিশ্বভ্রমই বা ঘটায় কিভাবে? (৪) নির্বিকল্প জ্ঞানকে অবিদ্যার নিরাকরণকারক বলা হয়েছে, সে জ্ঞান যখন সম্ভব নয় (কারণ জ্ঞান মাত্রেই সবিকল্প) তখন অবিদ্যার নিরাকরণও সম্ভব নয়। অবিদ্যা যদি 'ভাবরূপ' হয় তাহলেও তার নিরাকরণ সম্ভব নয়। (৫) শংকর-সম্প্রদায় বিবর্তকে অধ্যাসের কার্য বলেছেন। যেমন শুক্তিতে রজতের অধ্যাসবশতঃ ভ্রম, ব্রহ্মে জগতের অধ্যাসবশতঃ ভ্রম। অধ্যাস পূর্বস্মৃতিরূপ। রজতের পূর্বস্মৃতি থাকলে তবেই সেই সূত্রে অধ্যাস আসতে পারে। তাহ'লেই তো জগতের স্মৃতি অর্থাৎ জগতের বাস্তব অস্তিত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তা

ছাড়া ভ্রান্তির মধ্যেও সত্যের ধারণা ঘটে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সর্পবৎ ব'লে। প্রস্তর-কুক্কুরাদির ভ্রান্তি তো ঘটে না। ভ্রান্তি-নিরপেক্ষ জ্ঞান সম্ভব কিনা তা-ও বিচার্য। (৬) অবিদ্যার প্রমাণ নেই। জ্ঞানে এ বস্তুকে ধরা যাচ্ছে না, প্রত্যক্ষে নয়, অনুমানেও নয়। শ্রুতিতে—'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্' এবং 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়েতি' (শ্বেতাশ্বতর)—প্রভৃতিতে ব্রহ্মের সত্য শক্তির কথাই বলা হয়েছে। অতএব রামানুজ মায়াকে ঈশ্বরের শক্তি ব'লে স্বীকার করেছেন। মায়ার সত্যতা নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অধ্যক্ষতায় মায়ার কার্যকারিতা নির্ণয় করেছেন।

শংকরের মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই ('তৎ ত্বম্ অসি')। উপাধি এবং সেই সঙ্গে অবিদ্যার বিনাশে জীব তার স্বরূপ লাভ করে। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। রামানুজের মতে জীব ঈশ্বরের চিদংশ। আত্মা অনাদি, অজর, অমর হলেও পরমাত্মার আশ্রিত। জীব কর্মফলভোক্তা। অজ্ঞান এবং কর্মের জন্য সংসারে বদ্ধ। সুতরাং কর্মবন্ধ নাশ হলে জ্ঞানও আবরণহীন হয়ে পড়ে এবং জীবাত্মা ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ ক'রে তাঁর পরিবারভুক্ত হয়ে পড়ে ও অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ ভোগ করে। মুক্তির জন্য শ্রীরামানুজ জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয় গ্রহণ করতে বলেছেন। তাঁর মতে পরজ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠা ভক্তি একই বস্তু। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম করতে করতে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয়। জীব যখন স্মরণ, উপাসনা, নিদিধ্যাসনে রত হয় এবং শরণাগতি বা প্রপত্তি প্রার্থনা করে, তখন ঈশ্বরকৃপায় চরম জ্ঞানের আবির্ভাবে সে মুক্ত হয়ে যায়। আমরা পরে দেখব অন্যান্য বিষয়ে রামানুজের অভিমতের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের বহু মিল থাকলেও সাধ্যসাধন বিষয়ে মিল নেই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ঈশ্বরের শক্তি হিসাবে লক্ষ্মী বা শ্রীকে স্থাপন করেছেন, কিন্তু শক্তিতত্ত্বের সহায়তায় অভেদের মধ্যে ভেদকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। প্রমাণ হিসাবে তিনি বেদ (উপনিষদ্) এবং ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করেছেন, কোনো পুরাণকে (বিশেষতঃ ভাগবতকে) নয়। তাঁর মতে নারায়ণ বা বাসুদেবই ঈশ্বর, কৃষ্ণ নন। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য ঈশ্বরের এই চার মূর্তিতে বিলাস (চতুর্ব্যূহ) এবং যুগাবতাররূপে প্রকাশ ও শ্রীরামানুজের চিন্তিত বিষয়। শ্রী বা লক্ষ্মীর কল্পনার জন্য এবং শ্রী-ভাষ্য রচনার জন্য তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী-সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদায় ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শ্রীরামানুজের আবির্ভাবের স্বল্পপরবর্তী সময়ে নিম্বার্ক উদিত হয়ে পূর্ববর্তী ভাস্কর-মতকেই কিঞ্চিৎ পরিবর্তনসহ উপস্থাপিত করার প্রয়াস করেন। ভাস্করের মত তাঁর অভিমতকেও ভেদাভেদ (যুগপৎ ভেদ ও অভেদ) বা দ্বৈতাদ্বৈত নামে অভিহিত করা হয়েছে, এবং তাঁর

নিম্বার্ক

সম্প্রদায়কে বলা হয়েছে সনক-সম্প্রদায়। রামানুজের মত ইনিও ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, জগৎ-কারণ, অপ্রাকৃতবহুগুণাধার প্রভৃতি রূপে উপলব্ধি করেন। পার্থক্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বর এবং রাধাকে তাঁর শক্তি বলে তিনি অনুভব করেছেন। এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিমতের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। রামানুজের মতো তিনিও জীবাত্মাকে স্বরূপতঃ চেতন, জ্ঞানাশ্রয়, ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত, ঈশ্বরাশ্রিত, পরিমাণে অণু এবং সংখ্যায় অনন্ত প্রভৃতি মনে করেন। পার্থক্য এই যে, চিৎ এবং অচিৎময় বিশ্বকে তিনি ঈশ্বরের দেহ ব'লে মনে করেন না, শক্তির পরিণাম ব'লেই চিন্তা করেন।

রামানুজাচার্য ভেদকে স্বীকার করলেও তাঁর মতে অভেদের প্রাধান্য, জীবজগৎ বা যাবতীয় প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ নিয়ে ঈশ্বর একটি সমগ্র একক সত্তা। নিম্বার্কের মতে কেবল অভেদ হ'লে ঈশ্বরও দুঃখভাগী হয়ে পড়েন, তাঁর পূর্ণ শুদ্ধ সত্তা থাকে না। ঈশ্বরের এক অংশ বিকারী, অন্য অংশ নির্বিকার এমন পার্থক্যও তো হতে পারে না। আবার ভিন্ন হ'লে বিশ্ব তাঁর নিয়ন্তৃত্বের বাইরে থেকে যায়, আত্মা এবং জড়ের স্বতন্ত্র সত্তার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দিতঃ, ইত্যাদি বচনে মায়াধীশ এবং মায়াবশ ঈশ্বর-জীবে তিনি প্রভেদ নির্দেশ করেছেন। আবার চিৎ ও অচিৎ যেহেতু তাঁর শক্তি-পরিণাম বা অংশ, সেইহেতু অভেদও তাঁর মতে সত্য। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ও জগতের (চিৎ ও অচিৎ-এর) ভেদ এবং অভেদ বিষয়ে নিম্বার্ক কারণ-কার্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন। ব্রহ্ম কারণ এবং জীব ও জগৎ তাঁর কার্য। ব্রহ্ম অংশী—জীব ও জগৎ অংশ, ব্রহ্ম জ্ঞেয়—জীব জ্ঞাতা, ব্রহ্ম উপাস্য—জীব উপাসক, অন্তর্যামী ব্রহ্ম নিয়ন্তা—জীব নিয়ন্ত্রিত। আবার ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জগৎ জ্ঞানহীন। যেমন, কারণই কার্যরূপে অভিব্যক্ত হ'লে কারণগুণ কার্যগুণে বর্তমান থাকে, তেমনি ব্রহ্ম এবং জীবের মূলে কিছু ঐক্য আছেই। নিম্বার্ক এই ভেদ ও অভেদকে স্বাভাবিক মনে করেছেন ব'লে তাঁর অভিমতকে বাস্তব ভেদাভেদবাদও বলা হয়। জীব ভক্তির চর্চা ক'রে শুদ্ধজ্ঞানলাভে সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির অধিকারী হয়—এসব তত্ত্ব তিনি রামানুজাচার্যের সদৃশভাবেই উপস্থাপিত করেছেন।

শ্রীচৈতন্য-পূর্ব অপর উল্লেখযোগ্য ভক্তি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্বাচার্য। ইনি ভেদবাদী বা দ্বৈতবাদী—অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে জীব বা জড়জগৎ বাস্তবিক ভিন্ন এরকম মত পোষণ করেন। সুতরাং ভক্তিবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্বই শংকরের সবচেয়ে প্রবল বিরুদ্ধবাদী। শংকরের অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদকে তিনি মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ব'লেই মনে করেন। তিনি পাঁচ প্রকারের ভেদ দেখিয়েছেন—ঈশ্বরে ও জীবাত্মায় ভেদ, জীবাত্মা ও জীবাত্মায় ভেদ, আত্মা ও জড়ে ভেদ, ঈশ্বরে ও জড়ে ভেদ এবং জড়ে ও জড়ে ভেদ। এমনকি তিনি মুক্ত আত্মার মধ্যেও বিজ্ঞান ও আনন্দ উপভোগের তারতম্য নির্দেশ করেছেন। মধ্বের মতে সমস্ত জ্ঞানই হচ্ছে ভেদমূলক। কোন বস্তুকে জানার অর্থ অন্য বস্তু থেকে পৃথক ক'রে জানা। রামানুজের মত তিনি বিশ্ব এবং তার যাবতীয় বৈচিত্র্যকে সত্য ব'লে মনে করেন, কিন্তু রামানুজের মত অ-পৃথকসিদ্ধির ধারণা অঙ্গীকার করেন না। রামানুজ যাকে গুণ ও ধর্ম বলেছেন, ইতি তাকেই পৃথকত্ব বলেছেন। রামানুজের মতে ভেদ স্বতন্ত্র সত্য ব্যাপার নয়, ঐক্যের ধর্ম মাত্র। মধ্বের মতে বিভেদই বাস্তব সত্য। আবার ঈশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার ক'রে জীব ও জড়কে বা প্রকৃতিকে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল বা ঈশ্বরেচ্ছায় ক্রিয়াশীল বলে তিনি বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে সবিশেষ ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, আর জীব অ-স্বতন্ত্র। রামানুজের মতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ দুই-ই, মধ্বের মতে নিমিত্ত-কারণ মাত্র, উপাদান-কারণ প্রকৃতি। রামানুজের মতে সব জীবাত্মাই সমান। মধ্বের মতে এক জীবাত্মা অন্য থেকে পৃথক, এমনকি, মুক্তির পরেও আনন্দ-তারতম্য লাভ ক'রে পৃথক সত্তা নিয়েই বর্তমান থাকে, যেমন—

মধ্বাচার্য

মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্দেহং সংশ্রিতা অপি।
তারতম্যেন তিষ্ঠন্তি গুণৈরানন্দপূর্বকৈঃ ॥

সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য এবং সারূপ্য এই চারপ্রকার মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিতেও ঈশ্বর জীবাত্মার পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। মাধ্বমতে উপাস্য হলেন বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ বা লক্ষ্মীনারায়ণ, ব্রজলীলারসিক কৃষ্ণ নন। এই অংশে রামানুজের সঙ্গে তাঁর মিল, কিন্তু সাধনপথ সম্পর্কে কিছু পার্থক্য আছে। রামানুজ-মতে ভক্তিসহায়ক কর্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানের চর্চা, মাধ্বমতে বর্ণাশ্রমধর্মপালন এবং কর্মফল কৃষ্ণে সমর্পণ, পরিশেষে জ্ঞান। মহাপ্রভু-প্রদর্শিত গৌড়ীয় মতে রাগানুগা ভক্তির সাধনই অনন্য পথ, আর লক্ষ্য মুক্তি নয়, ব্রজপরিকরদের মধ্যে স্থান লাভ ক'রে স্থায়ীভাবে কৃষ্ণসেবানন্দের অধিকার লাভ। এসব আমরা একটু পরেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি। মধ্বাচার্য জীবের মুক্তি বিষয়ে কৃপণতা দেখিয়েছেন। তিনি মুক্তির অধিকারভেদ প্রদর্শন করেছেন। দেবতা, ঋষি এবং উচ্চবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণের মুক্তি হয়, কিন্তু সংসারে আসক্ত মানুষের, বিশেষতঃ আসুরভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের কদাপি হয় না, এরকম অভিমত পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে ভক্তিতত্ত্ববাদীদের সকলের থেকেই তিনি পৃথক্।

ভক্তিবিষয়ে তত্ত্ববাদীদের চতুর্থ হলেন আচার্য বল্লভ, যাঁর আবির্ভাব শ্রীচৈতন্যের সমকালে। তাঁর সম্প্রদায় রুদ্রসম্প্রদায় নামে খ্যাত। সনক-সম্প্রদায়ের নিম্বার্কের মত ইনিও শ্রীকৃষ্ণকেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পূর্ণব্রহ্ম বলে নির্ধারণ করেছেন। এই ঈশ্বর সমস্ত সদ্‌গুণের আধার এবং যাবতীয় বৈচিত্র্য এবং বিরুদ্ধতারও আশ্রয়। একই সময়ে এক এবং বহু। একোঽহং বহু স্যাম্। তাঁর ইচ্ছায় তিনি নিজেকে জড় ও চিৎরূপে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টি ভ্রম নয়, অসৎ মায়াও নয়। সৎ মায়াশক্তি অবলম্বন ক'রেই ব্রহ্ম নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টি যেমন বিবর্ত নয়, তেমনি পরিণামও নয়, অবিকৃত পরিণাম। এজন্য ব্রহ্মকে বিশ্বের উপাদান-কারণ না বলে 'সমবায়ী কারণ' ব'লে তিনি অভিহিত করতে চান। অগ্নির সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের অথবা মণির সঙ্গে জ্যোতির যে সম্বন্ধ তা-ই ব্রহ্মের সঙ্গে বিশ্বের। তিনি মায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ স্বীকার করতে চাননি। এজন্য তাঁর মতবাদকে শুদ্ধাদ্বৈত নাম দেওয়া হয়েছে। সচ্চিদানন্দের সৎ থেকে জীবদেহ, চিৎ থেকে জীবের জ্ঞান এবং আনন্দ থেকে তাঁর আত্মা বা অন্তর্যামী গঠিত ব'লে তিনি মনে করেন। এই হিসাবে জড়বস্তু ও জীব অন্তর্যামী ব্রহ্ম থেকে মূলতঃ অভিন্ন।

বল্লভ

ভাস্করমতে জীবাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, কেবল কর্মের জন্য ভিন্নাকার প্রাপ্ত। রামানুজমতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার দেহী-দেহ-সম্পর্ক। নিম্বার্কের মতে জীবাত্মা পৃথক্ এবং অপৃথক্ দুই-ই, সসীম এবং আশ্রিত এই অর্থে পৃথক্। মধ্বের মতে জীবাত্মা ঈশ্বরাধীন হলেও স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন। বল্লভের মতে অংশ বা অণু, সেজন্য কোনো গুণ প্রকাশিত, কোনো গুণ আচ্ছন্ন। পরবর্তী আলোচ্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদে জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্তির প্রকাশ, ঈশ্বরের চিদংশ, যেমন মণির জ্যোতি বা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা আবৃতস্বরূপ।

বল্লভাচার্য শুদ্ধা ভক্তির পথিক। এই ভক্তি তাঁর মতে কর্ম বা জ্ঞান থেকে আসে না। ঈশ্বরকৃপাই এর আবির্ভাব ঘটায়। ভক্তিকে তিনি বলেছেন ঈশ্বরে সুদৃঢ়ঃ সর্বতোঽধিকঃ স্নেহঃ। বল্লভাচার্য কথিত ভক্তিবাদে ঈশ্বরের মায়াসম্পর্ক-রহিতত্ত্ব, জীবস্বরূপ এবং আরও

নানা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের কথা রয়েছে ব'লে শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে অনেক অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের দ্বারা প্রভাবিত ব'লে মনে করেন।

সে যাই হোক, দেখা গেল শ্রীচৈতন্যের লীলাপ্রকাশের পূর্ব থেকে বাঙলায় এবং বহির্বঙ্গে ঈশ্বরস্বরূপ এবং ভক্তিমত একটা তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাও লাভ করছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং নবধর্মের স্বরূপ-প্রদর্শন এসব তত্ত্বের প্রতি নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধ হলেও এবং তাঁকে তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রচারক সম্প্রদায়গুরুদের মত কোনো একজন মনে করা না গেলেও, মায়াবাদ-নিরসন এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মত স্থাপনে এই সব তত্ত্ববিচার যে পরবর্তীকালে বহুল পরিমাণে সাহায্যে করেছিল সেকথা বলা বাহুল্য।

(৩) খ্রীস্টীয় দ্বাদশ-একাদশ শতাব্দী থেকে পিছনের দিকে খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে উপলব্ধি করা যায়, ইতিহাসলভ্য অনল্প দেড়হাজার বছর ধ'রে ভক্তিভাবুকতার বিস্তৃত চর্চা ভারতে হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের আলবারদের উচ্ছ্বসিত রাগভক্তিসংগীতকে যদি প্রাদেশিক ব'লে মনে করাও যায়, গীতা এবং ভাগবতপুরাণের সর্বভারতীয় প্রসারের কথা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। এ ছাড়া বহুধা বিচিত্রীকৃত রামচরিত, বিস্তৃত

পূর্বে ইতিবৃত্তে কৃষ্ণপ্রসঙ্গে

পঞ্চরাত্র-সংহিতা, দাক্ষিণাত্যে রচিত ব্রহ্মসংহিতা এবং কর্ণামৃতাদি স্তবগীতগ্রন্থ, বিষ্ণু, বায়ু, পদ্ম, মৎস্য, স্কন্দ প্রভৃতি কয়েকটি পুরাণ এবং আরও পিছনে গেলে উপনিষদ্, এমন কি, ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক উপলব্ধির বিন্যাস দেখা যাবে। ব্যাসরচিত বেদান্তসূত্রের বিপুল প্রভাব তো রয়েছেই। বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত এবং পরিশেষে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের প্রতিষ্ঠাতা গোস্বামীগণ এই সব গ্রন্থ থেকে তাঁদের স্বাভিমতের পরিপোষক বহু অংশ উদ্ধার করেছেন। এই সমস্ত ভগবদ্দর্শনমূলক রচনার মধ্যে ভাগবতপুরাণকে মুখ্যভাবে অবলম্বন ক'রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রাগাত্মিক সাধনার ধারা পুষ্টিলাভ করেছে।

ইতিহাসবিদ্ ডঃ ভাণ্ডারকর, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতগণ নারায়ণ-বাসুদেব-কৃষ্ণ উপাসনার প্রাথমিক ইতিবৃত্ত নির্ণয়ের প্রয়াস করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, বৈদিক দেবতা বিষ্ণু, যাঁকে ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞপুরুষ ব'লে অভিহিত করা হয়েছে এবং "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্" "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রে যাঁর গৌরব কীর্তিত হয়েছে তিনি শ্রেষ্ঠ দেবতা মাত্র, হতে পারেন সূর্য। নারায়ণ শব্দও প্রথম শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তৈত্তিরীয়-অরণ্যকে বিষ্ণু এবং নারায়ণকে এক দেবতা ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম কৃষ্ণের কথা পাচ্ছি, তিনি দেবকীপুত্রও, কিন্তু তিনি ঋষিমাত্র, অঙ্গিরসশিষ্য। কৃষ্ণ-নারায়ণকে ভক্তিধর্মের উদ্‌গাতারূপে ঐতিহাসিকেরা দেখেছেন। পরে তিনি বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েছেন লৌকিক ধারণায়। সূর্য-বিষ্ণু এবং সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ একই কল্পনার বিকাশ মাত্র। বিষ্ণু-নারায়ণ ও বাসুদেব-কৃষ্ণের অভিন্নতা যে খ্রীস্টপূর্বাব্দ অন্ততঃ অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত তা জানা যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যক থেকে—'নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ' ইত্যাদি। বৈয়াকরণ পাণিনিও এই অর্থেই বাসুদেব শব্দের ব্যবহার করেছেন। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে যে বাসুদেব-কৃষ্ণের মূল কাহিনীগুলি এবং কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে,

মহাভারতই তার প্রমাণ। তা ছাড়া পতঞ্জলির মহাভাষ্যে গ্রথিত—'অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণ' এবং 'জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ' প্রভৃতিও একালে পূর্ণ সংগঠিত কৃষ্ণকাহিনীর পোষক। ঘটজাতকে কৃষ্ণের লম্বাচুলের বিবরণ রয়েছে। বহু পরবর্তীকালে হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বর্ণনায় কৃষ্ণ 'ঘোড়াচুলা'। আমাদের অনুমান কৃষ্ণের গোবিন্দত্ব বা গো-পালকত্বের কাহিনীও খ্রীস্টপূর্বাব্দেই প্রসারলাভ করেছিল। একই সময়ে বাসুদেব-কৃষ্ণ যে ভগবান্ ব'লে গৃহীত হয়েছিলেন তার সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় বেসনগরে আবিষ্কৃত শিলালেখ থেকে। ঐ শিলালেখ অনুসারে গান্ধারের নিকটবর্তী গ্রীক রাজা বাসুদেব কৃষ্ণের উদ্দেশে গরুড়ধ্বজ উৎসর্গ করছেন। এ হ'ল খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনো সময়ের ঘটনা। প্রাচ্যবিদ্যার ঐতিহাসিক ডঃ বীনটারনীৎস্‌ও মনে করেন যে অন্ততঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতের গ্রীক নরপতিরা ভাগবতধর্ম গ্রহণ করেন। ভক্তিপথিক সাত্বত বা ভাগবতধর্ম-সম্প্রদায়ের সুপ্রাচীন অস্তিত্ব ইতিহাসের সমর্থন লাভ করেছে দেখা গেল। গুপ্তযুগের আরম্ভ থেকে কিছুকালের জন্য ভগবান্ হিসাবে শিবের প্রতিষ্ঠা। যদিও ডঃ হেম রায়চৌধুরীর মতে গুপ্তযুগের পূর্বেই কৃষ্ণোপাসনার বহুল প্রচলন ঘটে গেছে। লেখ্যস্থাপন ও মন্দিরাদি নির্মাণ এ বিষয়ের পরিচয় বহন করে। আর 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের গোপীলীলা ও কালিদাস-উল্লিখিত "বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ" নিঃসংশয়ে ভাগবতের কৃষ্ণের পূর্ব থেকেই উপাসনার কথা জানায়।

সুতরাং উপনিষদের সময় থেকেই যজ্ঞাদি কর্মের পাশাপাশি ভক্তিমূলক ধর্মাচরণের একটি ধারা বহমান ছিল এমন মনে করা অসংগত হবে না। সে-ভক্তি প্রথম বিষ্ণুকে নিয়ে অথবা বাসুদেবকে নিয়ে, অথবা গোপ-বিষ্ণু কি বাসুদেব-কৃষ্ণকে নিয়ে এ তথ্যের সমাধান অসম্ভব বললেই চলে, কিন্তু কৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন এবং লৌকিক-অলৌকিক বহুবিধ শক্তির অধিকারী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ করলে মহাভারতাদি বহু গ্রন্থকে কাল্পনিক ব'লে বর্জন করতে হয়। ইতিহাস-জনশ্রুতি কথা-উপকথা মিলে, ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ঘিরে কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনী এত বিচিত্র ও অদ্ভুত রূপ পরিগ্রহ করেছে যে তা থেকে নির্বিবাদ ইতিহাস রচনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বমতে মহামানব কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা নির্ণয়ের একটা প্রারম্ভিক উদ্‌যোগ করেছিলেন, কিন্তু তা অসম্ভব ব'লেই হয়ত সে-পথে আর কারো অগ্রগতি ঘটেনি। এদেশের মনস্বী ভক্তের অধ্যয়নে কৃষ্ণকথাই সাহিত্য-ইতিহাস-ধর্মগ্রন্থে সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছে, এ দেশ শরণাগতের, ভক্তের। দেখা হয়েছে—বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে॥ কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'রৈবতক' কাব্যের প্রথম সর্গে অর্জুনের মুখ দিয়ে কৃষ্ণকথা বিষয়ে বিস্ময়-বিমিশ্র প্রশ্ন প্রকাশ করেছেন, যে প্রশ্নে আমাদের সকলেরই মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে—

> "শুনিয়াছি জনরব সহস্র জিহ্বায়
> কহিতে সহস্ররূপে জীবন তোমার।
> ...সেই বাল্যক্রীড়া, সেই কৈশোর প্রমোদ,
> যৌবনের সে বীরত্ব, দেবত্ব তোমার,
> সর্বশেষ প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডার

রৈবতকে এ দুর্ভেদ্য দুর্গের নির্মাণ,
সিন্ধুগর্ভে দ্বারাবতী অলকা সমান—
অদ্ভুত কাহিনী সব।"
"অদ্ভুত কাহিনী"—ধীরে ঈষৎ হাসিয়া
উত্তরিলা—"সত্য পার্থ, অদ্ভুত কাহিনী
আমার জীবন।"

উপনিষদ্‌গুলি নির্গুণ-সগুণ অসৎ-সৎ ত্যাগ-বৈরাগ্য জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি নিয়ে বিভিন্ন ঋষির বহুবিচিত্র উপলব্ধি বহন করছে। ব্যাপকভাবে বেদের সংলগ্ন ক'রে এগুলিকে শ্রুতি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে, যদিচ বৈদিক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাদির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে উপনিষদের গূঢ়ার্থদর্শনের কোনো মিল নেই। শংকরাচার্য তাঁর জ্ঞানভিত্তিক ব্রহ্মানুভবের ক্ষেত্রে বৈদিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল হওয়ার যৌক্তিকতা বোধ করেননি। একমাত্র মীমাংসকেরা এবং ভক্তিবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজ এবং মধ্ব কর্মকে বহুমান করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের বা বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের কোনো স্থান নেই। জ্ঞানেরও নেই, তবু যেহেতু বিভিন্ন উপনিষদে সগুণব্রহ্মের স্বরূপ এবং উপাসনার পরিচয় দিয়ে ভক্তির পথ উন্মোচন করা হয়েছে, সেজন্য ভক্তিবাদী তত্ত্বদর্শীরা সকলেই উপনিষদ থেকে বিভিন্ন স্থান গ্রহণ ক'রে স্বাভিমত সমর্থন করেছেন। বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-সূত্রগুলিকে অনেকেই পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন, ওর 'মায়াবাদী ভাষ্যে'র প্রতিবাদকল্পে রামানুজ শ্রীভাষ্য রচনা করেছেন। ব্যাসসূত্রের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' 'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি' 'প্রকাশবচ্চ অবৈয়র্থ্যাৎ' 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' প্রভৃতি বহুসূত্র ভক্তিবাদীগণ পরিণামবাদ, ভেদাভেদবাদ, লীলাবাদ প্রভৃতি বোঝাতে বারংবার উদ্ধৃত ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন। তেমনি বিভিন্ন উপনিষদের নিম্ন-উদ্ধৃত মন্ত্রগুলিকেও ভক্তি-সম্প্রদায়ে প্রায়শঃ অবলম্বন করতে দেখা যায় ঃ সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রমাণ করতে—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তিরীয়), 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (বৃহদারণ্যক), 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছান্দোগ্য), আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' (তৈত্তিরীয়), 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে...তদেব ব্রহ্ম' (তৈত্তিরীয়) প্রভৃতি। ঐ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য ও সর্বময় কর্তৃত্ব বোঝাতে 'যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' (মুণ্ডক), 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়' (শ্বেতাশ্বতর), 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্' (শ্বেতাশ্বতর), 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি (মুণ্ডক), এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ তিষ্ঠতঃ' (বৃহদারণ্যক) প্রভৃতি। ব্রহ্মের মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় এবং ব্রহ্মকে অপ্রাকৃতদেহী বোঝাতে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' (শ্বেতাশ্বতর), 'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্ বা অন্তিকে' (ঈশ), 'আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ' (কঠ), 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' (শ্বেতাশ্বতর) প্রভৃতি। শক্তিতত্ত্ব এবং মায়ার বাস্তবতা প্রতিষ্ঠাকল্পে 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়েতি' (শ্বেতাশ্বতর), 'অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজ্যমানাঃ স্বরূপাঃ' (শ্বেতাশ্বতর), 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্' (শ্বেতাশ্বতর) প্রভৃতি। ঈশ্বরের রসস্বরূপত্ব এবং ভক্তের রসানন্দ

লাভ বিষয়ে 'রসো বৈ সঃ। রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি' (তৈত্তিরীয়), 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' (তৈত্তিরীয়), 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি' ইত্যাদি (তৈত্তরীয়) প্রভৃতি। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদাভেদ, ব্রহ্মের অপ্রাকৃত দেহবত্তা ও অপ্রাকৃত বাসনা বোঝাতে 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (ছান্দোগ্যে), 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় (তৈত্তিরীয়), 'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ' (শ্বেতাশ্বতর), 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ. .দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে' (মুণ্ডক) প্রভৃতি। ঈশ্বরকৃপার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ...যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' (কঠ) ; ঈশ্বরেই প্রিয়তা সম্পর্কের স্থিতি বোঝাতে 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরো যদয়মাত্মা' (বৃহদারণ্যক) প্রভৃতি।

বেদ এবং উপনিষদের মন্ত্রসমূহ বিভিন্ন সম্প্রদায়-গুরুরা স্বমতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। শংকরাচার্য করেছেন অদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্ম স্থাপনের অনুকূলে, রামানুজাচার্য করেছেন তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈত স্থাপনের অভিপ্রায়ে। বাদরায়ণের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাসূত্র সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। বস্তুতঃ ঐ সব তত্ত্বচিন্তা সুপ্রাচীন কালের ব'লে ঐগুলির ভাষা ও ইঙ্গিত নিগূঢ় এবং জটিল হয়ে পড়ায়, বিভিন্ন অর্থ নিয়ে বিভিন্ন মনীষীর কাছে প্রতিভাত হয়েছে। এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রুতিকে গৌণ-প্রমাণ হিসাবেও উপস্থাপিত করতে চাননি। গোস্বামীগণ মহাপ্রভু-প্রদর্শিত নবধর্মের তত্ত্বরূপ দিতে গিয়ে পূর্ব-পূর্ব ভক্তি-সম্প্রদায়-গুরুদের পদ্ধতি প্রয়োজনমত অনুসরণ করেছেন। গোস্বামীগণ ইতিহাস-পুরাণকেই প্রামাণ্য শাস্ত্ররূপে শিরোধার্য করেছেন। এর মধ্যে আবার ভাগবতই তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁব 'তত্ত্বসন্দর্ভ' বিভাগে বিষয়টিকে নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রে প্রমাণ হিসাবে ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধান্ত করেছেন। বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যের খর্বতা সাধন না করেও তিনি কিভাবে ধীরে ধী'বে ভক্তিবিষয়ে ভাগবতকেই একমাত্র শাস্ত্ররূপে স্থাপন করেছেন তা প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে দেখা যেতে পাবে ঃ "তত্র চ বেদ-শব্দস্য সম্প্রতি দুষ্পারত্বাৎ দুরধিগমার্থত্বাচ্চ তদর্থনির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পরবিরোধাস্ বেদরূপো বেদার্থনির্ণায়কশ্চেতিহাসপুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ। তত্র চ যো বা বেদশব্দোনাত্মবিদিতঃ সোঽপি তদ্দৃষ্ট্যানুমেয় এবেতি সম্প্রতি তস্যৈব ভ্রমোৎপাদকত্বং স্থিতম্। তথাহি মহাভারতে মানবীয়ে চ 'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ' ইতি।...ঋগাদিভিঃ অনয়োরপৌরুষেয়ত্বেনাভেদো মাধ্যন্দিনশ্রুতাবেব ব্যজ্যতে 'এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্' ইত্যাদিনা...'পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ' 'ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে' 'বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্' ইত্যাদৌ।...অথ বেদার্থনির্ণায়কত্বঞ্চ বৈষ্ণবে 'ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ...বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ' ইত্যাদৌ।...বেদশব্দেনাত্র পুরাণাদিদ্বয়মপি গৃহ্যতে। তদেবমিতিহাস-পুরাণ-বিচার এব শ্রেয়ানিতি সিদ্ধম্। তত্রাপি পুরাণস্যৈব গরিমা দৃশ্যতে। উক্তং হি নারদীয়ে 'বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্র সংশয়॥'...অথ পুরাণানামেবং প্রামাণ্যে স্থিতেঽপি তেষামপি সামস্ত্যেনাপ্রচরদ্রূপত্বাৎ নানাদেবতাপ্রতিপাদকপ্রায়ত্বাৎ অর্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরর্থো দুরধিগমঃ ইতি তদবস্থ এবং সংশয়ঃ।

তদেবং সতি তত্তৎকল্পকথাময়ত্বৈনৈব মাৎস্য এব প্রসিদ্ধানাং তৎপুরাণানাং ব্যবস্থা জ্ঞাপিতা, তারতম্যন্তু কথং স্যাৎ যেনেতরনির্ণয়ঃ ক্রিয়তে। সত্ত্বাদিতারতম্যে নৈবেতি চেৎ 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্' 'সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনমি'তি চ ন্যায়াৎ সাত্ত্বিকমেব পুরাণাদিকং পরমার্থ-জ্ঞানায় প্রবলমিথ্যায়াতম্। তথাপি পরমার্থেঽপি নানাভঙ্গ্যা বিপ্রতিপদ্যমানানাং সমাধানায় কিং স্যাৎ। যদি সর্বাস্যাপি বেদস্য পুরাণস্য চার্থনির্ণয়ায় তেনৈব শ্রীভগবতা ব্যাসেন ব্রহ্মসূত্রং কৃতম্, তদবলোকনেনৈব সর্বোঽর্থো নির্ণেয় ইত্যুচ্যতে তর্হি নান্যসূত্রকারমুন্যনুগতৈঃ মন্যেত। কিঞ্চাত্যন্ত-গূঢ়ার্থানামল্পাক্ষরাণাং তৎসূত্রাণামন্যার্থত্বং কশ্চিদাচক্ষীত, ততঃ কতরদিবাত্র সমাধানম্। তদেবং সমাধেয়ম্ যদ্যেকতমমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং শাস্ত্রং সর্ববেদেতিহাসপুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপং স্যাৎ! সত্যমুক্তম্। যত এব চ সর্বপ্রমাণানাং চক্রবর্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্‌ভাবিতং ভবতা।"

অর্থাৎ—'বহুকাল অতীত হওয়ায় বৈদিক সাহিত্যের কিছু কিছু লুপ্ত বা অদল-বদল হয়ে পড়েছে, তা ছাড়া ওর অর্থও ঠিক ঠিক অনুধাবন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে, আর যে-সব মনীষী বেদ উপনিষদের অর্থ নির্ণয় করতে চেয়েছেন তাঁদের অভিমতে বিরোধ এত বেশি যে সেগুলির অর্থ পরিস্ফুট ক'রে বলা হয়েছে এমন ইতিহাস-পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর পন্থা। বেদ-উপনিষদে যা উহ্য রয়ে গেছে এমন বিষয়ও ঐ ইতিহাস-পুরাণ থেকে স্বচ্ছন্দে অনুমান ক'রে নেওয়া যাবে। এই জন্যই ভারতকার এবং স্মার্ত মনু বলেছেন 'ইতিহাস পুরাণের সাহায্যে বেদার্থ পরিপূরণ করে নিও'।...ঋগ্‌বেদাদির সঙ্গে ইতিহাসপুরাণের অপৌরুষেয়ত্বের বিষয়ে অভেদ সম্পর্কে বৃহদারণ্যকের এই অভিমত প্রণিধানযোগ্য—'সেই মহান্ দেবাদিদেবের নিঃশ্বাস থেকেই ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব এই চার বেদ এবং ইতিহাস-পুরাণ বিনির্গত হয়েছে।'...পুরাণ হ'ল পঞ্চম বেদ। উক্ত আছে—'ইতিহাস এবং পুরাণ পঞ্চম বেদ' 'মহাভারত যার পঞ্চম এমন বেদসমূহ অধ্যাপনা করেছিলেন'।...বিষ্ণুপুরাণেও এইভাবে বেদার্থ স্থির করা হয়েছে 'মহাভারত রচনায় সুকৌশলে বেদার্থ প্রকটিত করা হয়েছে। অখিল বেদকে যে পুরাণেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে এতে সংশয় নেই'।...বেদ শব্দে এখানে ইতিহাস এবং পুরাণ এ দুইও গ্রহণীয়। সুতরাং এই দাঁড়ায় যে ইতিহাস-পুরাণেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে এতে সংশয় নেই'।...বেদ শব্দে এখানে ইতিহাস এবং পুরাণ এ দুইও গ্রহণীয়। সুতরাং এই দাঁড়ায় যে ইতিহাস-পুরাণের ব্যাখ্যানই শ্রেয়। ইতিহাস-পুরাণের মধ্যে আবার পুরাণেরই গৌরব সমধিক। নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে 'বেদার্থের চেয়েও পুরাণার্থের মহিমা বেশি। অখিল বেদকে পুরাণসমূহের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে'।... এইভাবে পুরাণসমূহকে যদি প্রমাণ বলে স্থির করা যায়ও, তবু সংশয় ঘোচে না, কারণ পুরাণগুলিও যথাযথভাবে আমরা পাচ্ছি না, তা ছাড়া ঐগুলির মধ্যে নানা দেবতার বিষয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে সাম্প্রতিক এবং স্বল্পবুদ্ধি মানুষের পক্ষে ওগুলির বক্তব্য নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়েছে।

এরকম অবস্থায় ভাবীকালের মানুষ উৎসুক হয়ে নিজ নিজত মতানুসারে নির্বাচন করবে এই বিষয় বিবেচনা ক'রে মৎস্যপুরাণ পুরাণের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ অনুসারে বিভাগ স্থির করেছে। তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের জন্য তাহলে সাত্ত্বিক

পুরাণগুলিই পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের জন্য গৃহীত হোক, যেহেতু উক্ত আছে 'সত্ত্বের থেকে জ্ঞান জন্মে' 'সত্ত্বগুণের ফলে ব্রহ্মদর্শন হয়'। ঠিক কথা, কিন্তু সাত্ত্বিক পুরাণগুলিতেও তো পৃথক্ পৃথক্ রীতিতে পরমার্থ নিরূপণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রেই বা সমাধান কোথায়? ব্যাসের বেদান্তসূত্রের কথা এখানে স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। তাতে ব্যাসদেব সমস্ত বেদপুরাণের সারার্থই নির্ণয় করেছেন, আর, বেদান্তসূত্রকে শাস্ত্রপ্রমাণরূপে গ্রহণ করলেই সর্বার্থ বিনির্ণয় হতে পারে একথাও ঠিক, কিন্তু পরমার্থতত্ত্বনিরূপণে (গৌতমাদি) আরও অনেকে রয়েছেন, তাঁদের অনুগামীরা তো ব্যাসসূত্রের দিকে যেতেই চান না। তা ছাড়া গূঢ়ার্থময় অল্পাক্ষরযুক্ত এই সূত্রগুলিরও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কেউ কেউ নির্দেশ করতে পারেন। এতেও সমাধান হচ্ছে না। হতে পারে, যদি এমন একটি পুরাণ থাকে যা অপৌরুষেয় শাস্ত্রের মত হয়, যার মধ্যে সমস্ত বেদ-ইতিহাস-পুরাণের অর্থসার নিহিত থাকে, যার মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের বক্তব্যগুলি পরিস্ফুট হয়, আর যার সম্পূর্ণ প্রচার থাকে। এতক্ষণে বোধ হয় ঠিক পথ পাওয়া গেল। এরকম পুরাণগ্রন্থ একটি মাত্রই আছে যা সমস্ত প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মনোমত, তা হল শ্রীমদ্‌ভাগবত।"

বস্তুতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতকে ভাগবতধর্মের আকরগ্রন্থ বলা যায় এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মতেও ভাগবতই রাগাত্মিক ভক্তিবিষয়ে মুখ্য অবলম্বন। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই শ্রীজীব তাঁর গৌড়ীয় ধর্মের দর্শনানুগত প্রতিষ্ঠাপক গ্রন্থ ষট্‌সন্দর্ভ নির্মাণ করেছেন। তাঁর উক্তিমতে গোস্বামীপ্রবর শ্রীগোপালভট্ট এই গ্রন্থের একটি খসড়া পূর্বেই প্রণয়ন করেছিলেন, তা ছাড়া তিনি তৎকালে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর পিতৃব্যদ্বয়ের রচিত বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, বৈষ্ণব-তোষণী-টীকা, লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসা-মৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। সে যাই হোক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভাব অনুসরণ ক'রে স্বরূপদামোদর, সনাতন-রূপ-ভট্টাদি এবং তদনুসরণে জীবগোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে যুক্তি-তর্কনিষ্ঠ যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন তাতে সাধারণ্যে প্রচলিত ও গৃহীত পুরাণগুলিই অশেষ মর্যাদায় ভূষিত হ'ল। শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরই প্রাচীন যে গ্রন্থ তাঁদের বিশেষ অবলম্বন হয়েছে তা হল ভগবদ্‌গীতা। ভাগবতের মত গীতা থেকেই গোস্বামীগণ প্রচুর প্রমাণ পুনঃপুন উদ্ধার করেছেন। গীতায় কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির পথ প্রদর্শন ক'রে কর্মাপেক্ষা জ্ঞানের এবং সুসাধ্যতার দিক দিয়ে জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তিযোগের উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ভাগবতের পরেই গীতার স্থান। এই দু'টি গ্রন্থের যে সব অংশ ভক্তিধর্ম স্থাপনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে তা থেকে কিছু কিছু দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধার করা গেল :

ক. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

১. ভূভারহরণের জন্য ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ বিষয়ে :

'যদা যদা হি ধর্মস্য' ইত্যাদি দুই শ্লোক (৪র্থ অধ্যায়)

২. তাঁর মানুষদেহে লীলা বিষয়ে :

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (নবম অধ্যায়)

৩. জড়া প্রকৃতি, মায়া, জীবশক্তির স্বরূপ, মায়ার উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং

ঈশ্বরভক্তির সাহায্যে মায়াকে অতিক্রম করার বিষয়ে :

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ (সপ্তম)
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (সপ্তম)
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (অষ্টাদশ)
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। (নবম)

৪. ঈশ্বরাশ্রয়ে মুক্তি এবং অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে :

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (অষ্টম)
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (নবম)
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (নবম)
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ (একাদশ)
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ (অষ্টাদশ)
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (অষ্টাদশ)

৫. ঈশ্বর সাধকের অভীষ্ট বিশেষ উপাসনারীতির অনুকূলেই আত্মস্বরূপ প্রকটিত করেন এ বিষয়ে :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ (চতুর্থ) ইত্যাদি।

খ. শ্রীমদ্ভাগবত

১. শ্রীকৃষ্ণের যুগাবতারত্ব ও বর্ণরূপবেশ সম্বন্ধে। তৃতীয় শ্লোকটিতে গৌরাবতারের কথা :

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ (দশম স্কন্ধ)
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ (একাদশ)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (একাদশ)

২. ভক্তদের কৃপাপূর্বক আরাধনার পথ প্রদর্শনের জন্য মানুষরূপে অবতার বিষয়ে :

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ (দশম)

৩. মায়াশক্তির বহিরঙ্গতা, ঈশ্বরাধীনত্ব ও জীবপীড়ন বিষয়ে :

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥ (দ্বিতীয়)
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ (দ্বিতীয়)

৪. ভক্তিধর্মের শুদ্ধত্ব, অহৈতুকত্ব এবং মুক্তি অপেক্ষা শ্রেয়স্করত্ব প্রতিপন্ন করতে :

ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্মৎসরাণাং সতাম্ ইত্যাদি॥ (প্রথম)
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (প্রথম)

৫. অদ্বৈত জ্ঞানস্বরূপ আত্মস্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপের একত্ব সম্বন্ধে .

বদন্তি তৎতত্ত্ব বিদস্তত্বং যজ্‌জ্ঞানমব্যয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (প্রথম)

৬. কৃষ্ণের পূর্ণভগবত্তা এবং অন্যান্য অবতারগণের তাঁর অংশত্ব বিষয়ে :

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ (প্রথম)

৭. শুদ্ধা অনুরক্তির শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে :

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাম্ অমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্ মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ (দশম)
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ (একাদশ)
সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (তৃতীয়)

৮. ভগবানের ভক্তবৎসলতা সম্বন্ধে ও গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে :

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়স্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (নবম)
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ (দশম)

৯. সাধনভক্তি সম্বন্ধে :

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদঃ
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (তৃতীয়)
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ (সপ্তম)

১০. ভক্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাবের লক্ষণ বিষয়ে :

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ (একাদশ)

১১. গোপীপ্রেমের গাঢ়তা বিষয়ে :

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ (দশম

১২. শ্রেষ্ঠা গোপী বা রাধা বিষয়ে :

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ (দশম)

১৩. রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যমূলক আকর্ষণ-যোগ্যতা বিষয়ে :

তাসামাবিরভূৎ শৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্ মন্মথমন্মথঃ॥
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ।
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥ (দশম)

১৪. গোপীপ্রেমে ঈশ্বরারাধনার পরাকাষ্ঠা বিষয়ে :

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং ইত্যাদি।

১৫. "কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার" বিষয়ে :

অহো বত! শ্বপচতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ (তৃতীয়)

শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা ছাড়া খ্রীস্টপূর্বাব্দে বিরচিত বিষ্ণুপুরাণ থেকে বৈষ্ণব তাত্ত্বিকগণ তাঁদের মূল্যবান্ শক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির সাহায্য পেয়েছিলেন—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

* *

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥

পদ্মপুরাণের কয়েকটি অংশ, এমনকি মহাভারতের দুচারটি শ্লোকও এই নবভক্তিধর্মের রাধা ও পরকীয়াবাদ, নামমাহাত্ম্য, গৌরাঙ্গ-অবতারের বাস্তবতা স্থাপনের সহায়ক হিসাবে তাঁরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন। মহাপ্রভু থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করে লোকপ্রচলিত প্রণয়-কবিতাকেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা রাগাত্মিক ভক্তির শীর্ষে তুলে ধরেছেন। এছাড়া একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি কোন সময়ে গ্রথিত ব্রহ্মসংহিতা, কৃষ্ণকর্ণামৃত, নারদীয়তন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র এবং গোপালতাপনী উপনিষদ্ প্রভৃতি থেকেও কৃষ্ণের ভগবত্তা, রাধা ও গোপীসহ লীলার শ্রেষ্ঠতা এবং শুদ্ধা ভক্তির সমর্থক প্রমাণ তাঁদের সংগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রেরণা লাভ করেছিল শ্রীধরস্বামী-কৃত বিখ্যাত ভাগবতের টীকা থেকে। মহাপ্রভুর স্বামীকৃত টীকায় আস্থার সংবাদ চরিতামৃতের পাঠক-মাত্রেরই জানা। শ্রীপাদ্ জীবগোস্বামীও তাঁর সন্দর্ভগুলিতে প্রয়োজনমত স্বামীর ভক্তিমূলক ব্যাখ্যাকে বহুমান করেছেন। অতএব একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, চৈতন্যপূর্ব ভক্তিধর্মের পরিবেশের মধ্যে শ্রীধরস্বামী[১] প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। বাসুদেব-নারায়ণ-কৃষ্ণের লীলা, ব্যূহতত্ত্ব, কৃষ্ণের অবতারশ্রেষ্ঠতা, চিৎশক্তি ও জড়শক্তির পার্থক্য, শুদ্ধা ভক্তির মাহাত্ম্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁর সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপলব্ধির সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রীধরস্বামী শিষ্যপরম্পরায় অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের হলেও মাধবেন্দ্রপুরীর মতই সগুণ ব্রহ্মে ও বিগ্রহে আস্থাবান্ ছিলেন, যদিও রাগাত্মিক ভক্তি পর্যন্ত অগ্রসর হননি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা হল রাধাকৃষ্ণলীলার সত্যতায় ও নিত্যত্বে বিশ্বাস। অথবা, কৃষ্ণলীলায় রাধাপ্রেমের গুরুত্ব অনুধাবন। প্রকট এবং অপ্রকট লীলায় বৃন্দাবনে 'রাধাসহ ক্রীড়া' মাধুর্যৈকস্বরূপ রসিক কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ কার্য এ-তত্ত্বটি বিশেষভাবে বাঙলার বৈষ্ণবধর্মের, কিন্তু এর পূর্বাভাস কোথাও রয়েছে কিনা দেখতে হবে। প্রথমতঃ বাঙলাতেই তিনজন প্রধান কবি রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে বিস্তৃত কাব্য লিখেছেন। এঁরা জয়দেব, বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। এঁরা যে শুধু লৌকিক কাব্যরস পরিবেশন করার জন্য লেখেননি, সে বিষয়ে বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ প্রমাণ যথেষ্ট। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বচনায় বাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো কোনো কবি যে সেরকম লিখতে পারেন না তা নয়। এ রকম কিছু লৌকিক রচনা কয়েকটি সংস্কৃত-প্রাকৃত কোষগ্রন্থে এবং রসবিবেচনায় স্থান পেয়েছে। অনুরূপ- হরগৌরী-শক্তিতত্ত্বের আশ্রয়ে কবিরা অপূর্ব পূর্ব-প্রণয় ও দাম্পত্য প্রণয় চিত্র নির্মাণ করেছেন। কিন্তু ভক্ত কবিদের রচনাকে তা থেকে পৃথক্ করতে কষ্ট পেতে হয় না। রাধা-কৃষ্ণ প্রণয় নিয়ে লৌকিক কাব্যের কিছু প্রসার ঘটলেও, একথা ঠিক নয় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে রাধার প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা ঐ লৌকিক কাব্যচিত্র থেকেই।[২] রাধা যদি লৌকিক নায়িকা হন, অর্থাৎ চপলা কোনো আভীর গোপী, যাকে নিয়ে পল্লীতে পল্লীতে প্রেমকাহিনী গড়ে উঠেছিল,

১. খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ থেকে চতুর্দশের মধ্যভাগ।

২. ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। সম্প্রতি শ্রীযুত জনার্দন চক্রবর্তী মহোদয় প্রদত্ত কমলা-বক্তৃতামালায় রাধাপ্রণয়ের লোককাব্য-মৌলতা নিপুণভাবে খণ্ডিত হয়েছে।

তিনিই পরে ধর্মে ও দর্শনে স্থান পান এমন যদি হয়, তাহলে কৃষ্ণকেও তো কেবল প্রেমিক গোপযুবক হিসাবে ধরতে হয়, আর তাহলে বৈদিক যুগের ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণের এবং পৌরাণিক যুগের বিষ্ণুর অবতার ভগবান্ কৃষ্ণের ঐতিহ্য মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যদি বলা যায় কৃষ্ণের একটা শাখা-কাহিনী পল্লীপ্রেমগীতিকায় বহুপূর্ব থেকেই ছিল, পুরাণকাররা অবতার কৃষ্ণের সঙ্গে তা মিলিয়ে নিয়ে ভগবান্ কৃষ্ণ গঠন করেছেন তাহলেও সংগতি রক্ষিত হয় না, কারণ, লৌকিক কাব্যে সর্বপ্রথম যেখানে রাধার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় (ধরা যাক পঞ্চম শতাব্দীর 'গাথাসপ্তশতী') তা যে পুরাণগুলির পূর্ববর্তী এমন প্রমাণ নেই। যদি বলা হয় যে পদ্মপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণে রাধার উল্লেখ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব যুগের প্রক্ষেপ, আর ব্রহ্মবৈবর্তের বিস্তৃত রাধাকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ একেবারে অর্বাচীন, তাহলেও সমস্যা মেটে না। কারণ, ধর্মীয় বহু রচনাতেই কৃষ্ণের সর্বাধিক প্রীতিপাত্র প্রধানতমা একজন গোপীর বিবরণ (ভাগবত, গোপাল-তাপনী উপনিষদ্ প্রভৃতিতে) রয়েছে। ঋক্-পরিশিষ্টে স্পষ্টতই রাধা-মাধবের যুগল স্থিতির বিষয় বলা হয়েছে এবং বৈষ্ণবাচার্যের দ্বারা তা উল্লিখিতও হয়েছে—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা'। দাক্ষিণাত্যের আলবার- গণের মধ্যে অণ্ডালের গীতেও এক প্রধানা গোপীর বিরহার্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাছাড়া লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের অন্ততঃ দু'তিনটি শ্লোকে রাধার কথা পাওয়া যাচ্ছে।[১] কৃষ্ণকর্ণামৃত একাদশ শতকের পরবর্তী রচনা নয়। কারণ, জয়দেবের রচনায় এর ভাষা ও ছন্দের প্রভাব স্পষ্ট। এ ছাড়া 'নারদ-পঞ্চরাত্র' নামক ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে রাধার তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতগুলি ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলাকে সর্বাংশে প্রক্ষিপ্ত মনে করার কোনো কারণ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় কৃষ্ণ যে-প্রধানা গোপীকে গ্রহণ করে অন্য সকলকে ত্যাগ করেছিলেন[২] তিনি যে শ্রীরাধাই এ কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তবাদীদেরই মত নয়, কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের উৎসও এ থেকেই[৩] এবং দশম শতাব্দীর ভট্টনারায়ণকৃত বেণীসংহারের নান্দী শ্লোক[৪] ঐ "অনয়া রাধিতেরই" ব্যাখ্যা শ্লোক মাত্র। কিন্তু কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণই নয়, রাধাকে কৃষ্ণের শক্তিরূপে শাস্ত্রে স্থাপন করেছেন তৎ-পূর্ববর্তী সনক-সম্প্রদায়ের নিম্বার্ক। রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে নিগূঢ় বিস্তৃত কথা গোদাবরীতীরের রায় রামানন্দই মহাপ্রভুকে জানিয়েছিলেন।

রাধা-প্রসঙ্গ

এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসছি যে : অবতার বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার প্রেমলীলাতত্ত্ব অন্-আর্য লোকমূল হলেও গোড়া থেকে ধর্মীয় সহজ-ভাবুকতার সঙ্গে মিশ্রিতই ছিল, অর্থাৎ লিখিত শুদ্ধ কবিতা সাহিত্যের পূর্বে ভক্তিধর্মেই

১. "তেজসেঽস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে।।"

"যে বা চপলশৈশবব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ..." "রাধা পুনাতু জগদচ্যুতদত্তচিত্তা মন্থানমা-কলয়তী" ইত্যাদি।

২. অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। ইত্যাদি পূর্বেই উল্লিখিত।

৩. কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥

৪. কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতাম্ উৎসৃজ্য রাসে রসং গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্" ইত্যাদি।

এই প্রেমমূলক মানসিকতা প্রথম গড়ে ওঠে। পশ্চাৎ কবিরা একে লৌকিক কাব্যরসের বিষয়ীভূত করে বিক্ষিপ্তভাবে শ্লোক রচনা করেন। যেমন করেন কৃষ্ণের অসুরবিনাশ, গোবর্ধনধারণ এবং গোচারণ প্রভৃতি নিয়েও। প্রাচীন পুরাণগুলিতে বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, কিন্তু মনে হয়, কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠায় রুক্মিণী এবং ভগবত্তা প্রতিষ্ঠায় রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়।[১] জ্যোতির্বিদ্যার সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের মহাকাশে পরিভ্রমণের বিষয়টি (স্বর্গত রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহোদয়ের অভিমত) এই সময়ে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। রাধা হল বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম। অথর্ববেদের "রাধো বিশাখে" এই পরিচয়ের পূর্বে রাধার নাম আর কোথাও মেলে না। এইভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা গড়ে উঠলে পর রাধা লক্ষ্মীর অবতার এরকম একটি অভিমতও স্থাপিত হয়। বিভিন্ন পুরাণে নারায়ণ-বিষ্ণু-লক্ষ্মী এবং কৃষ্ণ-রাধা শক্তির পরিচয় পাচ্ছি। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে রাধাকে লক্ষ্মীর অবতাররূপে গ্রহণ করেছেন এবং রাধার জন্মবৃত্তান্ত স্বাধীনভাবে বর্ণনা করেছেন (পদুমার—পদ্মার গর্ভে, সাগরের ঔরসে)। রা + ধা ধাতু থেকে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেক পরে নির্দেশিত হয়। যাই হোক, ঈশ্বরীয় লীলাবাদের জন্মক্ষণ থেকেই রাধার কৃষ্ণসম্পর্কের প্রতিষ্ঠা। লিখিত রচনায় ভাগবতপুরাণকেই রাধার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমরা এই অংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের প্রকাশের পূর্ব-পরিস্থিতি আলোচনা করে এখন মহাপ্রভুর লীলায় এই ভক্তিধর্মের আবির্ভাব ও বিকাশের স্বরূপ পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হচ্ছি। এর পরবর্তী অধ্যায় থেকে আলোচ্য মূল বিষয়ে প্রবেশ করব। আমাদের পূর্ব-আলোচিত ভক্তিধর্ম ও দার্শনিক পটভূমির বিবরণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা সংগত হবে না যে, পূর্বসূত্র অবলম্বন করেই কারণ-কার্যের নীতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গড়ে উঠেছে। আমরা শুধু ঐতিহ্য এবং পরিবেশ চিত্রিত করলাম। রাগাত্মিক ভক্তিধর্ম একান্তভাবে বাঙলারই বিশেষ সম্পদ। সূফীধর্মে এবং মাধবেন্দ্র-ঈশ্বরপুরীর মধ্যে এর অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল। কিন্তু স্বভাবে বাউল মহাপ্রভুই এর পুষ্পপত্রসমন্বিত মহীরুহ। শ্রীমদ্‌ভাগবত, কর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, সূফীভাবুকতা, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী প্রভৃতির প্রীতিবারিনিষেক এই মহীরুহকে বর্ধিত হতে সাহায্য করেছে। চরিতামৃতের নিম্নলিখিত বর্ণনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকর ধর্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকর পৃথিবীতে আনি।
ভক্তিকল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানী॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥

(আদি, নবম)

১. তু°—রুক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। (মৎস্যপুরাণ)

মহাপ্রভুর লৌকিক ও দিব্য জীবন

(আবির্ভাব ১৪০৭ শক, ফাল্গুন ২৩, সন্ধ্যা।
তিরোভাব ১৪৫৫ শক, আষাঢ়, রথ-পরবর্তী সপ্তমী)[১]

বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের রীতিতে লেখা কোনো কোনো নব্য ইতিবৃত্তগ্রন্থে চৈতন্যজীবনী-কারদের বর্ণন-বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ ক'রে বলা হয়েছে যে, তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্যের মানবীয় জীবনকে ভক্তবুদ্ধি-সমাচ্ছাদিত সুতরাং অতিশয়িত করে দেখেছেন এবং অলৌকিক ঘটনার বাড়াবাড়িও করেছেন, যার ফলে তাঁদের লেখা থেকে ঘটনাসমূহের বাস্তব স্বরূপ জানবার এবং যথার্থ জীবনী পাবার উপায় নাই। তা ছাড়া, বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ব্যাপারে জীবনীকারদের মধ্যে মতভেদ থাকায় ইতিহাস-নির্ণয়ের প্রয়াস বিফল হয়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বক্তব্য বিবৃত করে পশ্চাৎ আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মুখ্য আশ্রয় চৈতন্য-জীবনে প্রবেশ করব।

জীবনীকারদের বিপক্ষে ঐতিহাসিকদের অভিযোগের সারবত্তা মোটামুটি স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা যায় যে ঃ বৈষ্ণবজীবনীকারেরা, গবেষণালব্ধ ইতিহাস লিখব, এমন প্রতিজ্ঞা ক'রে লেখনী গ্রহণ করেননি। তাঁরা চৈতন্য-জীবনে যে সব অ-পূর্বদৃষ্ট এবং অ-পূর্বকল্পিত ভাবসমূহের প্রকাশ দেখেছিলেন এবং তাঁর আচরণে জীবনের যে সমুন্নতি লক্ষ্য করেছিলেন তা-ই মুখ্যভাবে চৈতন্য-জীবন বিষয়ক রচনায় তাঁদের প্রবৃত্ত করে। শ্রীচৈতন্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বা তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে যখন তাঁরা নিঃসন্দেহ তখন লীলাবর্ণনের ব্যাকুলতা

চরিতগ্রন্থের প্রমাণ

কেউ কেউ অনুভব করেন। এ বিষয়ে তাঁর লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টাদের পদরচনা অগ্রগণ্য। অর্থাৎ নরহরি সরকার, গোবিন্দ-মাধব-বাসুঘোষের পদরচনা শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরীয় লীলারম্ভের সমকালীন ব'লে এগুলির মূল্য সর্বাগ্রে। কিন্তু গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদরচয়িতারা ভাবুকতা এবং কাব্যকুশলতার উপরই অধিক নির্ভরশীল ছিলেন ব'লে তাঁদের রচনা থেকে তথ্যের দিক দিয়ে খুব বেশি লাভবান হওয়া যায় না। এদিকে আবার নীলাচল জীবনচিত্র নিয়ে সেখানকার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাদের সংস্কৃত কড়চা এবং তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে লেখা বাঙলা চরিতামৃতও রয়েছে। কিন্তু কী সংস্কৃত কী

---

১. পাঠারম্ভ শক ১৪১১-১২, বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ ও প্রভুর পাঠচ্ছেদ ১৪১৬, পুনঃ পাঠারম্ভ ১৪১৬, মিশ্র পুরন্দরের মৃত্যু ১৪২০, প্রভুর বিবাহ ১৪২২, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনা আরম্ভ ১৪২৪, পূর্ববঙ্গ গমন ও লক্ষ্মীদেবীর তিরোধান ১৪২৬, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে বিবাহ ১৪২৮, গয়া গমন ১৪৩০, প্রেমভক্তির আরম্ভ ১৪৩০, সন্ন্যাস ১৪৩১ পৌষ-মাঘ সংক্রান্তি, নীলাচল যাত্রা ১৪৩১ ফাল্গুন, দক্ষিণ যাত্রা ১৪৩২ বৈশাখ, দক্ষিণ থেকে প্রত্যাবর্তন ১৪৩৪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, গৌড় যাত্রা ১৪৩৬-শেষ ও প্রত্যাবর্তন ১৪৩৭ বৈশাখ, বৃন্দাবন যাত্রা ১৪৩৭ ও প্রত্যাবর্তন ১৪৩৮ বৈশাখ, স্থিরভাবে নীলাচলে স্থিতি ১৪৩৮-১৪৫৫ শক।

বাঙলা, জীবনীকাব্যগুলিই তথ্যের অভাব পূর্ণ করতে অগ্রসর হয়েছিল। চরিত-কাব্যকারদের মধ্যে আদিলীলায় শ্রীচৈতন্য-জীবনের নবদ্বীপ-পর্বের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মুরারি গুপ্ত আছেন, প্রত্যক্ষদ্রষ্টাদের কাছ থেকে শ্রোতা আছেন কয়েকজনই, আবার মাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল লেখকও দুর্লভ নন। এর মধ্যে বেশ পরবর্তী যুগের এবং কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল লেখকদের বাদ দিলে যাঁরা প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বা প্রত্যক্ষদ্রষ্টাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁরা নিজেদের বিচার ও প্রত্যয়মতেই ঘটনা ও চারিত্র্যের বিন্যাস করেছেন। জনশ্রুতি থেকে কোনো উপাদান নিলেও সেগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহাতীত হয়েই তাঁরা গ্রন্থমধ্যে তা সন্নিবিষ্ট করেছেন। উদ্ভট বা স্বকপোল-কল্পিত ঘটনার অনুপ্রবেশ সম্পর্কে তাঁরা সাবধানই ছিলেন। গ্রন্থরচনাকে তাঁরা জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে মিথ্যাচার করেননি। শ্রীচৈতন্যকে আতিশয়িত ক'রে দেখার এবং তাঁর জীবনের বহু কার্যকে অলৌকিকভাবে দেখার উপাদান তাঁর জীবনের ঘটনায় এবং আচরণে বহুল বিদ্যমান ছিল, নতুবা তিনি অবতার, এমনকি স্বয়ং-ভগবান্‌রূপে পূজিত হতেন কিনা সন্দেহ। যাঁরা এই লোকোত্তরতায় আস্থাবান্ নন, তাঁরা বোধ হয় শ্রীচৈতন্যকে শংকর, নানক, কবীরের মত প্রচারক রূপেই দেখতে চান, কিন্তু একথা ভুলে যান যে তিনি নিজে কিছুই প্রচার করেননি, তাঁর জীবনে অদ্ভুত প্রকাশের দ্বারা প্রচারের চেয়ে বেশি কাজ হয়েছিল। আর যে ধর্মানুভূতি তাঁর জীবনে স্ফুরিত হয়েছিল তার অনায়াস প্রচার ঘটেছিল অঙ্গ-উপাঙ্গরূপ-পার্ষদগণের বা তাঁদের কৃপাপ্রাপ্ত জীবনীকার ও পদকর্তাদের দ্বারা।

তারপর অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ, যেমন—শিশু গৌরচন্দ্রের হরিনামশ্রবণে রোদন সংবরণ, গৌরাঙ্গের সর্পের উপর শয়ন, শিশু গৌরাঙ্গের মুখে শচীদেবীর বিশ্বরূপ দর্শন, গৌরাঙ্গ কর্তৃক তৈর্থিক ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন ভক্ষণ ও পশ্চাৎ স্বরূপ প্রকাশ, গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম ভাবপ্রকাশের মধ্যে বরাহ-নৃসিংহ-বলরামাদির চারিত্র্য প্রকাশ, সার্বভৌমকে ষড়্‌ভুজ মূর্তি প্রদর্শন, দক্ষিণভ্রমণাবসরে কুষ্ঠীর রোগমোচন, বৌদ্ধদের সর্বনাশ, শিবানন্দের সঙ্গে আগত কুক্কুরের অন্তর্ধান, মৃত গায়ক হরিদাসের অদৃশ্যে সংগীতধ্বনি, মহাপ্রভুর সমাধির অবস্থায় সমুদ্রে পতন ও নুলিয়ার জালে উদ্ধার প্রভৃতি আরও অনেক। ভক্তদের কাছে এসব ঘটনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এবং সেই হিসাবেই এগুলির সন্নিবেশ জীবনীকারেরা করেছেন। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস এক হিসাবে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, যুক্তিবাদ এই স্বভাবকে লঙ্ঘন করতে শিক্ষা দেয়, আবার ভক্তি, যা বিশ্বাসের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত তা প্রাকৃত অপ্রাকৃতের তারতম্য করে না। এইজন্য যাবতীয় মহাপুরুষের জীবনের সঙ্গেই অতিপ্রাকৃত ঘটনা অল্পবিস্তর জড়িত। এই ঘটনাগুলিকে আমরা সত্য বলতে পারছি না, কিন্তু মিথ্যা বললে একমাত্র প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণগুলিকে অস্বীকার করতে হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকের ও-রকম অলৌকিক ঘটনাকে সত্য-মিথ্যা কিছুই বলা উচিত হবে না। দেখতে হবে, শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিতকারেরা সকলেই কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার বিন্যাস করেছেন। এ-বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের স্থান শীর্ষে হলেও চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মুরারিও (অবশ্য প্রবল হস্তক্ষেপ-চিহ্নিত প্রাপ্ত পুঁথি অনুসারে) কিছু কম যান না। আমরা মনে করি ঐ ঘটনাগুলিকে বর্জন ক'রেও ঐতিহাসিক উপাদান স্বচ্ছন্দে আহরণ করা চলে। যেমন বলা যায়, শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমকে ষড়্‌ভুজ ও চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিয়েছিলেন

কিনা এ তথ্যে না গিয়েও বলা চলে অদ্বৈতমতের একজন প্রধান প্রবক্তাকে শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রভাবে সহজেই ভক্তিধর্মে আস্থাবান্ ক'রে তুলেছিলেন। মুরারি গুপ্তের গৃহে শ্রীচৈতন্য একেবারে বরাহ হয়ে পড়েছিলেন, এ ব্যাপার প্রতীতিযোগ্য না হলেও একথা স্বচ্ছন্দে মনে করা যায় যে, গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীচৈতন্যের আচরণে বহু বিচিত্র এবং অসাধারণ ভাবাবেশ ঘটেছিল। এরকম কিছু অতিরঞ্জন এবং স্বল্প কিছু অলৌকিক ঘটনার বিষয় বাদ দিয়ে স্বচ্ছন্দে চৈতন্য-জীবনের বাস্তব ইতিবৃত্ত লাভ করা সম্ভব, সে উপাদান চরিতকারেরা যথেষ্ট রেখে গেছেন। তা সত্ত্বেও যাঁরা পাশ্চাত্য জীবনচরিতের নিরিখে যাবতীয় ভালোমন্দ খুঁটিনাটি চাইবেন তাঁরা অসম্ভাব্য বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ ক'রে ব্যর্থমনোরথ হলে সে দায় চরিতকারের নয়।

আধুনিক ইতিবৃত্ত-সন্ধিৎসুর চরিতকাব্যগুলি সম্পর্কে অপর অভিযোগ শ্রীচৈতন্য-জীবনের কয়েকটি ঘটনার বর্ণনায় চরিতকারদের পারস্পরিক ঐকমত্যের অভাব। এ বিষয়ে বলা যায় যে, চরিতকারেরা দেশকালে পরস্পর দূরবর্তী ছিলেন, সকলের সংবাদের উৎস এক ছিল না, এমনকি চৈতন্যলীলার যাঁরা প্রত্যক্ষদ্রষ্টা তাঁরাও শ্রীচৈতন্যের জীবনের সমস্তটাই দেখেছেন কিনা সন্দেহ। সংবাদের সূত্র অল্পবিস্তর বিভিন্ন হওয়ায় সব ঘটনার ঐক্য পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ এরকম ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তা-ই ঘটেছে। তবু চৈতন্য-জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি এবং চৈতন্য-চরিত বলতে যা বোঝায় সে বিষয়ে মুখ্য চরিতকারদের মতৈক্যই লক্ষণীয়। এর উপর প্রাচীন গ্রন্থ ব'লে প্রক্ষেপের কথাও চিন্তা করতে হবে এবং কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল অথবা একেবারে কাল্পনিক গ্রন্থ নির্মাণের বিষয়টিও ভাবতে হবে। চরিতগ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা-অপ্রামাণিকতার বিষয় আধুনিক চরিত-চিন্তকেরা অনেকেই বিচার ক'রে দেখেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো নিজ অনুমানের পোষকতা করতে গিয়ে সন্দিগ্ধ গ্রন্থ বা সন্দিগ্ধ অংশ থেকে প্রমাণও তুলতে চেয়েছেন দেখি। হিসাবে দেখা যায় ইতিবৃত্তসহ যাঁরা চৈতন্যচরিত লিখছেন (কেবল লীলার বর্ণনা দিচ্ছেন না), তাঁদের মধ্যে নবদ্বীপলীলা পর্যন্ত প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিতামৃতের ঐ অংশ (প্রচলিত পুস্তকের নীলাচল-লীলা, এমনকি নবদ্বীপলীলার কিছু অংশেরও বর্ণনা বিষয়ে বিচারকগণ যথার্থভাবেই সন্দিগ্ধ), প্রত্যক্ষদ্রষ্টাদের কাছ থেকে যাঁরা শুনেছেন তাঁদের মধ্যে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের ঐ নবদ্বীপলীলা পর্যন্ত অংশ, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃতই নির্ভরযোগ্য। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল দু'একটি বিষয় ছাড়া মুরারি গুপ্তের প্রক্ষেপ-যুক্ত কড়চার উপরই নির্ভরশীল ; তা ছাড়া এতে তথ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল নিতান্ত জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত উদ্ভট জল্পনা-কল্পনায় পূর্ণ গ্রন্থ। এতে উপরের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির বিরোধী এবং অবিশ্বাস্য বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বহু পরবর্তী কালের যে-সব চরিতে প্রাসঙ্গিকভাবে চৈতন্য-জীবনের কোনো কোনো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ষোড়শ শতকে বা কাছাকাছি সময়ে রচিত গ্রন্থগুলির বিবরণের সঙ্গে বিরোধে সেগুলির অধিক প্রামাণিকতা স্বীকার করা যায় না। প্রামাণিক চরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের ধারণামত সেগুলির সমাধান-পথের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

(১) বৃন্দাবন-যাত্রার সংকল্প নিয়ে শ্রীচৈতন্য যখন গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামে

এসেছিলেন তখন সনাতন এবং রূপ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অথচ বৃন্দাবনদাস এ ঘটনার বিবরণ দেননি। মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ এবং রামানন্দ-মিলনও বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করছেন না। বৃন্দাবনভ্রমণের বিষয় তাঁর সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে মাত্র। এ ছাড়া সার্বভৌম-মিলন প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে, সার্বভৌম আগে থেকেই ভক্তিবাদী ছিলেন। এ বিষয়ে বলা যায় যে, বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা পর্যন্ত অংশ যেরকম অনুসন্ধানাদি ক'রে নানা স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে লিখেছিলেন, পরবর্তী লীলা সম্পর্কে তা পারেননি। এতেই তাঁর উদ্যম অবসিত হওয়ার কথা। নীলাচল-লীলা সম্পর্কে কিছু কিছু যা সংবাদ পেয়েছিলেন তা-ই তিনি পরিবেশন করেছেন। বৃন্দাবনদাস যখন লিখছেন সে সময়ে রূপ-সনাতনের কীর্তিসমূহ ও কর্ণপূর রচনা প্রসার লাভ করেনি। দেখা যায়, নরহরি শিষ্য লোচন রূপ-সনাতনের প্রসঙ্গই উত্থাপন করেননি। আর কবিকর্ণপূরও তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে রামকেলির রূপ-সনাতন-মিলন বিষয়ে উল্লেখ করছেন না। মুরারি করেছেন, কিন্তু মুরারির এসব অংশকে অনেকেই প্রক্ষিপ্ত ব'লে সন্দেহ করেন এবং সে সন্দেহ অহেতুক নয়। সনাতন-রূপের কাহিনী আদ্যন্ত যথাযথভাবে গ্রথিত করতে পেরেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, এবং তাঁর সে অধিকারও ছিল। শ্রীরূপের কাছ থেকেই এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ তিনি পেয়েছিলেন। চৈতন্যজীবনের নীলাচললীলার শেষ পর্যন্ত বর্ণন-বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী যে অধ্যবসায় করেছেন, তা অন্যত্র দুর্লভ, এমনকি কবিকর্ণপূর-বিরচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও ঐ প্রতিভার স্পর্শ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবতের এই অপূর্ণতার বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং কতকটা সেইজন্যই তিনি চরিতামৃত রচনায় প্রবৃত্ত হন। বৃন্দাবনদাস, কবিকর্ণপূর, মুরারি এবং লোচনের গ্রন্থের নীলাচল-লীলা বিষয়ে নানান্ অসম্পূর্ণতা দৃষ্টে যদি কেউ অনুমান করেন যে, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে বাঙলার ভক্তদের ঈর্ষা ও বিরোধের সম্পর্ক ছিল তাহ'লে তা শ্রদ্ধেয় হবে না। তথ্যসংগ্রহের অসামর্থ্য এবং অপরিচয়ের দূরত্ব উভয়পক্ষে নানা ব্যাপারের অনুল্লেখের কারণ হয়েছে।

(২) বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে নরহরি সরকারের উল্লেখ করেননি। অথচ নরহরি গৌরাঙ্গভক্ত পরিকরদের অন্যতম ছিলেন ; গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীচৈতন্য যে-সব আশ্চর্য ভাব-প্রকাশ করেছিলেন, নরহরি তার শুধু প্রত্যক্ষদ্রষ্টাই ছিলেন না, এ বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃতভাবে পদরচনাও করেছিলেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকর্তা কেউ কেউ নবদ্বীপলীলায় নরহরির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবনদাসের এই অনুল্লেখ বিষয়ে আধুনিক কোনো গ্রন্থকারের অভিমত এই যে, নরহরি সরকার গৌর-নাগরীভাবের প্রবর্তক ছিলেন। কিন্তু দেখতে হবে, মুরারি গুপ্ত তাঁর কড়চায় এবং তদনুসরণে কবিকর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যেও নবদ্বীপ-লীলা প্রসঙ্গে নরহরির নাম করেননি। মনে হয়, নরহরি শ্রীখণ্ড থেকে মাঝে-মধ্যে নবদ্বীপে আসতেন এবং হয়ত বা নবদ্বীপের পরিকরদের সঙ্গে ব্যবধান রেখে স্বতন্ত্র ভজন-সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। হয়ত চৈতন্যের ভাবপ্রকাশ লীলার প্রথমের দিকে নরহরি যেবকম যোগ দিতে পেরেছিলেন পরে আর তেমন পারেননি। সেজন্য ভক্তবৃন্দ তাঁর গুরুত্ব তেমন স্মরণে রাখেননি। কিন্তু নিত্যানন্দ বিদ্বিষ্ট হয়ে নরহরির কথা লিখতে বৃন্দাবনকে নিষেধ করেছিলেন এমন অনুমান শ্রদ্ধার যোগ্য

নয়। তাহলে নরহরি-শিষ্য লোচনদাস-কৃত চৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবনের বন্দনা থাকত না। লক্ষণীয় এই যে, কবিকর্ণপূর তাঁর নাটকে নরহরি সরকারের নীলাচলে আগমনকে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ব'লে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে বলা যায়, বৃন্দাবনদাস রঘুনাথদাস গোস্বামীরও নামোল্লেখ করেননি, যদিও ঐ রঘুনাথ নীলাচল-চৈতন্যের শরণার্থী হয়ে পানিহাটিতে নিত্যানন্দের আশীর্বাদভিক্ষু হলে নিত্যানন্দ তাঁকে দিয়ে পুলিনভোজন বা চিঁড়াদধি মহোৎসব করিয়েছিলেন। রঘুনাথদাস গোস্বামীর বা রূপগোস্বামীর নিত্যানন্দ-বন্দনা পাওয়া যায় না। বলা যেতে পারে, এঁরা চৈতন্যের বা কৃষ্ণের বন্দনা করায় বলরামের বন্দনার আবশ্যকতা বোধ করেননি। তা ছাড়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের কার্যক্রম ও চৈতন্যাবতার প্রসঙ্গে এঁদের গুরুত্ব সম্পর্কে এঁরা সবিশেষ অবহিতও ছিলেন না, ঐ বিষয়ে চর্চার কোনো অবকাশও এঁদের ছিল কিনা সন্দেহ। চরিতামৃতকার গোপালভট্টের কাহিনী বর্ণনা করেননি। তাঁর খুল্লতাত এবং শিক্ষাগুরু প্রবোধানন্দের চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ থেকে তেমন বিশেষ প্রমাণ উদ্ধৃত করেননি। এর কারণ, প্রথমতঃ এবিষয়ে গোপাল ভট্টের নিষেধ ছিল, তিনি আত্মপ্রচার চাননি। দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যচন্দ্রামৃতের পুঁথি কবিরাজ গোস্বামীর হাতের কাছে হয়ত ছিল না। হয়ত বা এসব বিষয়ে গ্রন্থকারদের ভুল হয়ে গেছে। কোনো বিষয়েই আপত্তি উঠতে পারে না এমন নির্মাণ পৃথিবীতে দুর্লভ। এসব বিষয়ে তর্ক যেমন সম্ভব, বিতর্কও তেমনি সম্ভব, এবং সমাধান অসম্ভব। এ নিয়ে অন্য কিছু অনুমান কল্পনারই সামিল হবে।

(৩) মুরারিগুপ্তের অধুনা প্রচলিত গ্রন্থে এমন একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যার সমর্থন অন্য কোনো জীবনীকাব্য থেকে পাওয়া যায় না এবং বিচারের দিক থেকেও যা অসম্ভাব্য বলেই মনে হয়। বিবরণটি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে পুনরায় গৌড়ভ্রমণ নিয়ে। মুরারির বর্ণনামতে মহাপ্রভু ঐ সময় ফুলিয়া থেকে নবদ্বীপ এসে মাতাকে প্রণাম করেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে তাঁর মূর্তি প্রস্তুত ক'রে পূজা করতে বলেন। পরে আম্বুয়া-কালনায় যান এবং সেখানকার গৌরীদাস পণ্ডিতকে গৌরনিতাই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন। মহাপ্রভুর যে চরিত্র চরিতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং মুরারি গুপ্ত নিজে যে চরিত্র এঁকেছেন তার সঙ্গে এরকম ঘটনার সম্বন্ধ অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আধুনিক কোনো ঐতিহাসিক মুরারির কড়চায় প্রাপ্ত এই অংশটিকে একটা ভালো সত্যের আবিষ্কার ব'লে ধরে নিয়েছেন এবং বলেছেন যে নবদ্বীপে স্বগৃহের সমীপে গমন এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে নির্দেশ দান প্রভৃতিতে তাঁদের কল্পিত চরিত্রের মর্যাদা রক্ষিত হয় না ব'লে অন্য জীবনীকারেরা যেন পরস্পর যোগাযোগ ক'রে এই ঘটনাটির বর্ণনা করেননি। আমাদের ধারণায় মুরারি গুপ্তের কড়চার ঐ সব অংশ অন্যের গ্রথিত। এই বিবরণটিই তা বিশেষভাবে প্রমাণ করে। কিন্তু আরও আছে। শ্রীচৈতন্য যে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ ও বিবাহিত সম্পর্ক আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারেননি তারও বিবরণ মূল মুরারির লেখায় অবশ্য ছিল। বর্তমানে প্রাপ্ত পুঁথিতে দেখা যায়, তা সুকৌশলে (মুরারির মৃত্যুর পরই) চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া যায়নি। কবিকর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যে মুরারির নবদ্বীপলীলা পর্যন্তই অনুসরণ করেছেন।

পরবর্তী অংশ নিজ আহৃত জ্ঞান অনুসারে লিখেছেন। আর কবিরাজগোস্বামী কেবল আদিলীলা বিষয়েই মুরারির রচনা স্বীকার করেছেন।[১]

(৪) কয়েকটি ছোটখাটো বিষয়ে চরিতকারদের পরস্পর মতৈক্য দেখা যায় না। যেমন, 'চৈতন্যভাগবত'-এ বাস্তব বর্ণনার মধ্যে জগন্নাথমিশ্র-গৃহের দারিদ্র্যের ছবি দেওয়া হয়েছে। মুরারি গুপ্তও মিশ্রপরিবারের সচ্ছলতার বর্ণনা দেননি। বরং তাঁকে সুদরিদ্রই বলেছেন। কিন্তু গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীতে এবং তদনুসরণে কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে ধনরত্ন মণিমাণিক্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে পদকর্তাদের কাব্যকল্পনায় শ্রীচৈতন্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে দেখাই স্বাভাবিক। আর কিশোরকবি কর্ণপূর মুরারির কড়চায় পরিস্ফুটভাবে যা পাননি তা নিয়েছেন পদাবলী থেকে। চৈতন্যপরিবারে চৈতন্যের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কর্ণপূর-পিতা দূরাবস্থিত শিবানন্দসেনের বিশেষ জান সম্ভব ছিল না। বৃন্দাবনদাস শুধু নিত্যানন্দ ও মাতা নারায়ণীর মুখেই শোনেননি, বর্ষীয়ান পরিকরদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর হয়ে নীলাচল যাত্রাপথে মহাপ্রভুর সঙ্গী কে কে ছিলেন সে বিষয়ে চৈতন্য-ভাগবত বলছেন—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, জগদানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ। চৈতন্য-চরিতামৃত বলেছেন—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দত্ত এই চারজনকে অদ্বৈত আচার্য সঙ্গে দিলেন। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা বিষয়ে অবহিত হয়েও যখন কবিরাজ গোস্বামী পৃথক সংবাদ দিচ্ছেন তখন বুঝতে হবে তিনি পরবর্তীকালে সন্ধান নিয়ে পূর্ববর্তী বর্ণনায় যা পরিবর্তনযোগ্য তা পরিবর্তন করে লিখেছেন। এইভাবে বলা যায়, নিত্যানন্দ কর্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গের স্থান বিষয়ে ও মহাপ্রভুর প্রথমে সার্বভৌমগৃহে গমন অথবা জগন্নাথ-মন্দিরে গমন পরভৃতির সন্দেহ নিরাকরণ চৈতন্য-চরিতামৃতই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। চরিতামৃতে লিখিত বৃন্দাবনদাস ও চৈতন্যভাগবত বিষয়ে উচ্ছ্বসিত মন্তব্যগুলি স্মরণে রেখে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঘটনার সত্যতা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ না হলে বৃন্দাবনদাসকে লঙ্ঘন করতেন না।

পরিশেষে আমাদের নির্ধারণ এই যে, চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত নিয়ে শ্রীচৈতন্যের যে জীবনালেখ্য ফুটে ওঠে, বস্তু এবং ভাবের দিক্ থেকে তা-ই আমাদের প্রয়োজন মোটামুটি সিদ্ধ করে। এই দুই গ্রন্থ দুই দিক্ থেকেই পরস্পরের পরিপূরক। চৈতন্যচরিতামৃত শুধু চৈতন্যভাগবতেরই অসম্পূর্ণতার পূরণ করেনি, কবিরাজ গোস্বামীর সামনে পূর্বলিখিত যে-সব চরিতগ্রন্থগুলি ছিল, যেমন, মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত কড়চা, কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও নাটক, সে সবের উপাদান ও ভাবসার পর্যালোচনা করে তিনি একটি প্রণালীবদ্ধ, অত্যন্ত সুসমঞ্জস ও উন্নতশ্রেণীর গ্রন্থ নির্মাণ করেছেন। মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত কড়চা এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত তুলনা করলে দেখা যাবে, উভয়ের মধ্যে মূল বিষয়গত পার্থক্য সামান্যই, অথচ বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপের, মিশ্রপুরন্দর-গৃহের, চৈতন্যের বাল্য-চাপল্যের, অধ্যয়নের, পরিহাস-প্রিয়তার এবং সর্বোপরি প্রথম প্রকাশ ও আশ্চর্য লীলাসমূহের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, আর শচীদেবী ও অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাসাদির জীবন যেরকম বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তা মুরারি গুপ্তের বর্ণনাতেও

---

১. আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥ (চৈ-চ, আদি—১৩)

পাওয়া যায় না। লোচনদাস উপাদানের দিক দিয়ে নির্বিচারে (ঐভাবে প্রক্ষেপ-যুক্ত) মুরারি গুপ্তের অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস স্বকীয়ভাবে তথ্যসংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। চরিতামৃতকার যে অবসর পেলেই বৃন্দাবনদাসের উচ্চপ্রশংসা করেছেন সে কেবল বিনয়বশতঃ নয়। আর কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব যতই থাক, তিনি শ্রীচৈতন্যের বহিরঙ্গ জীবন এবং ভাব-জীবনের বর্ণনায় যুক্তিবিচারের পদ্ধতিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এ তাঁর বর্ণনরীতিতে স্পষ্ট। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে তথ্যের দিক দিয়ে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নরহরির সম্পর্কের বিষয়টি ছাড়া মুরারিগুপ্ত বা বৃন্দাবনদাস থেকে নতুনতর কিছুই নেই। কবিত্ব কল্পনার দিক থেকে এটি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীর সমশ্রেণীর রচনা। গোবিন্দদাসের কড়চা নিঃসন্দেহে প্রচুর পরিমাণে কাল্পনিক রচনা। অন্ততঃ এর আংশিক সত্যও মিথ্যায় ঢাকা পড়ে গেছে। কড়চাটিতে শ্রীচৈতন্যের লৌকিক জীবন ফুটেছে মনে করে কোনো কোনো আধুনিক গ্রন্থকার এর স্থানবিশেষ কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেও গ্রন্থটির কৃত্রিমতা ও অপ্রামাণিকতা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল নেহাতই জনশ্রুতির উপর লেখা গ্রন্থ। জয়ানন্দ পালাগানের রীতিতে লিখেছেন এবং লোকের চমৎকার লাগে এমন বহু উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। সুতরাং এটি কেবল ভক্তের দৃষ্টিতেই দূষ্য নয়, ইতিবৃত্তের দিক দিয়েও অবিশ্বাস্য। এসব বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনায় পরিস্ফুট হবে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ এবং শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কাহিনী অবলম্বনে যে-সব আখ্যান-গ্রন্থ নির্মিত হয়েছিল সেগুলি চৈতন্য-জীবনের প্রাসঙ্গিক তথ্য কিছু পরিবেশন করলেও সেগুলির উপর বিনা-বিচারে নির্ভর করা যায় না। বিশেষতঃ চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত-এর সঙ্গে ভাগবত বিরোধের ক্ষেত্রে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' এমনকি 'ভক্তি-রত্নাকরে'র তথ্যকেও বহুমান করা সমীচীন হবে না।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে রাগভক্তির উদয় আকস্মিকভাবেই ঘটেছিল। একে আবির্ভাব বা প্রকাশ বলা যেতে পারে, বলা যেতে পারে "ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়।" গয়ায় পিতৃকৃত্য করতে গিয়ে আপনা থেকেই ঘটুক, রামকেলি গ্রামের কাছে কল্পনায় কৃষ্ণদর্শন থেকেই হোক, অথবা ঈশ্বরপুরীর সংসর্গেই ঘটুক[১] যে মুহূর্তে তাঁর চোখে অশ্রু দেখা দিয়েছিল সেই মুহূর্তটি বাঙলাদেশ এমনকি ভারতবর্ষের পক্ষে অতুলনীয় শুভমুহূর্ত। জীবনীকারেরা এ দিনটিকে চিহ্নিত করেননি।[২] কিন্তু নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতন্যের নিজ জীবনেও ঐটি একটি স্মরণীয় দিন। তার ঠিক পূর্বে তিনি কলাপ-ব্যাকরণে অধীতী, দশকর্মের

১. চৈতন্যভাগবত মতে বিষ্ণুপদের মাহাত্ম্যকীর্তন শুনে প্রথম তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়, বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে অলৌকিক ভাবাবেশে তাঁর চিত্ত বিহ্বল হয় এবং ঈশ্বরপুরীর সংসর্গে তা বর্ধিত হয়। ঐ সময়ে ঈশ্বরপুরী দশাক্ষর নামমন্ত্র দানে তাঁর কৃষ্ণবিরহ উদ্দীপিত করেন।

তু°—পাদপদ্মতীর্থের লইতে প্রভু নাম। অঝোরে ঝরয়ে দুই কমল নয়ান॥ (মধ্য-১)

২. আনুমানিক ১৪৩০ শক আশ্বিন শেষ বা কার্তিক প্রথমেই তিনি গয়াগমনে বহির্গত হন। সুতরাং ঘটনাটি কার্তিক-অগ্রহায়ণের। চৈতন্যভাগবতের বর্ণনানুসারে গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর অধ্যাপনায় বেশ কিছুদিন বিচ্ছেদ ঘটেছিল এবং তাঁর পড়ুয়ারা আর কারও কাছে পড়তেও চায়নি। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য মতে পৌষমাসে তিনি গয়া থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হন। আবার চব্বিশ বৎসর শেষে ১৪৩১ শকের পৌষ-সক্রান্তি বা ১লা মাঘ তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ। চৈতন্যভাগবতের মতে "বৎসরেক কীর্তন করিলা যেন মতে" ধ'রে গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন ঐ সময়ে ধরা যায়।

শিক্ষানবীশ, কাব্য-স্মৃতি-ব্যাকরণের একত্রে ছাত্র ও অধ্যাপক, দাম্ভিক পণ্ডিতের গর্বনাশক[১] এবং সেই সঙ্গে সংসারের সম্বল-চিন্তায়ও ব্যস্ত। বৃন্দাবনদাস আভাস দিচ্ছেন যে সহপাঠী মুকুন্দ-গদাধর যখন কিছু কিছু ধর্মচর্চা করছেন, আর অদ্বৈতের বাসায় গীতা-ভাগবতের ব্যাখ্যা চলছে তখন নিমাই পণ্ডিত নিতান্তই কৃষ্ণবিমুখ।[২] তাঁর ব্যাকরণের পাণ্ডিত্য লোকব্যবহারে প্রায় ঔদ্ধত্যে পরিণত হয়েছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস পণ্ডিতও তাঁর ফাঁকি-জিজ্ঞাসা থেকে রেহাই পেতেন না। চঞ্চলতাময় বুদ্ধিদীপ্ত দুর্ঘট-ঘটক ব্যাকরণবিদ্যায় তিনি এমনই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে শুদ্ধভক্তিবাদী ঈশ্বরপুরী এই প্রতিভা-দীপ্ত তরুণের মধ্যে ধর্মীয় সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে এসে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজ রচনার ত্রুটি দেখিয়ে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু নিমাই-পণ্ডিতের এই ঔদ্ধত্যের জন্য কেউ যে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হননি তার কারণ তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক সরলতা, ব্যবহারে ঔদার্য, যথাস্থানে নম্রতা, পরিহাসপটুতা, অন্যায়-অসহিষ্ণুতা, নেতৃসুলভ দৃঢ়তা প্রভৃতি বহুগুণ। অন্যকে বিরক্ত করে তিনি যে নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করতেন তার দৃষ্টান্ত 'খোলাবেচা শ্রীধরে'র সঙ্গে কি মুরারি-মুকুন্দের সঙ্গে তাঁর রঙ্গ-রসিকতা।[৩] এর পূর্বসূত্র রয়েছে তাঁর শাণিত বুদ্ধিযুক্ত বাল্যচাপল্যের মধ্যে—গঙ্গার ঘাটে এবং তীরবর্তী সমগ্র পল্লীতে বিশেষ বিশেষ গৃহস্থকে উদ্বেজিত করার মধ্যে। জীবনীকার ও কবি বৃন্দাবন এই জীবনের নিপুণ বর্ণনা গ্রথিত করেছেন। আমরা এই নিয়ে বাগ্‌বিস্তার করতে চাই না। তাঁর বর্ণনায় যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটেছে তার অনুবৃত্তিও আমাদের ক্ষমতার বাইরে। আমাদের মন্তব্য এই যে, তেইশ বৎসর পূর্ণ হয়নি এমন সময়ে গয়ায় বিষ্ণুপদদর্শনে ও

---

১. দিগ্বিজয়ী-পরাভব ঘটনা প্রথম বৃন্দাবনদাস ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত বর্ণনা না করলেও কবিপক্ষীয় অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে, এই ধরনের কোনো ঘটনার সম্ভাব্যতায় অবিশ্বাস করা যায় না। মূলে কোনো সত্য না থাকলে কবিরাজ গোস্বামীও দীর্ঘ বর্ণনা গ্রথিত করতেন কিনা সন্দেহ। তবে দিগ্‌বিজয়ী যে কেশব-কাশ্মীরী সে বিষয় অবশ্য নিতান্তই অনুমানমূলক। মিথিলা অঞ্চলের কোনো পণ্ডিত হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

২. হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন বিপ্ররূপে॥
প্রেমভক্তি প্রকাশ নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন, ইচ্ছা সে তাঁহার॥ (চৈ-ভা, আদি—১১)

প্রভু সে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে।
ভক্ত সভে দুঃখ পায়, দেখেন আপনে॥ (চৈ-ভা, আদি—১২)

৩. না চিন্তে মুরারি গুপ্ত পুঁথি প্রতুস্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালেন তাঁহানে। **
প্রভু বোলে "ইথে আছে কোন্ বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন...॥
শুনয়ে মুরারি গুপ্ত আ টাপ-টংকার।
না বোলয়ে কিছু, কার্য করে আপনার॥
প্রভু বোলে, বৈদ্য, তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দৃঢ়।
ব্যাকরণশাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥ ইত্যাদি (চৈ-ভা, আদি—৭)

শ্রাদ্ধাদি-বিহিত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে এক মুহূর্তে যে কাণ্ড ঘটল তা শ্রীচৈতন্য নিজেও বোধ হয় প্রত্যাশা করতে পারেননি। কিন্তু যা অনিবার্য তা ঘটবেই। মহানিষ্ক্রমণ দিবসে ভগবান্ বুদ্ধেরও এরকম ঘটেছিল।

গয়াগমনের পূর্বে মহাপ্রভুর চারিত্র্যে এমন কিছু দেখা যায় না যা থেকে তাঁর পরবর্তী ধর্মাভিভব সূচিত হয়। তথাপি বহিরঙ্গ কোনো ঘটনা এবিষয়ে গৌণভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল কিনা তাও দেখা প্রয়োজন। তিনি সাংসারিক জীবনে তিনটি উল্লেখ্য ভবিতব্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন : (১) অগ্রজ বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ[১] (২) পিতা জগন্নাথ মিশ্রের দেহত্যাগ[২] এবং (৩) স্বনির্বাচিত প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর দেহত্যাগ।[৩] এর মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয় ঘটনা দুটিই অপেক্ষাকৃত গুরুতর এবং তৃতীয়টিই বিশেষভাবে, এমন অনুমান বোধ হয় অসংগত হবে না। এই তিনটি ঘটনা তাঁর অন্তঃকরণে বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুসন্ধানের উপযুক্ত ভূমিকা প্রস্তুত করে চলেছিল এমন হতেও পারে। এছাড়া দেখা যায়, দরিদ্র অথচ সাধুপ্রকৃতির ও পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র-পুরন্দরের গৃহে প্রায়শই সাধু-সন্ন্যাসী আতিথ্য গ্রহণ করতেন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের কয়েকমাস পূর্বে তাঁর সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতী এসেছিলেন, গয়াগমনের কিছু পূর্বে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে এলে শ্রীচৈতন্য তাঁকে নিজগৃহে একদিন এনেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের শৈশবে এসেছিলেন এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ, যাঁর নিবেদিত অন্ন নিমাই পুনঃপুন ভক্ষণ করেছিলেন বলে প্রকাশ। এ ছাড়া শ্রীচৈতন্যের জন্ম-পূর্বকালে সম্ভবতঃ স্বয়ং মাধবেন্দ্রপুরী সশিষ্য (শ্রীরঙ্গপুরী, যাঁর সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর দক্ষিণ ভ্রমণের সময়ে, 'চৈতন্যচরিতামৃত' দ্রঃ) মিশ্র পুরন্দরের গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করেছিলেন।

এসব বাহ্য ঘটনা শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিগত জীবনে বৈরাগ্যপ্রবণতা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এমন মনে করা গেলেও কিন্তু রাগাত্মিক ভক্তি উদয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আমরা মনে করি এর মধ্যে দৈব যুগ-প্রবণতাই তাঁর লৌকিক ব্যক্তিত্বের অন্তরালে কাজ করেছিল এবং তিনি দুর্জ্ঞেয়-স্বরূপ যুগাবতারই। বৌদ্ধধর্মের অবনতির পর থেকে ভারতে মানুষ-জীবনে বিদ্যা, ধনসম্পদ ও জাতিগত কৌলীন্যের পার্থক্যবুদ্ধিতে যে

১. বিশ্বরূপ নিমাই থেকে আনুমানিক ৭/৮ বৎসরের বড় ছিলেন। কারণ বিশ্বরূপ যখন অদ্বৈতের নিকট পাঠ নিচ্ছেন তখন 'দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর' গৌরাঙ্গ তাঁকে আহারের জন্য ডাকতে যেতেন। বিবাহের কথাবার্তা চলছে এমন সময় বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হন আনুমানিক ১৭ বৎসর বয়সে। সুতরাং গৌরাঙ্গের বয়স তখন ১০ বৎসর। চৈতন্যভাগবত লিখছেন :

> যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
> তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির॥
> ...খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
> তিলার্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে।

২. অনুমান শ্রীচৈতন্যের বয়স তখন ১৪, তিনি তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের মধ্যম কোনো শ্রেণীর ছাত্র।

৩. চৈতন্য-বয়ঃক্রম আনুমানিক ২০-২১। ঐ সময়েই অধ্যাপনার দ্বারা যে শিষ্যগৃহে দর্শন দিয়ে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর পদ্মাতীরভূমি গমন সংগত মনে হয়। দেখা যায় ১৬ বৎসর পর্যন্ত তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিয়মিত ছাত্র। পাঠ কিছুটা সমাপ্ত হলে বিবাহ ধরে ১৭ বৎসরে প্রথমে বিবাহ। (চৈ-ভা—'ষোড়শ বৎসর প্রভুর প্রথম যৌবন' : আদি—৭ম)

'কায়েমী স্বার্থ' সমুচ্চ হয়ে উঠেছিল, সুতরাং ধর্মে যে গ্লানি দেখা দিয়েছিল, অভ্যন্তরীণ ইতিহাসের দিক্ থেকে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ভক্তিতত্ত্ববাদীরা এই সংগ্রামের আভাস দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ঐ গ্লানির বিপক্ষে আত্যন্তিক বিদ্রোহ করেননি, আপস করে চলেছিলেন মাত্র। মাধবেন্দ্রপুরীর চারিত্র্যে বিপ্লবের বীজ নিহিত হয়েছিল, যা তৎ-সম্প্রদায়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিন্তু মহাপ্রভু এবং তাঁর পরিকরদের চেষ্টার মধ্যেই এর বহুশাখাসমন্বিত বিকাশ চিহ্নিত হয়েছিল। মানবগোষ্ঠীর অন্তরতম মানুষের আকাঙ্ক্ষারই মূর্তবিগ্রহরূপে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে, ভগবান্ বুদ্ধাদির মত তিনি নব-উপলব্ধ ধর্মের প্রচারকার্যে ব্রতী হননি,[১] এ ধর্ম তাঁর চারিত্র্যে এমনভাবে স্ফূর্ত হয়েছিল যে জাতিতে নিতান্ত হীন বলে পরিগণিত, পতিত এবং ধর্মহীন মানুষকেও মহত্তম অধিকার দান সম্ভব করেছিল।[২] সাধারণভাবে যাকে আমরা মানবপ্রীতি ব'লে থাকি, যা সীমিত এবং ঐকদেশিক, এ তার চেয়ে ঢের বেশি সমুন্নত এবং প্রকারে বিভিন্ন ছিল। পূর্বেকার কোনো ভক্তিমত অথবা সোঽহংবাদও মানুষকে এই ন্যায্য ও পরিপূর্ণ অধিকার দিতে পারেনি। অতএব শ্রীচৈতন্যের মানসে ধর্মাভিভবের বিষয়টিকে আধুনিক যে-সব গ্রন্থকার তাঁর বাল্য ও কৈশোরের ক্রমিক অভিব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে অমরা একমত হতে পারছি না।[৩]

গয়ায় নবধর্ম-উপলব্ধির পরবর্তী অনিবার্য প্রতিক্রিয়া তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ, মোটামুটি এক বৎসর এক মাস পরে।[৪] এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিঃসন্দেহে, কিন্তু পৃথকভাবে এর অভ্যন্তরীণ মূল্য তত প্রবল নয়,[৫] যতটা বহিরঙ্গ লোকসম্পর্ক-মূল্য। যে নবজীবন পূর্বেই প্রারদ্ধ হয়েছিল এই ঘটনায় তাকে বাহ্য স্বীকৃতির মর্যাদা দেওয়া হল এবং লোকমধ্যে

---

১. আপনি আচরি জীবে শিখাইলা ভক্তি। (চৈ-চ)

২. নীচ জাতি ন হ কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥ (চৈ-চ, অন্ত্য—৪)
'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।'

৩. তু° চৈ-ভা— 'আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ"
"প্রেমবৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ"
"পরম অদ্ভুত কথা মহা-অসম্ভব।
নিমাঞিপণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব।"

৪. চরিতামৃতকার এইভাবে তারিখ দিচ্ছেন :
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

অর্থাৎ ১৪০৭ শক ফাল্গুনী পূর্ণিমা (২৩ ফাল্গুন) দিবসে (১৪৮৬ খ্রীঃ ৮/৯ মার্চ) তাঁর জন্ম ধরে ১৪৩১ শক পৌষ-মাঘ সংক্রান্তি (১৫১০ খ্রীঃ ১৩/১৪ জানুআরি) শুক্লপক্ষ, ধরা যাক, দ্বাদশী-ত্রয়োদশী। চব্বিশ বৎসর প্রায় পূর্ণ হয় চান্দ্র মাস তিথি ধরে এবং মাস-হিসাবে মেয়েলি গণনাতেও।

মুরারি ও বৃন্দাবন আরও নির্দিষ্ট করে বলেছেন 'সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দিবস'।

৫. তু° পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংস্যর-তারণ॥ (চৈ-চ, মধ্য—১)

এই সন্ন্যাস যে তাঁর লীলার সঙ্গে একাত্ম তা একজন পদকর্তা সুন্দরভাবে নিবদ্ধ করেছেন—*

প্রতিষ্ঠাও দেওয়া হল। বিশ্বম্ভর-নিমাইপণ্ডিত এখন থেকে 'কৃষ্ণচৈতন্য' হলেন, উপবীত ত্যাগ করে কেশমুণ্ডন করে গৈরিক ধারণ করে এবং হাতে দণ্ড নিয়ে তিনি যেন নূতন জন্মে উপনীত হলেন। এই ঘটনাটি অভূতপূর্ব কারুণ্যের সঙ্গে চরিতকারেরা, বিশেষভাবে পদকর্তাগণ বর্ণনা করেছেন। মানুষ যে মানুষের কাছে কত প্রিয় হতে পারে এই পদসমূহ তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কবি বৃন্দাবনদাসের বর্ণনামতে পাষণ্ডী অবিশ্বাসীদের যাতে নবধর্মে প্রত্যয় জাগে তার জন্য গৌরাঙ্গ দ্রুত সন্ন্যাস আশ্রয় করলেন।[১] রাগভক্তি আচরণের পথে সন্ন্যাসের প্রয়োজন আত্যন্তিক না হলেও লোক-কল্যাণের জন্য অবশ্যকরণীয় ছিল। তা ছাড়া, বুঝতে হবে, কৃষ্ণপ্রেমে রাধার মত সর্বত্যাগ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকই হয়েছিল। বলা বাহুল্য, কঠোর সন্ন্যাস মহাপ্রভু শেষদিন পর্যন্ত ত্যাগ করেননি। কিন্তু এর মহান্ ব্যতিক্রমও ছিল, সে তাঁর মাতৃভক্তি। সন্যাসী হয়ে মাতার চিত্তে গুরুতর বেদনা দিয়েছেন এই করুণ অনুভব তাঁর চিত্তকে মাঝে মাঝে বিচলিত করত। তিনি লোক পাঠিয়ে শচীদেবীকে তাই প্রবোধ দিতেন এবং বস্ত্রাদি প্রেরণ করে যথাসাধ্য সেবারও প্রয়াস করতেন।[২] এছাড়া গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মিলন-বাসনাও তাঁর চিত্তের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। কিন্তু সন্ন্যাসের পর তিনি পূর্বাশ্রমে ফিরেও যাননি, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য কোনো উৎকণ্ঠা আগে পরে কোনোদিনই বোধ করেননি।[৩] এবিষয়ে তাঁর লোকাপেক্ষা কিরকম বলবান্ ছিল তা জগদানন্দের প্রীতিপূর্ণ

* এ বড় বিস্ময় লাগে মনে।
জিনি নব জলধর   পূর্বে যাঁর কলেবর
সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে॥
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাবেড়া   মনোহর যাঁর চূড়া
সে মস্তক কেশশূন্য দেখি।
যার বাঁকা চাহনিতে   মোহে রাধিকার চিতে
এবে প্রেমে ছলছল আঁখি॥
সদা গোপী সঙ্গে রহে   নানারঙ্গে কথা কহে
এবে নারীনাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশী ধরি   আকর্ষয়ে ব্রজনারী
সেই ভুজে দণ্ডে কেনে লয়ে॥

১. কিন্তু আমরা মনে করি, শচীদেবী জোর করে দ্বিতীয়বার বিবাহ না দিলে গৌরাঙ্গ এত শীঘ্র নবদ্বীপ ত্যাগ করতেন না।

২. এ সম্বন্ধে চৈ চ বলেছেন :

"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম নাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার॥
নীলাচলে আমি আছি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥"

* * *

মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥ (অন্ত্য—১৯)

৩. মুদ্রিত সংস্কৃত কড়চা মতে বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মহাপ্রভু নবদ্বীপে এসে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁর মূর্তি গড়িয়ে পূজা করতে বলেন, কিন্তু এই অসম্ভব ঘটনা আর কোনো জীবনীকার লিপিবদ্ধ করেননি। তা ছাড়া মুদ্রিত ঐ কড়চার নবদ্বীপলীলা (তাও আংশিক) ব্যতীত পরবর্তী অংশের রচনা মুরারির পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা এবিষয়ে আমরা সন্দিগ্ধ।

সেবাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে অস্বীকার এবং তাঁর প্রতি বহুক্ষেত্রে তিরস্কারই প্রমাণ করে। নিতান্ত প্রীতিবৎসল পরিকরদের নির্বন্ধাতিশয্যে প্রদত্ত ভিক্ষান্ন উপেক্ষা করতে সমর্থ না হলেও, আহার বিষয়ে রামচন্দ্রপুরীর মন্তব্য শুনে তারপর থেকে তিনি দৃঢ়ভাবে অর্ধাশন গ্রহণ করতে থাকেন। যাই হোক, সন্ন্যাস যে তাঁর ভক্তির আচরণে এবং লোকশিক্ষণে প্রবল সহায়ক হয়েছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

শ্রীচৈতন্যের গয়া থেকে প্রত্যাগমন এবং সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যবর্তী এক বৎসরের কিছু বেশি সময় রাগভক্তি প্রকাশ এবং বিস্তারের দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ঘটনাবহুলও। এই সময় অশ্রু কম্প রোদন মূর্ছাদি অদৃষ্টপূর্ব বিকারসমূহের প্রকাশ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা[১] বর্জন, শ্রীবাসগৃহে বান্ধব পরিকরসহ সংকীর্তনারম্ভ,[২] নিত্যানন্দ-মিলন, হরিদাস ঠাকুরের যোগদান, মহাপ্রভুর কৃষ্ণাবতারত্বে পরিকরগণের দৃঢ়প্রত্যয় এবং তদর্থে অভিষেক, জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার, চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে বড়াই-ঘটিত দানলীলা ও রুক্মিণীলীলার অভিনয়, নগরসংকীর্তনের রীতিস্থাপন ও কাজী-প্রবোধ, সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প এবং ক্ষুদ্রবৃহৎ নানান্ অভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গ ঘটনা। মহাপ্রভুর এই আশ্চর্য প্রকাশ প্রসঙ্গে নরহরি-বাসুঘোষ-গোবিন্দঘোষ, বৃন্দাবনদাস (এবং মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর প্রভৃতি সকলেই) অল্পবিস্তর অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলির যথাযথতায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না যে অশ্রু-প্রলাপ-মূর্ছাদি বিকারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের হাবভাবে আরও বহু অদ্ভুততর প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। এগুলি বাস্তবেই ঘটেছিল, কিন্তু অন্য কোথাও এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি বলে পূর্বপরিচিত অবতারাদির অলৌকিক রূপ ও ভাবের সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য দর্শন সহজ হয়েছিল। মহাপ্রভুর জীবনচিত্রের এই অংশের শ্রেষ্ঠ রূপকার বৃন্দাবনদাস।

নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপনা-ত্যাগের বিষয়টি লীলাচারী বৃন্দাবন প্রত্যক্ষদর্শীর মত বর্ণনা করেছেন, এবং দু'চার কথাতেই সমাপ্ত করেননি। পল্লীর মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল বসত এবং তাঁর পুত্র পুরুষোত্তমসঞ্জয় নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু নব-অনুরাগের রক্তচ্ছটায় যাঁর চিত্ত রঞ্জিত হয়েছে, তাঁর পক্ষে পাঠগ্রহণ এবং ব্যাখ্যান অসম্ভব হয়ে উঠল। ধাতু ও প্রত্যয়ে, বর্ণে ও আগমে তিনি কৃষ্ণের আভাস দেখতে লাগলেন এবং ছাত্রদের কৃষ্ণ-ভাবনার উপদেশ দিতে লাগলেন। ব্যাপারটি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গোচরে আনা হলে তিনি নিমাইকে ডেকে উপদেশ দিলেন ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে, কারণ ঠিক মত জ্ঞান হলে ভক্তি আরও সুদৃঢ় হবে। গুরু-উপদেশে নিমাই পণ্ডিত একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলেন, কিন্তু প্রয়াস বিফল হল। সূত্র বৃত্তি টীকা সর্বত্র হরিকথাই

১. দেখা যায়, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়নি এমন সময় তিনি অধ্যাপনাও করছেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে সহায়ক অধ্যাপকের কাজ করছেন এমন অনুমান করা যায়।

২. গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আনুমানিক দু'তিন মাস তিনি ছাত্রদের নিয়ে বসার চেষ্টা করেছিলেন। সংকীর্তনে মত্ত হবার আগেই অসমর্থ হয়ে অধ্যাপনা-প্রহসন ত্যাগ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবত উভয়েরই মতে তিনি প্রায় এক বৎসর নবদ্বীপে নৃত্য-সংকীর্তনে অতিবাহিত করেন। অর্থাৎ ১৪৩০ শকের ফাল্গুন-চৈত্র থেকে ১৪৩১ শকের পৌষ পর্যন্ত তিনি সংকীর্তন করেছিলেন।

দেখতে পেলেন এবং অধ্যাপন-প্রহসন সাঙ্গ করে জন্মের মত পুঁথি বন্ধ করলেন।[১] চৈতন্যভাগবত মতে বিদ্যাবিলাস সমাপ্ত করেই গৌরাঙ্গ নৃত্য ও সংকীর্তনে নিরত হলেন। প্রথমে পড়ুয়া শিষ্যদের সম্মুখেই তিনি নাম-কীর্তন আরম্ভ করেন—হরয়ে নমঃ ইত্যাদি। গয়া গমনের পর থেকে তিনমাস মাত্র ব্যবধানে বিশ্বম্ভরের এ এক আশ্চর্য নূতন মূর্তি। কোথায় গেল সেই বিদ্যার ঔদ্ধত্য, কোথায় সেই চপলতা, ছিদ্রান্বেষণপর পরিহাসরসিকতা! ক্রমে সারা নবদ্বীপে এবং শান্তিপুরে ব্যাপারটি রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। অদ্বৈত আচার্য তাঁর ঈশ্বরোপাসনার মধ্যে বহুদিন ধরে ধর্মের গ্লানির বিনাশ এবং ভক্তিধর্ম প্রতিষ্ঠায় অবতারের আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি ধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। শ্রীবাসাদি স্বচক্ষে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। গদাধর, মুকুন্দ নিয়ত শ্রীচৈতন্যের পার্শ্ববর্তী রইলেন। এদিকে অত্যন্ত অপরিচিত ও কল্পনাতীত ভাববিকার দৃষ্টে[২] অনেকেরই ধারণা হল নিমাইয়ের বায়ুরোগ জন্মেছে। শচীমাতা যারপরনাই ভীত ও ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ওষুধ, তেল, ঝাড়ফুঁক চলল কয়েকদিন, কিন্তু শীঘ্রই সকলে বুঝলেন এ বায়ুর পিছনে গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে, এ ভূতপ্রেত বা সাধারণ দেবতার ভর নয়—এ 'কদম্ব-বনদেবতা নবতমালনীলদ্যুতিঃ' আর এ অশ্রু-কম্পাদি নব কৃষ্ণানুরাগের ফল মাত্র। শ্রীবাসই শচীমাতাকে বুঝিয়ে বললেন, এ বায়ুরোগ নয়, কৃষ্ণভক্তি। এখন শচীমাতার ভয় ভিন্ন প্রকারের হল, বিশ্বরূপের মত নিমাইও যদি সন্ন্যাসী হয় আর ঘন ঘন ভূমিতে পতন

---

১. "...কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখো তাই ভাই বোলোঁ সর্বথায়॥
যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নহিল আমার।
তোমা সভাকার—যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার ঠাঞি পড়—আমি দিলাঙ নির্ভয়॥
কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আজি কহিলাঙ চিত্ত আপনার॥
এই বোল মহাপ্রভু সভারে কহিয়া।
দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥ (চৈ-ভা, মধ্য—১)

২. শতেক-জানও কম্প ধরিবারে নারে।
লোচনে বহয়ে নদী শত শত ধারে॥
কনক-পনস যেন পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥
ক্ষণে রয় আনন্দমূর্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ-ব্যতিরেক॥
হুংকার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তাঁর ভক্ত সব তরে॥
সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়।
অপূর্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহো না করয়ে মনে। (চৈ-ভা, মধ্য—১)

দেখে তিনি অপরিসীম বেদনাবোধ করতে লাগলেন। শ্রীবাসই প্রস্তাব করলেন, তাঁর গৃহ ভক্তবৃন্দসহ সংকীর্তনের স্থান হোক। ইতিমধ্যে অদ্বৈতের আকর্ষণে মহাপ্রভু নিজেই অদ্বৈতগৃহে উপস্থিত হয়ে ভাবভক্তির নতুন প্রকাশের স্বরূপ দেখানোতে অদ্বৈত বুঝলেন তাঁর এতদিনের প্রত্যাশা বোধ হয় সফল হতে চলেছে।

আরম্ভ হল সংকীর্তন, নবদ্বীপের পুরাতন রীতির রামোপাসক নারায়ণ-উপাসকদের মিলনক্ষেত্র শ্রীবাসগৃহে। উচ্চকণ্ঠে, সুর সংযোগে নামগুণকীর্তন যে ভক্তিসাধনার মুখ্য অঙ্গ তা শ্রীচৈতন্যই প্রথম দেখালেন।[১] শান্তিপুর থেকে ছুটে এলেন ঈশ্বর-উপাসনার নেতা ও গুরু প্রবীণ অদ্বৈত, সঙ্গে নিয়ে সূফী সাধক ও নামমন্ত্রের অনুরাগী হরিদাসকে, কোথা থেকে এসে জুটলেন সহজ-অনুরাগ ধর্মের অন্য শ্রেষ্ঠ পথিক নিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্যের ন'বৎসরের জ্যেষ্ঠ। সমতট থেকে এলেন মাধবেন্দ্র-শিষ্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীখণ্ড থেকে এসে ক্বচিৎ যোগ দিতে লাগলেন নরহরি সরকার। আর নবদ্বীপের গদাধর, মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত, খোলা-বেচা শ্রীধর, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, বক্রেশ্বর, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন, পুরুষোত্তম আচার্য (?), দামোদর পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, ব্রহ্মানন্দ। কদাচিৎ দিবসে এবং প্রায়শঃ নিশাভাগে নবদ্বীপের গঙ্গাতীরবর্তী এই পল্লী খোল মাদল করতাল যোগে কীর্তন-মুখরিত হতে থাকল। সংকীর্তন-চিত্রে দেখতে পাই প্রিয়তম গদাধর সব সময়েই তাঁর বাঁদিকে রয়েছেন, ডাইনে আছেন নিত্যানন্দ—আছাড় থেকে শ্রীচৈতন্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। সঙ্গে নৃত্য করছেন অক্লান্ত-নর্তক, বক্রেশ্বর, গাইছেন কিন্নরকণ্ঠ মুকুন্দ এবং বাসু ঘোষ, খোলবাদন করছেন গোবিন্দাদি, আর অদ্বৈত, নরহরি, দামোদর, শ্রীবাস ভাবে আত্মহারা হয়ে ঘুরছেন। কখনো বা দেখা যায়, ভক্ত সংখ্যা বেশি হলে অদ্বৈত শ্রীবাসাদি পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে নৃত্য-কীর্তন করছেন। ধর্মপথের যাঁরা পথিক তাঁরা যেমন এতে নবচৈতন্য লাভ করলেন, তেমনি বিষয়ী পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা এসব ব্যাপারকে উৎপাত মনে করলেন, এবং লোকধর্ম-বিরোধীরা এঁদের বিদ্বেষের চোখে দেখতে লাগলেন। একদিকে দীন অবহেলিত পতিত মানুষ, অন্যদিকে "বিদ্যা ধন কূল জ্ঞান-তপস্যার মদে" প্রমত্ত নবদ্বীপের অভিজাত নাগরিক, এ দুয়েব মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীই দিব্যজীবনের অধিকার পেলেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে. অদ্বৈত-শ্রীবাস-মুরারি প্রমুখ ভক্তবৃন্দও প্রথমে শুদ্ধভক্তিবাদী ছিলেন কিনা সন্দেহ। শ্রীল অদ্বৈত অধ্যাত্মপ্রিয় এবং তত্ত্বদর্শী ছিলেন, সেই মর্মেই গীতা-ভাগবতের ব্যাখ্যা করতেন। মুরারিও যোগবাশিষ্ঠ অনুসারে শ্লোক রচনা করতেন।[২] মহাপ্রভুর প্রথম প্রভাবেই তাঁরা এই পথ ত্যাগ করেন। এই ব্যক্তিগত প্রভাব যা সকলকে মুহূর্তে অভিভূত করে ফেলত, এই উন্মাদক সংকীর্তন-সুরা, এই কৃষ্ণানুরাগের আশ্চর্য অভিব্যক্তি এবং ভক্তচিত্তের রূপান্তর সব মিলিয়ে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তাস্বীকার অনিবার্য হয়ে উঠল। ভক্তেরা স্বাভাবিকভাবেই শ্রীচৈতন্যের ভাববিকার সমূহে অলৌকিক প্রকাশ উপলব্ধি করতে লাগলেন।

---

১. 'চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম-সংকীর্তন'
'সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' (চৈ-চ)

২. চৈ-চন্দ্রোদয় নাটক ও চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক উল্লিখিত।

শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা বা কৃষ্ণাবতারত্ব সম্পর্কে অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি নিঃসংশয় হলে পর তাঁরা ভগবান্‌রূপে শ্রীচৈতন্যকে অভিষিক্ত করার ব্যাকুলতা অনুভব করলেন। এই অভিষেক ঘটনাটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা বা প্রচারের দিক্ থেকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীবাসগৃহে ঐদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করলে অদ্বৈতাদি নানা উপচারে তাঁর পূজা করেছিলেন এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে নবদ্বীপলীলার সমূহ পরিকর নানা উপহার দিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। গৌরাঙ্গের কৃষ্ণত্ব অদ্বৈতাচার্য কয়েকদিন পূর্বেই অনুভব করেছিলেন। এই দিন সকলের মনে ঐ সত্য বদ্ধমূল হল এবং অতঃপর গৌরাঙ্গকে পরিচিত অসাধারণ মানুষমাত্ররূপে দেখা আর ভক্তদের পক্ষে সম্ভব হল না। বিশেষ এই যে, এখন থেকে নিত্যানন্দও কৃষ্ণ-চৈতন্যের দ্বিতীয় এবং অভিন্ন প্রকাশরূপে চিহ্নিত হলেন এবং অদ্বৈতাচার্য এসবের মূলাধার রূপে পরিগণিত হলেন। এখন থেকেই প্রারব্ধ হল নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর গৌরলীলা বিষয়ক পদরচনা। এঁদের কেউ কেউ তরুণ গৌরাঙ্গের নৃত্য ও ভাবপ্রকাশকে বৃন্দাবিপিনবিহারী নটবরবেশী কৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে অভিন্নভাবে দেখে স্বমাধুর্যরসে গৌরপ্রেমলীলা অনুভব করলেন, কেউ তাঁকে কৃষ্ণ হিসাবে, কেউ বা বিরহসন্তপ্তা রাধা হিসাবে তাঁকে অনুভব করলেন, আবার কেউ বা কালবিলুপ্ত প্রেমের মহান্ দাতা যুগাবতার রূপে দেখলেন।

সন্ন্যাস-পূর্ব নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীচৈতন্যের একটি কীর্তি হল বাঙলা রীতিতে যাত্রাভিনয়—পৌরাণিক রুক্মিণী-কৃষ্ণলীলার সঙ্গে বাঙলায় প্রচলিত চণ্ডীদাস-প্রদর্শিত বড়াইঘটিত রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা মিলিয়ে। এই অভিনয়ে গদাধর ও শ্রীচৈতন্য পর পর রুক্মিণী ও রাধা, ব্রহ্মানন্দ ও নিত্যানন্দ এ দুয়ের বড়াই, শ্রীবাস নারদ, হরিদাস কোটাল, এছাড়া অদ্বৈত, মুরারি, শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভৃতি কৃষ্ণাদি বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্যের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে অভিনয় হয়েছিল বলে বৃন্দাবনদাস আমাদের জানিয়েছেন। বেশ বোঝা যায়, বাঙলার সুপ্ত লৌকিক ভাবসম্পদগুলির পুনরুজ্জীবনও প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে মহাপ্রভু দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। অন্য যে-দুটি ঘটনা ভক্তিধর্ম প্রচারে ও শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ভগবত্তার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল তা হল জগাই-মাধাই উদ্ধার, এবং কাজীর বিরুদ্ধাচরণ প্রশমন।[১]

বাঙলার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে আভিজাত্য-বিরোধী নবলোকধর্মের অভ্যুদয়-সংঘটন এইভাবে সিদ্ধ হলেও অর্থ-বিদ্যা-কুলীনেরা কেউ তখনই প্রবুদ্ধ হয়েছিল কিনা সন্দেহ। কতকটা এই কারণে এবং বিশেষভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ও প্রেরণায় শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণে কৃতসংকল্প হলেন। বৃন্দাবনদাস এবং কোন কোন পদকর্তা সন্ন্যাসের ঐ বহিরঙ্গ প্রয়োজনের বিষয়ই লিপিবদ্ধ করেছেন।[২] সম্ভবতঃ ভক্তদের ধারণায় যুগাবতারী পূর্ণ

---

১. বৃন্দাবনদাস-কর্তৃক প্রদত্ত আখ্যান অতিরঞ্জিত হলেও, মুরারি গুপ্ত তাঁর কড়চায় ঘটনাটির বিশদ বর্ণনা না দিলেও এবং ঘটনার দিক থেকে চরিতামৃতে কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও মূল ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হয় না। কাজীদের উপর বৃন্দাবনদাসের ব্যক্তিগত ক্রোধ হয়ত কাজী-প্রবোধের ব্যাপারটিকে কাজীদলনে পরিণত করেছে। অনুরূপভাবে বলা যায়, দিগ্বিজয়ী-পরাভব বা কোনো বৈদেশিক পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যগর্বনাশের বর্ণনা মুরারি গুপ্ত এবং কবিকর্ণপূর না দিলেও অধ্যাপক শ্রীচৈতন্যর পক্ষে তা অসম্ভব মনে হয় না।

২. "করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরও কফ বাড়িল দেহেতে।"

ভগবানের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণের কোনো আবশ্যকতা ছিল না, লোকাপেক্ষায় এবং লোক-শিক্ষণের জন্যই শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস। সমসাময়িক পদকর্তারাও এইভাবে লিখে গেছেন। এইজন্যই নিত্যানন্দ নীলাচল যাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যের দণ্ডটি ভেঙে দিয়েছিলেন। আর তার পূর্বে শ্রীবাস-গৃহে তাঁর নিজের দণ্ডকমণ্ডুলও ভেঙেছিলেন। নিত্যানন্দ অবধূতমার্গের অর্থাৎ তান্ত্রিক সহজানন্দ পথের পথিক ছিলেন। আরও লক্ষণীয় এই যে শংকর-সম্প্রদায়ের দশনামীদের মধ্যে যেমন অভিমতের তেমনি বেশভূষা আচরণের বিষয়েও নানা বিভিন্নতা এসে পড়েছিল। প্রেমধর্মে বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও নানা দিক্ বিবেচনা করে মহাপ্রভু দ্রুত সন্ন্যাসেই সংকল্প স্থির করেছিলেন এবং দণ্ড-কমণ্ডলু থাক্ না থাক্ সন্ন্যাসীর সুকঠোর বৈরাগ্য শেষদিন পর্যন্ত পালন করেছিলেন। তাঁর অভ্যন্তরীণ কৃষ্ণ-অপ্রাপ্তি এবং বিরহ-ব্যাকুলতার সঙ্গে এই স্বাভাবিক সন্ন্যাস-আচরণ সর্বথা সংগতও ছিল।

মুরারি গুপ্তের মতে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছিলেন রবির মকর থেকে কুম্ভে যাওয়ার দিবসে 'কুম্বং প্রযাতি মকরাৎ' অর্থাৎ ২৯ মাঘ। বৃন্দাবনদাসের মতে সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দিবস অর্থাৎ ১লা মাঘ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর বয়ঃক্রম ধরে—"চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।" এই বর্ণনায় মনে করা হয়, 'ঐদিন শুক্লপক্ষ শেষ হয়ে কৃষ্ণপক্ষও পড়েছিল। মহাপ্রভু শুক্লপক্ষ থাকতে থাকতে দিনের

প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশত্র।
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয়-নিশ্চয়।
ভালে আইলাঙ আমি জগৎ তারিতে।
তারণ নহিল আইলাঙ সংহারিতে।
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধ-নাশ।
একগুণ বন্ধ আর হৈল কোটি-পাশ॥

* *

দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া।
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥

* *

তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয়।
গারিহস্থ বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥ (চৈ-ভা, মধ্য—২৫)

"পণ্ডিত পড়ুয়া যারা আমারে না মানে তারা
মোর উপদেশ নাহি লয়।
ভাবি হই বুদ্ধিহারা কিরূপে তরিবে তারা
দূর হব নরকের ভয়।
অনেক চিন্তার পর দঢ়ায়িনু এ অন্তর
আমি ত্বরা ছাড়ি গৃহবাস।
মস্তক মুণ্ডন করি ডোর কৌপীন পরি
অবিলম্বে লইব সন্ন্যাস।" (গোবিন্দ ঘোষ)

পূর্বভাগে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।' কিন্তু চরিতামৃত ধরে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমরা এক্ষেত্রে ১লা মাঘের উপরই জোর দিতে চাই। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার হিসাব করে দেখিয়েছেন, সন্ন্যাস-গ্রহণের দিনরাত্রি কাটোয়ায় অতিবাহিত করে পরের দিন প্রত্যুষে বৃন্দাবন যাত্রার জন্য পশ্চিম দিক্ লক্ষ্য করে চলতে থাকেন। আর, সন্ন্যাসের জন্য গৃহত্যাগ সংক্রান্তির তিন দিন আগেই করেছিলেন।[১] বাসুদেবাদির পদে দেখা যায় মহাপ্রভু সকলের অজ্ঞাতেই গৃহত্যাগ করেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় তিনি তারিখ নির্দেশ করে নিত্যানন্দ, গদাধর মুকুন্দকে তাঁর গোপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং নিত্যানন্দকে নির্দেশ দেন যেন শচীদেবী, চন্দ্রশেখর আচার্য এবং ব্রহ্মানন্দকেও তিনি পূর্বাহ্নেই জানিয়ে রাখেন। ঐ রাত্রে গদাধর এবং হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করেছিলেন। মুরারি গুপ্ত বলেন যে, মহাপ্রভু তাঁকেও জানিয়েছিলেন মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি এবং সহায়হীন মাতার জন্য পরবর্তী উদ্বেগ প্রভৃতি থেকে ধরে নেওয়া যায় তিনি শচীদেবীর অনুমতি-ভিক্ষা না করে হঠাৎ গৃহত্যাগ করেন নি। সুতরাং বৃন্দাবনদাস-পরিবেশিত নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনাই ঠিক এবং যেমন বাস্তব তেমনি করুণ।[২]

আই জানে—আজি প্রভু করিব গমন।
আইর নাইক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ॥ **
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর॥
"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্ধেকো না ভাবিয়া দুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইল সুখ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি-কল্পে নারিব শুধিবার॥
তোমার সাদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকার।
আমি পুন জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥

১. কিন্তু সন্ন্যাস-দিবসের এত আগে গৃহত্যাগ কখনোই সমীচীন মনে হয় না। আমাদের মনে হয় ১লা মাঘ সন্ন্যাস-গ্রহণের দিন নির্বাচন করে সংক্রান্তির ঠিক আগেকার রাত্রিশেষেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হন। চন্দ্রশেখর আচার্য গিয়ে সব ব্যবস্থা করেন। পরদিন ক্ষৌরকর্ম-গঙ্গাস্নান সেরে তার পরদিন দীক্ষা নেন। এবিষয়ে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনারীতিই যথাযথ মনে হয়।

২. এবং চরিতামৃতে নানাস্থানে বর্ণিত মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি-প্রকাশের সঙ্গে এই বর্ণনার ভাবাত্মক মিলও রয়েছে।

দশ দিন অন্তরে কি এখনও বা আমি।
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥"
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার বার।
"তোমার সকল ভার আমার আমার॥"
যত কিছু বোলে প্রভু সব শচী শুনে।
উত্তর না স্ফুরে কান্দে অঝর-নয়নে॥
পৃথিবী-স্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা।
কে বুঝয়ে কৃষ্ণের অচিন্ত্য সর্ব কথা॥
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে॥ (মধ্য—২৬)

শ্রীচৈতন্যের মহানিষ্ক্রমণের কিছুক্ষণ পরে পূর্বনির্দেশমত নিত্যানন্দাদি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকটে হাজির হলেন। প্রথম দিন আয়োজন এবং সংকীর্তনে কাটল। পরদিন নূতন জীবন, বিশ্বম্ভর-নিমাইয়ের নতুন নাম। পরিকরেরা কেশমুণ্ডন দেখে অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না—সেই তরঙ্গিত কেশদাম, স্কন্ধবিলম্বিত, নৃত্যকালে বিক্ষিপ্ত উদ্দাম, তন্ময়াবস্থায় মেঘচ্ছায়াবিকীর্ণশ্রী—সেই কেশরাজি আর পরিকরেরা দেখতে পেলেন না। এই ঘটনার পর ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্য সেদিন কাটোয়ায় নবদ্বীপ-সহচরদের সঙ্গে কোনোমতে সংকীর্তনে কাটিয়ে প্রত্যুষেই বৃন্দাবনের উদ্দেশে দ্রুতবেগে বহির্গত[১] হলেন। প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তিন চার দিন ঘুরলেন বর্ধমান-বীরভূমে। তাঁর সঙ্গে কিছুদূর গেলেন কেশব ভারতী পথ দেখিয়ে, নিত্যানন্দ যথাসম্ভব তাঁর কাছে কাছে থাকলেন, আর কিছু দূরে অনুসরণ করতে লাগলেন মুকুন্দ, গদাধর এবং গোবিন্দ ঘোষ।[২] বক্রেশ্বর তীর্থের কিছু আগেই কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী বিপরীতমুখে ফিরলেন।[৩] চতুর্থ দিনে সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে এলে শ্রীচৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে এবং পরের দিন তিনি নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিলে নিত্যানন্দ চার-পাঁচ দিনের মধ্যে নবদ্বীপে এসে শচীমাতাকে সব সংবাদ দেন। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পূর্বমধ্যাহ্ন থেকেই শচীদেবী অন্নজল ত্যাগ করেছিলেন। নিত্যানন্দ যেদিন নবদ্বীপে ফিরলেন সেদিন "আইব দ্বাদশ উপবাস"। এদিকে মহাপ্রভু ফুলিয়ায় হরিদাসের কুটিরে উপস্থিত হলে পর অদ্বৈত আচার্য এসে তাঁকে শান্তিপুরে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হলেন নিত্যানন্দ সহ (অথবা আচার্যরত্ন সহ) শচীদেবী এবং ক্রমান্বয়ে নবদ্বীপের পরিকরবৃন্দ।[৪] শান্তিপুরে লোকসংঘট্ট হল প্রচুর। সন্ধ্যায় অদ্বৈত আচার্য কীর্তন আরম্ভ করলেন—'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥" অশ্রু কম্প পুলক মূর্ছায় নবীন সন্ন্যাসীর

১. ২রা মাঘ, ১৪৩১ শক, ১৫১০ খ্রীস্টাব্দ।

২. চৈ-চ মতে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য এবং মুকুন্দ এই তিনজন তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন।

৩. চৈ-চ মতে নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁকে ফিরিয়েছিলেন এবং আচার্যরত্নকে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে ও পরে নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে নিয়ে যাচ্ছেন এই সংবাদ দিয়ে। চৈ-ভা মতে মহাপ্রভু নীলাচল যাবেন বলে নিজেই ফিরেছিলেন।

৪. চৈ-চ মতে অদ্বৈতগৃহে আগমনের পরের দিন প্রভাতে শচীদেবীর উপস্থিতি।

দেহ বিদলিত হ'ল। মুকুন্দ এই বিরহবিকারের সমুচিত পদ ধরলেন—'হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে। কানুপ্রেমবিষে মোর তনুমন জারে।' শচীদেবী স্বহস্তে রন্ধন ক'রে পুত্রকে ভিক্ষা দিয়ে মাতৃহৃদয়ের সন্তাপ কথঞ্চিৎ দূর করতে পারলেন। পরে তাঁরই অনুরোধে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে থাকার অভিলাষ বর্জন ক'রে নীলাচলে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন।[১] শান্তিপুরে এইভাবে কয়েক দিন বিশ্রামের পর[২] মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রা করলেন। চৈ-ভা মতে এই যাত্রায় সঙ্গী হলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ।[৩] গঙ্গাতীর ধ'রে চলতে চলতে শ্রীচৈতন্য স্থলভ্রমণে আঁটিসারা-ছত্রভোগ পর্যন্ত এলেন। তখন গৌড়ের রাজা হুসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের বিবাদ চলছিল। হুসেন শাহের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার রাজকর্মচারী রামচন্দ্র খাঁ শ্রীচৈতন্য এবং সঙ্গীদের কৌশলে গঙ্গাপথে সুবর্ণরেখার কাছাকাছি পর্যন্ত পৌছে দিলেন রাত্রে নৌকার ব্যবস্থা ক'রে। সুবর্ণরেখা পার হয়ে জলেশ্বর, তারপর বাঁশদা, রেমুনা, যাজপুর এবং বৈতরণী নদী পার হয়ে ভুবনেশ্বর, পরিশেষে নীলাচল। ইতিমধ্যে একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা ঘটে। তা হ'ল নিত্যানন্দ কর্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ। চৈতন্যভাগবত মতে সুবর্ণরেখা পার হ'লে এটি ঘটেছিল। চৈতন্য-চরিতামৃত মতে ভার্গী নদীতে মহাপ্রভুর স্নানকালে,—নীলাচলের সন্নিকটে। যাই হোক, এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মহাপ্রভু সকলের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে একাকী ছুটলেন নীলাচলের দিকে। ক্রমে জগন্নাথ দর্শনের ব্যাকুলতাও তাঁর বেড়ে উঠল। দ্রুত-পদক্ষেপে মন্দিরে ঢুকে দুহাত বাড়িয়ে জগন্নাথের দিকে ছুটে যাবেন এমন সময়ে দ্বারের কাছে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।[৪]

ঐ সময়ে নীলাচলে অবস্থান করতেন প্রাক্তন নদীয়াবাসী, নৈয়ায়িক ও অদ্বৈত মতে আস্থাবান্ খ্যাতনামা পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তিনি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভু যখন প্রস্তর-চত্বরে পড়ে গেছেন এবং মন্দিররক্ষী উৎপাত মনে ক'রে তাঁকে মারতে উদ্যত এমন সময়ে দৈবে সার্বভৌম মন্দিরে প্রবেশ করলেন। নবীন সন্ন্যাসীর শ্রীমণ্ডিত অবয়ব দর্শনে তিনি প্রতীক্ষককে নিবৃত্ত করলেন এবং মূর্ছিত অবস্থাতেই তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে এলেন। সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য, যিনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি সার্বভৌমের গৃহেই তখন ছিলেন। সুতরাং আর কিছুই অজানা রইল না। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ-মুকুন্দাদি খোঁজ করতে করতে গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে

---

১. চৈ-চ গ্রন্থের এই কারণ-নির্দেশই যথাযথ ব'লে মনে হয়।

২. কবিকর্ণপূর ও চৈ-চ অনুসারে 'দশদিন ভোজন কীর্তন'। চৈ-চ অনুসারে ফাল্গুন শেষে মহাপ্রভুর নীলাচলে দোলযাত্রা দেখা ঘটে। নীলাচল যেতে অন্তত ১৫ দিন লেগেছিল এবং দোল পূর্ণিমা ফাল্গুনের ২০-২২ তারিখে হয়েছিল ধরলে মহাপ্রভু ৭-৮ ফাল্গুন শান্তিপুর ত্যাগ করেছিলেন বলতে হবে। বৃন্দাবনদাস কোনো কালপরিমাণ নির্দেশ করেননি। সুতরাং এমন মনে করাই ঠিক যে শান্তিপুরে ১০-১২ দিন কাটিয়ে নীলাচল যাত্রা করেছিলেন এবং চরিতামৃতকার হয়ত বা রাঢ় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দশ দিন বলেছেন।

৩. চৈ-চ মতে—"নিত্যানন্দ গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারিজনে আচার্য দিলা প্রভু সনে॥"

অত্যন্ত স্পষ্ট উল্লেখ এবং নানা কারণে এই বিবরণই ঠিক ব'লে মনে হয়।

৪. কবিকর্ণপূর এবং লোচনের মতে শ্রীচৈতন্য প্রথম সার্বভৌম-গৃহে যান, জগন্নাথ মন্দিরে নয়। কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তী জীবনীকার কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণই ঠিক।

সার্বভৌমের গৃহেই তখন ছিলেন। সুতরাং আর কিছুই অজানা রইল না। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ-মুকুন্দাদি খোঁজ করতে করতে গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে সার্বভৌমের গৃহে এসে হাজির হলেন। নীলাচলে উপস্থিতির এই সময় (১৪৩১ শক, ফাল্গুন প্রায় শেষ) শ্রীচৈতন্যের বয়স পূর্ণ চব্বিশ, সূক্ষ্ম গণনায় কয়েকদিন বেশি হতে পারে।

এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল অদ্বৈতবাদী সার্বভৌমের মত পরিবর্তন এবং ভক্তিমতে বা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে পূর্ণ প্রত্যয়।[১] শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলেই এটি বিশেষভাবে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর অপূর্ব কৃষ্ণবিরহ, অশ্রু কম্প পুলক মূর্ছা প্রভৃতি অ-লৌকিক ভাবাবেশই অদ্বৈতমতের নিঃশেষ শ্রেয়স্করত্ব সম্বন্ধে সার্বভৌমকে সন্দিহান ক'রে তুলেছিল। চৈতন্য-চরিতকার বলেছেন যে স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা যেমন সোনা হয়ে যায়, তেমনি সার্বভৌমের কুতর্কমলিন চিত্তও ভাবস্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। অবশ্য কবিকর্ণপূর এবং কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনামতে শ্রীচৈতন্য যুক্তিতর্কের দ্বারাও অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। যাই হোক, নীলাচলে পদক্ষেপ করেই মহাপ্রভু অনায়াসে যে ঘটনা সম্ভব করলেন তা উড়িষ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে প্রভূত সহায়তা করেছিল।

তীর্থপর্যটন সন্ন্যাসের অঙ্গ। ফলে মহাপ্রভু নীলাচলে বেশিদিন অপেক্ষা না করেই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হলেন।[২] তা ছাড়া দাক্ষিণাত্য বহু পূর্ব থেকেই ভক্তিধর্মের প্রধান কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত। রামানুজ, ভাস্কর, যামুন প্রভৃতি আচার্য, কৃষকর্ণামৃত-রচয়িতা লীলাশুক এবং বহু পূর্ব থেকেই ভক্তিধর্মের প্রধান কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত। রামানুজ, ভাস্কর, যামুন প্রভৃতি আচার্য, কৃষ্ণকর্ণামৃত-রচয়িতা লীলাশুক এবং বহু আলবার ভক্তের প্রেমময় সাধনায় পবিত্র ঐ দক্ষিণ দেশ। মহাপ্রভু মুখে শুধু বললেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ-শংকরারণ্যের সন্ধানে তিনি যাচ্ছেন তাই এই দ্রুততা। এ যাত্রায় মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গীদের সাহচর্য অস্বীকার করলেন, কিন্তু সকলের আগ্রহাতিশয্যে কালা কৃষ্ণদাস নামে এক বাঙালি ব্রাহ্মণকে জলপাত্র-করঙ্কবাহীরূপে সঙ্গে নিলেন।[৩] যাত্রার পূর্বে সার্বভৌম তাঁকে বললেন কৃষ্ণলীলারসিক রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যেতে। তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে গোদাবরী তীরবর্তী বিদ্যানগরের প্রধান কর্মচারী, কিন্তু প্রেমমার্গের উন্নত ভক্তিভাবুক। বলা বাহুল্য, এই সাক্ষাৎকার এবং কয়েকদিন ধ'রে উভয়ের ভাবের আদান-প্রদানও রাগভক্তির প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্রজভাব, গোপীপ্রেম, রাধিকার মহাভাব, রাগাত্মিক কৃষ্ণভজনের বিবিধ রীতি, প্রেমরসের সূক্ষ্ম বৈচিত্রী-সমূহ উভয়ের আলাপ-আলোচনায় পরিস্ফুট হ'ল। এ বিষয়ে মহাপ্রভুর যা জানবার তিনি রামানন্দ রায়ের কাছ থেকে জেনে নিলেন এবং নিজভাবের সঙ্গে মিলিয়ে অপরিসীম আনন্দ লাভ করলেন, আর কৃষ্ণপ্রেম ও রাধাভাবের মূর্ত বিগ্রহের সাহচর্য লাভ ক'রে

---

১. বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা মতে সার্বভৌম পূর্ব থেকেই ভক্তিমতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক মনে হয় না। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনাই এবিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য।

২. ১৪৩২ শকের বৈশাখ প্রথমেই শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্যের পথে পদক্ষেপ।

৩. 'গোবিন্দদাসের কড়চা' অনুসারে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন গ্রন্থকার গোবিন্দ কর্মকার। কিন্তু এবিষয়ে প্রধান জীবনীকাব্যগুলিতে কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। গোবিন্দ নামে পাওয়া যায় নবদ্বীপলীলার পরিকর এবং গায়ক কবি গোবিন্দ ঘোষকে, খোল-বাজিয়ে গোবিন্দানন্দ বা গোবিন্দ দত্তকে এবং ঐ ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য এবং তাঁরই আজ্ঞায় মহাপ্রভুর পরিচারকরূপে নিযুক্ত শেষদিন পর্যন্ত নীলাচল বাসের সঙ্গী, ভৃত্য এবং আত্মসচিব গোবিন্দকে। কিন্তু ইনি তখনও প্রভুসংস্পর্শে আসেননি। কড়চা এবং গোবিন্দ কর্মকার দুই-ই কাল্পনিক এই হ'ল পণ্ডিতদের অভিমত।

রায় রামানন্দের হৃদয়ও অরুণরাগে রঞ্জিত হ'ল, তিনি বিষয়নিষ্ঠা ত্যাগ ক'রে বৈরাগ্যে কৃতসংকল্প হলেন। কথা হ'ল মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণান্তে রামানন্দও নীলাচল আশ্রয় ক'রে তাঁর সঙ্গসুখ আস্বাদন করবেন, ইতিমধ্যে বিষয়কর্মের ব্যবস্থা করে নেবেন ও রাজাজ্ঞা নিয়ে রাখবেন।

হরিনামমূর্তি শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগর ত্যাগ ক'রে চললেন দক্ষিণ দিকে। জ্ঞানবাদী, কর্মবাদী, পাশুপতব্রতধারী এবং ধর্মবিরোধী বহু 'পাষণ্ডী' ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসে মনুষ্যত্ব পেলে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রী-সম্প্রদায়ের বহু ভক্ত রাগানুগা ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করলেন। শ্রীরঙ্গমে এসে মহাপ্রভু সাক্ষাৎ পেলেন রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ভক্ত বেঙ্গট ভট্টের ও তাঁর অনুজ প্রবোধানন্দের।[১] সেখানে চার মাস থেকে বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্টকে সংসার করতে নিষেধ ক'রে শিক্ষান্তে বৃন্দাবন যাওয়ার কথা বলে এলেন। এরপর মাদুরায় তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল মাধবেন্দ্রপুরী-শিষ্য পরমানন্দপুরীর সঙ্গে। মহাপ্রভু গুরুসম্পর্কে তাঁর এই অগ্রজের সঙ্গে তিন দিন কাটিয়ে তাঁকে পুনঃপুন প্রণাম ক'রে নীলাচলে এসে অবস্থান করতে বললেন। তারপর তাম্রপর্ণী অতিক্রম ক'রে কন্যাকুমারীর দিকে অগ্রসর হলেন। সেতুবন্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভক্তি-সম্প্রদায়ের একটি অমূল্য গ্রন্থ—'ব্রহ্মসংহিতা' পেয়ে তার অনুলিপি করিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন। এর পর উত্তরপথে যাত্রায় শংকরাচার্য-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত শৃঙ্গেরী মঠ দর্শন ক'রে মহীশূরে তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম ক'রে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সাধনকেন্দ্রে এসে উপস্থিত হলেন। উদিপিতে মধ্বাচার্য স্থাপিত গোপালকৃষ্ণ দর্শন ক'রে মহাপ্রভু যদ্যপি পরমপ্রীতি লাভ করলেন, তবু দুঃখিত হলেন মাধ্ব-সম্প্রদায়ে রাগভক্তির অভাব লক্ষ্য ক'রে। দেখলেন এই সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক ভক্তেরা মুক্তিলাভকেই সাধ্যবস্তু ব'লে ধ'রে আছে, কৃষ্ণপ্রেমকে নয়। আর বর্ণাশ্রমধর্মানুগত ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির পৃথক্ পৃথক্ কর্মানুসরণকেই সাধনপথ বলে মনে করছে। এঁদের শুদ্ধাভক্তি বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে মহাপ্রভু এসে পৌঁছালেন পন্ধরপুরে বিট্‌ঠলনাথ মন্দিরে, কোলাপুর অতিক্রম ক'রে। এখানে এসে এক গ্রামে আকস্মিকভাবে অপর এক মাধবেন্দ্র-শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। শুনলেন মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে ইনি একবার নবদ্বীপে এসে জগন্নাথ মিশ্র-পুরন্দরের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তখন শচীদেবীর রান্না মোচার ঘণ্ট খেয়ে অপূর্ব তৃপ্তি পেয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি সংবাদ দিলেন যে সেই তীর্থেই মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ-শংকরারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটেছে। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে মহাপ্রভু কৃষ্ণবেণ্বা-তীরবর্তী এক মন্দিরে লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের বিখ্যাত রাগভক্তিকাব্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের আবৃত্তি শুনলেন এবং কৃষ্ণকর্ণামৃতের পুঁথি নকল করিয়ে সঙ্গে নিলেন। এরপর নর্মদা ও নির্বিন্ধ্যা তীরবর্তী তীর্থসমূহ পরিক্রম ক'রে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন এবং দক্ষিণমুখী হয়ে গঞ্চবটী, নাসিক প্রভৃতি পরিভ্রমণ ক'রে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি স্থান থেকে অগ্রসর হয়ে পুনরায় বিদ্যানগরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সেখানে ব্রহ্মসংহিতা এবং কৃষ্ণকর্ণামৃতের পুঁথি দুটি রামানন্দের হাতে সমর্পণ ক'রে, পাঁচ-সাত দিন কৃষ্ণপ্রেমপ্রসঙ্গে যাপন ক'রে রামানন্দের নীলাচলবাসের আয়োজন দেখে তৃপ্তি পেয়ে জগন্নাথের নিকটবর্তী আলালনাথে

১. প্রথমে তত্ত্ববাদী, পরে চৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক বিখ্যাত চৈতন্যলীলা-কড়চার কর্তা।

এসে পৌঁছালেন। সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে সেখান থেকে নীলাচলে পাঠাতেই নিত্যানন্দ, জগদানন্দ মুকুন্দাদি সেখানে এসে পড়লেন। এঁদের সঙ্গে মহাপ্রভু নীলাচলে পৌঁছালেন। ঐখানে রাজা প্রতাপরুদ্রের আয়োজনক্রমে রাজগুরু এবং জগন্নাথমন্দিরের অধ্যক্ষ কাশীমিশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর স্থায়ী বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। আর—

"কাশী মিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥"[১]

প্রায় দুবছর ধ'রে দক্ষিণভ্রমণ সমাপ্ত ক'রে মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরলেন ১৪৩৪-এর প্রথমে, আনুমানিক বৈশাখ-শেষে।[২] কাশীমিশ্রের আবাসে মহাপ্রভু-সমীপে একে একে ওড়িয়া ভক্তগণ এসে প্রণত হলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সকলের বিবরণ দিলেন— জগন্নাথ-সেবক জনার্দন, আয়-ব্যয়াদির লিখন-অধিকারী শিখী মাইতি, ভক্তব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্ন মিশ্র, জগন্নাথের প্রধান সূপকার চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি। সবশেষে এলেন রায় রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় মহাপ্রভুর সেবায় তাঁর পাঁচ পুত্রকে উৎসর্গ করার অভিলাষ নিয়ে। মহাপ্রভু বাণীনাথ রায় পট্টনায়ককে তাঁর কাছে রাখলেন। এই বাণীনাথকে শ্রীচৈতন্য-সমীপে আগত যাবতীয় ভক্তদের আবাস নির্ধারণ এবং ভিক্ষাদির ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া হ'ল।

এদিকে একে একে মহাপ্রভুর নীলাচলসঙ্গী খ্যাতনামা ভক্তবৃন্দও এসে পড়তে লাগলেন। প্রথমে পরমানন্দ পুরী, যাঁর সঙ্গে মহাপ্রভুর দক্ষিণভ্রমণে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তিনি দক্ষিণ থেকে নীলাচল হয়ে গৌড়-গঙ্গা-নবদ্বীপ ঘুরে এসেছিলেন এবং নবদ্বীপের পরিকরদের ও শচীদেবীকে মহাপ্রভুর দক্ষিণভ্রমণের সংবাদ দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে ফিরেছেন শুনে তিনি নবদ্বীপভক্তদের আগেই নীলাচলে এসে পৌঁছালেন। ইনি মহাপ্রভুর গুরুর গুরুভ্রাতা, সুতরাং মহাপ্রভুর সগৌরব প্রীতির অধিকারী হলেন। কাশীমিশ্রের গৃহে নিজসমীপেই মহাপ্রভু এঁকে রাখলেন। এরপর এলেন মহাপ্রভুর নিরন্তর

১. মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে কোন্ কোন্ পথ দিয়ে কোন্ কোন্ তীর্থ পর্যটন ক'রে কিভাবে প্রত্যাবর্তন করেন সে সম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ পাওয়া হয়ত বা দুষ্কর। মোটামুটি এই বলা যায় যে, তিনি ওড়িষ্যা থেকে অন্ধ্র-মাদ্রাজ উপকূল ধ'রে কন্যাকুমারী এবং সেখান থেকে কর্ণাট-মহীশূর রাজ্যের ভিতর দিয়ে উত্তরে নর্মদা পর্যন্ত গিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে গোদাবরী ধ'রে ফিরে আসেন। বৃন্দাবনদাস দক্ষিণভ্রমণের কোনো বিবরণ দেননি। মুরারি গুপ্ত তাঁর কড়চায় (?) দিয়েছেন, আর কিছু কিছু দিয়েছেন কবিকর্ণপূর তাঁর চৈ-চ মহা-কাব্যে ও নাটকে। উপরের বিবরণ কবিরাজ গোস্বামীর চৈ-চ থেকে দেওয়া। যদিও ঐ বর্ণনায় স্থান ও পথের ক্রম সম্বন্ধে কিছু গোলমাল থাকা স্বাভাবিক, তবুও অনুমান করা যায়, মুরারি গুপ্ত এবং কবিকর্ণপূরের লেখার উপর পরবর্তীকালে যে সংশোধন প্রয়োজন হয়েছিল, চৈ-চতে তা-ই আছে। গোবিন্দদাসের কড়চার বিবরণ অবিশ্বাস্য। কিন্তু একথা ঠিক যে, মহাপ্রভু কোনো প্ল্যান নিয়ে বহির্গত হননি। আর যাবতীয় তীর্থ পর্যটনও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। 'ভাবে বিহ্বল মানুষ, বেরিয়ে পড়েছিলেন। যেখানে ভালো লেগেছিল সেখানে কিছুদিন বেশি ছিলেন এবং কিছু অগ্রপশ্চাৎ গতাগতিও করেছিলেন। (ডঃ বিমানবিহারী)

২. আরও পরে অর্থাৎ ১৪৩৪-এ হেমন্তকালে ফিরেছিলেন এমন মনে করলে, মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তন সংবাদ পেয়ে গৌড়ীয় ভক্তগণের ঐ বৎসর রথযাত্রায় আসা সম্ভব হয় না। চরিতামৃতের বর্ণনায় ঐ বৎসরই নবদ্বীপ-পরিকরেরা এসেছিলেন। স্নানযাত্রার সময়ে জগন্নাথদর্শন না হওয়ায় শ্রীচৈতন্য আলালনাথে চলে যান। সেখান থেকে সার্বভৌম তাঁকে নীলাচলে নিয়ে এলে দেখা গেল নবদ্বীপ-পরিকরেরা এসে পড়েছেন।

লীলাসুহৃদ নিগূঢ়-ব্রজরসবেত্তা স্বরূপ দামোদর। ইনি সম্ভবতঃ নবদ্বীপ-লীলাতেও সহচর ছিলেন।[১] কিন্তু মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দেখে নিজে সন্ন্যাস নিয়ে কাশী চলে যান। সেখানে বেদান্ত অধ্যয়ন ক'রে তৃপ্তি না পেয়ে পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে চলে আসেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও ইনি সন্ন্যাসের বেশভূষা এবং উপাধি গ্রহণ করেননি। স্বরূপে থাকতেন বলে স্বরূপ দামোদর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। যেমন সংগীতে কৃতিত্ব ভক্তিশাস্ত্রে এঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল। নীলাচল-লীলায় মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ অবস্থায় ইনি এবং রায় রামানন্দ ঘনিষ্ঠ সাহচর্য দান করতেন। এই স্বরূপ দামোদরই মহাপ্রভুর নিগূঢ় ভাবনায় অবস্থাগুলি সংস্কৃত শ্লোকে গ্রথিত ক'রে রাখতেন এবং মহাপ্রভু যে রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণবিগ্রহ, এ তিনিই প্রথম ভালোভাবে ধরতে পারেন। এরপর ক্রমে এলেন ঈশ্বরপুরীর সেবক গোবিন্দ, যাঁকে সেবক রূপে গ্রহণ করতে মহাপ্রভু প্রথমে অস্বীকার করলেন গুরুমর্যাদা লঙ্ঘন হয় ব'লে, কিন্তু পরে গুরুর আদেশ ব'লে পরমানন্দপুরী ও সার্বভৌমের অনুমতি নিয়ে সেবকরূপে স্বীকার করলেন। গোবিন্দ কীরকম নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেবাকার্য সম্পাদন করেছিলেন তা চৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়লেন ভক্তিমতে পরিবর্তিত খ্যাতনামা অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত সন্ন্যাস-গুরু কেশবভারতীর গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দ ভারতী, হালিশহরের বিষয়ী ধনী শতানন্দ খানের পুত্র ভগবান্ আচার্য, রামভদ্রাচার্য এবং বলিষ্ঠদেহ, মহাপ্রভুর আজ্ঞাবহ ও পরে বৃন্দাবনের গোবিন্দবিগ্রহের অধিকারী কাশীশ্বর গোস্বামী। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ এবং দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে এসে থেকে গিয়েছিলেন।[২] ইতিমধ্যে ঐ দামোদর-ভ্রাতা মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় শংকরও এসে পড়েছিলেন। রথযাত্রার আগে রায় রামানন্দও এলেন। ফলে ভক্ত এবং পরিকরগণের সমাবেশে নীলাচলে যেন চাঁদের হাট বসে গেল। বলা বাহুল্য, মহাপ্রভুর দিব্য প্রভাব ইতিমধ্যে ভারতের পূর্ব দক্ষিণাঞ্চলে সম্যক্ বিস্তৃত না হ'লে তাঁর সঙ্গলাভেচ্ছায় এতগুলি সাধক একত্র মিলিত হতেন কিনা সন্দেহ। চৈতন্যচরিতামৃতকার ঠিকই বলেছেন :

যত নদনদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয়॥
সভে আসি মিলিল প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সভাএ রাখিলা নিজস্থানে॥

'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' নামক নব লোকধর্মের স্থায়ীত্ব অতঃপর সন্দেহাতীত হয়ে উঠল।

এদিকে দক্ষিণভ্রমণ থেকে শ্রীচৈতন্য ফিরেছেন এই সংবাদ কালা কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে বহন ক'রে নিয়ে গেলে রথযাত্রার পূর্বেই নবদ্বীপ থেকে শচীমাতার আজ্ঞা নিয়ে এসে পড়লেন পুত্র অচ্যুতানন্দ সহ অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, চন্দ্রশেখর আচার্য, মুরারি গুপ্ত, গদাধর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর, শ্রীবাস-ভ্রাতা শ্রীরাম, শ্রীমান্ পণ্ডিত, খোলাবেচা শ্রীধর, মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ-মাধব-

---

১. পুরুষোত্তম আচার্য। নবদ্বীপলীলাসঙ্গী ইনি ছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু এ বিষয়ে চরিতামৃতের বর্ণনাই বিশ্বাসযোগ্য। নবদ্বীপলীলার মধ্যেই ইনি প্রভুসঙ্গ ত্যাগ করেন, পরে অনুতপ্ত হয়ে নীলাচলে ফিরে আসেন।

২. মহাপ্রভুর অনুপস্থিতিতে নিত্যানন্দ বৎসর-খানেকের মত গৌড়ে কাটিয়ে ফিরে এসেছিলেন এমনও হতে পারে।

বাসুঘোষ, পুরুষোত্তমসঞ্জয়, শুক্লাম্বর, পানিহাটি থেকে এলেন রাঘব পণ্ডিত, কুলীনগ্রাম থেকে এলেন সত্যরাজ খান (রামানন্দ বসু), শ্রীখণ্ড থেকে চিরঞ্জীব সেন, নরহরি সরকার, তস্যভ্রাতা মুকুন্দ ও তাঁর পুত্র মহাবৈষ্ণব রঘুনন্দন এবং আরও অনেকে। শিবানন্দ সেন ধনী ব্যক্তি হওয়ায় সব যাত্রীদের রাহা-খরচ যোগালেন (এবং প্রতিবারই যোগাতেন)। প্রভুসঙ্গ-লোভাতুর গৌড়ীয় ভক্তদের এই প্রথম নীলাচলে আগমন।

নিঃসন্দেহে নীলাচলে শত শত ভক্তপরিকরসহ মহাপ্রভুর এই লীলা এবং সেই সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার তদানীন্তন ওড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সানুগত্য-সহায়তা ব্যতিরেকে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্রও সার্বভৌমের ও রায় রামানন্দের কাছ থেকে এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য পাত্রদের কাছ থেকে মহাপ্রভুর অ-লৌকিক চারিত্র্যের সংবাদ শুনে তাঁর নিতান্ত অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে কিভাবে কৃপা করেন তার একটি মনোজ্ঞ চিত্র কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে প্রদত্ত হয়েছে।[১] শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ গমনের পর একদিন প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমের কাছে শ্রীচৈতন্যকে দর্শনের আগ্রহ জানালে সার্বভৌম তাঁকে বলেছিলেন—তিনি উদাসী সন্ন্যাসী এবং মহাপ্রতাপ, নিজের খুশীমত চলেন। রাজদর্শন করবেন কিনা বলতে পারি না, তবু দক্ষিণ থেকে ফিরে এলে তাঁকে বলব। প্রত্যাবর্তনের পর এবং মহাপ্রভু নীলাচলবাসী ভক্ত ওড়িয়াদের দর্শনদানে কৃতার্থ করলে পর প্রতাপরুদ্রের দর্শনেচ্ছা বেড়ে গেল। সার্বভৌম একদিন অবসর বুঝে মহাপ্রভুর কাছে কথাটা পাড়লে তখন—

কর্ণের হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
...সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন সব বিষের ভক্ষণ॥

রাজার ভক্তি এবং বৈষ্ণবানুগত্য বিষয়ে সার্বভৌম যুক্তি উপস্থাপন করতে চাইলে মহাপ্রভু বললেন 'তথাপি রাজা কাল-সর্পাকার'—

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥

সার্বভৌম আপাতত নিবৃত্ত হলেন। এদিকে রায় রামানন্দ যখন সব ছেড়ে দিয়ে বিদ্যানগর থেকে শ্রীচৈতন্যের নিকট এসেছিলেন প্রতাপরুদ্রও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন নীলাচলে। যখন তিনি প্রতাপরুদ্রের অজস্র গুণকীর্তন ক'রে তাঁর উপর প্রগাঢ় ভক্তির কথা উল্লেখ করলেন তখন মহাপ্রভু শুধু বললেন 'কৃষ্ণ তাঁকে নিশ্চয়ই কৃপা করবেন'। সে-যাত্রা রায় রামানন্দ তাঁকে অনুগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করলেন না। রাজার কিন্তু উৎকণ্ঠার শেষ নেই। নীলাচলে এসেই তিনি সার্বভৌমকে পুনরায় ডাকলেন এবং বললেন—

প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগৎ উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥
তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥

---

১. বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে কবিকর্ণপূরের গ্রন্থদ্বয়ে, মুরারি গুপ্তের কড়চায় এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতেও দেখা যায়। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী যেভাবে গুছিয়ে বিষয়টির বিন্যাস করেছেন তাতেই বাস্তবতা চমৎকার ফুটে উঠেছে।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজাকে আশ্বস্ত করে একটা উপায় ঠিক করলেন। রথযাত্রার দিনে প্রভু রথের আগে আবিষ্টভাবে নৃত্য করবেন, তখন রাজা তাঁকে দেখতে পাবেন, আর প্রেমাবেশে যদি মহাপ্রভু নিকটবর্তী উপবনে প্রবেশ করেন তাহলে ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ী শ্লোক পড়তে পড়তে তাঁর পাদস্পর্শ করবেন। পরে রাজা একটি পত্রেও সার্বভৌমকে তাঁর অনুনয়ের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিলে সার্বভৌম নবদ্বীপ-পরিকরদের সভায় বিষয়টি উপস্থাপিত করলেন। তখন নিত্যানন্দ সাহস করে সব ব্যাপার মহাপ্রভুর গোচরে আনলে পরে মহাপ্রভু দামোদর-পণ্ডিত প্রমুখ সকলের উপর ন্যায়ান্যায় বিচারের ভার ছেড়ে দিলেন। কিন্তু কেউই সাহস করে মহাপ্রভুকে অনুরোধ করতে পারলেন না। তখন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর একটি বহির্বাস চেয়ে নিয়ে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর রামানন্দ রায়ের পালা। তিনি পূর্বেই প্রতাপরুদ্রের গুণাবলী এবং বৈষ্ণবতা সম্পর্কে ভূমিকা করেছিলেন, আজ ভেঙে বললেন, এবং যুক্তি দেখালেন—

রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে কর ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র॥

তখন

প্রভু কহে, আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥
রায় কহে কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান্।
তাঁহারে মলিন কৈল এক রাজ নাম॥

ঠিক হল রাজার পুত্রকে মহাপ্রভু দর্শন দিবেন এবং দিলেনও। এদিকে রথযাত্রার দিন নিকটবর্তী হলে ঐ ১৪৩৪ শকাব্দে মহাপ্রভু স্বীয় পরিকরদের সঙ্গে জগন্নাথের বিশ্রামস্থান গুণ্ডিচা-গৃহ মার্জন করলেন। স্বহস্তে সম্মার্জনী ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করলেন।[১] রথযাত্রার দিন মহাপ্রভু জগন্নাথের রথ বেষ্টন করে সাত-সম্প্রদায়ের এক অপূর্ব নৃত্য-কীর্তনের আয়োজন করলেন। নিজে এই সাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিধ্বনি করে উৎসাহ দিয়ে ঘুরতে লাগলেন। পরে সাত-সম্প্রদায় একত্র করে মধ্যে নিজে নৃত্য আরম্ভ করলেন। এই দৃশ্য প্রতাপরুদ্র দেখলেন, পাশে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে নিয়ে—

উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভু করিয়া হুংকার।
চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার॥

১. এই সময়কার ঘটনাবলী বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামী যেমন দিয়েছেন, তেমনটি অন্য কোনো জীবনীকাব্যে পাওয়া যায় না।

...স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানাভাবে বিবশতা গর্ব হর্ষ দৈন্য॥
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ি যায়।
সুবর্ণ পর্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥

এই মিলনভাবের নৃত্যের পর মহাপ্রভুর ভাবান্তর ঘটল। ঐশ্বর্যমূর্তি জগন্নাথকে দেখে তাঁর মনে হল এ কুরুক্ষেত্রের নায়ক কৃষ্ণকে দেখছেন, বৃন্দাবনের উজ্জ্বল-রসমূর্তি গোপীচিত্রহারী অখিলভুবনাকর্ষক কৃষ্ণকে নয়।[১] সুতরাং তিনি বিষণ্ণ হলেন, নৃত্য থেমে গেল। 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোক পুনঃপুন আবৃত্তি করতে লাগলেন। চোখে অশ্রুর ফোয়ারা ছুটল। মাটিতে বসে তর্জনী দিয়ে কী যেন লিখতে লাগলেন। স্বরূপ-দামোদর ভাবাবস্থা বুঝে কীর্তন ধরলেন—'সোইত পরাণনাথ পাইলুঁ। যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ॥' প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে বিস্ময়ে সব দেখছেন। এই ভাব প্রশমিত হলে প্রভু আবার নৃত্য আরম্ভ করলেন। এবার নাচতে নাচতে বাহ্য হারিয়ে প্রতাপরুদ্রের সামনেই আছাড় খেয়ে পড়ে যাবার মত হলেন। নিত্যানন্দ, কাশীশ্বর কাছে ছিলেন না যে তাঁকে ধরে ফেলবেন। প্রতাপরুদ্রই ছুটে এসে তাঁকে ধরে ফেললেন। বিষয়ী-সংস্পর্শ হতেই প্রভুর চেতনা ফিরে এল। তিনি পরিকরদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। সার্বভৌম রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় নেই, মনে হয় অন্তরে প্রভু আপনার উপর বিরক্ত হননি। অতঃপর সার্বভৌম এবং রাজা যে সুযোগ খুঁজছিলেন তা এসে গেল। রথচলার মধ্যবর্তী বিশ্রামস্থানে আসতেই মহাপ্রভু বৃন্দাবনভ্রমে নিকটবর্তী পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করলেন এবং প্রেমাবেশে অভিভূত হয়েছেন এমন অবস্থায় প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করে সামান্য বৈষ্ণবের বেশে প্রভুর পদদ্বয় ধারণ করে রাসলীলার শ্লোক পড়তে আরম্ভ করলেন। আর সেই অবসরে ভাবের আবেশে মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। রাজার অভিলাষ এতদিনে পূর্ণ হল। এর পর তিনি পূর্ণচেতন স্বাভাবিক অবস্থায় মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁর গৌড়ে যাবার সময়। যাত্রাপথে কটকে রামানন্দ রায়ের গৃহোদ্যানে মহাপ্রভু যখন বিশ্রাম করছিলেন তখন প্রতাপরুদ্র বিহ্বল হয়ে পুনঃপুন প্রণাম করলে পর মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করেন মহানদী পার হওয়ার সময় হস্তীপৃষ্ঠ থেকে রাজাব স্ত্রীগণও মহাপ্রভুকে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। প্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয়ের ঘটনায় সারা কলিঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। এই ঘটনা ঘটল মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের ষষ্ঠ বৎসরে অর্থাৎ ১৪৩৬ শকে।[২]

দক্ষিণ-ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। আজ বর্ষা, কাল শীত, রথের পর যাত্রা করবেন, দোলটা দেখেই যাবেন, এরকম করে রামানন্দ ও সার্বভৌম দু'বৎসর আটকে রাখলেন। পরবৎসর (১৪৩৬ শক) গৌড় থেকে ভক্তেরা এসে রথ দেখেই চলে গেলেন। এ বৎসর রামানন্দ-সার্বভৌম দেখলেন আর ঠেকাতে চেষ্টা করা ঠিক হবে না। সুতরাং রথযাত্রার পর বিজয়া দশমীর

১. রথস্থ জগন্নাথকে দেখে এই ভাবান্তর তাঁর প্রায়ই ঘটত।

২. কিন্তু বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুসারে মহাপ্রভু গৌড় থেকে নীলাচল প্রত্যাবর্তনের পর প্রতাপরুদ্রকে অনুগ্রহ করেন।

দিন মহাপ্রভু যাত্রা করলেন। ঠিক করলেন জাহ্নবীতে স্নান করে জননীর পদধূলি নিয়ে গৌড় হয়ে বৃন্দাবন যাবেন।[১] তাঁর সঙ্গে আসতে লাগলেন রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম, পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ দামোদর, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি প্রায় সকল অন্তরঙ্গ। মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতকে ফিরে যেতে বললে গদাধর রাজি হলেন না। 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা।' —গদাধর শুনলেন না, কারণ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গই তাঁর কাছে নীলাচল-বাস। বিগ্রহের সেবা? গদাধর বললেন, সেজন্য যে অপরাধ হবে তার ভাগী আমি হব। মহাপ্রভু পুনঃপুন নিষেধ করলে গদাধর বললেন—তোমার সঙ্গলোভে আমি যাচ্ছি না, শচীমাতাকে দেখতে যাচ্ছি। এই বলে তিনি পৃথক চলতে লাগলেন। কটকে এসে মহাপ্রভু গদাধরকে ডাকালেন এবং পুনরায় বোঝাতে লাগলেন কেন তাঁর নীলাচলে থাকা প্রয়োজন। গদাধর যখন কোনো কথাতেই কান দিলেন না তখন মহাপ্রভু রুষ্ট হয়ে শপথ দিয়ে বললেন, আমার সুখ যদি চাও ফিরে যাও। এই বলেই নৌকায় চড়লে গদাধর সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে বললেন গদাধর পণ্ডিতকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। মহানদী অতিক্রম করে চৌদারের পথে যাজপুরে এসে প্রতাপরুদ্র প্রেরিত সঙ্গী ও সেবক রাজপাত্র দু'জনকে বিদায় দিলেন, তারপর ভদ্রকে এসে বিদায় দিলেন রামানন্দকে। ওড়িষ্যার সীমানায় এসে হুসেন শাহের অধিকার গৌড়-বাঙলায় যাওয়ার ব্যবস্থার জন্য দু'চার দিন অপেক্ষা করতে হল। সেখানকার মুসলমান রাজ-কর্মচারী সব শুনে এবং প্রভুসহ বৈষ্ণব সমাজকে দেখে প্রীত হয়ে রূপনারায়ণ পর্যন্ত সকলকে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে। সেখান থেকে গঙ্গাপথে মহাপ্রভু পানিহাটি এসে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে উঠলেন। সেখান থেকে হালিশহরে শ্রীবাস-গৃহে, তারপর কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেনের ওখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে নবদ্বীপ-সন্নিকটে সার্বভৌম-ভ্রাতাবিদ্যাবাচস্পতির গৃহে এসে পাঁচদিন থাকলেন।[২] সেখানে মহাপ্রভুকে দেখবার জন্যে দিবারাত্রি অগণিত লোকের ভিড় হতে লাগল। ক্রমে লোকসমাগম এমন হল যে মহাপ্রভু রাত্রে লুকিয়ে চলে গেলেন মাইল দুই দূরে নবদ্বীপের বিপরীতে ও গঙ্গার পশ্চিম তীরে কুলদ্বীপ বা কুলিয়া গ্রামে। মাধবদাসের গৃহে কুলিয়াতেও লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাগম হতে লাগল।[৩] তারা মহাপ্রভুর পশ্চাদ্গমন করতে লাগল। শ্রীচৈতন্য কুলিয়া থেকে চলে এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে এবং সেখানে শচীমাতার পদধূলি নিয়ে কালক্ষেপ না করেই চললেন রাজধানী গৌড়ের কাছাকাছি রামকেলি পর্যন্ত। ইতিমধ্যে এই আশ্চর্য লোকসমাগম এবং

---

১. গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়। জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥ চৈ-চ, ২-২৬

২. বৃন্দাবনদাস আগমন পথে পানিহাটি প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করেননি। একেবারে বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহে এসে ওঠার কথা বলেছেন। প্রত্যাবর্তনের সময় শ্রীবাস-গৃহে এবং রাঘব পণ্ডিতের গৃহে গমনের কথা উল্লেখ করেছেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল মতে মহাপ্রভু ভিন্ন পথে গৌড়ে আসেন। জলেশ্বর থেকে দাঁতন হয়ে বর্ধমানের মধ্য দিয়ে। পথে আমাইপুরা গ্রামে জয়ানন্দের পিতার আতিথ্য গ্রহণ করেন। 'গুইয়া' নাম পরিবর্তিত করে তাঁর জয়ানন্দ নামকরণ করেন, ইত্যাদি। কিন্তু জয়ানন্দের এ সব তথ্য কাল্পনিক বলেই মনে হয়।

মুরারি গুপ্তের কড়চার মতে মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে গৌড়ে আসেন এবং নবদ্বীপেও আসেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নিজমূর্তি স্থাপনের অনুমতি দেন, কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে আসেন ইত্যাদি। কিন্তু কড়চার এই অংশ মুরারি গুপ্তের রচনা কিনা সে বিষয়ে আমরা ঘোর সন্দিহান। সন্দিগ্ধতার অন্যান্য প্রমাণও মিলছে।

৩. লক্ষ লক্ষ লোক আসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথে না পারি চলিতে॥
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ॥

সন্ন্যাসীর কথা হুসেন শাহের কানে গিয়ে পৌঁছালে এবং রাজা তাঁর দেহরক্ষী কেশব ছত্রীকে ব্যাপার কী তা জিজ্ঞাসা করলে কেশব ছত্রী সাবধান হয়ে ব্যাপারটিকে লঘু বলে উড়িয়ে দিলেন। হুসেন শাহের সন্দেহ হওয়াতে তিনি দবীর খাসকে (আত্মসচিব, রূপ গোস্বামী) ডেকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি রাজাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। হুসেন শাহ আদেশ প্রচার করলেন যাতে কেউ তাঁর কোনও অনিষ্ট না করে।

গৌড়-সংলগ্ন এই রামকেলি গ্রামে এমন আর একটি ঘটনা ঘটল যার ফল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হল। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী এখানে মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করলেন।[১] এঁরা হুসেন শাহের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। রামকেলিতে এঁদের বাসভবন ছিল। রূপ ছিলেন 'দবীর খাস' সনাতন 'সাকর মল্লিক' এবং ঐ ব্যবহারিক পদবীতেই তাঁদের পরিচয় ছিল। শুধু তা-ই নয়, এঁদের পূর্বপুরুষ কর্ণাটক দেশীয় ব্রাহ্মণ হলেও, সম্ভবতঃ পিতৃপক্ষে এবং নিজেদের পক্ষে মুসলমান সংস্পর্শে এ দুজনের পাতিত্য দোষ ঘটেছিল।[২] তাই এঁরা ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন মহাপ্রভু-প্রদত্ত রূপ-সনাতন আখ্যার পূর্ব পর্যন্ত। বস্তুতঃ এঁদের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীজীব-পিতা অনুপম বা বল্লভের মত এঁদের নাম জানা যায় না। এঁদের মধ্যে সনাতন ন্যায়স্মৃতিতে পণ্ডিত এবং ভাগবতধর্মে আস্থাবান ছিলেন। আর রূপ ছিলেন একাধারে পণ্ডিত ভক্ত এবং সর্বোপরি রসজ্ঞ কবি। শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্য-মিলনের পূর্বেই অন্ততঃ দুখানি কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক দূতকাব্য 'হংসদূত' এবং 'উদ্ধব-সন্দেশ' এবং কিছু কৃষ্ণস্তবও রচনা করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ 'দানকেলিকৌমুদী' রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট আত্মসমর্পণের পূর্বে শ্রীরূপ নিজ মনোভাব জানিয়ে মহাপ্রভুর কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁদের রাজকর্মের অবসরে ভক্তিরস আস্বাদন করার জন্য শ্লোকে উপদেশ পাঠিয়েছিলেন।[৩] তাঁর সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে দৈন্য সহকারে আত্মপরিচয় দিতেই মহাপ্রভু তাঁদের আলিঙ্গন করলেন, সনাতন-রূপ নামকরণ করলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁদেরও বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। সনাতন মহাপ্রভুকে এত লোক সঙ্গে নিয়ে এইভাবে বৃন্দাবনে না যাওয়ার জন্য উপদেশ দিলে তিনি মত পরিবর্তন করলেন এবং গৌড়াভিমুখে কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত গিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন শান্তিপুর হয়ে নীলাচলে ফিরে যাওয়ার জন্য। শান্তিপুরে দশদিন থাকলেন এবং শচীমাতার কাছে ভিক্ষাগ্রহণ করে ও অদ্বৈতাদি ভক্তদের সঙ্গে নৃত্যসংকীর্তনে কাটিয়ে, বৈরাগী শরণার্থী তরুণ রঘুনাথ দাসকে (পরবর্তীকালে বিখ্যাত রঘুনাথ দাস গোস্বামী) উপদেশ দিয়ে গৃহে পাঠিয়ে নীলাচলে ফিরে এলেন শুধু দামোদর পণ্ডিত এবং বলদেব (বলভদ্র?) ভট্টাচার্যের সঙ্গে ১৪৩৭ শকের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। এখানে এসে রায়-রামানন্দ,

১. বৃন্দাবনদাস এই সাক্ষাৎকার বর্ণনা করেননি। ঘটনাটি তাঁর অজ্ঞাত ছিল।

২. শ্রীরূপ-সনাতনের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন তাঁর চরিতামৃতে পুনঃপুন এবং স্পষ্টভাবে এঁদের নিজ উক্তিতে নীচজাতি, ম্লেচ্ছজাতি বলে উল্লেখ করেছেন এবং বুঝিয়েও দিয়েছেন তখন সন্দেহ থাকে না যে এঁরা পতিত হয়েছিলেন, আর মহাপ্রভু তো পতিতকে মানুষের অধিকার দেওয়ার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৩. পরবাসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তদেব্যস্ব দয়তস্তন বসঙ্গরসায়নম্॥

সার্বভৌম, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, কাশী মিশ্রাদি ভক্তগণের কাছে সব পরিস্থিতি বুঝিয়ে একাকী বৃন্দাবন যাওয়ার প্রসঙ্গ পাড়লেন। গদাধর পণ্ডিতের আগ্রহাতিশয্যে ঠিক হল বর্ষা চার মাস গেলে রথযাত্রা দেখে বৃন্দাবন যাবেন। গৌড়ের ভক্তবৃন্দ এ বৎসর নীলাচলে এলেন না। কারণ, বৃন্দাবন যাবেন বলে মহাপ্রভু এঁদের আসতে নিষেধ করে এসেছিলেন। শরৎকালে এসে পড়লে মহাপ্রভু আর থাকতে চাইলেন না, একাই যাওয়া ঠিক করলেন, কিন্তু স্বরূপ দামোদরের অনুরোধে বলভদ্র ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিলেন। কেউ না জানতে পারে এমনভাবে ঝাড়খণ্ডের মধ্যবর্তী বনপথ দিয়ে সাঁওতাল ভীলদের গ্রামের পাশ দিয়ে অগ্রসর হলেন এবং আনুমানিক একমাস মধ্যে কাশীতে এসে তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করে চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে কয়েকদিন যাপন করলেন। এখানে তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ (পরবর্তীকালে গোস্বামী রঘুনাথ ভট্ট) মহাপ্রভুকে সেবার দ্বারা তুষ্ট করলেন। মহাপ্রভু কাশীতে প্রকাশানন্দ প্রমুখ অদ্বৈতবাদীদের ভক্তি-বিদ্বেষের কথা কানে শুনলেন মাত্র। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে প্রয়াগ হয়ে বৃন্দাবন-মথুরা চললেন। মথুরায় মাধবেন্দ্র শিষ্য ও তৎপ্রতিষ্ঠিত গোপাল-বিগ্রহের সেবক এক পতিত ব্রাহ্মণের সাহায্যে প্রেমে-ব্যাকুল অবস্থায় তীর্থাদি পর্যটন করলেন, গোবর্ধন-প্রদক্ষিণ করলেন এবং কয়েকটি লুপ্ত তীর্থের নির্দেশ দিলেন। এখানে এক রাজপুত 'কৃষ্ণদাস', গৃহস্থ অথচ কৃষ্ণপ্রেমিক, তাঁর অনুচর হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন। বৃন্দাবনেও সেই লোক-কোলাহল, মহাপ্রভুর কৃষ্ণোন্মাদ। অক্রূর তীর্থে একদিন তো তিনি জলে ঝাঁপ দিয়ে কিছুক্ষণ ডুবেই থাকলেন। সঙ্গী বলভদ্র শঙ্কাকুল হয়ে ঠিক করলেন বৃন্দাবনে বেশিদিন থাকা চলবে না। কোনো প্রকারে মহাপ্রভুর সম্মতি নিয়ে নিলেন এবং মাঘের প্রথমেই মহাপ্রভুকে চালিত করলেন প্রয়াগের দিকে। মহাপ্রভু পথমধ্যে স্বপ্রভাবে পাঠান ভুঁইয়ার পুত্র বিজুলি খাঁকে ভক্তির পথে নিয়ে এলেন। প্রয়াগে এসে সেই গোপাল-বিগ্রহের সেবক এবং প্রেমিক রাজপুত কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিলেন এবং মকরস্নান প্রসঙ্গে দশদিন যাপন করলেন।

প্রয়াগে মহাপ্রভুর অবস্থিতিকালের উল্লেখ্য ঘটনা হল শ্রীরূপের সঙ্গে মিলন। রামকেলিতে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর থেকেই শ্রীসনাতন রাজকার্য ত্যাগ করে অসুখের ছলে গৃহে শাস্ত্রালোচনায় দিন কাটাচ্ছিলেন। গৌড়রাজ এসে অনুরোধ করাতেও তিনি গেলেন না। এদিকে হুসেন শাহ ওড়িষ্যারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন। সনাতনকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন, কারণ, তাঁর সন্দেহ দৃঢ় হয়েছিল যে সনাতন বৈরাগ্য নিয়ে চলে যাবেন। সনাতন তাতেও অস্বীকৃত হলে পর তাঁকে বন্দি করে রেখে গেলেন। এই অবসরে রূপ নিজের এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার পলায়নের সুবিধার জন্য বৈষয়িক ব্যবস্থার সমাধান করে কনিষ্ঠ অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে প্রয়াগে এসে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিললেন। ইতিমধ্যে তিনি চর পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন মহাপ্রভু কখন নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাত্রা করেছেন। প্রেম-ব্যাকুলতা নিয়ে দৈন্য ও আর্তির সঙ্গে রূপ নিজেকে নিবেদন করলেন।[১] সেখানে গঙ্গা-যমুনা সংগমে দু'একদিন কাটাবার পর নিকটবর্তী 'আড়ায়েল'

১. তু° তৎকৃত চৈতন্য-বন্দনা :

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।

গ্রাম থেকে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত ও ভাগবত-রসজ্ঞ বল্লভভট্ট এসে মহাপ্রভুকে রূপাদি সহ নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। সেখানে ত্রিহুতের বিখ্যাত কৃষ্ণপ্রেমিক রঘুপতি উপাধ্যায়ও এসে যোগ দিলেন। মোটামুটি দশদিন মহাপ্রভু প্রয়াগে কাটালেন। রামানন্দ রায়ের কাছে মহাপ্রভু পঞ্চরসে ভজন, রাধাভাব, গোপীপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে যা শিখেছিলেন তার কিছু বর্ণনা করলেন রূপের কাছে এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ে গ্রন্থাদি নির্মাণ করতে উপদেশ দিয়ে এবং পরে নীলাচলে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন রূপকে। রূপ-অনুপমের সঙ্গে ফিরে গেলেন মাধবেন্দ্র-শিষ্য এবং প্রেমিক কৃষ্ণদাস। গঙ্গাতীর-পথ দিয়ে কাশীতে শ্রীচৈতন্য ফিরে এলেন মাঘ মাসের মাঝামাঝি। কাশীতে দুমাস চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে বাস এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করে রইলেন। এঁরা দুজনই বাঙালি।

কাশীতে মহাপ্রভুর দুমাস অবস্থিতির কারণ দুটি (১) নিজ সঙ্গ দ্বারা এবং আলোচনা দ্বারা সনাতনের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেওয়া ও তাঁকে বৃন্দাবন-কেন্দ্রে নবধর্ম প্রচারের নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করা[১] এবং (২) প্রকাশানন্দ প্রমুখ কাশীর অদ্বৈতমতের সন্ন্যাসীদের ভক্তিধর্মের তীব্র প্রতিকূলতা বিষয়ে চিত্ত-পরিবর্তন-সাধন।[২] মহাপ্রভু কাশীর পণ্ডিতদের ভক্তিধর্মনিন্দা বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং বৃন্দাবন-দর্শনের ত্বরায় যাত্রাপথে কাশীতে অবস্থান কালে এঁদের উপেক্ষা ক'রে গিয়েছিলেন, কিন্তু নিজহৃদয়ে উপলব্ধ রাগভক্তিতত্ত্বের সত্যতা অদ্বৈতবাদীরা উপলব্ধি করুক এরকম ইচ্ছা মহাপ্রভুর পক্ষে পোষণ করা স্বাভাবিক। চরিতামৃতের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, শিষ্য-সম্প্রদায় সহ প্রকাশানন্দ

১. শ্রীসনাতনকে শিক্ষাদান অবলম্বনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মধ্যলীলার ছ'টি দীর্ঘ অধ্যায়ে বৈষ্ণবধর্মের ভগবৎ-স্বরূপ, জীবস্বরূপ, রাগমার্গ ভক্তিসাধন এবং সাধ্য প্রেমতত্ত্ব বিষয়ে যে বিস্তৃত বর্ণন শ্রীচৈতন্যমুখে গ্রথিত করেছেন তার সম্ভাব্য সত্যতা সম্পর্কে চৈতন্য-জীবনী ও বৈষ্ণবধর্মের আধুনিক ঐতিহাসিক কোনো কোনো গ্রন্থকার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ, দেখা যায়, পরবর্তীকালে লিখিত রূপ-সনাতন-জীবগোস্বামীর ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক বিচার ও সিদ্ধান্তসমূহই এর মধ্যে রয়েছে। আর মহাপ্রভু নিজে ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে এত খুঁটিনাটি বিষয় অধ্যয়ন ও চিন্তা করেছেন এ অসম্ভব। যুক্তিসংগত কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে হয়, নামমহিমাদি সম্বন্ধে, রাগাত্মিক ভক্তি সম্বন্ধে বা রাধাকৃষ্ণ লীলাব এবং বৈষ্ণবীয়তার মূল বিষয়গুলি নিয়ে সনাতনের সঙ্গে সাধারণভাবে মহাপ্রভুর কিছু আলোচনা নিশ্চিতই হয়েছিল। মহাপ্রভু রায়রামানন্দের সঙ্গে প্রথম এবং পরবর্তী বহু সম্ভাব্য আলোচনায় রাগভক্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিয়েছিলেন। সে সব বিষয়ের উত্থাপন খুবই সম্ভব, তবে চরিতামৃতকার মূল বিষয়টিকে কিছু বিস্তৃত আকারেই হয়ত বা পরিবেশন করেছেন।

২. প্রকাশানন্দ-উদ্ধার কাহিনী অন্য কোনো গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি ব'লে এবং ঐ অদ্বৈতবাদীর উপর বৃন্দাবনদাসাদি চরিতকারের ক্রোধ লক্ষ্য ক'রে অনেকেই এই ঘটনাটি সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেছেন। কিন্তু প্রকাশনানন্দের ভক্তিমুখে সম্যক্ পরিবর্তন হয়েছিল এ বিষয় স্বীকার না করা গেলেও তাঁর ভাবধর্ম-বিরোধিতা যে বহুল পরিমাণে হয়েছিল এ বিষয় স্বীকার না করা গেলেও তাঁর ভাবধর্ম-বিরোধিতা যে বহুল পরিমাণে প্রশমিত হয়েছিল এ মনে করতে বাধা নেই। ঘটনা হিসাবে উভয়ের সাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব নয় এবং মহাপ্রভুর রূপ আকৃতি ও ভাবাবেশসমূহ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে চাঞ্চল্য আনার পথে যথেষ্ট ছিল। মনে রাখতে হবে সনাতন গোস্বামী তখন কাশীতে, আর সনাতনের কাছে না হোক, রূপের কাছে কবিরাজ গোস্বামী এ ঘটনা নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। এ বিষয়ে চরিতামৃতের বর্ণনাও অস্পষ্ট নয়। কবিরাজ গোস্বামী আদি ৭ম, ১৭শ এবং ২৫শ পরিচ্ছেদে এর বর্ণনা দিয়েছেন।

গৌড়-নীলাচলের নব ভাবধর্মের আন্দোলন এবং মহাপ্রভুর ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিতই ছিলেন। ভক্তিবাদ বিষয়ে তাঁর ঘৃণা ছিল তীব্র। উত্তরভারতে তখন একমাত্র তিনিই যাবতীয় ভক্তিধর্মকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন ক'রে অদ্বৈতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর কাছে যাতায়াত ছিল এমন একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুব অলৌকিক আকৃতি, সন্ন্যাসবেশ এবং সেইসঙ্গে ভাবাবেশসমূহ দেখে বিস্মিত হয়ে তাঁর কাছে জানালে তিনি অবজ্ঞাসহ বিদ্রূপ ক'রে বললেন ঃ

শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তাঁর, ভাবকগণ লৈয়া।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥
যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥
সার্বভৌম ভট্টাচার্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥
সন্ন্যাসীর নামমাত্র, মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি॥
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইহ তার পাশ॥...ইত্যাদি।

মহাপ্রভু তখন বৃন্দাবনযাত্রাপথে। তিনি শুনে মৃদু হাস্য করলেন এবং বললেন, 'কাশীতে যদি গ্রাহক না মিলে, ভাবের বোঝা মাথায় ক'রে গৃহেই ফিরে যাব।' এরপর ফিরে আসার পথে যখন কাশীতে অবস্থান করছেন তখন সেই মারাঠী ব্যক্তি মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রকাশানন্দ ও তাঁর সাক্ষাৎকারের জন্য একদিন স্বগৃহে সন্ন্যাসীদের ভিক্ষানির্বাহের নিমন্ত্রণ করলে এবং কাকুতি-মিনতি ক'রে মহাপ্রভুকেও নিয়ে গেল। মহাপ্রভুর বয়স তখন ত্রিশের কোঠায় আর প্রকাশানন্দ সম্ভবতঃ প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে। মারাঠী-গৃহে ভিক্ষাগ্রহণের সময় সন্ন্যাসীরা শুদ্ধ মার্জিত স্থানে আসন নিয়েছেন, মহাপ্রভু সেখানে আসন না ক'রে পাদ-প্রক্ষালন ক'রে সেই জায়গাতেই বসে পড়লেন। লক্ষ্য ক'রে প্রকাশানন্দ ওখানে বসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মহাপ্রভু বললেন 'আমি হীন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, আপনার সঙ্গে একাসনে বসার অধিকারী নই।' প্রকাশানন্দ তখন হাতে ধ'রে নিজের কাছে নিয়ে এলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন সন্ন্যাসী হয়ে অদ্বৈত বেদান্তের দিকে না গিয়ে ভাবে অস্থির হয়ে গান করেন নাচেন কেন। তখন মহাপ্রভু বিনয় সহকারে বললেন, "আমি মূর্খ জ্ঞানহীন। আমার মূর্খতা দেখে গুরু আমাকে শুধু কৃষ্ণনাম করতে বলেছেন। কৃষ্ণনাম করতে করতে আমাব যেটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল সব সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। নামজপ করতে করতে এমন হ'ল যে নাম নিয়ে নাচবার এবং গান করবার প্রবল বাসনা আমি রোধ করতে পারি না"। তখন আমার গুরু বললেন—'এই হ'ল ভাবের অবস্থা। এর তুলনায় আনন্দের অবস্থা আর কিছু নেই। এরকম কৃষ্ণপ্রেমের কাছে মোক্ষও তুচ্ছ হয়ে যায়।' এই জন্যেই আমি নিরন্তর হাসি, নাচি, গাই। নিজের ইচ্ছায় নয়।" মহাপ্রভুর এরকম আত্মদৈন্যমূলক বিনয়বাক্যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষভাব কমে গেল। এরপর কথাপ্রসঙ্গে

ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, শক্তির কথা, রাগভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে তর্কের মধ্যে না গিয়েও মহাপ্রভু নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করলে পর এবং উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র ও গীতাভাগবতের কিছু শ্লোক নিজ-ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা ক'রে শোনালে পর সন্ন্যাসীরা অভিভূত হলেন। প্রকাশানন্দ সার্বভৌমের মত রাগভক্তিবাদী হয়ত হন নি, কিন্তু ভক্তিধর্ম-বিরোধের পথ যে ত্যাগ করেছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আসলে দেখা যায়, মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও নবভাবধর্ম মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরও ন্যায়-বেদান্ত-স্মৃতির পণ্ডিতেরা অনেকেই অবিচল ছিলেন। সার্বভৌমের প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের সংশয়ভঞ্জনাত্মক প্রশ্নই বিষয়টি নির্দেশ করে "রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হয় কৃষ্ণ। তবে কেনে পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ॥' কিন্তু ক্রমশঃ যে তারা বিদ্বিষ্টতা ত্যাগ করেছিল এও তো ঠিক। প্রকাশানন্দ-পরাজয় এই পরিবর্তনের প্রবল সূচক হতে পারে। কাশীতে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা ত্যাগ করলে পর মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটতে লাগল। রাত্রিদিন লোক-সংঘট্টে ব্যতিব্যস্ত হয়ে মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই ঝাড়খণ্ডের পথেই নীলাচল যাত্রা করলেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরে এলেন ১৪৩৮ শকের বৈশাখ প্রথমের দিকে। প্রত্যাবর্তন সংবাদ নবদ্বীপে পাঠানো হতেই গৌড়ের ভক্তেরা রথযাত্রার পূর্বে আসবার আয়োজন করতে লাগলেন। এদিকে রূপগোস্বামী তাঁর ভ্রাতা অনুপমের সঙ্গে বৃন্দাবনে কয়েকদিন কাটিয়ে সাধনার স্থান ঠিক ক'রে ফিরলেন গৌড়ের দিকে। রূপের অভিলাষ গৌড়ে ফিরে সাধনার প্রতিকূলতা জন্মাচ্ছিল এমন কিছু বৈষয়িক ব্যাপার সমাধা ক'রে, নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে থাকবেন এবং সনাতনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভক্তিমূলক কাব্যশাস্ত্রাদি রচনা ক'রে, বিগ্রহ স্থাপন ক'রে, লুপ্ততীর্থাদি উদ্ধার ক'রে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন। রূপ আসছেন বৃন্দাবন থেকে, আর সনাতন যাচ্ছেন বৃন্দাবনের দিকে, কিন্তু উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটেনি, কারণ, রূপ ফিরেছিলেন গঙ্গাতীর পথ দিয়ে, আর সনাতন গিয়েছিলেন রাজপথ ধ'রে। যাই হোক, শ্রীরূপ গৌড়ে গিয়ে শেষবারের মত সংসারের ব্যবস্থা ক'রে ফিরবেন এমন সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের মৃত্যু হ'ল।[১] রূপ গোস্বামীর নীলাচলে ফিরতে আরও কিছু বিলম্ব হয়ে গেল। নবদ্বীপ হয়ে আসার সময় তিনি মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্তন শুনলেন। তখন ভক্তেরাও নীলাচল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। কিন্তু রূপ তার আগেই দ্রুতবেগে নীলাচলে এসে হাজির হলেন, উঠলেন ঠাকুর হরিদাসের বাসায়। মহাপ্রভুর নিয়ম ছিল প্রতিদিন জগন্নাথের বাল্যভোগ দর্শন ক'রে হরিদাস বা সনাতন-রূপ থাকলে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে স্বমন্দিরে ফিরে যাবেন। রূপের উপস্থিতির দিন তার আগেই এসে হাজির হলেন। রূপ দণ্ডবৎ করলেন, মহাপ্রভু আলিঙ্গন করলেন। ক্রমে নীলাচলবাসী সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে মহাপ্রভু রূপের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অদ্বৈত নিত্যানন্দ এসে পৌছালে তাঁদের বললেন শ্রীরূপকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আশীর্বাদ করতে।

দু'খানি দূতকাব্য এবং সম্ভবতঃ 'দানকেলি' লিখে শ্রীরূপ তখনই ভক্তকবি হিসাবে প্রসিদ্ধ। ইতিমধ্যে তিনি ললিতমাধব এবং বিদগ্ধমাধব নামে দু'খানা নাটকেরও ভূমিকা

১. অনুমান হয়, অনুপমের পুত্র শ্রীজীব তখন ২।৩ বৎসরের শিশু।

ক'রে ফেললেন।[১] ঠিক ছিল দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন একত্র ক'রে দূতী-সখীসহ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবিস্তারের একখানা পূর্ণাঙ্গ নাটকই লিখবেন, কিন্তু কথিত হয়, সত্যভামা স্বপ্ন দিয়ে দ্বারকালীলা বিষয়ে পৃথক্ গ্রন্থ লিখতে বলেন। যাই হোক্ নান্দী শ্লোকের শ্রীচৈতন্য-বন্দনা, সূত্রধারের ভূমিকা এবং পাত্রপ্রবেশ ও দু'চারটি শ্লোক পর্যন্ত লেখার পর একদিন স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের (এবং হরিদাস-ঠাকুরের) সম্মুখে রূপের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করা হ'লে সকলে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। মহাপ্রভু সাবধান ক'রে দিলেন, বৃন্দাবন লীলা থেকে যেন কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে না দেখানো হয়। আর একদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। রথযাত্রার সময় নৃত্য এবং কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু কখনো কখনো জগন্নাথের ঐশ্বর্যমূর্তি নিরীক্ষণ ক'রে বিরহভাবে আবিষ্ট হতেন, ভাবতেন, এই তো সেই আমার প্রিয় কৃষ্ণ, কিন্তু এ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে সুখ কই? মুখে একটি সংস্কৃত কবিতা পড়তেন, যা লৌকিক পরকীয়া রতির কবিতা, যার ব্যঞ্জিতার্থ ঐ।[২] একমাত্র স্বরূপ দামোদর ছাড়া ঐ শ্লোকের ব্যঞ্জিতার্থ আর কেউ বুঝতে পারতেন না। এইবার রথাগ্রে নৃত্য করতে করতে যখন স্তব্ধ ও বিষণ্ণ হয়ে মহাপ্রভু ঐ শ্লোক আবৃত্তি করলেন তখন রূপ নিজ প্রতিভায় ওর ব্যঞ্জিতার্থ ধরে ফেললেন, এমন কি সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বৃন্দাবন-লীলায় পরকীয়া রতি উৎকর্ষ প্রতিপাদক একটি শ্লোকও রচনা করে ফেললেন। পরের দিন ঐ শ্লোকটি বাসার চালায় গুঁজে রেখে সমুদ্র-স্নান করতে গেছেন এমন অবসরে মহাপ্রভু এসে চালে-গোঁজা শ্লোক ('প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি' ইত্যাদি) পেয়ে প'ড়ে আবিষ্ট হলেন। রূপ ফিরে আসতেই তাকে চাপড় মেরে আলিঙ্গন করলেন এবং বহুপ্রশংসা করলেন। মহাপ্রভু বুঝলেন রূপের নবধর্মে দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।

এইভাবে দশমাস নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে কাটিয়ে শ্রীরূপ মহাপ্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে ও বৃন্দাবন-কেন্দ্রে নব বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের বিষয় বুঝে নিয়ে গৌড়যাত্রা করলেন ঐ শকাব্দেরই শেষে ফাল্গুন-চৈত্রে। গৌড়ে এক বৎসরের মত কাটিয়ে ১৪৪০ শকের প্রারম্ভে বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানেই স্থায়ী হলেন।

এদিকে শ্রীরূপের নীলাচল ত্যাগের দশদিন পরেই বৃন্দাবন থেকে শ্রীসনাতন এসে উপস্থিত হলেন। ঝাড়খণ্ডের আরণ্যপথ দিয়ে আসতে তাঁর চর্মরোগ জন্মেছিল। পথে আসতে তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে এ দেহ রাখবেন না, জগন্নাথের রথের চাকায় আত্মবিসর্জন দিবেন। কারণ, হীন জাতি ব'লে তিনি মন্দিরে জগন্নাথ দেখতে পাবেন না, এদিকে দৈহিক ব্যাধির জন্য মহাপ্রভুর কাছে দেখা দিতেও পারবেন না। যাই হোক, নীলাচলে এসে তিনি হরিদাস ঠাকুরের সাধন-কুঠিতে উঠলেন। জগন্নাথের বাল্যভোগ

১. গ্রন্থকার প্রদত্ত পুষ্পিকা থেকে জানা যায়, বিদগ্ধমাধব সমাপ্ত হয় ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধান বৎসরে এবং ললিতমাধব সমাপ্ত হয় আরও চার বৎসর পরে। ফলে ১৪৩৮ শকাব্দে রূপের নীলাচলে অবস্থানের সময় ঐ দুই নাটক সম্পূর্ণ হয় কী ক'রে এই ভেবে কোনো আধুনিক ইতিবৃত্তকার চৈ-চ এর বর্ণনকে অমূলক প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়, এই সময় নাটক দুটির প্ল্যান ঠিক হয়েছিল, কিন্তু মহাপ্রভুর নির্দেশ (কৃষ্ণ বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে) পালন করতে গিয়ে পরে নতুন ক'রে ঘটনার উদ্ভাবন করতে হয় এবং এইভাবে অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়েই থাকে।

২. 'যঃ কৌমারহারঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ" ইত্যাদি কাব্যপ্রকাশধৃত নিরলংকার বাক্যের কাব্যত্ব প্রতিপাদনকল্পে গ্রথিত কোনও কবির শ্লোক।

দেখে নিয়মমাফিক মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের ওখানে এলে তাঁর সঙ্গে সনাতনের সাক্ষাৎ ঘটল। মহাপ্রভু দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে গেলে সনাতন সবেগে পিছিয়ে গেলেন, কিন্তু মহাপ্রভু জোরপূর্বক তাঁকে আলিঙ্গন করায় সনাতনের চর্মক্ষত থেকে ক্ষরিত রস মহাপ্রভুর সর্বাঙ্গে লেগে গেল, সনাতন হায় হায় করে উঠলেন। এইভাবে নিত্য সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভু সাক্ষাৎ করেন, আলিঙ্গন করেন এবং ইষ্টগোষ্ঠী করে স্বমন্দিরে চলে যান। তাঁর দূষিত কণ্ডু উপেক্ষা করে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করেন, এতে সনাতনের ক্ষোভ বেড়েই চলল। দেহত্যাগে কৃতসংকল্প হলে মহাপ্রভু তাঁর মনের কথা জানতে পারলেন এবং বোঝালেন যে দেহত্যাগে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, সাধন-ভজনেই পাওয়া যায়, অতএব জীবন রক্ষা করাই উচিত। তাছাড়া সনাতনের জীবনে বৈষ্ণব-ধর্মের অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। রথের সময় চারমাস গৌড়ের ভক্তেরা এসে থাকলে মহাপ্রভু সকলের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে একদিন মহাপ্রভু এক দূরবর্তী উদ্যানে আছেন এমন সময় সনাতনকে ডেকে পাঠালে সনাতন জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বার অতিক্রম করে ছায়াশীতল পথ দিয়ে না গিয়ে তপ্তবালুকার উপর দিয়েই হেঁটে গেলেন, পায়ে ফোস্কা পড়ল, কিন্তু তিনি বুঝতেই পারলেন না। নীলাচলে পণ্ডিত জগদানন্দ মধুরভাব আশ্রয় করে মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করতেন। সনাতনের কণ্ডু উপেক্ষা করে মহাপ্রভু তাঁকে দিন দিন জোরপূর্বক আলিঙ্গন করেন এ নিয়ে জগদানন্দ অন্তরে ক্ষুব্ধ ছিলেন। একদিন জগদানন্দের কাছে নানা কথা প্রসঙ্গে সনাতন মহাপ্রভুর আলিঙ্গন নিয়ে নিজের মনোদুঃখ প্রকাশ করলে পর জগদানন্দ এ-বিষয়ের সমাধান হিসাবে সনাতনকে বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। এ সংবাদ মহাপ্রভুর কানে গেলে তিনি জগদানন্দের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন :

> কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্বী হৈল।
> তোমাকেই উপদেশ করিতে লাগিল॥
> ব্যবহার পরমার্থে তুমি গুরুতুল্য।
> তোমারে উপদেশ করে না জানে আপ্তমূল্য॥
> আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য।
> তোমারে উপদেশে, বালক করে ঐছে কার্য॥

শ্রীসনাতন এ ভর্ৎসনা শুনলেন, বললেন, এ ভৎর্সনা যাঁর উপর তিনিই প্রভুর যথার্থ আত্মীয়, মর্যাদার ভাগী আমি এক্ষেত্রে কতই না দূরবর্তী! অনুযোগ করে মহাপ্রভুকে বললেন :

> জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়সুধাধার।
> মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি নিম্বনিসিন্দাসার॥

মহাপ্রভু বোঝালেন যে ঠিক তা নয়, জগদানন্দ তাঁর কাছে সনাতনের চেয়ে প্রিয়তর নন, আর তিনি যথার্থই মর্যাদালঙ্ঘন সহ্য করতে পারেন না। আর, আলিঙ্গন সম্বন্ধে বোঝালেন যে সনাতনের দেহ তাঁর কাছে অতি প্রিয়। তা ছাড়া ভদ্রাভদ্র, জ্ঞান মনোধর্ম মাত্র, শুচি-অশুচিবোধও তাই, পঙ্কে চন্দনে সন্ন্যাসীর সমবুদ্ধি, এইজন্যও সনাতনের দেহে তাঁর বিন্দুমাত্র ঘৃণা নাই। এইভাবে সনাতনকে এক বৎসরের মত নিজের কাছে রেখে, বৃন্দাবনে তঁর করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। ঝাড়খণ্ডের যে অরণ্যপথ দিয়ে

বৃন্দাবনযাত্রার সময় মহাপ্রভু গিয়েছিলেন, বলভদ্র ভট্টাচার্যের কাছে সে পথে মহাপ্রভুর গমনের বিবরণ জেনে নিলেন এবং যে যে বৃক্ষ, প্রস্তর, নদী, গ্রাম মহাপ্রভুর স্পর্শলাভ করেছিল তা দেখতে দেখতে শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাসুখে বৃন্দাবনে চলে এলেন। স্বল্প পরে শ্রীরূপও গৌড় থেকে নীলাচল হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার মধ্যেকার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রঘুনাথদাসের আগমন। সপ্তগ্রামের করশুল্ক-আদায়ের ভারপ্রাপ্ত জমিদার হিরণ্যদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ও গোবর্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথ প্রথম যৌবনেই বৈরাগ্যের অভিমুখী হয়ে শ্রীচৈতন্যের শরণ গ্রহণ করতে শান্তিপুরে আসেন। প্রথমবার, যখন সন্ন্যাসের পরেই মহাপ্রভু শান্তিপুরে ফিরে এসেছেন এবং দ্বিতীয়বার গৌড় রামকেলি থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে। তিনি রঘুনাথকে সে সময় গৃহে ফিরে যেতে এবং অনাসক্ত হয়ে বিষয়-ভোগ করতে উপদেশ দেন। রঘুনাথ বৎসরখানেক সেইরকম চেষ্টা করে দেখলেন, কিন্তু গৌর-কৃষ্ণে নিবিষ্ট চিত্তকে সংসারে ধরে রাখতে অসমর্থ হলেন। 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য এবং অপ্সরাসম স্ত্রী' তাঁকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হল। পিতামাতা বার বার তাঁকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন, তিনি বারবার পালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে গৌরাঙ্গশরণলাভ মানসে তিনি নিত্যানন্দের কৃপাভিক্ষা করার জন্য বহির্গত হলেন। নিত্যানন্দ তখন পানিহাটিতে তাঁর "গোপবৃন্দ" সহ গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূল উজ্জ্বল করে বসে আছেন। রঘুনাথ দূর থেকে দণ্ডবৎ করতেই 'চোরা। এতদিন পরে এলি, আয় তোর দণ্ডবিধান করব' বলে আকর্ষণ করে তাঁর মাথায় পাদস্পর্শ করলেন। বললেন, তাঁর সব গোপবৃন্দকে যমুনাপুলিন-লীলার অনুকরণে দধি-চিঁড়া মহোৎসবের দ্বারা পরিচর্যা করতে। সেই আয়োজনই হল। মহোৎসবের নাম শুনে দূরবর্তী স্থান থেকেই বহুলোক আসতে লাগলেন। পণ্ডিত ভট্টাচার্য থেকে হীনতম শূদ্র পর্যন্ত এই মহোৎসবে এসে ধন্য হয়ে গেলেন। সন্ধ্যায় রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নৃত্যকীর্তনাদি সংঘটিত হল। পরদিন প্রাতে রাঘব পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় রঘুনাথ নিত্যানন্দ-সমীপে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করে তাঁর কৃপা চাইলেন :

মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি! হইয়া সদয়॥
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাওঁ—কর আশীর্বাদ॥

নিত্যানন্দ আশীর্বাদ করলে পর রঘুনাথ সানন্দচিত্তে ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু গৃহের অভ্যন্তরে গেলেন না। দুর্গামণ্ডপে থাকলেন এবং সেই অবস্থায় তাঁকে নজরবন্দী করা হল। এরই ফাঁকে একদিন সুকৌশলে তিনি পালালেন। দিন পনের ক্রোশ হেঁটে পথে মাত্র তিন দিন অন্ন গ্রহণ করে বারো দিনে নীলাচলে এসে হাজির হলেন। এবার আর মহাপ্রভু তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন না।[১] শিক্ষার জন্য স্বরূপ দামোদরের কাছে তাঁকে সমর্পণ করলেন। আরম্ভ হল রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্যব্রত। সেখানে প্রথম রঘুনাথ অন্যান্য ভক্তের মত জগন্নাথের প্রসাদান্নে শরীর রক্ষা করতেন। পরে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি করতে লাগলেন। সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা বেশ্যাবৃত্তির মত দেখায় বলে সে পথ ছেড়ে দিয়ে অন্নসত্রে ভিক্ষা করে খেতে লাগলেন। পরে তাও ছেড়ে দিলেন এবং গাভীগণের কাছে

১. আনুমানিক ১৪৪০ শকাব্দ।

ফেলে দেওয়া বাসি প্রসাদান্ন, যা গাভীতেও খায় না, তা-ই তুলে নিয়ে এসে ধুয়ে ধুয়ে এক আধ মুষ্টি খেয়ে জীবন নির্বাহ করতে লাগলেন। মহাপ্রভু এই ব্যাপার শুনে একদিন এসে হাজির হলেন এবং স্বয়ং জোর করে এ অন্নের এক মুষ্টি মুখে দিয়ে তার অমৃতস্বাদের গৌরব কীর্তন করে ভক্তবৃন্দকে শিক্ষা দিলেন। রঘুনাথের অত্যাশ্চর্য নিষ্ঠায় আনন্দিত হয়ে মহাপ্রভু রঘুনাথকে তাঁর নিজের পূজিত ও অশ্রুজলে বহুধৌত গোবর্ধন শিলা এবং সেই সঙ্গে গুঞ্জামালা দিলেন। এইবার আরম্ভ হল রঘুনাথের কঠোর ভক্তিসাধনা। ঐ গোবর্ধন শিলার পূজা দিতে তিনি কঠোর নিয়ম সহকারে নিযুক্ত হলেন। স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর বিচিত্র ভাবাবেশ নিয়ে নিগূঢ় রাধাভাবলীলা বিষয়ক শ্লোক রচনা করে যেতেন, আর তাঁরই আদেশে রঘুনাথ তার অর্থ পরিস্ফুট করতেন। এইভাবে ষোল বৎসর মহাপ্রভুর নিকট কাটিয়ে তাঁর এবং স্বরূপের তিরোধানের পর ১৪৫৬ শকে তিনি বৃন্দাবন গিয়ে শ্রীরূপের শরণ গ্রহণ করেন। তিনি গৌরাঙ্গ বিষয়ক স্তব, রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কিছু কিছু রচনা লিখে যেমন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তচিত্তের তৃপ্তিসাধন করেছেন, তেমনি এই নবধর্মের আন্দোলনকে অগ্রসর করেও দিয়েছেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ও শ্রীরূপের কাছে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ করেছিলেন।[১]

এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল নিঃশেষ রাগভক্তিপ্রচারের জন্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বাঙলায় প্রেরণ। নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নীলাচল আগমনের সঙ্গী হয়ে এসেছিলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ যাত্রা করলে সম্ভবতঃ তিনি গৌড়ে কিছুদিনের জন্য যাপন করে নীলাচলে ফিরে আসেন। মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি ছিলেন, তারপর প্রথমবার গৌড়ের ভক্তেরা এলে পর রথযাত্রাদি উৎসবে যে-সব আনন্দ-সম্মিলন ও প্রেমভক্তির প্রবল প্রকাশ ঘটেছিল তার মধ্যে তাঁর স্বভাবসুলভ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। গৌড়ের ভক্তবৃন্দের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মহাপ্রভু নিভৃতে নিত্যানন্দের সঙ্গে যুক্তি করলেন। এবং তাঁকে বাঙলায় থেকে প্রেমধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিলেন। তবু সদাচঞ্চল নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গ-সুখের লালসায় পরবৎসর এবং তার পর-বৎসরও যখন এলেন তখন মহাপ্রভু আবার তাঁর সঙ্গে নিভৃতে যুক্তি করলেন এবং এবার অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে মিলে নিত্যানন্দের গৌড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের নির্দেশ দিলেন। এই সময় অদ্বৈতাচার্য হেঁয়ালি ভাষায় যে তর্জা বলেছিলেন, মহাপ্রভু সহাস্যে তার অনুমোদনও করেছিলেন।[২] কিন্তু মহাপ্রভুর নিষেধ থাকলেও প্রেমোন্মাদ নিত্যানন্দ গৌড়ের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নীলাচলে আসতে ছাড়েন নি। যাই হোক, নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর নির্দেশে বাঙলার মধ্যভাগে সহজ গৌরকৃষ্ণ প্রেমের যে প্রসার ঘটিয়েছিলেন তা অতুলনীয় এবং তা নিত্যানন্দের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভুর কার্যকারিতা প্রমাণ করে। নিত্যানন্দ জাতকুল একেবারেই মানেননি। সন্ন্যাসী হলেও মহাপ্রভুর লোকাপেক্ষা ছিল। নিত্যানন্দের কিছুই ছিল না। এ বিষয়ে চরিতামৃতকার বলছেন :

১ "শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।"

২. কেউ কেউ মনে করেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুকে মহাপ্রভু বিবাহ করে গৃহী হবার উপদেশও দিয়েছিলেন। চৈ-চ, মধ্য—১৬ দ্রঃ।

সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল-যাঁহা তাঁহা দান॥

একটি গীতেও বলা হয়েছে :

যারে দেখে তারে কয় দন্তে তৃণ করি।
আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি॥

নিত্যানন্দের অপার প্রেমদাতৃত্বের বিষয় স্মরণ করে বাউল কবি গেয়েছেন—

নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে।
কে পারে যাবি ধর এসে॥

নিত্যানন্দপ্রভুর অপর কীর্তি হল তরুণ কবি বৃন্দাবনদাসকে চৈতন্যচরিত রচনায় অনুপ্রাণিত করা। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর ন'বৎসর ধরে নিত্যানন্দ প্রধানতঃ নদীয়া-বর্ধমানের গ্রামে ভক্তগৃহে গমনাগমন করে প্রেমধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পত্নী জাহ্নবাদেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্র বাঙলার বৈষ্ণবধর্মের নেতৃত্ব করেন।

ইতিহাস ঘটনা চায়। সেরকম ঘটনা বলতে শ্রীচৈতন্যের জীবনে তেমন বেশি কিছু নেই, বিশেষতঃ তাঁর অন্ত্যলীলার শেষ দ্বাদশ বৎসরে।[১] তবু অন্তরঙ্গ ভাবে বিচার করলে বলা যায় যে ঘটনার বিরলতাও ছিল না। চরিতামৃতের লেখক দিগ্‌দর্শন হিসাবে তার কিছু বর্ণনা করেছেন মাত্র। প্রথমতঃ লোকযাতায়াতের বিরাম ছিল না রথযাত্রার পূর্ব থেকে চারমাস গৌড়ের ভক্তবৃন্দ থাকতেন, এঁদের নানান্ জনের ধর্মাচরণে নানান্ প্রশ্ন, নানান্ সমস্যা। এঁদের সঙ্গে কীর্তনাদিতে যোগ দিতে গিয়ে এবং নিমন্ত্রণ-ভিক্ষা নির্বাহ করতে গিয়ে মানবীয় স্নেহপ্রীতি, মান-অভিমানের নানা ব্যাপারের সম্মুখীন মহাপ্রভুকে হতে হত। তারপর নানা স্থান থেকে ধার্মিক ও বিদগ্ধ ব্যক্তির সমাবেশ প্রায়ই ঘটত। কারুর দাবি, মহাপ্রভুকে তাঁর ভাগবত ব্যাখ্যা শুনতে হবে এবং অনুমোদন করতে হবে, কারুর ইচ্ছা মহাপ্রভুকে স্বকৃত ভক্তিবিষয়িণী কবিতা শোনাবেন, কেউ বা শুধু দেখার, শোনার এবং সাহচর্যলাভের বাসনা নিয়ে কয়েক দিন যাপন করে চলে যেতেন। রঘুনাথ ভট্ট, রঘুপতি উপাধ্যায়, বল্লভ ভট্ট, উচ্ছিষ্টভোজী কালিদাস প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ নীলাচলে যাঁরা স্থায়ীভাবে তাঁর সঙ্গে অবস্থিতি করতেন তাঁদের নিয়ে ঘটনাও কম ছিল না। কীর্তনিয়া ছোট হরিদাস বৈষ্ণবী মাধবীর কাছ থেকে তাঁর জন্য চাল ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন এই অপরাধে মহাপ্রভু তাঁকে ত্যাগ করায় এবং কোনোমতেই ক্ষমা না করায় ছোট হরিদাস প্রয়াগে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিলেন। কোনো বিধবা ব্রাহ্মণীর একমাত্র পুত্রের উপর মহাপ্রভুর স্নেহপ্রীতি লক্ষ্য করে দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে তিরস্কার করলেন। ভিক্ষা গ্রহণ কালে মহাপ্রভুর ভোজনের পরিমাণ লক্ষ্য করে রামচন্দ্র পুরী মন্তব্য করলে পর মহাপ্রভু অর্ধাশন করতে লাগলেন। জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রীতির আতিশয্যে সন্ন্যাসধর্ম; লঙ্ঘনের ভয়ে মহাপ্রভু বিক্ষুব্ধ হতেন, আবার অনুরোধ না মানলে জগদানন্দ প্রবল অভিমান করবেন বলে মহাপ্রভু মনে মনে ভয়ও করতেন। ভাববিহ্বল অবস্থায় থাকতে থাকতে মহাপ্রভুর বায়ুবৃদ্ধি হত, রাত্রে নিদ্রা হত না বলে জগদানন্দ মহাপ্রভুর জন্য এক তুলার বালিশ তৈরি করে তার উপর মাথা রাখবার অনুনয় করলে মহাপ্রভু

১. ১৪৪৩—৫৫ শকাব্দ।

তা অঙ্গীকার করলেন না। আরম্ভ হল জগদানন্দের অনশন। শেষে স্বরূপ-দামোদর কলার পাতা নখ দিয়ে চিরে চিরে তাই দিয়ে বালিশ তৈরি করে দিলে মহাপ্রভু তা অস্বীকার করতে পারলেন না। জগদানন্দেরও কোনো প্রকারে মানভঙ্গ ঘটল। একবার জগদানন্দ নবদ্বীপে মাতৃসমীপে মহাপ্রভু কর্তৃক প্রেরিত হলে পর সেখান থেকে চন্দনাদি-তৈল এক হাঁড়ি নিয়ে আসেন, ইচ্ছা তৈললেপনে মহাপ্রভুর বায়ুশান্তি ঘটাবেন। মহাপ্রভু যখন কোনো মতেই অঙ্গীকার করলেন না, তখন জগদানন্দ ক্রোধে সেই হাঁড়ি উঠানে নিক্ষেপ করে ভেঙে ফেললেন। এরকম বহু ঘটনা প্রায়ই ঘটত।

তাঁর অলৌকিক চরিত্রে একাধারে সাতিশয় মৃদুতা এবং অনমনীয় দৃঢ়চিত্ততা লক্ষিত হত। চরিতামৃতকার এটি বোঝাবার জন্য ভবভূতি-বর্ণিত রামচরিত্রের বিষয় উল্লেখ করেছেন—বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। মহাপ্রভুর মৃদুতা এবং কারুণ্য তাঁর জননীবাৎসল্যে, অধম পতিত হীন জাতির প্রতি পক্ষপাতে এবং ভক্তবৎসলতায় প্রকাশিত; তাঁর কঠোরতা ফুটেছে বিষয়ীর আচরণের বিরুদ্ধে, বৈরাগ্য-ভঙ্গে, মর্যাদা-লঙ্ঘনে, এবং তাঁর নিজের প্রতি স্তুতিবাদে। এই ভাবস্থিরনেত্র, আজানুলম্বিতভুজ এবং স্মেরাস্য দেবমানব সহসা বিচলিত হতেন না, আবার বিচলিত হলে নিজ সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে নড়ানোও সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু একদিনকার একটি ঘটনায় মহাপ্রভুকে সাতিশয় ক্ষুব্ধই হতে হয়েছিল। রায় রামানন্দের এক ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে শুল্ক-আদায়কারী কর্মচারী ছিলেন। রাজাকে দেয় টাকার অনেক বাকি পড়ায় এবং পুনঃপুন তাগাদা সত্ত্বেও নানা অছিলায় কালক্ষেপ করায় এবং সেই সঙ্গে যুবরাজকে অপমান করায় গোপীনাথের কঠোর শাস্তির আদেশ হয়। ঠিক হয় প্রত্যক্ষ মৃত্যুভয় দেখিয়েও টাকা আদায় না হলে তাকে চাঙে চড়িয়ে অর্থাৎ বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করা হবে। আটক করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন সময় গোপীনাথপক্ষের লোকজন এসে মহাপ্রভুর পার্ষদদের ধরলে যে, একমাত্র মহাপ্রভুর কথাতেই রাজা বা যুবরাজ গোপীনাথকে মুক্তি দিতে পারেন। সার্বভৌম বিষয়টি মহাপ্রভুর গোচর করলে মহাপ্রভু বললেন, রাজার তঙ্কা আত্মসাৎ করে সে অপরাধ করেছে, আর আমি সন্ন্যাসী মানুষ, পুনরায় এ অনুরোধ করলে এখানে আর আমাকে দেখতে পাবে না। সার্বভৌম তখনকার মত নিরস্ত হলেন, কিন্তু গোপীনাথকে সত্য সত্য চাঙে চড়াবার আয়োজন করা হচ্ছে এই কথা শুনে পক্ষীয় লোকজন সার্বভৌমের কাছে এসে কেঁদে পড়লে পর সার্বভৌম যখন ঐ অবস্থার কথা পুনরায় মহাপ্রভুকে জানালেন তখন মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ হয়ে—এখানে বিষয়ীদের কাছে আর নয়, বলে উঠে পড়লেন। সার্বভৌম আর অনুরোধ করবেন না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে মহাপ্রভু শান্ত হলেন। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সার্বভৌম প্রতাপরুদ্রের কাছে ছুটে গেলেন এবং রামানন্দ রায়ের পরিবারবর্গ মহাপ্রভুর বিশেষ অনুগৃহীত এই বিষয় জানিয়ে গোপীনাথের মুক্তি করিয়ে নিলেন। মহাপ্রভুর কানে যখন এই সংবাদ পৌঁছাল তখন তিনি আর ক্রোধ প্রকাশ করতেও অসমর্থ হলেন, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আক্ষেপ করে শুধু বললেন :

প্রভু কহে ভট্টাচার্য কি মোর করিলে।
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি মোরে করাইলে॥

এসব ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল হরিদাস ঠাকুরের দেহরক্ষা (আনুমানিক

১৪৫০ শক)। হরিদাস ঠাকুরের নাম-সাধনার একাগ্রতা এবং অন্যান্য চারিত্রিক গুণসম্পদের জন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রতি নিতান্ত প্রীতিবৎসলতা এবং শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। হরিদাস মুসলমান ভক্ত ছিলেন বলে তাঁর দৈন্যবোধের জন্যও মহাপ্রভু অন্যান্য পার্ষদদের চেয়ে তাঁকে অধিক সমাদর করতেন। মহাপ্রভুর অবশ্য-পাল্য নিয়ম ছিল প্রতিদিন জগন্নাথের উপলভোগ দর্শন করে হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে কুশলপ্রশ্নাদি করে তবে নিজ কুটিরে ফিরে যাওয়া। হরিদাসের নিয়ম ছিল লক্ষ নাম জপ না করে তিনি অন্নগ্রহণ করতেন না। তিনি নাম করতে করতে এবং মহাপ্রভুকে দেখতে দেখতে দেহত্যাগ করলে মহাপ্রভু অন্যের সঙ্গে নিজ হাতে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করেন এবং তাঁর পাদোদক ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করেন। সুতরাং বলা যায়, ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা না ঘটলেও নীলাচলে তাঁর পরিকরবৃন্দ, ওড়িয়া ভক্তবৃন্দ, গৌড়ের ভক্তবৃন্দ এবং বহিরাগত নানা লোকের সঙ্গে লৌকিক, আধ্যাত্মিক বিভিন্ন ব্যবহার রক্ষা মহাপ্রভুর কর্তব্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এছাড়া জগন্নাথের বারো মাসে তের পার্বণে যোগদান তো আছেই।

পঞ্চমতঃ মহাপ্রভুর কীর্তন শ্রবণ, কীর্তনগান এবং সর্বোপরি তাঁর দিব্যোন্মাদের অবস্থাবৈচিত্র্য। অর্ধবাহ্য দশায় কখনো শ্রবণ কীর্তন করতেন, কখনো বিলাপ করতেন, কখনো স্বরূপ দামোদরের গলা ধরে অন্তরের বিরহশোক নিবেদন করতেন। রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর এই অন্তরঙ্গ-লীলায় অনুক্ষণ সাহচর্য দিয়ে তাঁকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতেন। চরিতামৃতকার বলছেন :

যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ ভয়ে॥
উৎকট বিয়োগদুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহবেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হঞা অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদনা॥

জগন্নাথ দর্শনে, কৃষ্ণলীলা শ্রবণে কখনও বা বহিরঙ্গ কারণ ব্যতিরেকেই মহাপ্রভুর বাহ্যদশা একেবারে লোপ পেয়ে যেত এবং তিনি উন্মাদের ন্যায় আচরণ করতেন। বিভিন্ন ভাবের আবেশে তাঁর দেহেন্দ্রিয় একেবারে বিকল ও জর্জরিত হয়ে পড়ত। কখনও বিরহের কাতরতা ব্যক্ত করতে না করতেই মিলনের উৎসাহে অধীর হতেন। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, স্মৃতি, গর্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ সঞ্চারী ভাবের আঘাত-সংঘাতে দলিত-পিষ্ট হয়ে পড়তেন। স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, রোমাঞ্চ, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবগুলি একসঙ্গে তাঁর দেহে প্রকাশিত হত। কবিরাজ গোস্বামী এই বিরহ-বিকার অবস্থায় বর্ণনায় বলেছেন :

নিরন্তর হঞা প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥

এইসব দেখে স্বরূপ-দামোদর মহাভাবের প্রকাশ বলে তাঁর যাবতীয় বিকারকে ব্রজের রাধাভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত প্রকাশ অবলম্বন করেই রাধাকৃষ্ণ-লীলা স্বরূপ-রঘুনাথ-রূপগোস্বামীর কাছে নূতন আলোকে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

এইসব ভাবজীবনের আশ্চর্য লীলা শ্লোকে গ্রথিত করে রেখেছিলেন স্বরূপ-দামোদর। রূপগোস্বামীর চৈতন্যাষ্টক এবং প্রবোধানন্দের চৈতন্য-চন্দ্রামৃতেও তা বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু পরে চরিত্রলীলার উত্তরাধিকার এসেছিল রঘুনাথদাসের রচনায় ও কণ্ঠে। শ্রীল রঘুনাথ দাস এবং তাঁকে অবলম্বন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধাভাবান্বিত মহাপ্রভুর এই চিত্র পরিবেশন করতে কথঞ্চিত প্রয়াস করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং তাঁর শিক্ষাগুরু রঘুনাথদাসের মতে নিগূঢ় এ-লীলার সম্যক্ বর্ণন অসম্ভব। এরকম তীব্র উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার প্রকাশ এর পূর্বে মানুষে কেউ কখনো দেখেনি। এই অবস্থায় মহাপ্রভুকে পতনাদি থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে সেবক গোবিন্দ এবং স্বরূপ দামোদর সতত চেষ্টিত থাকতেন। একদিন নিকটবর্তী চটক পাহাড় দর্শনে গোবর্ধন ভ্রম হওয়ায় মহাপ্রভু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। আর একদিন দেবদাসীদের গীত জয়দেবের পদ শুনে ছুটে গিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করতে যাবেন এমন সময় সেবক গোবিন্দ পিছন থেকে চীৎকার করতে করতে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। শেষের কিছুদিন বিরহশোকে ব্যাকুল হয়ে মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরের গম্ভীরায় আশ্রয় নিতেন। সেখানে বিরহ বৃদ্ধি পেলে দেওয়ালে মুখ ঘসতেন, পল্লবতুল্য ওষ্ঠদ্বয়ে রক্তবিন্দু দেখা যেত। একদিন উন্মাদ অবস্থা বর্ধিত হলে প্রাচীর লঙ্ঘন করে মহাপ্রভু পড়ে গেলেন সিংহদ্বারের নিকটবর্তী গাভীদের কাছে। গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি জগন্নাথকে দেখতেন এবং অশ্রুতে তাঁর বক্ষ প্লাবিত হত, এ দৃশ্য অনেকেরই পরিচিত হয়ে পড়েছিল। শেষ কয়েক বৎসর মুহুর্মুহু তাঁর বিরহবিকার ঘটতে থাকে।

এইভাবে মহাপ্রভুর অন্তরে যে তীব্র আলোড়ন চলছিল তার অভিঘাত তাঁর মরদেহ সহ্য করতে অসমর্থ হল এবং তিনি লীলা সংবরণ করলেন আটচল্লিশ বৎসরে, ১৪৫৫ শকের আষাঢ়ে, রথযাত্রার পরবর্তী ৩/৪ দিনের মধ্যে।[১]

গয়া থেকে প্রত্যাগমনের পর থেকে প্রায় পঁচিশ বৎসরের অধিকাংশ সময় কৃষ্ণ-বিরহকাতরতায় স্বানুভবের অধীন থাকলেও নবলোকধর্ম-স্থাপনের কর্মতৎপরতাতেও মহাপ্রভুর কম সময় ব্যয়িত হয়নি। সাধারণ মহাপুরুষ বা ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে তাঁর এবিষয়ে

১. কীভাবে মহাপ্রভুর তিরোভাব ঘটে এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য চরিতকারেরা নীরব। এ নীরবতার কারণ অনুমান করতে কষ্ট হয় না, কিন্তু বাঙলা চরিতকার দু'জন এ সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লোচনদাস জানিয়েছেন যে, গুণ্ডিচামন্দিরে মধ্যাহ্নের দিকে জগন্নাথের মূর্তির সঙ্গে মহাপ্রভু বিলীন হয়ে যান। এ বিবরণ লোচনদাস সম্ভবতঃ ওড়িষ্যার জনশ্রুতি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এটি অলৌকিক। অপরপক্ষে জয়ানন্দ-প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে রথযাত্রার সময় নৃত্য করতে গিয়ে মহাপ্রভুর পায়ে ইঁটের আঘাত লাগে, জ্বর হয় এবং কয়েকদিন পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদ দৃশ্যতঃ বিশ্বাসযোগ্য হলেও জয়ানন্দের গ্রন্থে বহু উদ্ভট সংবাদের পরিচয় পাওয়া যায় বলে এটিও সেইরকম সন্দেহ নিয়ে আসে। আধুনিক কোনো ইতিবৃত্তকারের অনুমান—জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতেরা তাঁকে মেরে ফেলে—এও নিতান্ত অবিশ্বাস্য। তার চেয়ে—ভাববিহ্বল অবস্থায় মহাপ্রভু সমুদ্রে ঝাঁপ দেন ও আর ফেরেন না, এমন অনুমানই অধিকতর সমীচীন। অন্যথায় প্রশ্ন হতে পারে যে তাঁর দেহ গেল কোথায়?

পার্থক্য এই যে, তাঁর জীবনাচরণ থেকে অনায়াসেই কার্য সিদ্ধ হয়েছিল। স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে প্রচারাদি কোনো কর্মেই তাঁকে হাত দিতে হয়নি। নবদ্বীপে ও নীলাচলে ভক্তপরিকরদের সমাবেশ, দাক্ষিণাত্যে এই নবধর্মের প্রচার, এবং পূর্বেকার বৈষয়িকতাসহচর দম্ভময় মিথ্যাধর্মের অপসারণ এসব তাঁর প্রভাবে এবং প্রকাশে স্বতই ঘটেছিল। তিনি দৃশ্যতঃ নিজে কিছু করেননি, পরিকরদের দ্বারা সাধন করেছেন। জীবনীকারেরা এই কারণে যুক্তিযুক্তভাবেই 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ' কৃষ্ণরূপে তাঁকে দেখেছেন। সুতরাং তাঁর যা-কিছু কর্মতৎপরতা তা এই পরিকরদের নিয়েই। কাজ করেছেন তাঁরা, স্বতঃ-উৎসারিত নির্দেশ এসেছে তাঁর জীবনাচরণ থেকে। ক্বচিৎ পরিকরবৃন্দ তাঁর পরামর্শ পেয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর লীলার অন্তরঙ্গেরাই সব সমাধান করে দিয়েছেন। মহাপ্রভুর দূরদৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হল রূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনে স্থাপন, হরিদাস ঠাকুরকে নিজ সমীপে স্থানদান এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে বাঙলায় স্থায়ীভাবে যাপনের নির্দেশ দান। এইভাবে এই নবধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এর বিস্তার ঘটে বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের কাব্যরসময় ও তত্ত্বময় অজস্র গ্রন্থরচনায় ও শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থ নির্মাণে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দের গৌড়ে উত্তরবঙ্গে কামরূপে এবং ওড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে, বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নরহরি চক্রবর্তী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের জীবনী-গ্রন্থ রচনায় এবং নামকীর্তন ও লীলাকীর্তনের বিস্তারে। এর ব্যাপকতার চরম মুহূর্ত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-পূর্ব ভাগ। এই সময় ভারতের পূর্বাঞ্চলে এমন গ্রাম ছিল না যা কীর্তনে ও কৃষ্ণকথা বা চৈতন্যকথায় মুখরিত হয়নি, এমন সাহিত্যসৃষ্টি ছিল না যার মধ্যে ভক্তিভাব উৎসারিত হয়নি, এমন সমাজ ছিল না যা বিষয়-ঐশ্বর্য-কৌলীন্য থেকে মানুষকে ছোট করে ভেবেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে তন্ত্রবাহিত শাক্তধর্মের পুনরুত্থান ঘটলেও ভাব-প্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে তা নবীকৃত হয়েই প্রকাশ পায়। আর উনিশ শতকের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিচিত্র চিন্তা, বহু বিতর্ক, বহু মতামত এবং রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবোধের মধ্যেও যে-একটি সাধারণ মানবিকতা আমাদের অভ্যন্তরে কাজ করে যাচ্ছে সে এ ভাবুকতারই প্রাধান্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় এবং বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মপ্রবণতার মধ্যে ভাবের প্রেরণাই প্রাধান্য লাভ করেছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে কোটি কোটি মানুষের যে স্বরূপ-পরিবর্তন একদা প্রকট হয়েছিল এবং আজকের প্রগতিশীলতার মধ্যে যা সংস্কার-রূপে কাজ করেছে তার মুল হল সেই বৈপ্লবিক ভাবমূর্তি, যিনি দেবতা হয়েও মানুষ এবং মানুষ হয়েও দেবতা।

‘বৈষ্ণব’
বা
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা

কোনো দার্শনিক তত্ত্ব কোনো ধর্মানুভবের জন্ম দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। ধর্ম লোকচিত্তের বিভিন্ন অনুভবেরই অন্যতম প্রকাশবিশেষ, যা শক্তিমান্ কোনো ভাবুকের হৃদয়ে সম্পূর্ণ এবং নবীন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। পরে বুদ্ধি এবং চিন্তায় সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সেই আবির্ভাবকে যুক্তিগ্রাহ্য আকৃতি কেউ কেউ দিয়ে থাকেন। এ-ধর্ম যুগচিত্তসংঘাতের ফলে প্রকাশিত হয় এমন দেখা যায়। এরই অপর পৃষ্ঠায় রয়েছে রাষ্ট্রবিপ্লব, যার মুখ্য আশ্রয় বহিরঙ্গ জীবন, যারও উদ্ভব বিশেষধরনের ভাবের আন্দোলন থেকেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের মূলে সহজ অনুভব কিভাবে কাজ করেছে তার দৃষ্টান্ত গয়া-প্রত্যাবৃত্ত মহাপ্রভুর ভাবাবস্থা। কোনো কার্য-কারণসূত্রে ব্যাপারটিকে স্পষ্টভাবে ধরা যায় না বলে একে ধর্মের প্রকাশ বা আবির্ভাব বলা যেতে পারে। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং তৎশিষ্য ঈশ্বরপুরীপাদের সংসর্গে তাঁর ভাবোদ্‌গম হয়েছিল বলে এই ধর্মকে বিশেষভাবে বাঙ্‌লারই ধর্ম বলা যায়, আর মহাপ্রভুকে এই ভাবধর্ম সম্প্রদায় প্রভাবিত করেছিল এমনও স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। বাঙ্‌লার রাধাকৃষ্ণ গীতিকাব্য এবং স্মরণকীর্তন-পরায়ণ ও পুলকাশ্রুমূর্ছাময় সূফীসাধকদের ধর্মসাধনাকেও এ ধর্মের ভূমিকারূপে দেখা যেতে পারে। মহাপ্রভুর জীবনী থেকে আমরা দেখেছি তাঁর মধ্যে সহসা উদিত এই ধর্মসম্বন্ধে তাঁর কোন সজ্ঞান প্রস্তুতি ছিল না। তিনি ব্যাকরণ, অলংকার এবং পৌরোহিত্য-ক্রিয়াবিধির ছাত্র ছিলেন। কথকতা প্রভৃতি শোনার মধ্য দিয়ে পুরাণ এবং বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সঙ্গে আর পাঁচজনের মতই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাগানুগা ভক্তির কোনো পরিচয় তাঁর মধ্যে বা তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ অদ্বৈত-শ্রীবাসাদির মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। তাঁর চিত্তে নবভক্তিধর্মের আবির্ভাবের পরও দেখা যায় ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অর্জিত জ্ঞান সামান্যই ছিল। রাগাত্মিক প্রীতি, গোপীভাব, রাধাভাব প্রভৃতি বিষয়ে রায় রামানন্দ তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করেন। আর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে নানান্ তীর্থে সাধুমহাজনদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সম্ভবতঃ শ্রী-সনকাদি তত্ত্ব-বাদীদের অভিমতও তিনি কিছু কিছু জেনে নেন। তিনি নিজে তত্ত্বের চেয়ে আচরণের উপরেই জোর দেওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং এইজন্য ঠাকুর হরিদাস তাঁর গৌরবের পাত্র ছিলেন এবং রঘুনাথ দাস বিশেষ স্নেহভাজন হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং রাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্ব বিষয়ে কিছু লেখেননি এবং কেউ তাঁর কাছে এ বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হলে, হয় স্বরূপ-

কৃষ্ণ-উপাসনা ও গৌর-উপাসনা—বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ-কল্পিত বিতর্কের প্রত্যুত্তর

দামোদর নয়, রায় রামানন্দের কাছে তাঁকে যেতে বলতেন। তবে তিনি রূপ-সনাতন-গোস্বামীকে তাঁর সাধ্যমত এবং অতি সাধারণভাবে কৃষ্ণলীলাতত্ত্ব, নাম-মাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণবাচরণ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রেরণা দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে।[১] এ বিষয়ে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বর্ণন অবিশ্বাস্য মনে হয় না এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভে শ্রীরূপের স্পষ্টোক্তি—"হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতঽহং বরাকরূপোঽপি"—অর্থহীন নয়। কিন্তু তাহলেও একথা ঠিক যে, যে-নবধর্ম তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বতঃ-আবির্ভূত এবং নিয়ত নূতনতর হতে হতে প্রগাঢ়তা লাভ করেছিল, তার যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণে তিনি নিজে অক্ষম ছিলেন। নিরন্তর আস্বাদতন্ময় অবস্থায় যিনি যাপন করতেন, যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায় স্ববশে ছিল না, তাঁর পক্ষে আত্মবিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক বিচার প্রভৃতি অসম্ভবই ছিল। তাঁর লীলাসহচরেরা তাঁর বিচিত্র ভাববিলাস এবং বিবিধ বিকার দৃষ্টে রাগভক্তির শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে এবং শ্রীচৈতন্যের অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌরত্ব সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন। আশ্চর্য গৌরলীলাদৃষ্টে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণলীলাকেও নূতন তাৎপর্যে গ্রথিত করার প্রয়োজন উপলব্ধ হল। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করলেন রূপ-সনাতন, গোপাল ভট্ট এবং জীব গোস্বামী। প্রয়াগ ও বারাণসীতে মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের উপর নির্দেশ দিয়েছিলেন কৃষ্ণলীলাতত্ত্বকেই নূতন এবং যথার্থতর আলোকে উপস্থাপিত করে সাধারণ্যে প্রচার করতে। শ্রীরূপের রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক কাব্যগীতের সঙ্গে এবং শ্রীসনাতনের ভাগবতানুরাগ সম্বন্ধে মহাপ্রভু পূর্বেই অবহিত হয়েছিলেন। সুতরাং যোগ্যতম পাত্র নির্বাচনে তাঁর কোনো সংশয়ই ছিল না। শ্রীরূপাদি গৌরাঙ্গকে পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ জেনেও কেন গৌরলীলাবর্ণনে প্রবৃত্ত হননি এবং কেবল গৌর-লীলার ভিত্তিতে রাগভক্তির দার্শনিক রহস্য বিশ্লেষণ না করে কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যান কেন করতে গেলেন তাই নিয়ে কোনো পর্যালোচক নানাবিধ জল্পনায় উপনীত হয়েছেন। তাঁর সমগ্র অভিযোগটি এই :

Except the usual obeisance and homage to Chaitanya and general passages testifying to his identity with the supreme deity, there is nowhere in the extensive works of these early authoritative Gosvamins (Rupa, Sanatana & Jiva) any direct reference to his personal views and teaching. These theologians and philosophers are chiefly concerned with godhead of Krishna, Krishna in their theory as we shall presently see, is not an Avatara, but the supreme deity himself. They are almost entirely silent about Chaitanya-Lila and its place in their devotional scheme, and it

১. স্বর্গত ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর Vaisnava Faith & Movement গ্রন্থে চরিতামৃতে প্রদত্ত (মধ্যলীলা ১৯-২৪) রূপসনাতন-শিক্ষণের বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ, রূপ-সনাতনাদি গোস্বামীদের রচিত ভক্তিগ্রন্থের সারাংশই ওতে দেখা যায়। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য—ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই অবকাশে পাঠকদের অভীষ্ট পূরণের জন্য যদ্যপি বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তবু বারাণসীতে দু'মাস অবস্থানকালে মহাপ্রভু সনাতনের কাছে রাগানুগা ভক্তির মুখ্য ব্যাপারটি নিশ্চয়ই উপস্থাপিত করেছিলেন। নিজ উপলব্ধি ছাড়া মহাপ্রভু ইতিমধ্যে ঐবিষয়ে কিছু জ্ঞানও সঞ্চয় করেছিলেন।

is somewhat strange that in preserving a system in Chatianya's name they rely exclusively upon older sources and do not refer at all to his direct realisation of spiritual truth.

(ডঃ সুশীলকুমার দে সম্পাদিত "পদ্যাবলী"র ভূমিকা)

ঘটনার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়, রূপসনাতন এক্ষেত্রে প্রভুনির্দেশই আক্ষরিকভাবে পালন করেছিলেন। কৃষ্ণ-লীলাকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপিত করার পর তাঁদের এমন অবকাশ মেলেনি যাতে গৌরলীলায় হস্তক্ষেপ করেন। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে নবদ্বীপের প্রত্যক্ষদর্শীদের বহু পদরচনা, সংস্কৃত কড়চা এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে গ্রথিত চৈতন্যভাগবত রচিত হয়ে গেছে। শ্রীরূপাদি যে নিত্যানন্দ সম্পর্কে নীরব ছিলেন তারও কারণ এই এবং কিছুটা অনভিজ্ঞতাও হতে পারে, কিন্তু নিত্যানন্দ-বিমুখতা কোনোক্রমেই নয়। আমরা আরও অনুমান করি যে মহাপ্রভু রূপ-সনাতনকে তাঁর নিজলীলাবর্ণনে প্রকারান্তরে নিষেধই করেছিলেন। কৃষ্ণনাম ত্যাগ করে তাঁর নাম গ্রহণ করায় তিনি কিরকম ক্ষুব্ধ হতেন তার পরিচয় চরিতামৃতের নানাস্থানে রয়েছে। শ্রীরূপকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রারম্ভে গ্রথিত "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" ইত্যাদি বন্দনা শুনে মহাপ্রভু মন্তব্য করলেন—"এই অতি-স্তুতি শুনিল"। ললিতমাধব নাটকের "নিজপ্রণয়িতা" প্রভৃতি নান্দীতে পুনরায় আত্মস্তুতি শুনে বিরক্ত হয়েই মন্তব্য করলেন :

কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্যসুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতিক্ষারবিন্দু॥

রামানন্দ রায় কৌশলে রূপ গোস্বামীকে সমর্থন জানালে পর :

প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস॥ (চৈ-চ, অন্ত্যলীলা)

মহাপ্রভু নিজ বৈরাগ্য এবং বৈষ্ণব-শিক্ষণের জন্যই যে কৃষ্ণলীলার উপর জোর দিয়েছিলেন তা নয়। নবধর্মের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্য বৃন্দাবনলীলার দার্শনিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং নোতুন রসসিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। নীলাচলে রূপ-সনাতনের আগমনপ্রসঙ্গ বর্ণনের উপলক্ষ্যে চরিতামৃতকার মহাপ্রভুর এই অভিলাষ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন :

সবে কৃপা করি ইহারে (=শ্রীরূপকে) দেহ এই বর।
ব্রজলীলা-প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর॥

* * *

এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্তনে॥

পুনশ্চ, দেহত্যাগ কৃতসংকল্প সনাতন গোস্বামীকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে মহাপ্রভুর উক্তি :

তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বের নির্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা-প্রবর্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥

এই নব ভক্তিধর্ম সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের যা কিছু উপলব্ধি ও বাণী সে তো ঐ রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়েই। কৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা, বৃন্দাবনলীলার মুখ্যতা, গোপীপ্রেম ও রাধাভাব এবং প্রেমার পরমপুরুষার্থত্ব—এই সবই তো মহাপ্রভুর উপলব্ধি এবং বক্তব্য। স্বরূপ-দামোদর (শ্রীনাথ?) একটি শ্লোকে মহাপ্রভুর অভিমতের সারসংক্ষেপ করে বলেছেন :

আরাধ্যো ভগবনে্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম্ বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

এছাড়া, বহিরঙ্গ-শিক্ষণ হিসাবে মহাপ্রভু নামগ্রহণের উপরেই জোর দিয়েছেন। তাঁর রচিত 'শিক্ষাষ্টক' নামে প্রচলিত আটটি শ্লোকে তিনি যেমন নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন, তেমনি বৈষ্ণব-শিক্ষণের দিকটি যথাসাধ্য সম্পূরণ করেছেন। তাঁরই ইঙ্গিতে সনাতন তাঁর হরিভক্তিবিলাসে এবং রূপ তাঁর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে নামমাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর উপলব্ধিকে উপেক্ষা করে তাঁরা কৃষ্ণলীলাবর্ণনে আগ্রহী হয়েছিলেন এরকম অভিমত শ্রোতব্য নয়।

ঐ ভূমিকাতেই ডঃ দে-র দ্বিতীয় অভিযোগ হল এই গোস্বামীত্রয় মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষানুভূতির দিক্‌গুলি উপেক্ষা করে পুরাণবর্ণিত বিষয় এবং পরস্পর-বিরোধী আখ্যান-উপাখ্যানের সমাধান করতে গিয়ে অনর্থক তাঁদের প্রতিপাদ্যকে জটিল ও দুরবগাহ করে তুলেছেন। "...while the intellectual seriousness or the ethical nobility of heart is hardly propounded with force of direct realisation, in as much as they are completely merged in a floating mass of uncertain myths, legends and traditional beliefs. ..." বলা বাহুল্য, এধরনের আলোচনা ভারতীয়দের লেখনী থেকে নির্গত না হয়ে বৈদেশিক লেখনী থেকে নির্গত হলেই যথাযথ হত। গোস্বামীরা পৌরাণিক ব্যাপার নিয়ে চুলচেরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্যই ছিল, অন্ততঃ সেকালে। হৃদয়ে উপলব্ধ ঐ নবধর্মটিকে প্রচলিত বহুধা বিচিত্র ধর্মীয়তার উপরে তাঁদের স্থাপন করতে হয়েছিল। শুধু শ্রী-রুদ্রাদি সম্প্রদায়ে প্রচলিত তত্ত্বেরই খণ্ডন করতে হয়নি। বিষ্ণু, নারায়ণ, অবতার, লক্ষ্মী, রুক্মিণী -সত্যভামা প্রভৃতি নিয়ে যে-সব কাহিনী এবং তাত্ত্বিকতা প্রচলিত ছিল তার গ্রহণ-বর্জন করতে হয়েছিল এবং সর্বোপরি গোপীভাব এবং রাধাবাদের উপর ব্রজলীলার ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে নতুন যুক্তি বিন্যাস করে সমস্ত পুরাণকে ঢেলে সাজতে হয়েছিল। গোস্বামীরা বেদোক্তির প্রামাণিকতার উপর নির্ভর না করে পুরাণের উপর জোর দিতেই পুরাণ-প্রসঙ্গগুলির পুনর্বিচার অত্যাবশ্যক হয়েছিল। 'কৃষ্ণস্তুভগবান্ স্বয়ম্' এই উপলব্ধিতে আস্থাবান্ হওয়ায় অবতারবাদকে তাঁর ঢেলে সাজলেন। গুণাবতার, লীলাবতার, প্রকাশ-বিলাসাদির পার্থক্য, দ্বারকা-বৃন্দাবনের সামঞ্জস্য—এসব বর্জন করে পূর্ণাঙ্গ দার্শনিকতা কিভাবেই বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? কেবল প্রত্যাক্ষানুভূতির বিষয় বিশ্লেষণ করে তো কবিতা-গান রচনা চলে।

সে প্রয়াস তো ঐ সময়ে নরহরি-বাসুদেবাদির রচনায় এবং মুরারিগুপ্ত ও কর্ণপূর-বৃন্দাবনের জীবনীতে বা কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সিদ্ধ হয়েছে। শ্রীরূপ যদি দ্বিতীয় চৈতন্যচন্দ্রোদয় লিখতেন—সমালোচক কথিত "direct realisation"-এর বিষয়টি আর কতদূর বর্ধিত হতে পারত? আর নিগূঢ় শ্রীচৈতন্য-জীবনী রচনার যা সারাংশ তা-ই তো তাঁদের নবভক্তি-উদ্দীপিত গ্রন্থাদিতে বিস্তৃত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি এবং পদ্যাবলী প্রভৃতির গ্রন্থন কি মহাপ্রভুর হৃদয়ানুভবকেই বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করছে না? বস্তুতঃ রূপ-সনাতন এবং জীব ঐ Realisation-এর যৌক্তিক এবং কাব্যিক রূপ দিতে গিয়ে তাঁদের জীবৎকালে যা করে গেছেন তার তুলনা বিরল। এক হাতে অদ্বৈতবাদীর সঙ্গে, অন্য হাতে বৈশিষ্টাদ্বৈত বা প্রচলিত দ্বৈতবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁরা যে বিজয়ী হয়েছেন এবং প্রভুদত্ত প্রেরণার মর্যাদা নিঃশেষে রক্ষা করেছেন এর চেয়ে গৌরবের বিষয় তাঁদের এবং আমাদের আর কী হতে পারে?

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বলতে যা বোঝায় তা মুখ্যতঃ ঐ স্বরূপ-সনাতন-রূপ-জীব গোস্বামীর সৃষ্টি। মহাপ্রভুর মতানুযায়ী ভাগবতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এই দর্শনের সারকথা-সমূহ নিহিত এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসব্যাখ্যানে এই দর্শন পল্লবিত। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর ভাগবত-সন্দর্ভে রূপ-সনাতন-গোপালভট্টের আলোচনার সারনিষ্কর্ষ যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি এঁদের সকলেরই গ্রন্থের সার সন্নিবেশিত হয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাঙ্‌লা গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে। চরিতামৃত আবার উক্ত গ্রন্থাদি থেকে অধিকগুণও বটে। শ্রীচৈতন্যের নিগূঢ় রাধাভাবলীলা, স্বরূপ দামোদর ও তৎশিষ্য রঘুনাথদাস গোস্বামী বর্ষ বর্ষ ধরে যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার অধিকার লাভে ধন্য হয়েছিলেন কবিরাজ গোস্বামী। গোস্বামীগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গলীলা (বহিরঙ্গ লীলা তো বটেই) একাধারে সমীকৃত হয়ে এ গ্রন্থে বিরাজ করছে। কবিরাজ গোস্বামীকে নমস্কার। এই একটি গ্রন্থেই তিনি তাত্ত্বিক, রসলিপ্সু এবং লীলাশ্রবণোৎসুক পাঠককে সম্যক্ পরিতৃপ্ত করেছেন, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবস্বরূপা রাধাকে একাধারে ভক্তচক্ষুর গোচর করেছেন। কৃষ্ণলীলা এবং গৌরলীলার নিঃশেষ একাত্মানুভব নবদ্বীপের লীলা-পরিকরদের অন্তরে প্রতিভাত হয়নি, তাঁরা গৌরকৃষ্ণের অভিন্নতা যদিচ অনুভব করেছিলেন, তা আরও বিস্তৃত করে পূর্ণাঙ্গ প্রেমলীলাবাদের যৌক্তিক অথচ হার্দিক বিশ্লেষণ তাঁরা উপস্থাপিত করতে পারেননি। সন্ন্যাসাশ্রিত শ্রীগৌরের নীলাচল-লীলার অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছিল একমাত্র তাঁরাই পূর্বাপর মিলিয়ে সমগ্রভাবে বিষয়টিকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। এদিক থেকে ক্রমানুসারে রামানন্দ-স্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথদাস-জীব-কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ সাধকদের অনুভবই অগ্রগণ্য। নবদ্বীপ-লীলা-সহচরেরা, মুখ্যভাবে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ এবং সহায়কভাবে শ্রীবাস, মুরারি, গদাধর, নরহরি, গোবিন্দ-বাসুদেব, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি এক অতি মহৎ কর্তব্য সাধন করেছিলেন, তা হল শ্রীগৌরের কৃষ্ণত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করে ঈশ্বরীয় লীলার প্রকাশের আনুকূল্য বিধান। এঁরা লক্ষ্য করেছিলেন ধর্মসংস্থাপক কৃষ্ণ নামকীর্তনমুখে কলিযুগের উপযোগী প্রেমভক্তি প্রচার করে আচণ্ডাল মানুষকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। সন্ন্যাসপূর্ব বৎসরের সময়কার বিবিধ আবেশময় ও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল নবদ্বীপলীলায় অভিভূত এবং সন্ন্যাসে নিতান্ত

ব্যাকুল বিমূঢ় পরিকরবৃন্দের কাছে এছাড়া আর কিছু প্রতিভাত হয়নি। কেন তীব্র বৈরাগ, কেন অশ্রু-কম্প মূর্ছাদি, কেন কৃষ্ণের গৌরবর্ণ, এ সবের সমাধানে তাঁরা অগ্রবর্তী হননি। নীলাচল-বৃন্দাবনের যে-সব বিদগ্ধ প্রেমিক খুঁটিয়ে গৌর-লীলা অধ্যয়ন করলেন তাঁরা নবদ্বীপ পরিকরদের দর্শনের উপর ভিত্তি করেই পূর্ণাঙ্গ রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণদর্শন গড়ে তুললেন। এই দুই রীতির দর্শনে মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই। দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর নির্ভরশীল এবং পরিপূরকভাবে স্বভাবতই গড়ে উঠল। ফলে কেউ ভগবান্ বোধে গৌরবিগ্রহের আরাধনা করতে লাগলেন, আবার কেউ নবদ্বীপলীলার চেয়ে ব্রজলীলাতেই বেশি আসক্ত হলেন।[১] কবি কর্ণপূর যদিচ পিতৃ-ঐতিহ্য অনুসরণ করে গৌরভজনেই নিরত ছিলেন এমন মনে করা যায়, তবু তিনি এ বিষয়ে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক অভিমত পোষণ করতেন না এবং এর সমাধানের ইঙ্গিতও তিনি তাঁর নাটকে দিয়েছেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের দ্বিতীয়াঙ্কে গৌররূপ এবং শ্যামরূপ বিষয়ে অদ্বৈতের সংশয়ে নাট্যকার তদানীন্তন "মহামহিম"দের উপলব্ধিই ব্যক্ত করলেন—গৌর এবং শ্যাম অভিন্ন, লীলায় রূপভেদ এবং ভাবভেদ মাত্র। উপাস্য শ্যাম এবং গৌর দুই-ই হতে পারে, অহেতুকী প্রীতি যদি আকর্ষণের হেতু হয়। চরিতামৃতে দেখা যায়, রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধাস্বরূপাবৃত শ্যামকে লক্ষ্য করে সংশয়ী হয়ে মহাপ্রভুকেই জিজ্ঞাসা করছেন :

> পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
> এবে তোমা দেখোঁ মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
> তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পাঞ্চালিকা।
> তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা॥

রামানন্দ লীলাশুকের মতো মাধুর্য-সিন্ধু গোপকৃষ্ণের উপাসক হলেও শুদ্ধসখ্যে চৈতন্যোপাসকও ছিলেন ভট্টাচার্য নীলাচললীলা-তত্ত্বজ্ঞ হয়েও সম্ভবতঃ গৌরভজনেই আসক্ত ছিলেন। স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর অতি প্রিয় এবং মুখ্যলীলাসঙ্গী হলেও সম্ভবতঃ রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণরূপেই তিনি অনুরক্ত ছিলেন। সনাতন-রূপ-জীব গোস্বামী কৃত বিভিন্ন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এবং স্তবাদিতে গৌরাঙ্গের ভগবত্তা পুনঃপুন কীর্তন করা হয়েছে, তবু তাঁরা ভাগবত প্রতিপাদ্য রাসরসিক কৃষ্ণের লীলাতেই সম্ভবতঃ নিহিতচিত্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রেরিত হওয়ার পূর্বেই রূপ-সনাতন ভাগবতধর্মী ছিলেন। তখন সনাতন লিখনে কিছু প্রকাশ করেননি, কিন্তু রূপ রচনা করেছিলেন অন্ততঃ 'হংসদূত' এবং 'উদ্ধবসন্দেশ'। শ্রীচৈতন্য এঁদের ঐতিহ্য এবং মানসিকতা উপলব্ধি করে কৃষ্ণলীলা-ব্যাখ্যানেই এঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই রাধাভাববিগ্রহ যখনই অবকাশ পেয়েছেন তখনই "গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর" কৃষ্ণের আরাধনারই প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। ত্রিহুতের রঘুপতি উপাধ্যায়ের চৈতন্য-সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ (চৈ-চ, মধ্যলীলা দ্রঃ) অন্য বহু দৃষ্টান্তের একটি—

> প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়।
> শ্যামমেব পরং রূপং কহে উপাধ্যায়॥

---

১. তবু মহাপ্রভুর জীবৎকালে গৌরবিগ্রহের পূজা প্রারব্ধ হয়েছিল একথাও মনে করা যায় না। মুরারি গুপ্তের কড়চার যে অংশে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কর্তৃক এবং আম্বুয়া-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত কর্তৃক গৌরবিগ্রহ স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায় সে অংশ নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত।

শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়।
পুরী মধুপুরী বরা কহে উপাধ্যায়॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং কহে উপাধ্যায়॥
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
আদ্য এর পরো রসঃ কহে উপাধ্যায়॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্গদস্বরে॥

শ্রীচৈতন্যের সর্বাধিক গৌরবের পাত্র ঠাকুর হরিদাস উচ্চকণ্ঠে কোন্ প্রিয়নাম কীর্তন করতেন এবং তাঁর অভিলাষই বা কী ছিল? দেখা যায়, চৈতন্য নাম হয়, হরিনাম, এবং অন্ততঃ অদ্বৈত-চৈতন্য সংসর্গে এসে তাঁর অভিলাষ জন্মেছিল—'নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে'। নিজনাম গ্রহণ করায় শ্রীচৈতন্য কিরকম বিক্ষুব্ধ হতেন তার পরিচয়ও চরিতামৃতে রয়েছে :

একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্তন॥
শুনি ভক্তগণে কহেন সক্রোধ বচনে।
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্তনে॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সভাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সভে নাশাবে ভুবন॥

এ-বিবরণ অবিশ্বাস্য হতে পারে না। প্রবীণ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের দুই শ্লোকে চৈতন্যস্তুতি তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অথচ এই শ্রীচৈতন্যই প্রথম ভাবাবেশ সময়ে নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ প্রবীণ ভক্তদের মন্ত্রোচ্চারণে নিয়মিত পূজা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সে একদিন, আর সন্ন্যাস গ্রহণের পর এ আর একদিন। হিসাবে দেখা যায়, রায় রামানন্দের পর স্বরূপের অভিমতই মহাপ্রভুর একান্ত সমাদরযোগ্য ছিল। এবং তিনি যে তাঁর অশেষ স্নেহভাজন রঘুনাথদাসকে স্বরূপের নিকট সমর্পণ করেছিলেন তা অর্থহীন নয়। নবদ্বীপের পরিকরদের অনেককেই মহাপ্রভু গৌরআরাধনা থেকে নিরস্ত করতে পারেননি। নরহরি বাসুদেবাদি মমতাধিক্যবশতঃ যে পথ ধরেছিলেন তা থেকে নিরস্ত করা সহজও ছিল না। মুরারিকে রামভক্তি থেকে নিরস্ত করার ইচ্ছাও মহাপ্রভুর ছিল না। কিন্তু নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু যথার্থই পেরে ওঠেননি। তিনিই বাংলাদেশে জাতিকুল নির্বিচারে সকলকে গৌরহরি নাম গ্রহণ করিয়েছিলেন। ফলতঃ এই দাঁড়াল যে, একালের বাংলায় লিখিত পদে, চরিতাখ্যানে এবং আরাধনায় কৃষ্ণস্বরূপ গৌরই কিছুকাল পর্যন্ত কীর্তিত হতে থাকলেন এবং নীলাচল-বৃন্দাবনে অধিকতর চমৎকার ও সূক্ষ্মবৈদগ্ধ্যপূর্ণ রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণই প্রচারিত হলেন। ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় অনুভব প্রথমটিকে সমাচ্ছন্ন করে বাংলায় সর্বত্র গৃহীত হয়। কিন্তু তা ষোড়শ শতকের সপ্তম দশকের আগে নয়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর মথুরা-বৃন্দাবনের সঙ্গে বাংলার সংযোগ দৃঢ়তর হতে থাকে। বাঙ্লার বর্ষীয়ান্ মহান্তেরা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণাঙ্গ লীলাবাদের অভিমুখীন হয়ে নীলাচল-বৃন্দাবনের অভিমতের সমাদর

করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে নরহরি সরকার রচিত চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার পদের সঙ্গে নীলাচল-লীলার পদের পার্থক্য স্মরণীয়। অদ্বৈত-নিত্যানন্দের অপ্রকটের পর বাঙ্‌লার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব আংশিকভাবে শ্রীখণ্ডে চালিত হয়। 'গৌর-নাগর' ভাবের প্রবর্তক বিখ্যাত নরহরি সরকার ঠাকুর এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শ্রীচৈতন্যের নিতান্ত প্রিয় রঘুনন্দন উদ্‌যোগী হয়ে শ্রীনিবাস আচার্যকে বৃন্দাবনে অধ্যয়ন করার জন্য পাঠান। জাহ্নবা ঠাকুরাণী, বীরভদ্র, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতিরও বৃন্দাবনের সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ জানবার আগ্রহ কম ছিল না। বৃন্দাবন-প্রত্যাগত ঠাকুর নরোত্তমের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসবে জাহ্নবাদেবীর আনুকূল্য সকলের জানা। ঐ সময়েই কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাসের পদে রূপ-প্রবর্তিত নূতন ও সূক্ষ্ম বৈদগ্ধ্যের সন্নিবেশকে সকলেই অভিনন্দিত করেছেন।

বলা হয়েছে, চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস যখন তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করেন (আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীঃ) তখন স্বরূপদামোদর-প্রমুখ নীলাচলবাসীদের অভিমত এবং সেইসঙ্গে সনাতন-রূপের কিছু কিছু অভিমত নিশ্চয়ই নবদ্বীপে এসে পৌঁছেছিল : সেক্ষেত্রে বৃন্দাবন ঐ নূতন অভিমত সম্পর্কে নীরব রইলেন কেন? এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, রূপ-সনাতনের ভক্তি ও রসশাস্ত্রে অভিনিবেশ নবদ্বীপবাসীদের কর্ণগোচর হলেও তখনও ঠিকমত জানবার কথা নয়। আর স্বরূপ-দামোদরের সিদ্ধান্ত হয়তো মহাপ্রভুর লীলার শেষের দিকে অদ্বৈত-মুরারি-শিবানন্দের কর্ণগোচর হয়েছিল, কিন্তু তা সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ জানলেও এসব গ্রাহ্য করতেন না। স্ব-ভাবেই মত্ত থাকতেন। কবিকর্ণপূর তো তখনও বালক। আর মুরারি সম্ভবতঃ সংস্কৃত জীবনীতে মহাপ্রভুর নীলাচল-অবস্থানের প্রথম দিক পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ঐ জীবনীর তৃতীয় প্রক্রমের অর্ধ ও চতুর্থ প্রক্রম মুরারির কিনা সন্দেহ। মহাপ্রভুর তিরোধানের স্বল্প পরেই স্বরূপ-দামোদর তিরোহিত হন। রঘুনাথদাস গোস্বামী, যিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ও লীলা-কড়চা কণ্ঠস্থ করেছিলেন, তিনিও বৃন্দাবনপ্রয়াণ করেন। ফলতঃ অন্ত্যলীলা লেখার সময় বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর রসরাজ-মহাভাবত্ব কানে শুনলেও সম্যক্ না জানায় গ্রন্থমধ্যে স্থান দিতে পারেননি। দেখা যায়, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাচল যাত্রা পর্যন্ত ঘটনা বৃন্দাবন যেরকম মনপ্রাণ দিয়ে প্রকাশ করেছেন অন্ত্যলীলা সেরকম পারেননি। অন্ত্যলীলার ঘটনার বর্ণনায় তাঁর গ্রন্থে নানান্ অসংগতিও লক্ষ্য করা যায়। এরকম ক্ষেত্রে নীলাচল-বৃন্দাবনের নোতুন মত বৃন্দাবনদাস অধিগত করেও তাঁর গ্রন্থমধ্যে স্থান দেননি এ অভিযোগ যথার্থ নয়। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল যে-রীতির গ্রন্থ তাতে ইতিবৃত্ত রক্ষা বা তত্ত্বরসের কোনো বৈদগ্ধ্য তাঁর কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। নীলাচল-বৃন্দাবনের রাধাভাবিত-কৃষ্ণ মত শ্রীনিবাস-নরোত্তমের বৃন্দাবন গমনের পূর্বে বাঙ্‌লায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিশেষতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃত গ্রন্থের প্রচারের পূর্বে নয়। এরপর থেকে বাঙ্‌লার আচণ্ডালদ্বিজ বৈষ্ণব-সমাজ মোটামুটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এক, শিক্ষা-দীক্ষাহীন বৈষ্ণবজন যাঁরা নিত্যানন্দ-বীরচন্দ্র প্রচারিত সহজ প্রেমভক্তিকে ধরে রইলেন, আর এক, যাঁরা শিক্ষার আভিজাত্যসম্পন্ন, নব গোস্বামী-শাসিত বাদানুবাদনিষ্ঠ পণ্ডিত-ভক্ত, শাস্ত্রাধ্যায়ী ও কবিসমাজ। উভয়পক্ষের যৎকিঞ্চিৎ যোগাযোগ অবশ্য অনুমেয়।

উপরিলিখিত বিষয় থেকে সহজেই উপলব্ধ হবে যে, নবদ্বীপ নীলাচল বৃন্দাবনে এই

নবলোকধর্মের উদ্‌গাতা সম্পর্কে স্বল্পভিন্নরীতির ধারণা যোড়শ শতকের মাঝামাঝি প্রচলিত থাকলেও তা এমন প্রকট ও সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেনি যাতে মহান্ত ভক্তদের মধ্যে বিদ্বেষ মনোমালিন্য ঘটে। অথচ ইতিবৃত্তাশ্রয়ী আধুনিক কোনো কোনো বিচারক জীবনী ও তত্ত্বগ্রন্থের উল্লেখাদি বিচার করে নবদ্বীপ-বৃন্দাবনের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষের বীজ দেখতে পেয়েছেন। আমরা পূর্বেই 'পদ্যাবলী'র ভূমিকা থেকে ডঃ সুশীলকুমার দে-র অভিমত উদ্ধার করেছি। বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত করে তিনি দেখেছেন Vaisnava Faith and Movement গ্রন্থে। এর পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলছেন :

Unlike the Vrindavana Gosvámins, they take Chaitanya as the centre of their thought and emotion, and regard him as the highest reality and object of adoration of their faith. This has been characterised as the Gaurapáramya-Váda, which the Vrindávana Gosvámins never discuss or set forth in their theological treatises. In the eyes of the contemporary composers of padas of Chaitanya for instance, Chaitanya is Kirṣṇa himself who in his recollection for Vṛindávana pines for Rádhá. They also believe in the Radha Bhava of Chaitanya as both Kirṣṇa and Rádhá in one personality. They do not, however, consoder it necessary to discuss the question, but take it as already established by Anubhava or personal experience. Narahari and his disciple Lochana, however, develop a doctrine of Guara-nāgara-bhāva in which the devotee (in the Rāgānugā way) regards Chaitanya as the Nāgara and himself as a Nāgara. But this doctrine recevies little credit in the orthodox circles....

এই অভিমতের প্রতিধ্বনি করে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর শ্রীচৈতন্য-চরিতে উপাদান গ্রন্থে একেবার স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন—"গৌড়মণ্ডলে একপ্রকার মতবাদ এবং বৃন্দাবনমণ্ডলে অন্যপ্রকার মতবাদ স্থাপিত হইয়াছিল।" এবং "বৃন্দাবন ও গৌড়দেশে উত্থিত দুই মতবাদের শ্রীচৈতন্যের স্থান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট গৌরাঙ্গ হইতেছেন উপায়মাত্র (means to an end) আর গৌড়ে উত্থিত মতবাদের তিনি স্বয়ং উপেয় (end in itself)"[১] এই দ্বিতীয় বিবৃতিটিই অভিযোগ হিসাবে গুরুতর এবং শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে তাঁর প্রত্যক্ষেই এরকম দ্বান্দ্বিক মত প্রচলিত হয়েছিল এই ইঙ্গিতে প্রকারান্তরে তাঁর প্রতিও কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু আগে ডঃ দে-র প্রথম বক্তব্য পরীক্ষা করে দেখা যাক। তিনি বলেছেন, নবদ্বীপের পরিকরবৃন্দের মধ্যে কোনো সুসংগ্রথিত মতবাদ গড়ে ওঠেনি। ঠিক কথা; তাঁরা নিজ অন্তর দিয়ে শ্রীগৌর বিষয়ে যে-যে ধারণায় উপস্থিত হয়েছিলেন তা-ই ব্যক্ত করেছেন। নরহরি ও তৎশিষ্য লোচন যে-পথে গেছেন, শ্রীবাস, মুরারি, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ সে পথে যাননি। নরহরি সরকার বিরচিত পদে যেমন গৌর-নাগর ভাব দেখা যায়, তেমনি গোপীভাব বা

১. "In these Padas, as in the lives of Chaitanya which derive their inspiration from the Navadvipa circle, and to which they have a natural affinity, no abstruse theology obscures the simple and passionate faith; to them Caitanys is not an image of their supreme deity, but the deity himself incarnated, not a means, but an end in itself."

S. K. De–Vaisnava Faith & Movement.

রাধাভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায়। আবার কবিকর্ণপূর তাঁর চৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যে চৈতন্যজীবন যেমনভাবে বর্ণনা করেছেন, নাটকে ঠিক তেমনভাবে করেননি। অথচ একটি বিষয়ে এঁরা সকলেই একমত যে, শ্রীচৈতন্য কলিযুগে আবির্ভূত কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নন। নরহরি বাসুদেব যখন গৌরাঙ্গকে ভাগবতের কৃষ্ণত্ব উপলব্ধি করেই তাঁরা তা করেছেন, আবার যখন সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের কৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা বর্ণনা করেছেন তখনও কৃষ্ণবোধেই করেছেন, রাধাভাব-অবলম্বনকারী কৃষ্ণবোধে এই যা তফাৎ। কিন্তু তাহলে রূপ-স্বরূপ-রঘুনাথদাসের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য কোথায়? যদি বলা যায়, নবদ্বীপ-পরিকরদের সহজ উপলব্ধি ছিল ('simple and passionate') স্বরূপ-রূপের তা ছিল না, তাহলে সে তো অত্যন্ত বিপজ্জনক অথবা খামখেয়ালী মন্তব্যে দাঁড়ায়। এর প্রমাণই বা কী, যখন রূপ-সনাতন-জীব তাঁদের শতাধিক বন্দনায় এবং অন্যপ্রকারেও শ্রীচৈতন্যকে ভগবান্ বলেই বিবৃত করেছেন। আবার এই দুই মতবাদীদের একজনকে বলতে দেখা যাচ্ছে—"ভাবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই হিসাবে স্বরূপ-দামোদর যে প্রকারে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের রচিত সাহিত্যে যাহা আছে" ইত্যাদি (চৈ-উপাঃ)। তাহলে তো গোল চুকেই গেল। তাহলে আর লেখক তাঁদের উদ্ভাবিত গৌর-পারম্যবাদের দোহাই দিয়ে কবিকর্ণপূরের "গোস্বামী" না হওয়ার জন্য আক্ষেপ করেন কেন?—"বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা যে ছয়-গোস্বামী নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র হইয়াও এবং অতগুলি গ্রন্থ লিখিয়াও স্থান পাইলেন না; অথচ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না আসিয়া এবং রঘুনাথ ভট্ট কোনো গ্রন্থ না লিখিয়াও স্থান পাইলেন।" কিন্তু "গৌর-পারম্য" শব্দের অর্থ কী? এতে কি এই ব্যঞ্জিত করে যে, কৃষ্ণ-সম্পর্কহীন গৌরই স্বয়ং ভগবান্? ডঃ সুশীলকুমার শুধু সাম্প্রদায়িকতারই আভাস দিয়েছেন, ভিতরে প্রবেশ করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনবোধ করেননি। ভেবে দেখেননি যে, কোনো ভক্ত "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" প্রত্যক্ষ করেও ভজনের জন্য গৌরবিগ্রহকে স্বচ্ছন্দে অবলম্বন করতে পারেন। ডঃ বিমানবিহারী বলেছেন "শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার ও সম্ভবতঃ মুরারি গৌরমন্ত্র-দ্বারা রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ গৌরাঙ্গেরই উপাসনা প্রবর্তন করেন।" রক্ষা করেছেন, ভাগ্যিস বলেননি যে, কৃষ্ণ-সম্পর্কহীন গৌরেরই ভজনা করেছেন দ্বিতীয় স্বয়ং ভগবান হিসাবে! কিন্তু ওকথার কোনো প্রমাণ নেই, নরহরি শিবানন্দ গৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেননি। আসলে এ হল ভজন-সাধনের ব্যাপার, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"। যেমন একজন বহু পরবর্তী পদকার "যার মনে লেগেছে যারে তারা ভজুক তার গো, মোর মনে লেগেছে ভালো শচীর দুলাল গোরা গো"। এসব নিয়ে ইতিবৃত্তের কার্য-কারণের কোনো যোগ নেই। একথা কোনোমতেই মনে করা যায় না যে নরহরি, শিবানন্দ, মুরারি মহাভাব-ব্যাকুলিত প্রত্যক্ষে রাধারূপ কৃষ্ণের ধারণার উপর বিতৃষ্ণ ছিলেন। তারপর ঐ গৌর-নাগর ভাব। এর ভিত্তি যদি বৃন্দাবনের নটবর কৃষ্ণের উপর না হয় তাহলে তার কোনো অর্থই হয় না। গয়া-প্রত্যাগত বিশ্বম্ভরের নৃত্যকীর্তনাদি-সমন্বিত ভাবাবেশ ও পুষ্পমালাঢ্য চাঁচরচিকুর-সুশোভিত নবীন রূপ ভাগবত-গীতগোবিন্দ-চণ্ডীদাস-পদাবলীর পাঠক ভক্তের মুগ্ধ

দৃষ্টিতে গোপীচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণের বলে প্রতিভাত হওয়াতেই গৌরনাগর ভাবের বর্ণনা। রাধামোহনঠাকুর এইজন্যই নরহরি-লোচন-বাসুঘোষের পদকে 'ভাব-বিতর্ক' বলে এর যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। বৃন্দাবনদাস-এর সপক্ষতা করেননি, কারণ, ব্যাপারটি ঐতিহাসিক বাস্তব নয়। লোচনদাস যে করছেন তার কারণ গুরু নরহরির নির্বিচার অনুসরণ এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব, ভাবকল্পনার প্রাবল্য। তবু গৌরনাগর-ভাবনাকেও অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌরত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না।

এঁরা যাঁরা চৈতন্যজীবন এবং জীবনীগ্রন্থসমূহের উপর ইতিহাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ছোটখাট বিরুদ্ধতা এবং অসংগতির সমন্বয় সাধন না করতে পেরে নানান্ জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁর কলহ-সমাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে মাঝে মাঝে কিরকম ভ্রম-প্রমাদ করে ফেলেন তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। "Vaisnava Faith & Movement" গ্রন্থে চৈতন্য–জীবনের উপকরণ সংগ্রহে নিরত লেখক বলেছেন :

"Vasudeva paints Chaitanya as a devout person even from his birth; and like narahari and some other Pada-writers, he believes in the Radha-bhava of the Chaitanya incarnation–a doctrone, which is found indeed in the Stotras of Gosvamins and in the Ramananda Ray episode described by Krisnadasa Kaviraja, but which must have been a dogma of an earlier Navadvipa origin" এর পাদটীকায় উদাহরণ দেওয়া হয়েছে :

নরহরি : গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে। ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥

বাসুদেব : আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কাঁদে লোটায় ধরণী॥

শিবানন্দ সেন : রাধা রাধা বলি পঁহু পড়ে মুরছিয়া। শিবানন্দ কাঁদে পঁহুর ভাব না বুঝিয়া॥

পাঠক বিচার করুন, একে কি "রাধাভাব" বলে? না এ কৃষ্ণভাব? অবশ্য রাধাসম্বন্ধীয়ভাব এমন মধ্যপদলোপী সমাসের কষ্টকল্পনা করলে প্রযুক্ত রাধাভাবের অর্থ হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'রাধার ভাব' এই অর্থেই শব্দটি পারিভাষিক হয়ে পড়েছে, খুশিমত ব্যাখ্যা করার কোনো অধিকার নেই। ঐ গ্রন্থকারের ব্যাখ্যানের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানের গ্রন্থকারের অভিমতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইনি কৃষ্ণভাবকে রাধাভাব বলে বিষয়টিকে গেলামলে করেননি, কিন্তু নীলাচল ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের উপলব্ধির মহিমা খর্ব করতে বদ্ধপরিকর হয়ে শ্রীরূপ লিখিত চৈতন্যাষ্টকের রাধাভাবাবস্থার সঙ্গে সরকার ঠাকুর রচিত পদের কৃষ্ণভাবাবেশের ঐক্য নির্ধারণ করেছেন। কারণ, বৃন্দাবন-স্মরণের কথা দুয়েতেই আছে। ব্যঞ্জনা এই যে, সরকার ঠাকুরের রচনা অবলম্বনেই রূপগোস্বামী লিখেছেন। যেমন--

"গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পঁহু যমুনায় ভ্রমে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পূরব আবেশে ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে।
পীতবসন আর সে মুরলী চাহে॥...ইত্যাদি।

"শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যাষ্টকে প্রভুর নীলাচলের সমুদ্রতীরস্থ উপবন দেখিয়া বৃন্দাবন মনে পড়ার কথা আছে—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ।
ক্কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রবলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

...নরহরি সরকার ও শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের একই রূপ ভাবাবেশে (!) ভ্রম বর্ণনা করিয়াছেন"।

স্বমতের পোষকতা করতে গিয়ে এরকম অনেক বিষয় তিনি তাঁর বিখ্যাত "উপাদানে" কৌশলে সজ্জিত করেছেন যাতে নীলাচল-বৃন্দাবন-Tradition এবং গ্রন্থরচনাদি পাঠকের কাছে যথার্থই কৃত্রিম ও স্বল্পমূল্য প্রতিভাত হয়। তিনি নিশ্চিত বুঝেছেন যে গৌর-নাগরভাব-বিষয়ে পদরচনা করেছিলেন বলেই মুরারি, কবিকর্ণপূর এবং বৃন্দাবনদাস নরহরির উল্লেখ করেননি! নরহরির নবদ্বীপ-লীলাপরিকর হিসাবে অবিসংবাদিত প্রাধান্যের প্রমাণ তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির ভণিতা দেওয়া পদ থেকে। তাঁর মতে চরিতামৃতকার কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও নাটক থেকে মহাপ্রভু-রামানন্দ সাক্ষাৎকার হুবহু অনুবাদ করেছেন, অথচ কর্ণপূরের কাছে ঋণের কথা চেপে গেছেন। যেন রামানন্দ রায় থেকে স্বরূপ-দামোদর, রঘুনাথদাস এবং তাঁদের থেকে কবিরাজ গোস্বামীর জানা সম্ভবই ছিল না। কবিকর্ণপূর যে শিবানন্দ-পুত্র, আর সব তথ্যের ভাণ্ডার তো শিবানন্দের হাতেই ছিল! আরও দেখা যায়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে একখানি পুরোপুরি অনৈতিহাসিক গ্রন্থ এবং গোবিন্দদাসের কড়চাকে কাল্পনিক সৃষ্টি জ্ঞান করেও লেখক স্বমতের পরিপুষ্টির জন্য এঁদের থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে একটুও দ্বিধা করছেন না। আবার উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা এবং মুরারির কড়চার সর্বাংশই তিনি সত্য মনে করেন। মুরারি যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর সংস্কৃত চরিতামৃত লেখেন তা তিনি যখন ধরে নিচ্ছেন তখন আর কথা কী? কিন্তু "উপাদানে"র লেখক চরিত-গ্রন্থগুলির তথ্যস্থাপনে ও বর্ণনায় যথার্থ কতকগুলি বৈষম্য দেখিয়েছেন, হয়ত বা এইগুলির উপর ভিত্তি করেই নবদ্বীপ ঐতিহ্যের সঙ্গে নীলাচল-বৃন্দাবন ঐতিহ্যের তিনি বিরোধ অনুমান করেছেন এবং সম্ভবতঃ মহতের মতই দুর্বল-পক্ষ অবলম্বন করতে চেয়েছেন। তাঁর নির্দিষ্ট কয়েকটি বৈষম্য নিয়ে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি, কল্পিত তত্ত্ববিরোধ মীমাংসার প্রয়োজনে আরও দু-একটি বিষয় মন্তব্যসহ উল্লেখ করতে হচ্ছে। তিনি বিরোধ-বৈষম্যকে অতিশয়িত করে দেখেছেন কিনা এবং অন্যবিধ অনুমান সম্ভব কিনা তা পাঠকেরাই বিচার করবেন।

১। কর্ণপূর স্বরূপ-দামোদরের কড়চার নাম করেননি, যদিও তাঁর নাটকে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ্য লীলাপরিকর হিসাবে স্বরূপ-দামোদরের উল্লেখ করেছেন।

এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য, এই অনুল্লেখের ফলে স্বরূপ গোস্বামীর রচনা বিশেষ কিছু ছিল না এমন প্রমাণ হয় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ পুনঃপুন লিখেছেন যে রঘুনাথদাসের কণ্ঠ থেকে তিনি ঐ কড়চায় লিখিত বিষয়সমূহ জেনেছিলেন এবং তদনুযায়ী অন্ত্যলীলা লিখেছেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ লীলা সম্পর্কে স্বরূপের রচনা, নবদ্বীপলীলা-পরিকরদের,

যাঁরা বর্ষে বর্ষে আসতেন এবং দু-চার মাস থেকে চলে যেতেন, তাঁদের তেমন জানার কথা নয়, তাই কর্ণপূরও জানেননি। তত্ত্বদৃষ্টির বৈষম্যের জন্য তিনি স্বরূপের মতের উল্লেখ করেননি, এ অলীক কল্পনা মাত্র। অথচ, লেখকের মতে, স্বরূপ-দামোদরের পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ক অভিমত কর্ণপূর তার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় গ্রহণ করেছেন। আবার কর্ণপূর যাঁর শিষ্য, সেই শ্রীনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'চৈতন্যমতমঞ্জুষা'র মঙ্গলাচরণে ''আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলের মত তো পূর্বেই গ্রহণ করেছেন দেখছি। অবশ্য আমরা সন্দেহ করি, এই শ্লোকটি চক্রবর্তীপাদের নিজের নয়। যাই হোক, সত্য হলে কর্ণপূরের ব্রজ-বিমুখতা এবং লেখক-উক্ত গৌর-পারম্যবাদ টেঁকে কী করে?

২। কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত চরিতামৃত থেকে কোন শ্লোক উদ্ধার করেননি, ''চন্দ্রোদয়" থেকে করলেও প্রমাণ বিষয়ে যেমন বৃন্দাবনদাস, মুরারি গুপ্ত এবং স্বরূপ দামোদরের নাম উল্লেখ করেছেন, তেমন কবিকর্ণপূরের নাম করেননি—ইত্যাদি।

এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য, সংস্কৃত চরিতামৃত থেকে কবিরাজ একটি শ্লোক নিয়েছেন, তাঁর মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে : বৃন্দাবনে গিয়ে মহাপ্রভু গোবর্ধন আরোহণ করতে না চাওয়ায় স্বয়ং কৃষ্ণ নেমে এসে তাঁকে দর্শন দিলেন এই ঘটনার সমর্থনে। কেবল রূপ-সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন ঘটনার বর্ণনাতেই নয়, অন্য বহু বিষয়েও তিনি আত্মপক্ষ-সমর্থনে কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক থেকে শ্লোক গ্রহণ করেছেন। যেমন, গঙ্গায় যমুনাভ্রমবশতঃ মহাপ্রভুর যমুনাস্তব (মধ্যলীলা ৩য়); সার্বভৌমের সঙ্গে ব্রহ্ম বিষয়ে বিতর্কে সবিশেষ-ব্রহ্মস্থাপনে শ্লোক (মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ); নীলাচল-আগত স্বরূপ-দামোদরের চৈতন্যস্তব (মধ্যলীলা ১০ম) : সার্বভৌম-প্রস্তাবিত প্রতাপরুদ্রকে দর্শনদাস বিষয়ে মহাপ্রভু কর্তৃক অনৌচিত্য নির্দেশের দুটি শ্লোক (মধ্যলীলা ১১শ); রঘুনাথদাসের নীলাচলে মহাপ্রভু মিলনে শ্লোক (অন্ত্যলীলা ৬ষ্ঠ); এ ছাড়া অধুনা-লুপ্ত কর্ণপূরের আর্যাশতক-উদ্ধৃত তাঁর সাত বৎসর বয়সে রচিত এবং মহাপ্রভুর সামনে উচ্চারিত শ্লোক (অন্ত্যলীলা, ১৬শ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কবিরাজ গোস্বামী তাঁর পূর্বসূরী কবিকর্ণপূরের রচনার উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। তিনি আদিলীলার ও মধ্যের কিয়দংশের বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস ও মুরারির উপর প্রধানভাবে নির্ভর করেছিলেন, যেমন অন্ত্যলীলার জন্য স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের উপর, কারণ এঁরা অন্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। এছাড়া তিনি আরও নানান্ সূত্র থেকে প্রমাণ বা সমর্থন সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলি গৌণ ব্যাপার বলেই উল্লেখ করেননি। কিন্তু ''উপাদানে"র লেখক যেভাবে প্রমাণপঞ্জীতে কর্ণপূরের নাম দাবি করেছেন. সেরকম প্রমাণপঞ্জী দেওয়ার তিনি প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ আধুনিক রীতি; এটি ভালোও বলা চলে, মন্দও বলা চলে। আর, সকলের নাম করা এবং কাউকে না চটানো এটিও আধুনিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য! সেকালের লেখকেরা এসব কথা ভেবে দেখেননি।

৩। কবিরাজ গোস্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত চৈতন্যচন্দ্রামৃতের নামও করেননি। লেখকের অনুমান এই যে প্রবোধানন্দ গৌর-পারম্যবাদের ভক্ত ছিলেন বলে বৃন্দাবনের দল কেউ তাঁর সপক্ষতা করতে চাননি।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, প্রবোধানন্দের চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেন না, তাই কেউ নাম করেননি বা উদ্ধৃতি তোলেন নি। শুধু কবিরাজ গোস্বামীর

উপর দোষারোপ করলে চলবে কেন? গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় প্রবোধানন্দের গ্রন্থের উল্লেখ আছে, অতএব 'চন্দ্রামৃত' ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হলেও এবং গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ না করা গেলেও চৈতন্যচন্দ্রামৃত স্তবের প্রচার ছিল না এমন মনে করা যায় স্বচ্ছন্দে। আমাদের আরও মনে হয়, অনুরাগবল্লী-রচয়িতা মনোহরদাসই প্রবোধানন্দের গ্রন্থের প্রচার করেন। তাঁর দাক্ষিণাত্যে যাতায়াত ছিল এবং সে অঞ্চলে তাঁর বহু শিষ্যও ছিল। প্রবোধানন্দের উপর সাম্প্রদায়িক মত আরোপ করার আগে তাঁর শিষ্য ও ভ্রাতৃপুত্র অন্যতম গোস্বামী গোপাল ভট্টের কথা চিন্তা করতে হবে। তা ছাড়া দেখতে হবে প্রবোধানন্দ কেবল গৌরাঙ্গেরই অর্চনা করেননি, বৃন্দাবনের কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের অভেদ এবং শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-সম্মিলিত বিগ্রহও বারংবার লক্ষ্য করেছেন। বাহুল্যভয়ে তা দেখানো গেল না।

সুতরাং শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে গৌড়ভূমিতে প্রবর্তিত প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে নীলাচল-বৃন্দাবনের সূক্ষ্মতর ও প্রবৃদ্ধতর ধারণার যদি কিছু পার্থক্য থাকে তা পরিমাণগত মাত্র, গুণগত নয়। এই নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকলে জীবনীকার, প্রচারক ব্যাখ্যাতারা নিশ্চয়ই তা কোনো না কোনো রীতিতে নির্দেশ করতেন। নীলাচল-বৃন্দাবনের রাধাভাবান্বিত-কৃষ্ণ-তত্ত্ব নির্দ্বন্দ্বে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল, তবে কিছু সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীবাস-মুরারি-শিবানন্দ-কর্ণপূর তা সম্যক্ অবগত হতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। না পারলেও ক্ষতি কিছুই অনুভব করেননি, কারণ কল্পিত দু'পক্ষের পার্থক্য সামান্যই। আর আমাদের প্রার্থনা, যাঁরা উক্ত বিরোধ সম্পর্কে দৃঢ়মত তাঁরা ইতিহাসানুগত প্রমাণ দিন, বিনা প্রমাণে লোকচিত্তে কোনো সংস্কার গড়ে তোলার প্রয়াস যেন না করেন। আরও দুঃখের কথা, সাম্প্রতিক কোনো কোনো সাহিত্য-ইতিবৃত্তকার এরকম কলহদর্শী মতবাদকে বিনা-অনুসন্ধানে, কেবল অভিনবতার খাতিরে অথবা গড্ডরিকা-রীতিতে মেনে নিয়েছেন, যার ফলে ছাত্র ও জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের চিত্তে বৈষ্ণব ধর্ম, যুগ ও লোকমান্য সাধকদের সম্পর্কে সন্দেহের উদ্ভব ঘটেছে। দলগত কলহ বিশেষভাবে আধুনিকের স্বভাব। অপ্রমাণে এই স্বভাব ত্যাগী বৈরাগী নিষ্কিঞ্চন মানুষগুলির উপর আরোপ করা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় স্বভাবতই উক্ত মত-প্রসঙ্গ এসে পড়ল বলে সে বিষয়ের সমাধান করে আমরা এখন "বৈষ্ণব" তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এবিষয়ে আমাদের প্রয়োজন নির্বাহ করছে মুখ্যভাবে শ্রীজীবের ষট্সন্দর্ভ এবং কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত।

মনে রাখতে হবে—সৃষ্টি, বিশেষে জীব অর্থাৎ মানুষ এবং স্রষ্টা সম্পর্কে তাত্ত্বিক চিন্তাই হল দর্শন। বহুপূর্বে এই তত্ত্বচিন্তন ভারতবর্ষে উপনিষদের যুগে প্রারব্ধ হয়েছিল, অথবা, একথা বলাই ঠিক যে ঐ সময় 'ঋষি' আখ্যায় অভিহিত প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা তাঁদের প্রজ্ঞানময় বিচিত্র উপলব্ধিসমূহ প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলি পরবর্তী দর্শনের বীজ, কিন্তু ঠিক মননমূলক দর্শন-পদ্ধতির গঠন নয়। ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি প্রধান দশ-এগারোটি উপনিষদে যা যা বলা হয়েছে তাতে নানান্ মত ও পথের কথা আছে। ভারতে প্রথম মননমূলক দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত করেন যজ্ঞকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন স্বানুভবীরা এবং তারপর সাংখ্যযোগচিন্তকেরা। এঁদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ দার্শনিকেরা। তাঁদের শূন্যতাবাদ,

ক্ষণিকতাবাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ দর্শনে জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়নি। অথচ উপনিষদের বহু মন্ত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ব্যাস-বিরচিত বলে কথিত ব্রহ্মসূত্রেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব, সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রভৃতির বিষয় চিন্তিত হয়েছে। মহাভারতের অন্তর্গত গীতা-অংশে, বিষ্ণুপুরাণ প্রমুখ অন্ততঃ দু'চারটি পুরাণেও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সমসাময়িক আস্তিক-বিশ্বাসের পরিচয় প্রাপ্তব্য। বিচার দৃষ্টি নিয়ে উপনিষদ্ এবং গীতা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না এবং জীবনধর্মকেই চরম বস্তু বলে মনে করতেন এমন সম্প্রদায় (বোধ হয়, চার্বাক এবং বার্হস্পত্য) তখন অপ্রধান ছিল না। মুখ্যতঃ এঁদের উপলব্ধির বিরুদ্ধতার জন্যই যে উপনিষদের প্রারম্ভ, তার প্রমাণ ঐসব পর্যালোচনের মধ্যেই রয়েছে। সৃষ্টিতে যা আছে,বা যা হচ্ছে, যা হয়েছে এবং যা হবে, সমস্ত কিছুর মূলীভূত চরম একটি সত্যবস্তু লক্ষ্য করে তার সাধারণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'ব্রহ্ম'। এমন বহু মন্ত্র অবশ্য আছে যাতে সৃষ্টিকে অসত্য বলা হয়নি, সৃষ্টিসহ ব্রহ্ম সত্য এমন কথাও বলা হয়েছে।

ব্রহ্মসত্য উপলব্ধিকে আশ্রয় করে পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক চিন্তনের প্রতিষ্ঠা করেন শংকরাচার্য। তাঁর পূর্বে বৌদ্ধ মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের নাস্তিক দর্শন মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক মতবাদে পল্লবিত হয়ে প্রায় সমস্ত উত্তরভারত ব্যাপ্ত করে বিদ্যমান ছিল। অসৎ-বাদকে নিরস্ত করে সৎ-বাদ প্রতিষ্ঠায় শ্রীপাদ শংকর শূন্যতাসমর্থক যুক্তিতর্কের সাহায্য নিয়েই শূন্যতার খণ্ডন করেন। তাই তাঁর ব্রহ্ম সত্যবস্তু হলেও শূন্যের মতই নিরাকার, নির্বিশেষ, অনির্বাচ্য। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের জগৎও ক্ষণিকতাবাদীদের মত তাঁর কাছে অসত্য। কিন্তু মৌল সংবাদ স্থাপন করতেই দার্শনিক মননের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় উপলব্ধির ক্ষেত্রেও ভারতে বিপ্লব ঘটে গেল। বিশেষতঃ নির্গুণ ব্রহ্মের পাশাপাশি সগুণ ব্রহ্মের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত করায় শ্রীশংকর প্রকারান্তরে পরবর্তী কেবল-সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ভক্তিবাদের পথও চিহ্নিত করে রেখে গেলেন। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মই তাঁর যুক্তিসিদ্ধ অনন্য তত্ত্ব হওয়ায় তিনি পরবর্তী ভক্তিবাদী ঈশ্বরোপাসকদের দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হলেন। আমরা পূর্ববর্তী ভূমিকায় অদ্বৈতবাদ থেকে উদ্দীপিত ভক্তিশাখার তত্ত্ববাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁদের মূলসূত্রগুলির পর্যালোচনা করে তা থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিদর্শনের পার্থক্য প্রদর্শনের প্রয়োজন অনুভব করছি।

ক. **ব্রহ্ম ঈশ্বর**—শংকরের মতে নির্গুণব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। এই ব্রহ্ম শুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ। মায়ার মধ্যে প্রতিবিম্বিত এই ব্রহ্মের আভাসই ঈশ্বর। মায়িক জীবনের ধারণার শেষ সীমা এই ঈশ্বর পর্যন্ত। মায়ার আবরণ ছিন্ন করতে পারলে ও মানুষের শুদ্ধ চিৎ স্বপ্রকাশ হয়ে পড়লে পর, ব্রহ্মের সঙ্গে সেই চিৎ অভিন্ন হয়ে পড়ে। তখন জীব ব্রহ্মবিৎ এবং ব্রহ্ম দুইই হয়ে পড়ে। রামানুজের মতে ব্রহ্ম কখনোই শুদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ, নির্গুণ নির্বিশেষ এবং অনির্বাচ্য নন। তিনি সগুণ ঈশ্বরই এবং এই সগুণ বা সবিশেষ ঈশ্বরই শেষ সত্তা। জীব এবং জড় কোনো মায়িক ব্যাপার নয়; ঈশ্বরের মতই সত্য, যথাভূত বাস্তব : এ যেন ঈশ্বরের দেহ। চিৎ এবং অচিৎ অর্থাৎ জড় পদার্থের বিবিধ বৈচিত্র্য পার্থক্য নিয়েই ঈশ্বর ঈশ্বর, এসব বাদ দিয়ে নয় (জার্মান দার্শনিক Hegel এবিষয়ে রামানুজের অনুগামী)। ঈশ্বরই জগৎ-রূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হয়েছেন স্বেচ্ছায়, যেমন কারণ

কার্যে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে কিন্তু ঈশ্বর পরিবর্তিত হন না, তাঁর গুণ ও ধর্ম পরিবর্তিত হয় মাত্র, তিনি অবিকৃত থাকেন। অচিৎ এবং চিৎ অর্থাৎ জড় এবং জীবাত্মা তাদের স্থিতির জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। তিনি জীবের অন্তর্যামী এবং পরমা-গতি। তিনি অপ্রাকৃত দেহ-বিশিষ্ট, বাসুদেবাদিচতুর্ব্যূহ-সমন্বিত, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তা। তাঁকেই নারায়ণ বা পর-বাসুদেব বলা হয়, শক্তি এবং করুণার বিগ্রহস্বরূপিণী শ্রী বা লক্ষ্মী তাঁর অনপায়িনী শক্তি। জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। জীবাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভিন্ন এবং অভিন্ন দুইই, যেমন ব্যক্তির দেহের সঙ্গে অন্তরাত্মার সম্পর্ক।

ব্রহ্মসম্প্রদায়ী মধ্বের ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ক অভিমত বহুলাংশে রামানুজাচার্যের মতই। কিন্তু মধ্বাচার্য রামানুজের মত ভেদাভেদবাদী (= ভেদ সহ অভেদ) নন। তিনি নিঃশেষ ভেদবাদী, অর্থাৎ জীবাত্মা এবং বস্তুনিচয়, যা জড়-প্রকৃতির সৃষ্টি, তাঁর মতে তা ঈশ্বরের দেহ সুতরাং মূলতঃ অভিন্ন ব্যাপার নয়। চিরন্তন দ্বৈত বা নানাত্ব অর্থাৎ পার্থক্যই সত্য। রামানুজ-মতে ভেদ অভেদের ধর্ম মাত্র। রামানুজের মতই মধ্ব ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জড় এই তিনের সত্যতা ও অনাদিত্বে বিশ্বাসী এবং বিষ্ণু বা ঈশ্বরের নেতৃত্ব ব্যূহ, অবতার, লক্ষ্মী প্রভৃতিও স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত-কারণ মনে করেন, উপাদান-কারণ নয়। ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে নিম্বার্ক বা সনক-সম্প্রদায়ের ধারণা রামানুজেরই অনুসারী, যদিচ তাঁরা মনে করেন যে, দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুইই সত্য। পার্থক্য এই যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বর মনে করেন এবং রাধাকে তাঁর শক্তি মনে করেন। শুদ্ধাদ্বৈত বা বল্লভ-সম্প্রদায় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদীরা ঈশ্বর-স্বরূপ বিষয়ে রামানুজ প্রভৃতির সঙ্গে একাত্ম। অর্থাৎ ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দময়, অবতার-ধাম-বিগ্রহাদিসম্পন্ন, এবং সর্বকারণ বলে মনে করেন। একই সঙ্গে ভেদ এবং অভেদের বিরুদ্ধধর্মতা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে ঈশ্বরের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির জন্য। এঁরা লীলাবাদী এবং শক্তিবাদী। মধ্ব সম্প্রদায়ের মত কেবল-ভেদবাদী নন। এই অচিন্ত্য শক্তির কল্পনা করেই তাঁরা ঈশ্বর এবং জীবের যাবতীয় বিরুদ্ধ ধর্মের সমাধান করতে চেয়েছেন। শুদ্ধাদ্বৈত বা বল্লভ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য যৎসামান্য এবং নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মত এঁরা শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবান্ এবং রাধাকে তাঁর শ্রেষ্ঠা শক্তি বলে মনে করেন। বিশেষ এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে নারায়ণ-বাসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি এবং অবতার ও ব্যূহাধিপতিদের শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং কলা বলে গ্রহণ করা হয়। নারায়ণ ঐশ্বর্যমূর্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যমূর্তি বলে নারায়ণ থেকে শ্রীকৃষ্ণের গুণাধিক্য কল্পিত হয়। ভক্তদের বাসনাপূর্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন বিগ্রহে নানা মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মতে এই নানাত্ব কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাসের ফলেই হয়ে থাকে, এমনকি রাধাও কৃষ্ণের নিজ হ্লাদিনী শক্তির পরিণাম মাত্র, মূলে একাত্ম, লীলায় পৃথক্। এসব নিয়ে সৎ চিৎ আনন্দের পূর্ণতম বিকাশ যাঁর মধ্যে তিনি স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আর তাঁর বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি ত্রিবিধ শক্তির অধিকারী। স্বরূপ-শক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা।

খ. জীব—অদ্বৈতমতে জীব ব্রহ্মই, মায়াতে প্রতিবিম্বিত হয়ে, অবিদ্যা-সংস্পর্শে অথবা অবিদ্যার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে জীব নিজকে পৃথক বলে মনে করে ও সংসারভোগ করতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদি এবং অহং নিয়ে জীবের যে অন্তঃকরণ তা মায়িক উপাধি মাত্র, অথচ অজ্ঞান-বিমোহিত জীব একেই সর্বস্ব বলে জানে, সাক্ষীচৈতন্যস্বরূপ তার যে আসল সত্তা

রয়েছে, অবিদ্যার জন্য তা তার কাছে প্রতিভাত হয় না। স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্মের অংশ বা কণিকা নয়, বিভু অর্থাৎ ব্রহ্মই। অবিদ্যার আবরণ অপসৃত হলেই জীব ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যায়, বন্ধনমুক্ত হয়ে পড়ে। এই অদ্বৈত মতের সঙ্গে পরবর্তী তত্ত্ববাদী সকলেরই মতের পার্থক্য রয়েছে। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব চিৎ-অণু, ব্রহ্ম-আশ্রিত, ব্রাহ্মের শরীর। ব্রহ্ম জীবান্তর্যামী, জীবাত্মারও আত্মা এবং নিয়ামক। এক ব্রহ্মই জীবরূপে বহু হয়েছেন। অবিদ্যা এবং অদৃষ্ট বা পূর্বকৃত কর্মের জন্য জীব সুখদুঃখ ভোগ করে। উত্তম কর্ম এবং জ্ঞানের ফলে সে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দের, অনন্তের মধ্যবর্তী হয়ে পড়ে। শ্রীরামানুজ জীবকে তিন ভাবে ভাগ করেছেন—বদ্ধ, মুক্ত এবং নিত্যমুক্ত। মুক্ত এবং নিত্যমুক্ত জীব বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ করে লক্ষ্মীনাথ বিষ্ণুর পারিষদ-শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকেন। রামানুজ কিন্তু বদ্ধজীবকে অবিদ্যাপ্রভাবে বদ্ধ মনে করেন না, কর্মবন্ধনে অনাদি বদ্ধ বলে মনে করেন। ভেদবাদী মধ্বাচার্য জীবকে ঈশ্বর থেকে পৃথক্ সত্তা বলে মনে করেন, এমনকি জীবের সঙ্গে জীবের অর্থাৎ এক আত্মা থেকে অন্য আত্মার গুণগত পার্থক্য নির্ধারণ করেন। অথচ এসবকে অস্বতন্ত্র এবং ঈশ্বরের আশ্রিত বলেন। রামানুজের মত ইনিও অগণিত চিৎকণ জীবাত্মাকে কর্মহেতুক বদ্ধ, এবং বদ্ধ, মুক্ত, নিত্যমুক্ত শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। মুক্ত অবস্থাতেও তাঁর মতে ঈশ্বরে-জীবে ভেদ থাকে। সাযুজ্য মুক্তিতেও জীব পূর্ণ সচ্চিদানন্দের অধিকার লাভ করে না।[১] এছাড়া অসুরাদিযোনিতে জাত জীবের মুক্তি মধ্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে জীব এবং জড় বিশেষত্বের জন্যই ঈশ্বর থেকে অনাদি-পৃথক্। রামানুজের মত তিনি ঈশ্বর থেকে জীবের অ-পৃথক্সিদ্ধি স্বীকার করেন না। ভেদাভেদ (ভেদ ও অভেদ)-বাদী নিম্বার্কের মতে জীব মৌলিক জ্ঞানস্বরূপ, আবার জ্ঞানাশ্রয় সত্তাও। ধর্মী-ধর্ম-ভাবযুক্ত, জ্ঞাতা এবং জ্ঞান দুইই। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মা ভিন্ন এবং অভিন্ন; ঈশ্বরাশ্রিত, ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত। একটি শ্লোকে জীবের এই বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়েছে :

জ্ঞানস্বরূপং হরেরধীনং শরীরসংযোগ-বিয়োগ-যোগ্যম্।
অণু হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ॥

আত্মস্বরূপ জীবের কর্ম এবং অবিদ্যার বশে শরীরধারণ প্রভৃতি বর্ণনে নিম্বার্ক প্রায়শঃ রামানুজাচার্য এবং ক্বচিৎ মধ্বাচার্যের মতানুসরণ করেছেন। বল্লভাচার্যের বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মতে জগৎ ও জীব অন্তর্যামী ঈশ্বরের সঙ্গে মূলতঃ অভিন্ন। এ ব্রহ্মেরই অবিকৃত পরিণাম মাত্র। সৎ চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বর যথাক্রমে দেহ ও দেহী (অর্থাৎ জীব) এবং অন্তর্যামীতে পরিণত হন। ব্রহ্মের সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ, যেমন অগ্নির সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের। অথবা যেমন মণির সঙ্গে মণির জ্যোতির। জীব সচ্চিদানন্দের নিতান্ত অণুপরিমাণ বলে জীবে ঈশ্বরের কোনো গুণ প্রকাশিত, কোনো গুণ আবৃত।

রামানুজ-মতে জীবাত্মা পৃথক্ হলেও ঈশ্বরের দেহের অন্তর্ভুক্ত মধ্বমতে জীবাত্মা ঈশ্বরাধীন হলেও পৃথক্-অস্তিত্ব-সম্পন্ন। নিম্বার্কমতে পৃথক্ এবং অপৃথক্ দুই-ই। জীবাত্মা সসীম এবং আশ্রিত বলেই পৃথক। ভাস্করমতে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, কর্মদোষে ভিন্নাকার লাভ করেছে মাত্র। তাঁর মত অদ্বৈতমতের কাছাকাছি। বল্লভাচার্যের মতে ঈশ্বরের

---

১. মুক্তেঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্দেহং সংশ্রিতা অপি।
তারতম্যেন তিষ্ঠন্তি গুণৈরানন্দপূর্বকৈঃ॥

অণুপরিমাণ অংশ। এঁদের মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈত বা বল্লভ সম্প্রদায়ের সঙ্গেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মিল সব চেয়ে বেশি। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদীরা ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির কল্পনা করে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ বিষয়ে যাবতীয় দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চেয়েছেন। এঁদের মতে জীব হল ঈশ্বরের তটস্থা শক্তির পরিণাম। মায়াশ্রিত বলে ভিন্ন, কিন্তু মায়া ছিন্ন করতে পারে বলে প্রায় অভিন্ন, অর্থাৎ পরিশেষে স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভূত। জীবের বা সৃষ্টির এই ভিন্নত্ব এবং অভিন্নত্ব অচিন্ত্য, এ তাঁর শক্তির লীলাবিলাস। জীবের স্বরূপ হল চিদংশ, অণু, সূর্যের যেমন রশ্মি। জীব নিত্য এবং সংখ্যায় অনন্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা জীব-ঈশ্বরের রামানুজ-মতানুযায়ী শরীর-শরীরী সম্বন্ধ স্বীকার করেননি। ঈশ্বর স্রষ্টা অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা হওয়ায় জগৎ ও জীবের সঙ্গে জড়িত এরকম ধারণারই প্রশ্রয় দেন। ঈশ্বর শক্তিমান্, জগৎ-জীব শক্তি; ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। ব্যবহারিকভাবে ঈশ্বরে- জীবে, চিচ্ছক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আত্যন্তিক ভেদই অনুভব করেন। মহাপ্রভু তাঁর মনোভাব জ্ঞাপনে নানান্ স্থানে এই বিভেদের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। চরিতামৃত বলছেন :

> ঈশ্বররূপ যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
> জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

তাঁরা জীব-ঈশ্বরের পার্থক্যবোধক নিম্নোক্ত ইঙ্গিতেরই অনুসরণ করেন :

> হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
> অবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

গ. মায়া—প্রকৃতি, অবিদ্যা, অজ্ঞান, বীজশক্তি, ভ্রান্তি প্রভৃতি নানা আখ্যায় মায়াকে অভিহিত করা হয়েছে। উপনিষদে 'মায়া'র বিষয় কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। 'কেন' উপনিষদের কাহিনীতে মায়াকে হেমবর্ণা নারীমূর্তি ঈশ্বরী বলেও দেখা হয়েছে। বৌদ্ধ মাধ্যমিক এবং 'বিজ্ঞান' মতে ইন্দ্রজাল বা স্বপ্নের মত অলীক বোঝাতে মায়া শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া বলা হয়েছে, মায়া দৃষ্ট-বৈচিত্র্য থেকে পৃথক্ নয়, অপৃথক্ও নয়। সাংখ্য দর্শনে মায়াকে ভিন্ন নাম দিয়ে একটি মূলতত্ত্বরূপে দেখা হয়েছে। সাংখ্য মতে বাস্তবতত্ত্ব দুই, এক নয়—পুরুষ এবং প্রকৃতি। বিশ্বজগৎ জীব প্রভৃতি ঐ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি-তত্ত্বেরই পরিণাম। মায়া বিকারী, পুরুষ নির্বিকার। বেদান্তভিত্তিক অদ্বৈতমতে মায়া ব্রহ্ম থেকে পৃথক্ কোনো সত্তা নয়, আবার ব্রহ্মও নয়। ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধ চিৎ, মায়া হচ্ছে জড়, সাংখ্যের প্রকৃতির মত। কিন্তু প্রকৃতি যেমন বাস্তব স্বতন্ত্র সত্তা, অদ্বৈতের মায়া তাও নয়। সৎ অথবা অসৎ এ দুয়ের কোনো ধারণার দ্বারাই মায়াকে বোঝানো যায় না। অথচ মায়া একেবারে মিথ্যা নয়, কারণ এর একটি বৃত্তিতে এ বাস্তব সত্তা যা ব্রহ্মকে আবৃত করে (আবরণবৃত্তি), আর একটি বৃত্তি দ্বারা বৈচিত্র্যময় জগতের ভ্রান্তি জন্মায় (বিক্ষেপবৃত্তি) ব্রহ্মের উপর। মায়া হল বিবর্ত, ব্যবহারিক জ্ঞানের নিমিত্ত। যতক্ষণ এই জ্ঞান থাকে বা অবিদ্যা থাকে, ততক্ষণ মায়া থাকে, শুদ্ধ জ্ঞান উদয়ের বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই এর তিরোভাব। এই মায়া অনাদি। প্রলয়ের পর সৃষ্টির মুহূর্ত হতে কার্যরূপে এর প্রকাশ ঘটতে থাকে, জীব এর দ্বারা অভিভূত হয়ে দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে এবং সংসারকে সত্য বস্তু মনে করে বদ্ধ হতে থাকে।

শংকরাচার্যের এই মায়াবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের হাতে বিশেষভাবে আহত হয়েছে। এর পূর্বে তাত্ত্বিক ভাস্কর মায়াবাদকে মহাযান বৌদ্ধমতের তত্ত্ব বলেছিলেন। তাঁর মতে জীব আর ব্রহ্ম একই, ব্রহ্ম পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে জীব হয়ে গেছেন। এটি বাস্তব সত্য, জড়ের বাস্তব কাজ, মিথ্যা বা মায়া নয়। তাঁর মতে শুদ্ধ কর্ম এবং জ্ঞানেব দ্বারা এই বাস্তব অবস্থা অতিক্রমণীয়। ভাস্করের এই অভিমতের নানান্ অসংগতি শুধরে নিয়ে রামানুজ বলেছেন যে, যথার্থভাবে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জড়ের দ্বারা সীমিত হচ্ছেন না, হতে পারেন না। তাঁর দেহ, যার মধ্যে চিৎ এবং অচিৎ মিশ্রিত রয়েছে, তা-ই পরিণত হয়ে জীব-জগৎ হচ্ছে। রামানুজ মনে করেন ভেদকে নিয়েই অভেদ সত্য, সুতরাং মায়ার কার্যকারিতা—ঐ আবরণ এবং বিক্ষেপ—তিনি স্বীকার করেন না, রজ্জুতে সর্প বা শুক্তিতে রজত তাঁর মতে কোনো ভ্রান্তির ব্যাপার নয়। রামানুজ প্রকৃতি বা জড়কে ঈশ্বরের অংশ এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করেন। জ্ঞানও তাঁর মতে যথার্থ এবং সব সময়েই বিশিষ্ট। মায়ার স্থানে রামানুজ কর্মকে বসিয়েছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় জড়ের কাজ এবং ঈশ্বরেচ্ছায় কর্মের দ্বারা জীবের বন্ধন, সুতরাং ঈশ্বরে ভক্তি এবং শরণাগতির মনোভাবই জীবকে মুক্ত করতে পারে। তাঁর মতে কর্মফলত্যাগ, উপাসনা, প্রপত্তি—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্তিই অজ্ঞান দূর করে, ঈশ্বরজ্ঞান নিয়ে আসে। যাই হোক, তিনি শংকরের মায়াবাদকে নিম্নলিখিতভাবে আক্রমণ করেছেন :

১. মায়া বা অবিদ্যার মূল আশ্রয় কোথায়? ব্রহ্মে থাকতে পারে না, কারণ, তাহলে তো ব্রহ্ম সবিশেষই হয়ে যান। তাছাড়া জড় মায়া তথা অজ্ঞান অবিদ্যা, আর শুদ্ধবুদ্ধ ব্রহ্ম, এই দুই পরস্পর অত্যন্ত পৃথক। অবিদ্যার আশ্রয় ব্যষ্টি জীব, এও বলা যায় না, কারণ জীবের ব্যষ্টিগত উপাধিই তো মায়ার সৃষ্টি। জীবকে মায়ার আশ্রয় বললে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ এসে পড়ে।

২. মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করবে কী করে? ব্রহ্ম তো স্বপ্রকাশ। অন্ধকার কি আলোককে আবৃত করে?

৩. অবিদ্যা সৎও নয় অসৎও নয়, এ কেমন বিরুদ্ধ কথা? তর্কে তো এরকম উপপত্তি দাঁড়ায় না। আছেও নয়, নেইও নয়, এ মিথ্যা জল্পনা। তাছাড়া অবিদ্যাকে যদি জানা যায় না, তো বলা যায় কী করে? সুতরাং মায়া বাস্তব এবং ঈশ্বরের শক্তি—এ মনে করতেই হবে।

৪. মায়াবাদীরা শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিরাকরণের কথা বলেছেন, কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান কখনোই সম্ভব নয়, জ্ঞান সব সময়েই সবিকল্প। শুদ্ধ সত্তাও তেমনই সম্ভব নয়। সুতরাং অবিদ্যাকে দূর করা যায় না। আবরণ এবং বিক্ষেপ কার্যে যারা যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাকে দূর করা অসম্ভব।

রামানুজাচার্য অজ্ঞান এবং কর্মকে ঈশ্বরাধীন এবং অনাদি বলে মনে করেছেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ীও রামানুজের অনুসারে অদ্বৈতের মায়াকে স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে সৃষ্টি ঈশ্বরেচ্ছায়, প্রকৃতির দ্বারা। এই প্রকৃতি এবং সৃষ্ট বস্তু ঈশ্বর থেকে ভিন্ন বাস্তব সত্তা। তাঁরা কর্ম বা জ্ঞানকে মুক্তির সহায়ক বলে মনে করেন। বিশ্বের বাস্তব ও পৃথক সত্তা স্বীকার করার জন্য তাঁদের ক্ষেত্রে বিবর্ত স্বীকারের প্রসঙ্গই ওঠে না। বস্তুত এঁরাও

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা-প্রবর্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥

এই নব ভক্তিধর্ম সম্পর্কেশ্রীচৈতন্যের যা কিছু উপলব্ধি ও বাণী সে তো ঐ রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়েই। কৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা, বৃন্দাবনলীলার মুখ্যতা, গোপীপ্রেম ও রাধাভাব এবং প্রেমার পরমপুরুষার্থত্ব—এই সবই তো মহাপ্রভুর উপলব্ধি এবং বক্তব্য। স্বরূপ-দামোদর (শ্রীনাথ?) একটি শ্লোকে মহাপ্রভুর অভিমতের সারসংক্ষেপ করে বলেছেন :

আরাধ্যো ভগবনে্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম্ বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

এছাড়া, বহিরঙ্গ-শিক্ষণ হিসাবে মহাপ্রভু নামগ্রহণের উপরেই জোর দিয়েছেন। তাঁর রচিত 'শিক্ষাষ্টক' নামে প্রচলিত আটটি শ্লোকে তিনি যেমন নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন, তেমনি বৈষ্ণব-শিক্ষণের দিকটি যথাসাধ্য সম্পূরণ করেছেন। তাঁরই ইঙ্গিতে সনাতন তাঁর হরিভক্তিবিলাসে এবং রূপ তাঁর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে নামমাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর উপলব্ধিকে উপেক্ষা করে তাঁরা কৃষ্ণলীলাবর্ণনে আগ্রহী হয়েছিলেন এরকম অভিমত শ্রোতব্য নয়।

ঐ ভূমিকাতেই ডঃ দে-র দ্বিতীয় অভিযোগ হল এই গোস্বামীত্রয় মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষানুভূতির দিক্‌গুলি উপেক্ষা করে পুরাণবর্ণিত বিষয় এবং পরস্পর-বিরোধী আখ্যান-উপাখ্যানের সমাধান করতে গিয়ে অনর্থক তাঁদের প্রতিপাদ্যকে জটিল ও দুরবগাহ করে তুলেছেন। "...while the intellectual seriousness or the ethical nobility of heart is hardly propounded with force of direct realisation, in as much as they are completely merged in a floating mass of uncertain myths, legends and traditional beliefs. ..." বলা বাহুল্য, এধরনের আলোচনা ভারতীয়দের লেখনী থেকে নির্গত না হয়ে বৈদেশিক লেখনী থেকে নির্গত হলেই যথাযথ হত। গোস্বামীরা পৌরাণিক ব্যাপার নিয়ে চুলচেরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্যই ছিল, অন্ততঃ সেকালে। হৃদয়ে উপলব্ধ ঐ নবধর্মটিকে প্রচলিত বহুধা বিচিত্র ধর্মীয়তার উপরে তাঁদের স্থাপন করতে হয়েছিল। শুধু শ্রী-রুদ্রাদি সম্প্রদায়ে প্রচলিত তত্ত্বেরই খণ্ডন করতে হয়নি। বিষ্ণু, নারায়ণ, অবতার, লক্ষ্মী, রুক্মিণী -সত্যভামা প্রভৃতি নিয়ে যে-সব কাহিনী এবং তাত্ত্বিকতা প্রচলিত ছিল তার গ্রহণ-বর্জন করতে হয়েছিল এবং সর্বোপরি গোপীভাব এবং রাধাবাদের উপর ব্রজলীলার ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে নতুন যুক্তি বিন্যাস করে সমস্ত পুরাণকে ঢেলে সাজতে হয়েছিল। গোস্বামীরা বেদোক্তির প্রামাণিকতার উপর নির্ভর না করে পুরাণের উপর জোর দিতেই পুরাণ-প্রসঙ্গগুলির পুনর্বিচার অত্যাবশ্যক হয়েছিল। 'কৃষ্ণস্তুভগবান্ স্বয়ম্' এই উপলব্ধিতে আস্থাবান্ হওয়ায় অবতারবাদকে তাঁর ঢেলে সাজলেন। গুণাবতার, লীলাবতার, প্রকাশ-বিলাসাদির পার্থক্য, দ্বারকা-বৃন্দাবনের সামঞ্জস্য—এসব বর্জন করে পূর্ণাঙ্গ দার্শনিকতা কিভাবেই বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? কেবল প্রত্যাক্ষানুভূতির বিষয় বিশ্লেষণ করে তো কবিতা-গান রচনা চলে।

সে প্রয়াস তো ঐ সময়ে নরহরি-বাসুদেবাদির রচনায় এবং মুরারিগুপ্ত ও কর্ণপুর-বৃন্দাবনের জীবনীতে বা কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সিদ্ধ হয়েছে। শ্রীরূপ যদি দ্বিতীয় চৈতন্যচন্দ্রোদয় লিখতেন—সমালোচক কথিত "direct realisation"-এর বিষয়টি আর কতদূর বর্ধিত হতে পারত? আর নিগূঢ় শ্রীচৈতন্য-জীবনী রচনার যা সারাংশ তা-ই তো তাঁদের নবভক্তি-উদ্দীপিত গ্রন্থাদিতে বিস্তৃত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি এবং পদ্যাবলী প্রভৃতির গ্রন্থন কি মহাপ্রভুর হৃদয়ানুভবকেই বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করছে না? বস্তুতঃ রূপ-সনাতন এবং জীব ঐ Realisation-এর যৌক্তিক এবং কাব্যিক রূপ দিতে গিয়ে তাঁদের জীবৎকালে যা করে গেছেন তাব তুলনা বিরল। এক হাতে অদ্বৈতবাদীর সঙ্গে, অন্য হাতে বৈশিষ্টাদ্বৈত বা প্রচলিত দ্বৈতবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁরা যে বিজয়ী হয়েছেন এবং প্রভুদত্ত প্রেরণার মর্যাদা নিঃশেষে রক্ষা করেছেন এর চেয়ে গৌরবের বিষয় তাঁদের এবং আমাদের আর কী হতে পারে?

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বলতে যা বোঝায় তা মুখ্যতঃ ঐ স্বরূপ-সনাতন-রূপ-জীব গোস্বামীর সৃষ্টি। মহাপ্রভুর মতানুযায়ী ভাগবতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এই দর্শনের সারকথা-সমূহ নিহিত এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসব্যাখ্যানে এই দর্শন পল্লবিত। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর ভাগবত-সন্দর্ভে রূপ-সনাতন-গোপালভট্টের আলোচনার সারনিষ্কর্য যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি এঁদের সকলেরই গ্রন্থের সার সন্নিবেশিত হয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাঙ্‌লা গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে। চরিতামৃত আবার উক্ত গ্রন্থাদি থেকে অধিকগুণও বটে। শ্রীচৈতন্যের নিগূঢ় রাধাভাবলীলা, স্বরূপ দামোদর ও তৎশিষ্য রঘুনাথদাস গোস্বামী বর্ষ বর্ষ ধরে যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার অধিকার লাভে ধন্য হয়েছিলেন কবিরাজ গোস্বামী। গোস্বামীগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গলীলা (বহিরঙ্গ লীলা তো বটেই) একাধারে সমীকৃত হয়ে এ গ্রন্থে বিরাজ করছে। কবিরাজ গোস্বামীকে নমস্কার। এই একটি গ্রন্থেই তিনি তাত্ত্বিক, রসলিপ্সু এবং লীলাশ্রবণোৎসুক পাঠককে সম্যক্ পরিতৃপ্ত করেছেন, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবস্বরূপা রাধাকে একাধারে ভক্তচক্ষুর গোচর করেছেন। কৃষ্ণলীলা এবং গৌরলীলার নিঃশেষ একাত্মানুভব নবদ্বীপের লীলা-পরিকরদের অন্তরে প্রতিভাত হয়নি, তাঁরা গৌরকৃষ্ণের অভিন্নতা যদিচ অনুভব করেছিলেন, তা আরও বিস্তৃত করে পূর্ণাঙ্গ প্রেমলীলাবাদের যৌক্তিক অথচ হার্দিক বিশ্লেষণ তাঁরা উপস্থাপিত করতে পারেননি। সন্ন্যাসাশ্রিত শ্রীগৌরের নীলাচল-লীলার অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছিল একমাত্র তাঁরাই পূর্বাপর মিলিয়ে সমগ্রভাবে বিষয়টিকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। এদিক থেকে ক্রমানুসারে রামানন্দ-স্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথদাস-জীব-কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ সাধকদের অনুভবই অগ্রগণ্য। নবদ্বীপ-লীলা-সহচরেরা, মুখ্যভাবে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ এবং সহায়কভাবে শ্রীবাস, মুরারি, গদাধর, নরহরি, গোবিন্দ-বাসুদেব, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি এক অতি মহৎ কর্তব্য সাধন করেছিলেন, তা হল শ্রীগৌরের কৃষ্ণত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করে ঈশ্বরীয় লীলার প্রকাশের আনুকুল্য বিধান। এঁরা লক্ষ্য করেছিলেন ধর্মসংস্থাপক কৃষ্ণ নামকীর্তনমুখে কলিযুগের উপযোগী প্রেমভক্তি প্রচার করে আচণ্ডাল মানুষকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। সন্ন্যাসপূর্ব বৎসরের সময়কার বিবিধ আবেশময় ও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল নবদ্বীপলীলায় অভিভূত এবং সন্ন্যাসে নিতান্ত

ব্যাকুল বিমূঢ় পরিকরবৃন্দের কাছে এছাড়া আর কিছু প্রতিভাত হয়নি। কেন তীব্র বৈরাগ, কেন অশ্রু-কম্প মূর্ছাদি, কেন কৃষ্ণের গৌরবর্ণ, এ সবের সমাধানে তাঁরা অগ্রবর্তী হননি। নীলাচল-বৃন্দাবনের যে-সব বিদগ্ধ প্রেমিক খুঁটিয়ে গৌর-লীলা অধ্যয়ন করলেন তাঁরা নবদ্বীপ পরিকরদের দর্শনের উপর ভিত্তি করেই পূর্ণাঙ্গ রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণদর্শন গড়ে তুললেন। এই দুই রীতির দর্শনে মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই। দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর নির্ভরশীল এবং পরিপূরকভাবে স্বভাবতই গড়ে উঠল। ফলে কেউ ভগবান্ বোধে গৌরবিগ্রহের আরাধনা করতে লাগলেন, আবার কেউ নবদ্বীপলীলার চেয়ে ব্রজলীলাতেই বেশি আসক্ত হলেন।[১] কবি কর্ণপূর যদিচ পিতৃ-ঐতিহ্য অনুসরণ করে গৌরভজনেই নিরত ছিলেন এমন মনে করা যায়, তবু তিনি এ বিষয়ে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক অভিমত পোষণ করতেন না এবং এর সমাধানের ইঙ্গিতও তিনি তাঁর নাটকে দিয়েছেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের দ্বিতীয়াঙ্কে গৌররূপ এবং শ্যামরূপ বিষয়ে অদ্বৈতের সংশয়ে নাট্যকার তদানীন্তন "মহামহিম"দের উপলব্ধিই ব্যক্ত করলেন—গৌর এবং শ্যাম অভিন্ন, লীলায় রূপভেদ এবং ভাবভেদ মাত্র। উপাস্য শ্যাম এবং গৌর দুই-ই হতে পারে, অহেতুকী প্রীতি যদি আকর্ষণের হেতু হয়। চরিতামৃতে দেখা যায়, রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধাস্বরূপাবৃত শ্যামকে লক্ষ্য করে সংশয়ী হয়ে মহাপ্রভুকেই জিজ্ঞাসা করছেন :

পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখোঁ মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পাঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা॥

রামানন্দ লীলাশুকের মতো মাধুর্য-সিন্ধু গোপকৃষ্ণের উপাসক হলেও শুদ্ধসখ্যে চৈতন্যোপাসকও ছিলেন ভট্টাচার্য নীলাচললীলা-তত্ত্বজ্ঞ হয়েও সম্ভবতঃ গৌরভজনেই আসক্ত ছিলেন। স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর অতি প্রিয় এবং মুখ্যলীলাসঙ্গী হলেও সম্ভবতঃ রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণরূপেই তিনি অনুরক্ত ছিলেন। সনাতন-রূপ-জীব গোস্বামী কৃত বিভিন্ন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এবং স্তবাদিতে গৌরাঙ্গের ভগবত্তা পুনঃপুন কীর্তন করা হয়েছে, তবু তাঁরা ভাগবত প্রতিপাদ্য রাসরসিক কৃষ্ণের লীলাতেই সম্ভবতঃ নিহিতচিত্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রেরিত হওয়ার পূর্বেই রূপ-সনাতন ভাগবতধর্মী ছিলেন। তখন সনাতন লিখনে কিছু প্রকাশ করেননি, কিন্তু রূপ রচনা করেছিলেন অন্ততঃ 'হংসদূত' এবং 'উদ্ধবসন্দেশ'। শ্রীচৈতন্য এঁদের ঐতিহ্য এবং মানসিকতা উপলব্ধি করে কৃষ্ণলীলা-ব্যাখ্যানেই এঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই রাধাভাববিগ্রহ যখনই অবকাশ পেয়েছেন তখনই "গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর" কৃষ্ণের আরাধনারই প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। ত্রিহুতের রঘুপতি উপাধ্যায়ের চৈতন্য-সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ (চৈ-চ, মধ্যলীলা দ্রঃ) অন্য বহু দৃষ্টান্তের একটি—

প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়।
শ্যামমেব পরং রূপং কহে উপাধ্যায়॥

---

১. তবু মহাপ্রভুর জীবৎকালে গৌরবিগ্রহের পূজা প্রারব্ধ হয়েছিল একথাও মনে করা যায় না। মুরারি গুপ্তের কড়চার যে অংশে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কর্তৃক এবং আম্বুয়া-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত কর্তৃক গৌরবিগ্রহ স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায় সে অংশ নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত।

শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়।
পুরী মধুপুরী বরা কহে উপাধ্যায়॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং কহে উপাধ্যায়॥
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
আদ্য এর পরো রসঃ কহে উপাধ্যায়॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্‌গদস্বরে॥

শ্রীচৈতন্যের সর্বাধিক গৌরবের পাত্র ঠাকুর হরিদাস উচ্চকণ্ঠে কোন্ প্রিয়নাম কীর্তন করতেন এবং তাঁর অভিলাষই বা কী ছিল? দেখা যায়, চৈতন্য নাম হয়, হরিনাম, এবং অন্ততঃ অদ্বৈত-চৈতন্য সংসর্গে এসে তাঁর অভিলাষ জন্মেছিল—'নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে'। নিজনাম গ্রহণ করায় শ্রীচৈতন্য কিরকম বিক্ষুব্ধ হতেন তার পরিচয়ও চরিতামৃতে রয়েছে :

একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্তন॥
শুনি ভক্তগণে কহেন সক্রোধ বচনে।
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্তনে॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সভাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সভে নাশাবে ভুবন॥

এ-বিবরণ অবিশ্বাস্য হতে পারে না। প্রবীণ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের দুই শ্লোকে চৈতন্যস্তুতি তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অথচ এই শ্রীচৈতন্যই প্রথম ভাবাবেশ সময়ে নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ প্রবীণ ভক্তদের মন্ত্রোচ্চারণে নিয়মিত পূজা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সে একদিন, আর সন্ন্যাস গ্রহণের পর এ আর একদিন। হিসাবে দেখা যায়, রায় রামানন্দের পর স্বরূপের অভিমতই মহাপ্রভুর একান্ত সমাদরযোগ্য ছিল। এবং তিনি যে তাঁর অশেষ স্নেহভাজন রঘুনাথদাসকে স্বরূপের নিকট সমর্পণ করেছিলেন তা অর্থহীন নয়। নবদ্বীপের পরিকরদের অনেককেই মহাপ্রভু গৌরআরাধনা থেকে নিরস্ত করতে পারেননি। নরহরি বাসুদেবাদি মমতাধিক্যবশতঃ যে পথ ধরেছিলেন তা থেকে নিরস্ত করা সহজও ছিল না। মুরারিকে রামভক্তি থেকে নিরস্ত করার ইচ্ছাও মহাপ্রভুর ছিল না। কিন্তু নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু যথার্থই পেরে ওঠেননি। তিনিই বাংলাদেশে জাতিকুল নির্বিচারে সকলকে গৌরহরি নাম গ্রহণ করিয়েছিলেন। ফলতঃ এই দাঁড়াল যে, একালের বাংলায় লিখিত পদে, চরিতাখ্যানে এবং আরাধনায় কৃষ্ণস্বরূপ গৌরই কিছুকাল পর্যন্ত কীর্তিত হতে থাকলেন এবং নীলাচল-বৃন্দাবনে অধিকতর চমৎকার ও সূক্ষ্মবৈদগ্ধ্যপূর্ণ রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণই প্রচারিত হলেন। ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় অনুভব প্রথমটিকে সমাচ্ছন্ন করে বাংলায় সর্বত্র গৃহীত হয়। কিন্তু তা ষোড়শ শতকের সপ্তম দশকের আগে নয়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর মথুরা-বৃন্দাবনের সঙ্গে বাংলার সংযোগ দৃঢ়তর হতে থাকে। বাঙলার বর্ষীয়ান্ মহান্তেরা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণাঙ্গ লীলাবাদের অভিমুখীন হয়ে নীলাচল-বৃন্দাবনের অভিমতের সমাদর

করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে নরহরি সরকার রচিত চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার পদের সঙ্গে নীলাচল-লীলার পদের পার্থক্য স্মরণীয়। অদ্বৈত-নিত্যানন্দের অপ্রকটের পর বাঙ্‌লার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব আংশিকভাবে শ্রীখণ্ডে চালিত হয়। 'গৌর-নাগর' ভাবের প্রবর্তক বিখ্যাত নরহরি সরকার ঠাকুর এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শ্রীচৈতন্যের নিতান্ত প্রিয় রঘুনন্দন উদ্‌যোগী হয়ে শ্রীনিবাস আচার্যকে বৃন্দাবনে অধ্যয়ন করার জন্য পাঠান। জাহ্নবা ঠাকুরাণী, বীরভদ্র, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতিরও বৃন্দাবনের সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ জানবার আগ্রহ কম ছিল না। বৃন্দাবন-প্রত্যাগত ঠাকুর নরোত্তমের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসবে জাহ্নবাদেবীর আনুকূল্য সকলের জানা। ঐ সময়েই কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাসের পদে রূপ-প্রবর্তিত নূতন ও সূক্ষ্ম বৈদগ্ধ্যের সন্নিবেশকে সকলেই অভিনন্দিত করেছেন।

বলা হয়েছে, চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস যখন তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করেন (আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীঃ) তখন স্বরূপদামোদর-প্রমুখ নীলাচলবাসীদের অভিমত এবং সেইসঙ্গে সনাতন-রূপের কিছু কিছু অভিমত নিশ্চয়ই নবদ্বীপে এসে পৌঁছেছিল : সেক্ষেত্রে বৃন্দাবন ঐ নূতন অভিমত সম্পর্কে নীরব রইলেন কেন? এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, রূপ-সনাতনের ভক্তি ও রসশাস্ত্রে অভিনিবেশ নবদ্বীপবাসীদের কর্ণগোচর হলেও তখনও ঠিকমত জানবার কথা নয়। আর স্বরূপ-দামোদরের সিদ্ধান্ত হয়তো মহাপ্রভুর লীলার শেষের দিকে অদ্বৈত-মুরারি-শিবানন্দের কর্ণগোচর হয়েছিল, কিন্তু তা সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ জানলেও এসব গ্রাহ্য করতেন না। স্ব-ভাবেই মত্ত থাকতেন। কবিকর্ণপূর তো তখনও বালক। আর মুরারি সম্ভবতঃ সংস্কৃত জীবনীতে মহাপ্রভুর নীলাচল-অবস্থানের প্রথম দিক পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ঐ জীবনীর তৃতীয় প্রক্রমের অর্ধ ও চতুর্থ প্রক্রম মুরারির কিনা সন্দেহ। মহাপ্রভুর তিরোধানের স্বল্প পরেই স্বরূপ-দামোদর তিরোহিত হন। রঘুনাথদাস গোস্বামী, যিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ও লীলা-কড়চা কণ্ঠস্থ করেছিলেন, তিনিও বৃন্দাবনপ্রয়াণ করেন। ফলতঃ অন্ত্যলীলা লেখার সময় বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর রসরাজ-মহাভাবত্ব কানে শুনলেও সম্যক্‌ না জানায় গ্রন্থমধ্যে স্থান দিতে পারেননি। দেখা যায়, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাচল যাত্রা পর্যন্ত ঘটনা বৃন্দাবন যেরকম মনপ্রাণ দিয়ে প্রকাশ করেছেন অন্ত্যলীলা সেরকম পারেননি। অন্ত্যলীলার ঘটনার বর্ণনায় তাঁর গ্রন্থে নানান্‌ অসংগতিও লক্ষ্য করা যায়। এরকম ক্ষেত্রে নীলাচল-বৃন্দাবনের নোতুন মত বৃন্দাবনদাস অধিগত করেও তাঁর গ্রন্থমধ্যে স্থান দেননি এ অভিযোগ যথার্থ নয়। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল যে-রীতির গ্রন্থ তাতে ইতিবৃত্ত রক্ষা বা তত্ত্বরসের কোনো বৈদগ্ধ্য তাঁর কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। নীলাচল-বৃন্দাবনের রাধাভাবিত-কৃষ্ণ মত শ্রীনিবাস-নরোত্তমের বৃন্দাবন গমনের পূর্বে বাঙ্‌লায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিশেষতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃত গ্রন্থের প্রচারের পূর্বে নয়। এরপর থেকে বাঙ্‌লার আচণ্ডালদ্বিজ বৈষ্ণব-সমাজ মোটামুটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এক, শিক্ষা-দীক্ষাহীন বৈষ্ণবজন যাঁরা নিত্যানন্দ-বীরচন্দ্র প্রচারিত সহজ প্রেমভক্তিকে ধরে রইলেন, আর এক, যাঁরা শিক্ষার আভিজাত্যসম্পন্ন, নব গোস্বামী-শাসিত বাদানুবাদনিষ্ঠ পণ্ডিত-ভক্ত, শাস্ত্রাধ্যায়ী ও কবিসমাজ। উভয়পক্ষের যৎকিঞ্চিৎ যোগাযোগ অবশ্য অনুমেয়।

উপরিলিখিত বিষয় থেকে সহজেই উপলব্ধ হবে যে, নবদ্বীপ নীলাচল বৃন্দাবনে এই

নবলোকধর্মের উদ্‌গাতা সম্পর্কে স্বল্পভিন্নরীতির ধারণা ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি প্রচলিত থাকলেও তা এমন প্রকট ও সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেনি যাতে মহান্ত ভক্তদের মধ্যে বিদ্বেষ মনোমালিন্য ঘটে। অথচ ইতিবৃত্তাশ্রয়ী আধুনিক কোনো কোনো বিচারক জীবনী ও তত্ত্বগ্রন্থের উল্লেখাদি বিচার করে নবদীপ-বৃন্দাবনের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষের বীজ দেখতে পেয়েছেন। আমরা পূর্বেই 'পদ্যাবলী'র ভূমিকা থেকে ডঃ সুশীলকুমার দে-র অভিমত উদ্ধার করেছি। বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত করে তিনি দেখেছেন Vaisnava Faith and Movement গ্রন্থে। এর পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলছেন :

Unlike the Vrindavana Gosvámins, thcy take Chaitanya as the centre of their thought and emotion, and regard him as the highest reality and object of adoration of their faith. This has been characterised as the Gaurapáramya-Váda, which the Vrindávana Gosvámins never discuss or set forth in their thcological treatises. In the eyes of the contemporary composers of padas of Chaitanya for instance, Chaitanya is Kiṛsṇa himself who in his recollection for Vṛindávana pines for Rádhá. They also believe in the Radha Bhava of Chaitanya as both Kiṛsṇa and Rádhá in one personality. They do not, however, consoder it necessary to discuss the question, but take it as already established by Anubhava or personal experience. Narahari and his disciple Lochana, however, develop a doctrine of Guara-nāgara-bhāva in which the devotee (in the Rāgānugā way) regards Chaitanya as the Nāgara and himself as a Nāgara. But this doctrine recevies little credit in the orthodox circles....

এই অভিমতের প্রতিধ্বনি করে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর শ্রীচৈতন্য-চরিতে উপাদান গ্রন্থে একেবার স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন—"গৌড়মণ্ডলে একপ্রকার মতবাদ এবং বৃন্দাবনমণ্ডলে অন্যপ্রকার মতবাদ স্থাপিত হইয়াছিল।" এবং "বৃন্দাবন ও গৌড়দেশে উত্থিত দুই মতবাদের শ্রীচৈতন্যের স্থান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট গৌরাঙ্গ হইতেছেন উপায়মাত্র (means to an end) আর গৌড়ে উত্থিত মতবাদের তিনি স্বয়ং উপেয় (end in itself)"[১] এই দ্বিতীয় বিবৃতিটিই অভিযোগ হিসাবে গুরুতর এবং শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে তাঁর প্রত্যক্ষেই এরকম দ্বান্দ্বিক মত প্রচলিত হয়েছিল এই ইঙ্গিতে প্রকারান্তরে তাঁর প্রতিও কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু আগে ডঃ দে-র প্রথম বক্তব্য পরীক্ষা করে দেখা যাক। তিনি বলেছেন, নবদ্বীপের পরিকরবৃন্দের মধ্যে কোনো সুসংগ্রথিত মতবাদ গড়ে ওঠেনি। ঠিক কথা। তাঁরা নিজ অন্তর দিয়ে শ্রীগৌর বিষয়ে যে-যে ধারণায় উপস্থিত হয়েছিলেন তা-ই ব্যক্ত করেছেন। নরহরি ও তৎশিষ্য লোচন যে-পথে গেছেন, শ্রীবাস, মুরারি, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ সে পথে যাননি। নরহরি সরকার বিরচিত পদে যেমন গৌর-নাগর ভাব দেখা যায়, তেমনি গোপীভাব বা

১ "In these Padas, as in the lives of Chaitanya which derive their inspiration from the Navadvipa circle, and to which they have a natural affinity, no abstruse theology obscures the simple and passionate faith; to them Caitanys is not an image of their supreme deity, but the deity himself incarnated, not a means, but an end in itself."

S. K. De–Vaisnava Faith & Movement

রাধাভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায়। আবার কবিকর্ণপূর তাঁর চৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যে চৈতন্যজীবন যেমনভাবে বর্ণনা করেছেন, নাটকে ঠিক তেমনভাবে করেননি। অথচ একটি বিষয়ে এঁরা সকলেই একমত যে, শ্রীচৈতন্য কলিযুগে আবির্ভূত কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নন। নরহরি বাসুদেব যখন গৌরাঙ্গকে ভাগবতের কৃষ্ণত্ব উপলব্ধি করেই তাঁরা তা করেছেন, আবার যখন সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের কৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা বর্ণনা করেছেন তখনও কৃষ্ণবোধেই করেছেন, রাধাভাব-অবলম্বনকারী কৃষ্ণবোধে এই যা তফাৎ। কিন্তু তাহলে রূপ-স্বরূপ-রঘুনাথদাসের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য কোথায়? যদি বলা যায়, নবদ্বীপ-পরিকরদের সহজ উপলব্ধি ছিল ('simple and passionate') স্বরূপ-রূপের তা ছিল না, তাহলে সে তো অত্যন্ত বিপজ্জনক অথবা খামখেয়ালী মন্তব্যে দাঁড়ায়। এর প্রমাণই বা কী, যখন রূপ-সনাতন-জীব তাঁদের শতাধিক বন্দনায় এবং অন্যপ্রকারেও শ্রীচৈতন্যকে ভগবান্ বলেই বিবৃত করেছেন। আবার এই দুই মতবাদীদের একজনকে বলতে দেখা যাচ্ছে—"ভাবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই হিসাবে স্বরূপ-দামোদর যে প্রকারে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের রচিত সাহিত্যে যাহা আছে" ইত্যাদি (চৈ-উপাঃ)। তাহলে তো গোল চুকেই গেল। তাহলে আর লেখক তাঁদের উদ্ভাবিত গৌর-পারম্যবাদের দোহাই দিয়ে কবিকর্ণপূরের "গোস্বামী" না হওয়ার জন্য আক্ষেপ করেন কেন?—"বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা যে ছয়-গোস্বামী নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র হইয়াও এবং অতগুলি গ্রন্থ লিখিয়াও স্থান পাইলেন না; অথচ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না আসিয়া এবং রঘুনাথ ভট্ট কোনো গ্রন্থ না লিখিয়াও স্থান পাইলেন।" কিন্তু "গৌর-পারম্য" শব্দের অর্থ কী? এতে কি এই ব্যঞ্জিত করে যে, কৃষ্ণ-সম্পর্কহীন গৌরই স্বয়ং ভগবান্? ডঃ সুশীলকুমার শুধু সাম্প্রদায়িকতারই আভাস দিয়েছেন, ভিতরে প্রবেশ করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনবোধ করেননি। ভেবে দেখেননি যে, কোনো ভক্ত "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" প্রত্যক্ষ করেও ভজনের জন্য গৌরবিগ্রহকে স্বচ্ছন্দে অবলম্বন করতে পারেন। ডঃ বিমানবিহারী বলেছেন "শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার ও সম্ভবতঃ মুরারি গৌরমন্ত্র-দ্বারা রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ গৌরাঙ্গেরই উপাসনা প্রবর্তন করেন।" রক্ষা করেছেন, ভাগ্যিস বলেননি যে, কৃষ্ণ-সম্পর্কহীন গৌরেরই ভজনা করেছেন দ্বিতীয় স্বয়ং ভগবান হিসাবে! কিন্তু ওকথার কোনো প্রমাণ নেই, নরহরি শিবানন্দ গৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেননি। আসলে এ হল ভজন-সাধনের ব্যাপার, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"। যেমন একজন বহু পরবর্তী পদকার "যার মনে লেগেছে যারে তারা ভজুক তার গো, মোর মনে লেগেছে ভালো শচীর দুলাল গোরা গো"। এসব নিয়ে ইতিবৃত্তের কার্য-কারণের কোনো যোগ নেই। একথা কোনোমতেই মনে করা যায় না যে নরহরি, শিবানন্দ, মুরারি মহাভাব-ব্যাকুলিত প্রত্যক্ষে রাধারূপ কৃষ্ণের ধারণার উপর বিতৃষ্ণ ছিলেন। তারপর ঐ গৌর-নাগর ভাব। এর ভিত্তি যদি বৃন্দাবনের নটবর কৃষ্ণের উপর না হয় তাহলে তার কোনো অর্থই হয় না। গয়া-প্রত্যাগত বিশ্বম্ভরের নৃত্যকীর্তনাদি-সমন্বিত ভাবাবেশ ও পুষ্পমালাঢ্য চাঁচরচিকুর-সুশোভিত নবীন রূপ ভাগবত-গীতগোবিন্দ-চণ্ডীদাস-পদাবলীর পাঠক ভক্তের মুগ্ধ

দৃষ্টিতে গোপীচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণের বলে প্রতিভাত হওয়াতেই গৌরনাগর ভাবের বর্ণনা। রাধামোহনঠাকুর এইজন্যই নরহরি-লোচন-বাসুঘোষের পদকে 'ভাব-বিতর্ক' বলে এর যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। বৃন্দাবনদাস-এর সপক্ষতা করেননি, কারণ, ব্যাপারটি ঐতিহাসিক বাস্তব নয়। লোচনদাস যে করছেন তার কারণ গুরু নরহরির নির্বিচার অনুসরণ এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব, ভাবকল্পনার প্রাবল্য। তবু গৌরনাগর-ভাবনাকেও অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌরত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না।

এঁরা যাঁরা চৈতন্যজীবন এবং জীবনীগ্রন্থসমূহের উপর ইতিহাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ছোটখাট বিরুদ্ধতা এবং অসংগতির সমন্বয় সাধন না করতে পেরে নানান্ জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁর কলহ-সমাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে মাঝে মাঝে কিরকম ভ্রম-প্রমাদ করে ফেলেন তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। "Vaisnava Faith & Movement" গ্রন্থে চৈতন্য–জীবনের উপকরণ সংগ্রহে নিরত লেখক বলেছেন :

"Vasudeva paints Chaitanya as a devout person even from his birth; and like narahari and some other Pada-writers, he believes in the Radha-bhava of the Chaitanya incarnation--a doctrone, which is found indeed in the Stotras of Gosvamins and in the Ramananda Ray episode described by Krisnadasa Kaviraja, but which must have been a dogma of an earlier Navadvipa origin" এর পাদটীকায় উদাহরণ দেওয়া হয়েছে :

নরহরি : গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে। ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥

বাসুদেব : আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কাঁদে লোটায় ধরণী॥

শিবানন্দ সেন : রাধা রাধা বলি পঁহু পড়ে মুরছিয়া। শিবানন্দ কাঁদে পঁহুর ভাব না বুঝিয়া॥

পাঠক বিচার করুন, একে কি "রাধাভাব" বলে? না এ কৃষ্ণভাব? অবশ্য রাধাসম্বন্ধীয়ভাব এমন মধ্যপদলোপী সমাসের কষ্টকল্পনা করলে প্রযুক্ত রাধাভাবের অর্থ হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'রাধার ভাব' এই অর্থেই শব্দটি পারিভাষিক হয়ে পড়েছে, খুশিমত ব্যাখ্যা করার কোনো অধিকার নেই। ঐ গ্রন্থকারের ব্যাখ্যানের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানের গ্রন্থকারের অভিমতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইনি কৃষ্ণভাবকে রাধাভাব বলে বিষয়টিকে গেলামলে করেননি, কিন্তু নীলাচল ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের উপলব্ধির মহিমা খর্ব করতে বদ্ধপরিকর হয়ে শ্রীরূপ লিখিত চৈতন্যাষ্টকের রাধাভাবাবস্থার সঙ্গে সরকার ঠাকুর রচিত পদের কৃষ্ণভাবাবেশের ঐক্য নির্ধারণ করেছেন। কারণ, বৃন্দাবন-স্মরণের কথা দুয়েতেই আছে। ব্যঞ্জনা এই যে, সরকার ঠাকুরের রচনা অবলম্বনেই রূপগোস্বামী লিখেছেন। যেমন—

"গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পঁহু যমুনায় ভ্রমে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পূরব আবেশে ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে।
পীতবসন আর সে মুরলী চাহে॥...ইত্যাদি।

"শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যাষ্টকে প্রভুর নীলাচলের সমুদ্রতীরস্থ উপবন দেখিয়া বৃন্দাবন মনে পড়ার কথা আছে—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রবলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

...নরহরি সরকার ও শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের একই রূপ ভাবাবেশে (!) ভ্রম বর্ণনা করিয়াছেন"।

স্বমতের পোষকতা করতে গিয়ে এরকম অনেক বিষয় তিনি তাঁর বিখ্যাত "উপাদানে" কৌশলে সজ্জিত করেছেন যাতে নীলাচল-বৃন্দাবন-Tradition এবং গ্রন্থরচনাদি পাঠকের কাছে যথার্থই কৃত্রিম ও স্বল্পমূল্য প্রতিভাত হয়। তিনি নিশ্চিত বুঝেছেন যে গৌর-নাগরভাব-বিষয়ে পদরচনা করেছিলেন বলেই মুরারি, কবিকর্ণপূর এবং বৃন্দাবনদাস নরহরির উল্লেখ করেননি! নরহরির নবদ্বীপ-লীলাপরিকর হিসাবে অবিসংবাদিত প্রাধান্যের প্রমাণ তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির ভণিতা দেওয়া পদ থেকে। তাঁর মতে চরিতামৃতকার কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও নাটক থেকে মহাপ্রভু-রামানন্দ সাক্ষাৎকার হুবহু অনুবাদ করেছেন, অথচ কর্ণপূরের কাছে ঋণের কথা চেপে গেছেন। যেন রামানন্দ রায় থেকে স্বরূপ-দামোদর, রঘুনাথদাস এবং তাঁদের থেকে কবিরাজ গোস্বামীর জানা সম্ভবই ছিল না। কবিকর্ণপূর যে শিবানন্দ-পুত্র, আর সব তথ্যের ভাণ্ডার তো শিবানন্দের হাতেই ছিল! আরও দেখা যায়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে একখানি পুরোপুরি অনৈতিহাসিক গ্রন্থ এবং গোবিন্দদাসের কড়চাকে কাল্পনিক সৃষ্টি জ্ঞান করেও লেখক স্বমতের পরিপুষ্টির জন্য এঁদের থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে একটুও দ্বিধা করছেন না। আবার উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা এবং মুরারির কড়চার সর্বাংশই তিনি সত্য মনে করেন। মুরারি যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর সংস্কৃত চরিতামৃত লেখেন তা তিনি যখন ধরে নিচ্ছেন তখন আর কথা কী? কিন্তু "উপাদানে"র লেখক চরিত-গ্রন্থগুলির তথ্যস্থাপনে ও বর্ণনায় যথার্থ কতকগুলি বৈষম্য দেখিয়েছেন, হয়ত বা এইগুলির উপর ভিত্তি করেই নবদ্বীপ ঐতিহ্যের সঙ্গে নীলাচল-বৃন্দাবন ঐতিহ্যের তিনি বিরোধ অনুমান করেছেন এবং সম্ভবতঃ মহতের মতই দুর্বল-পক্ষ অবলম্বন করতে চেয়েছেন। তাঁর নির্দিষ্ট কয়েকটি বৈষম্য নিয়ে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি, কল্পিত তত্ত্ববিরোধ মীমাংসার প্রয়োজনে আরও দু-একটি বিষয় মন্তব্যসহ উল্লেখ করতে হচ্ছে। তিনি বিরোধ-বৈষম্যকে অতিশয়িত করে দেখেছেন কিনা এবং অন্যবিধ অনুমান সম্ভব কিনা তা পাঠকেরাই বিচার করবেন।

১। কর্ণপূর স্বরূপ-দামোদরের কড়চার নাম করেননি, যদিও তাঁর নাটকে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ্য লীলাপরিকর হিসাবে স্বরূপ-দামোদরের উল্লেখ করেছেন।

এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য, এই অনুল্লেখের ফলে স্বরূপ গোস্বামীর রচনা বিশেষ কিছু ছিল না এমন প্রমাণ হয় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ পুনঃপুন লিখেছেন যে রঘুনাথদাসের কণ্ঠ থেকে তিনি ঐ কড়চায় লিখিত বিষয়সমূহ জেনেছিলেন এবং তদনুযায়ী অন্ত্যলীলা লিখেছেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ লীলা সম্পর্কে স্বরূপের রচনা, নবদ্বীপলীলা-পরিকরদের,

যাঁরা বর্ষে বর্ষে আসতেন এবং দু-চার মাস থেকে চলে যেতেন, তাঁদের তেমন জানার কথা নয়, তাই কর্ণপূরও জানেননি। তত্ত্বদৃষ্টির বৈষম্যের জন্য তিনি স্বরূপের মতের উল্লেখ করেননি, এ অলীক কল্পনা মাত্র। অথচ, লেখকের মতে, স্বরূপ-দামোদরের পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ক অভিমত কর্ণপূর তার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় গ্রহণ করেছেন। আবার কর্ণপূর যাঁর শিষ্য, সেই শ্রীনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'চৈতন্যমতমঞ্জুষা'র মঙ্গলাচরণে "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলের মত তো পূর্বেই গ্রহণ করেছেন দেখছি। অবশ্য আমরা সন্দেহ করি, এই শ্লোকটি চক্রবর্তীপাদের নিজের নয়। যাই হোক, সত্য হলে কর্ণপূরের ব্রজ-বিমুখতা এবং লেখক-উক্ত গৌর-পারম্যবাদ টেঁকে কী করে?

২। কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত চরিতামৃত থেকে কোন শ্লোক উদ্ধার করেননি, "চন্দ্রোদয়" থেকে করলেও প্রমাণ বিষয়ে যেমন বৃন্দাবনদাস, মুরারি গুপ্ত এবং স্বরূপ দামোদরের নাম উল্লেখ করেছেন, তেমন কবিকর্ণপূরের নাম করেননি—ইত্যাদি।

এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য, সংস্কৃত চরিতামৃত থেকে কবিরাজ একটি শ্লোক নিয়েছেন, তাঁর মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে : বৃন্দাবনে গিয়ে মহাপ্রভু গোবর্ধন আরোহণ করতে না চাওয়ায় স্বয়ং কৃষ্ণ নেমে এসে তাঁকে দর্শন দিলেন এই ঘটনার সমর্থনে। কেবল রূপ-সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন ঘটনার বর্ণনাতেই নয়, অন্য বহু বিষয়েও তিনি আত্মপক্ষ-সমর্থনে কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক থেকে শ্লোক গ্রহণ করেছেন। যেমন, গঙ্গায় যমুনাভ্রমবশতঃ মহাপ্রভুর যমুনাস্তব (মধ্যলীলা ৩য়); সার্বভৌমের সঙ্গে ব্রহ্ম বিষয়ে বিতর্কে সবিশেষ-ব্রহ্মস্থাপনে শ্লোক (মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ); নীলাচল-আগত স্বরূপ-দামোদরের চৈতন্যস্তব (মধ্যলীলা ১০ম) : সার্বভৌম-প্রস্তাবিত প্রতাপরুদ্রকে দর্শনদাস বিষয়ে মহাপ্রভু কর্তৃক অনৌচিত্য নির্দেশের দুটি শ্লোক (মধ্যলীলা ১১শ); রঘুনাথদাসের নীলাচলে মহাপ্রভু মিলনে শ্লোক (অন্ত্যলীলা ৬ষ্ঠ): এ ছাড়া অধুনা-লুপ্ত কর্ণপূরের আর্যাশতক-উদ্ধৃত তাঁর সাত বৎসর বয়সে রচিত এবং মহাপ্রভুর সামনে উচ্চারিত শ্লোক (অন্ত্যলীলা, ১৬শ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কবিরাজ গোস্বামী তাঁর পূর্বসূরী কবিকর্ণপূরের রচনার উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। তিনি আদিলীলার ও মধ্যের কিয়দংশের বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস ও মুরারির উপর প্রধানভাবে নির্ভর করেছিলেন, যেমন অন্ত্যলীলার জন্য স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের উপর, কারণ এঁরা অন্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। এছাড়া তিনি আরও নানান্ সূত্র থেকে প্রমাণ বা সমর্থন সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলি গৌণ ব্যাপার বলেই উল্লেখ করেননি। কিন্তু "উপাদানে"র লেখক যেভাবে প্রমাণপঞ্জীতে কর্ণপূরের নাম দাবি করেছেন, সেরকম প্রমাণপঞ্জী দেওয়ার তিনি প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ আধুনিক রীতি; এটি ভালোও বলা চলে, মন্দও বলা চলে। আর, সকলের নাম করা এবং কাউকে না চটানো এটিও আধুনিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য! সেকালের লেখকেরা এসব কথা ভেবে দেখেননি।

৩। কবিরাজ গোস্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত চৈতন্যচন্দ্রামৃতের নামও করেননি। লেখকের অনুমান এই যে প্রবোধানন্দ গৌর-পারম্যবাদের ভক্ত ছিলেন বলে বৃন্দাবনের দল কেউ তাঁর সপক্ষতা করতে চাননি।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, প্রবোধানন্দের চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেন না, তাই কেউ নাম করেননি বা উদ্ধৃতি তোলেন নি। শুধু কবিরাজ গোস্বামীর

উপর দোষারোপ করলে চলবে কেন? গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় প্রবোধানন্দের গ্রন্থের উল্লেখ আছে, অতএব 'চন্দ্রামৃত' ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হলেও এবং গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ না করা গেলেও চৈতন্যচন্দ্রামৃত স্তবের প্রচার ছিল না এমন মনে করা যায় স্বচ্ছন্দে। আমাদের আরও মনে হয়, অনুরাগবল্লী-রচয়িতা মনোহরদাসই প্রবোধানন্দের গ্রন্থের প্রচার করেন। তাঁর দাক্ষিণাত্যে যাতায়াত ছিল এবং সে অঞ্চলে তাঁর বহু শিষ্যও ছিল। প্রবোধানন্দের উপর সাম্প্রদায়িক মত আরোপ করার আগে তাঁর শিষ্য ও ভ্রাতৃপুত্র অন্যতম গোস্বামী গোপাল ভট্টের কথা চিন্তা করতে হবে। তা ছাড়া দেখতে হবে প্রবোধানন্দ কেবল গৌরাঙ্গেরই অর্চনা করেননি, বৃন্দাবনের কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের অভেদ এবং শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-সম্মিলিত বিগ্রহও বারংবার লক্ষ্য করেছেন। বাহুল্যভয়ে তা দেখানো গেল না।

সুতরাং শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে গৌড়ভূমিতে প্রবর্তিত প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে নীলাচল-বৃন্দাবনের সূক্ষ্মতর ও প্রবৃদ্ধতর ধারণার যদি কিছু পার্থক্য থাকে তা পরিমাণগত মাত্র, গুণগত নয়। এই নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকলে জীবনীকার, প্রচারক ব্যাখ্যাতারা নিশ্চয়ই তা কোনো না কোনো রীতিতে নির্দেশ করতেন। নীলাচল-বৃন্দাবনের রাধাভাবান্বিত-কৃষ্ণ-তত্ত্ব নির্দ্বন্দ্বে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল, তবে কিছু সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীবাস-মুরারি-শিবানন্দ-কর্ণপূর তা সম্যক্ অবগত হতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। না পারলেও ক্ষতি কিছুই অনুভব করেননি, কারণ কল্পিত দু'পক্ষের পার্থক্য সামান্যই। আর আমাদের প্রার্থনা, যাঁরা উক্ত বিরোধ সম্পর্কে দৃঢ়মত তাঁরা ইতিহাসানুগত প্রমাণ দিন, বিনা প্রমাণে লোকচিত্তে কোনো সংস্কার গড়ে তোলার প্রয়াস যেন না করেন। আরও দুঃখের কথা, সাম্প্রতিক কোনো কোনো সাহিত্য-ইতিবৃত্তকার এরকম কলহদর্শী মতবাদকে বিনা-অনুসন্ধানে, কেবল অভিনবতার খাতিরে অথবা গড্ডরিকা-রীতিতে মেনে নিয়েছেন, যার ফলে ছাত্র ও জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের চিত্তে বৈষ্ণব ধর্ম, যুগ ও লোকমান্য সাধকদের সম্পর্কে সন্দেহের উদ্ভব ঘটেছে। দলগত কলহ বিশেষভাবে আধুনিকের স্বভাব। অপ্রমাণে এই স্বভাব ত্যাগী বৈরাগী নিষ্কিঞ্চন মানুষগুলির উপর আরোপ করা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় স্বভাবতই উক্ত মত-প্রসঙ্গ এসে পড়ল বলে সে বিষয়ের সমাধান করে আমরা এখন "বৈষ্ণব" তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এবিষয়ে আমাদের প্রয়োজন নির্বাহ করছে মুখ্যভাবে শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভ এবং কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত।

মনে রাখতে হবে—সৃষ্টি, বিশেষে জীব অর্থাৎ মানুষ এবং স্রষ্টা সম্পর্কে তাত্ত্বিক চিন্তাই হল দর্শন। বহুপূর্বে এই তত্ত্বচিন্তন ভারতবর্ষে উপনিষদের যুগে প্রারব্ধ হয়েছিল, অথবা, একথা বলাই ঠিক যে ঐ সময় 'ঋষি' আখ্যায় অভিহিত প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা তাঁদের প্রজ্ঞানময় বিচিত্র উপলব্ধিসমূহ প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলি পরবর্তী দর্শনের বীজ, কিন্তু ঠিক মননমূলক দর্শন-পদ্ধতির গঠন নয়। ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি প্রধান দশ-এগারোটি উপনিষদে যা যা বলা হয়েছে তাতে নানান্ মত ও পথের কথা আছে। ভারতে প্রথম মননমূলক দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত করেন যজ্ঞকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন স্বানুভবীরা এবং তারপর সাংখ্যযোগচিন্তকেরা। এঁদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ দার্শনিকেরা। তাঁদের শূন্যতাবাদ,

ক্ষণিকতাবাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ দর্শনে জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়নি। অথচ উপনিষদের বহু মন্ত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ব্যাস-বিরচিত বলে কথিত ব্রহ্মসূত্রেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব, সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রভৃতির বিষয় চিন্তিত হয়েছে। মহাভারতের অন্তর্গত গীতা-অংশে, বিষ্ণুপুরাণ প্রমুখ অন্ততঃ দু'চারটি পুরাণেও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সমসাময়িক আস্তিক-বিশ্বাসের পরিচয় প্রাপ্তব্য। বিচার দৃষ্টি নিয়ে উপনিষদ্ এবং গীতা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না এবং জীবনধর্মকেই চরম বস্তু বলে মনে করতেন এমন সম্প্রদায় (বোধ হয়, চার্বাক এবং বার্হস্পত্য) তখন অপ্রধান ছিল না। মুখ্যতঃ এঁদের উপলব্ধির বিরুদ্ধতার জন্যই যে উপনিষদের প্রারম্ভ, তার প্রমাণ ঐসব পর্যালোচনের মধ্যেই রয়েছে। সৃষ্টিতে যা আছে,বা যা হচ্ছে, যা হয়েছে এবং যা হবে, সমস্ত কিছুর মূলীভূত চরম একটি সত্যবস্তু লক্ষ্য করে তার সাধারণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'ব্রহ্ম'। এমন বহু মন্ত্র অবশ্য আছে যাতে সৃষ্টিকে অসত্য বলা হয়নি, সৃষ্টিসহ ব্রহ্ম সত্য এমন কথাও বলা হয়েছে।

ব্রহ্মসত্য উপলব্ধিকে আশ্রয় করে পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক চিন্তনের প্রতিষ্ঠা করেন শংকরাচার্য। তাঁর পূর্বে বৌদ্ধ মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের নাস্তিক দর্শন মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক মতবাদে পল্লবিত হয়ে প্রায় সমস্ত উত্তরভারত ব্যাপ্ত করে বিদ্যমান ছিল। অসৎ-বাদকে নিরস্ত করে সৎ-বাদ প্রতিষ্ঠায় শ্রীপাদ শংকর শূন্যতাসমর্থক যুক্তিতর্কের সাহায্য নিয়েই শূন্যতার খণ্ডন করেন। তাই তাঁর ব্রহ্ম সত্যবস্তু হলেও শূন্যের মতই নিরাকার, নির্বিশেষ, অনির্বাচ্য। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের জগৎও ক্ষণিকতাবাদীদের মত তাঁর কাছে অসত্য। কিন্তু মৌল সংবাদ স্থাপন করতেই দার্শনিক মননের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় উপলব্ধির ক্ষেত্রেও ভারতে বিপ্লব ঘটে গেল। বিশেষতঃ নির্গুণ ব্রহ্মের পাশাপাশি সগুণ ব্রহ্মের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত করায় শ্রীশংকর প্রকারান্তরে পরবর্তী কেবল-সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ভক্তিবাদের পথও চিহ্নিত করে রেখে গেলেন। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মই তাঁর যুক্তিসিদ্ধ অনন্য তত্ত্ব হওয়ায় তিনি পরবর্তী ভক্তিবাদী ঈশ্বরোপাসকদের দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হলেন। আমরা পূর্ববর্তী ভূমিকায় অদ্বৈতবাদ থেকে উদ্দীপিত ভক্তিশাখার তত্ত্ববাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁদের মূলসূত্রগুলির পর্যালোচনা করে তা থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিদর্শনের পার্থক্য প্রদর্শনের প্রয়োজন অনুভব করছি।

ক. ব্রহ্ম ঈশ্বর—শংকরের মতে নির্গুণব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। এই ব্রহ্ম শুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ। মায়ার মধ্যে প্রতিবিম্বিত এই ব্রহ্মের আভাসই ঈশ্বর। মায়িক জীবনের ধারণার শেষ সীমা এই ঈশ্বর পর্যন্ত। মায়ার আবরণ ছিন্ন করতে পারলে ও মানুষের শুদ্ধ চিৎ স্বপ্রকাশ হয়ে পড়লে পর, ব্রহ্মের সঙ্গে সেই চিৎ অভিন্ন হয়ে পড়ে। তখন জীব ব্রহ্মবিৎ এবং ব্রহ্ম দুইই হয়ে পড়ে। রামানুজের মতে ব্রহ্ম কখনোই শুদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ, নির্গুণ নির্বিশেষ এবং অনির্বাচ্য নন। তিনি সগুণ ঈশ্বরই এবং এই সগুণ বা সবিশেষ ঈশ্বরই শেষ সত্তা। জীব এবং জড় কোনো মায়িক ব্যাপার নয়; ঈশ্বরের মতই সত্য, যথাভূত বাস্তব : এ যেন ঈশ্বরের দেহ। চিৎ এবং অচিৎ অর্থাৎ জড় পদার্থের বিবিধ বৈচিত্র্য পার্থক্য নিয়েই ঈশ্বর ঈশ্বর, এসব বাদ দিয়ে নয় (জার্মান দার্শনিক Hegel এবিষয়ে রামানুজের অনুগামী)। ঈশ্বরই জগৎ-রূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হয়েছেন স্বেচ্ছায়, যেমন কারণ

কার্যে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে কিন্তু ঈশ্বর পরিবর্তিত হন না, তাঁর গুণ ও ধর্ম পরিবর্তিত হয় মাত্র, তিনি অবিকৃত থাকেন। অচিৎ এবং চিৎ অর্থাৎ জড় এবং জীবাত্মা তাদের স্থিতির জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। তিনি জীবের অন্তর্যামী এবং পরমা-গতি। তিনি অপ্রাকৃত দেহ-বিশিষ্ট, বাসুদেবাদিচতুর্ব্যূহ-সমন্বিত, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তা। তাঁকেই নারায়ণ বা পর-বাসুদেব বলা হয়, শক্তি এবং করুণার বিগ্রহস্বরূপিণী শ্রী বা লক্ষ্মী তাঁর অনপায়িনী শক্তি। জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। জীবাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভিন্ন এবং অভিন্ন দুইই, যেমন ব্যক্তির দেহের সঙ্গে অন্তরাত্মার সম্পর্ক।

ব্রহ্মসম্প্রদায়ী মধ্বের ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ক অভিমত বহুলাংশে রামানুজাচার্যের মতই। কিন্তু মধ্বাচার্য রামানুজের মত ভেদাভেদবাদী (= ভেদ সহ অভেদ) নন। তিনি নিঃশেষ ভেদবাদী, অর্থাৎ জীবাত্মা এবং বস্তুনিচয়, যা জড়-প্রকৃতির সৃষ্টি, তাঁর মতে তা ঈশ্বরের দেহ সুতরাং মূলতঃ অভিন্ন ব্যাপার নয়। চিরন্তন দ্বৈত বা নানাত্ব অর্থাৎ পার্থক্যই সত্য। রামানুজ-মতে ভেদ অভেদের ধর্ম মাত্র। রামানুজের মতই মধ্ব ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জড় এই তিনের সত্যতা ও অনাদিত্বে বিশ্বাসী এবং বিষ্ণু বা ঈশ্বরের নেতৃত্ব ব্যূহ, অবতার, লক্ষ্মী প্রভৃতিও স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত-কারণ মনে করেন, উপাদান-কারণ নয়। ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে নিম্বার্ক বা সনক-সম্প্রদায়ের ধারণা রামানুজেরই অনুসারী, যদিচ তাঁরা মনে করেন যে, দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুইই সত্য। পার্থক্য এই যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বর মনে করেন এবং রাধাকে তাঁর শক্তি মনে করেন। শুদ্ধাদ্বৈত বা বল্লভ-সম্প্রদায় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদীরা ঈশ্বর-স্বরূপ বিষয়ে রামানুজ প্রভৃতির সঙ্গে একাত্ম। অর্থাৎ ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দময়, অবতার-ধাম-বিগ্রহাদিসম্পন্ন, এবং সর্বকারণ বলে মনে করেন। একই সঙ্গে ভেদ এবং অভেদের বিরুদ্ধধর্মতা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে ঈশ্বরের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির জন্য। এঁরা লীলাবাদী এবং শক্তিবাদী। মধ্ব সম্প্রদায়ের মত কেবল-ভেদবাদী নন। এই অচিন্ত্য শক্তির কল্পনা করেই তাঁরা ঈশ্বর এবং জীবের যাবতীয় বিরুদ্ধ ধর্মের সমাধান করতে চেয়েছেন। শুদ্ধাদ্বৈত বা বল্লভ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য যৎসামান্য এবং নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মত এঁরা শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবান্ এবং রাধাকে তাঁর শ্রেষ্ঠা শক্তি বলে মনে করেন। বিশেষ এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে নারায়ণ-বাসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি এবং অবতার ও ব্যূহাধিপতিদের শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং কলা বলে গ্রহণ করা হয়। নারায়ণ ঐশ্বর্যমূর্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যমূর্তি বলে নারায়ণ থেকে শ্রীকৃষ্ণের গুণাধিক্য কল্পিত হয়। ভক্তদের বাসনাপূর্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন বিগ্রহে নানা মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মতে এই নানাত্ব কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাসের ফলেই হয়ে থাকে, এমনকি রাধাও কৃষ্ণের নিজ হ্লাদিনী শক্তির পরিণাম মাত্র, মূলে একাত্ম, লীলায় পৃথক্। এসব নিয়ে সৎ চিৎ আনন্দের পূর্ণতম বিকাশ যাঁর মধ্যে তিনি স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আর তাঁর বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি ত্রিবিধ শক্তির অধিকারী। স্বরূপ-শক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা।

খ. জীব—অদ্বৈতমতে জীব ব্রহ্মই, মায়াতে প্রতিবিম্বিত হয়ে, অবিদ্যা-সংস্পর্শে অথবা অবিদ্যার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে জীব নিজকে পৃথক বলে মনে করে ও সংসারভোগ করতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদি এবং অহং নিয়ে জীবের যে অন্তঃকরণ তা মায়িক উপাধি মাত্র, অথচ অজ্ঞান-বিমোহিত জীব একেই সর্বস্ব বলে জানে, সাক্ষীচৈতন্যস্বরূপ তার যে আসল সত্তা

রয়েছে, অবিদ্যার জন্য তা তার কাছে প্রতিভাত হয় না। স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্মের অংশ বা কণিকা নয়, বিভু অর্থাৎ ব্রহ্মই। অবিদ্যার আবরণ অপসৃত হলেই জীব ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যায়, বন্ধনমুক্ত হয়ে পড়ে। এই অদ্বৈত মতের সঙ্গে পরবর্তী তত্ত্ববাদী সকলেরই মতের পার্থক্য রয়েছে। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব চিৎ-অণু, ব্রহ্ম-আশ্রিত, ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম জীবান্তর্যামী, জীবাত্মারও আত্মা এবং নিয়ামক। এক ব্রহ্মই জীবরূপে বহু হয়েছেন। অবিদ্যা এবং অদৃষ্ট বা পূর্বকৃত কর্মের জন্য জীব সুখদুঃখ ভোগ করে। উত্তম কর্ম এবং জ্ঞানের ফলে সে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দের, অনন্তের মধ্যবর্তী হয়ে পড়ে। শ্রীরামানুজ জীবকে তিন ভাবে ভাগ করেছেন—বদ্ধ, মুক্ত এবং নিত্যমুক্ত। মুক্ত এবং নিত্যমুক্ত জীব বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ করে লক্ষ্মীনাথ বিষ্ণুর পারিষদ-শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকেন। রামানুজ কিন্তু বদ্ধজীবকে অবিদ্যাপ্রভাবে বদ্ধ মনে করেন না, কর্মবন্ধনে অনাদি বদ্ধ বলে মনে করেন। ভেদবাদী মধ্বাচার্য জীবকে ঈশ্বর থেকে পৃথক্ সত্তা বলে মনে করেন, এমনকি জীবের সঙ্গে জীবের অর্থাৎ এক আত্মা থেকে অন্য আত্মার গুণগত পার্থক্য নির্ধারণ করেন। অথচ এসবকে অস্বতন্ত্র এবং ঈশ্বরের আশ্রিত বলেন। রামানুজের মত ইনিও অগণিত চিৎকণ জীবাত্মাকে কর্মহেতুক বদ্ধ, এবং বদ্ধ, মুক্ত, নিত্যমুক্ত শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। মুক্ত অবস্থাতেও তাঁর মতে ঈশ্বরে-জীবে ভেদ থাকে। সাযুজ্য মুক্তিতেও জীব পূর্ণ সচ্চিদানন্দের অধিকার লাভ করে না।[১] এছাড়া অসুরাদিযোনিতে জাত জীবের মুক্তি মধ্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে জীব এবং জড় বিশেষত্বের জন্যই ঈশ্বর থেকে অনাদি-পৃথক্। রামানুজের মত তিনি ঈশ্বর থেকে জীবের অ-পৃথক্‌সিদ্ধি স্বীকার করেন না। ভেদাভেদ (ভেদ ও অভেদ)-বাদী নিম্বার্কের মতে জীব মৌলিক জ্ঞানস্বরূপ, আবার জ্ঞানাশ্রয় সত্তাও। ধর্মী-ধর্ম-ভাবযুক্ত, জ্ঞাতা এবং জ্ঞান দুইই। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মা ভিন্ন এবং অভিন্ন; ঈশ্বরাশ্রিত, ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত। একটি শ্লোকে জীবের এই বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়েছে :

জ্ঞানস্বরূপং হরেরধীনং শরীরসংযোগ-বিয়োগ-যোগ্যম্।
অণু হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ॥

আত্মস্বরূপ জীবের কর্ম এবং অবিদ্যার বশে শরীরধারণ প্রভৃতি বর্ণনে নিম্বার্ক প্রায়শঃ রামানুজাচার্য এবং ক্বচিৎ মধ্বাচার্যের মতানুসরণ করেছেন। বল্লভাচার্যের বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মতে জগৎ ও জীব অন্তর্যামী ঈশ্বরের সঙ্গে মূলতঃ অভিন্ন। এ ব্রহ্মেরই অবিকৃত পরিণাম মাত্র। সৎ চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বর যথাক্রমে দেহ ও দেহী (অর্থাৎ জীব) এবং অন্তর্যামীতে পরিণত হন। ব্রহ্মের সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ, যেমন অগ্নির সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের। অথবা যেমন মণির সঙ্গে মণির জ্যোতির। জীব সচ্চিদানন্দের নিতান্ত অণুপরিমাণ বলে জীবে ঈশ্বরের কোনো গুণ প্রকাশিত, কোনো গুণ আবৃত।

রামানুজ-মতে জীবাত্মা পৃথক্ হলেও ঈশ্বরের দেহের অন্তর্ভুক্ত মধ্বমতে জীবাত্মা ঈশ্বরাধীন হলেও পৃথক্-অস্তিত্ব-সম্পন্ন। নিম্বার্কমতে পৃথক্ এবং অপৃথক্ দুই-ই। জীবাত্মা সসীম এবং আশ্রিত বলেই পৃথক। ভাস্করমতে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, কর্মদোষে ভিন্নাকার লাভ করেছে মাত্র। তাঁর মত অদ্বৈতমতের কাছাকাছি। বল্লভাচার্যের মতে ঈশ্বরের

---

১. মুক্তেঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্দেহং সংশ্রিতা অপি।
তারতম্যেন তিষ্ঠন্তি গুণৈরানন্দপূর্বকৈঃ॥

অণুপরিমাণ অংশ। এঁদের মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈত বা বল্লভ সম্প্রদায়ের সঙ্গেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মিল সব চেয়ে বেশি। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদীরা ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির কল্পনা করে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ বিষয়ে যাবতীয় দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চেয়েছেন। এঁদের মতে জীব হল ঈশ্বরের তটস্থা শক্তির পরিণাম। মায়াশ্রিত বলে ভিন্ন, কিন্তু মায়া ছিন্ন করতে পারে বলে প্রায় অভিন্ন, অর্থাৎ পরিশেষে স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভূত। জীবের বা সৃষ্টির এই ভিন্নত্ব এবং অভিন্নত্ব অচিন্ত্য, এ তাঁর শক্তির লীলাবিলাস। জীবের স্বরূপ হল চিদংশ, অণু, সূর্যের যেমন রশ্মি। জীব নিত্য এবং সংখ্যায় অনন্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা জীব-ঈশ্বরের রামানুজ-মতানুযায়ী শরীর-শরীরী সম্বন্ধ স্বীকার করেননি। ঈশ্বর স্রষ্টা অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা হওয়ায় জগৎ ও জীবের সঙ্গে জড়িত এরকম ধারণারই প্রশ্রয় দেন। ঈশ্বর শক্তিমান্, জগৎ-জীব শক্তি; ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। ব্যবহারিকভাবে ঈশ্বরে- জীবে, চিচ্ছক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আত্যন্তিক ভেদই অনুভব করেন। মহাপ্রভু তাঁর মনোভাব জ্ঞাপনে নানান্ স্থানে এই বিভেদের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। চরিতামৃত বলছেন :

ঈশ্বরস্বরূপ যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

তাঁরা জীব-ঈশ্বরের পার্থক্যবোধক নিম্নোক্ত ইঙ্গিতেরই অনুসরণ করেন :

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

গ. মায়া—প্রকৃতি, অবিদ্যা, অজ্ঞান, বীজশক্তি, ভ্রান্তি প্রভৃতি নানা আখ্যায় মায়াকে অভিহিত করা হয়েছে। উপনিষদে 'মায়া'র বিষয় কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। 'কেন' উপনিষদের কাহিনীতে মায়াকে হেমবর্ণা নারীমূর্তি ঈশ্বরী বলেও দেখা হয়েছে। বৌদ্ধ মাধ্যমিক এবং 'বিজ্ঞান' মতে ইন্দ্রজাল বা স্বপ্নের মত অলীক বোঝাতে মায়া শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া বলা হয়েছে, মায়া দৃষ্ট-বৈচিত্র্য থেকে পৃথক্ নয়, অপৃথক্ও নয়। সাংখ্য দর্শনে মায়াকে ভিন্ন নাম দিয়ে একটি মূলতত্ত্বরূপে দেখা হয়েছে। সাংখ্য মতে বাস্তবতত্ত্ব দুই, এক নয়—পুরুষ এবং প্রকৃতি। বিশ্বজগৎ জীব প্রভৃতি ঐ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি-তত্ত্বেরই পরিণাম। মায়া বিকারী, পুরুষ নির্বিকার। বেদান্তভিত্তিক অদ্বৈতমতে মায়া ব্রহ্ম থেকে পৃথক্ কোনো সত্তা নয়, আবার ব্রহ্মও নয়। ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধ চিৎ, মায়া হচ্ছে জড়, সাংখ্যের প্রকৃতির মত। কিন্তু প্রকৃতি যেমন বাস্তব স্বতন্ত্র সত্তা, অদ্বৈতের মায়া তাও নয়। সৎ অথবা অসৎ এ দুয়ের কোনো ধারণার দ্বারাই মায়াকে বোঝানো যায় না। অথচ মায়া একেবারে মিথ্যা নয়, কারণ এর একটি বৃত্তিতে এ বাস্তব সত্তা যা ব্রহ্মকে আবৃত করে (আবরণবৃত্তি), আর একটি বৃত্তি দ্বারা বৈচিত্র্যময় জগতের ভ্রান্তি জন্মায় (বিক্ষেপবৃত্তি) ব্রহ্মের উপর। মায়া হল বিবর্ত, ব্যবহারিক জ্ঞানের নিমিত্ত। যতক্ষণ এই জ্ঞান থাকে বা অবিদ্যা থাকে, ততক্ষণ মায়া থাকে, শুদ্ধ জ্ঞান উদয়ের বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই এর তিরোভাব। এই মায়া অনাদি। প্রলয়ের পর সৃষ্টির মুহূর্ত হতে কার্যরূপে এর প্রকাশ ঘটতে থাকে, জীব এর দ্বারা অভিভূত হয়ে দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে এবং সংসারকে সত্য বস্তু মনে করে বদ্ধ হতে থাকে।

শংকরাচার্যের এই মায়াবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের হাতে বিশেষভাবে আহত হয়েছে। এর পূর্বে তান্ত্রিক ভাস্কর মায়াবাদকে মহাযান বৌদ্ধমতের তত্ত্ব বলেছিলেন। তাঁর মতে জীব আর ব্রহ্ম একই, ব্রহ্ম পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে জীব হয়ে গেছেন। এটি বাস্তব সত্য, জড়ের বাস্তব কাজ, মিথ্যা বা মায়া নয়। তাঁর মতে শুদ্ধ কর্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা এই বাস্তব অবস্থা অতিক্রমণীয়। ভাস্করের এই অভিমতের নানান্ অসংগতি শুধরে নিয়ে রামানুজ বলেছেন যে, যথার্থভাবে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জড়ের দ্বারা সীমিত হচ্ছেন না, হতে পারেন না। তাঁর দেহ, যার মধ্যে চিৎ এবং অচিৎ মিশ্রিত রয়েছে, তা-ই পরিণত হয়ে জীব-জগৎ হচ্ছে। রামানুজ মনে করেন ভেদকে নিয়েই অভেদ সত্য, সুতরাং মায়ার কার্যকারিতা—ঐ আবরণ এবং বিক্ষেপ—তিনি স্বীকার করেন না, রজ্জুতে সর্প বা শুক্তিতে রজত তাঁর মতে কোনো ভ্রান্তির ব্যাপার নয়। রামানুজ প্রকৃতি বা জড়কে ঈশ্বরের অংশ এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করেন। জ্ঞানও তাঁর মতে যথার্থ এবং সব সময়েই বিশিষ্ট। মায়ার স্থানে রামানুজ কর্মকে বসিয়েছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় জড়ের কাজ এবং ঈশ্বরেচ্ছায় কর্মের দ্বারা জীবের বন্ধন, সুতরাং ঈশ্বরে ভক্তি এবং শরণাগতির মনোভাবই জীবকে মুক্ত করতে পারে। তাঁর মতে কর্মফলত্যাগ, উপাসনা, প্রপত্তি—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্তিই অজ্ঞান দূর করে, ঈশ্বরজ্ঞান নিয়ে আসে। যাই হোক, তিনি শংকরের মায়াবাদকে নিম্নলিখিতভাবে আক্রমণ করেছেন :

১. মায়া বা অবিদ্যার মূল আশ্রয় কোথায়? ব্রহ্মে থাকতে পারে না, কারণ, তাহলে তো ব্রহ্ম সবিশেষই হয়ে যান। তাছাড়া জড় মায়া তথা অজ্ঞান অবিদ্যা, আর শুদ্ধবুদ্ধ ব্রহ্ম, এই দুই পরস্পর অত্যন্ত পৃথক। অবিদ্যার আশ্রয় ব্যষ্টি জীব, এও বলা যায় না, কারণ জীবের ব্যষ্টিগত উপাধিই তো মায়ার সৃষ্টি। জীবকে মায়ার আশ্রয় বললে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ এসে পড়ে।

২. মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করবে কী করে? ব্রহ্ম তো স্বপ্রকাশ। অন্ধকার কি আলোককে আবৃত করে?

৩. অবিদ্যা সৎও নয় অসৎও নয়, এ কেমন বিরুদ্ধ কথা? তর্কে তো এরকম উপপত্তি দাঁড়ায় না। আছেও নয়, নেইও নয়, এ মিথ্যা জল্পনা। তাছাড়া অবিদ্যাকে যদি জানা যায় না, তো বলা যায় কী করে? সুতরাং মায়া বাস্তব এবং ঈশ্বরের শক্তি—এ মনে করতেই হবে।

৪. মায়াবাদীরা শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিরাকরণের কথা বলেছেন, কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান কখনোই সম্ভব নয়, জ্ঞান সব সময়েই সবিকল্প। শুদ্ধ সত্তাও তেমনই সম্ভব নয়। সুতরাং অবিদ্যাকে দূর করা যায় না। আবরণ এবং বিক্ষেপ কার্যে যারা যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাকে দূর করা অসম্ভব।

রামানুজাচার্য অজ্ঞান এবং কর্মকে ঈশ্বরাধীন এবং অনাদি বলে মনে করেছেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ীও রামানুজের অনুসারে অদ্বৈতের মায়াকে স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে সৃষ্টি ঈশ্বরেচ্ছায়, প্রকৃতির দ্বারা। এই প্রকৃতি এবং সৃষ্ট বস্তু ঈশ্বর থেকে ভিন্ন বাস্তব সত্তা। তাঁরা কর্ম বা জ্ঞানকে মুক্তির সহায়ক বলে মনে করেন। বিশ্বের বাস্তব ও পৃথক সত্তা স্বীকার করার জন্য তাঁদের ক্ষেত্রে বিবর্ত স্বীকারের প্রসঙ্গই ওঠে না। বস্তুত এঁরাও

সংকর্ষণের ঐ অংশেরও অংশবিশেষ। বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ যথাক্রমে চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি এবং মনের অধিপতি, যদিও এ কেবল চিচ্ছক্তিরাজ্যে—মথুরা-দ্বারকায় মায়িক রাজ্যে বা ব্রহ্মাণ্ডে নয়। এই সংকর্ষণ-বলরামই নবদ্বীপলীলার নিত্যানন্দ। এঁরা সব কৃষ্ণের মতই দ্বিভুজ। তবে বর্ণে ভিন্ন, ভাবেও ভিন্ন। যেমন বাসুদেবের ক্ষত্রিয়ভাব। কায়ব্যূহ অর্থে নিতান্ত আত্মীয়, নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত, সদা সঙ্গী। এঁদের দ্বারা মথুরা-দ্বারকায় কৃষ্ণ বহু কার্য সাধন করেন। পরব্যোমে যে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ (ঐ মথুরা-দ্বারকারই প্রতিবিম্ব) তার মধ্য দিয়েই আবার এঁদের বিলাস। ঐ বিলাসের বিলাসমূর্তি কুড়িটি (৪×৩+৪×২), যেমন কেশব, নারায়ণ, হরি, বিষ্ণু, শ্রীধর, অচ্যুত, জনার্দন প্রভৃতি। মর্ত্যের মথুরা নীলাচল প্রয়াগ প্রভৃতিতে এঁদের কারো কারো অবস্থান, তাছাড়া এঁদের কেউ কেউ অবতারের মধ্যেও গণিত। শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্রধারণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম। ঐ কুড়ি এবং চতুর্ব্যূহের চার নিয়ে প্রাভব বিলাস সম্পূর্ণ। এর পর বৈভব-বিলাস। আসলে এ থেকে যা বোঝা যায় তা হ'ল ঈশ্বর-কৃষ্ণের বহুদৃষ্ট ঐসব নামের ও ভাবের একটা শ্রেণীবিভাগ গোস্বামীরা করতে চান। শ্রীরূপের লঘুভাগবতামৃতে এর প্রথম বিবরণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই ব্যূহ-কল্পনা বহু প্রাচীন, হয়তো বা খ্রীস্টপূর্বকালের সাত্বতদের। পঞ্চরাত্র, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্ম-সংহিতা প্রভৃতির মধ্যে ব্যূহের পরিচয় রয়েছে। 'বৈভব-বিলাস' আর কিছুই নয়, ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রধারী ঐ অংশ-ভগবান্‌দের (স্বাংশ নয়) যদি আবার আকৃতি এবং পরিচ্ছদের ভিন্নতা হয় তাহ'লেই বৈভব-বিলাস-মূর্তি বলা যাবে। যেমন বলা যায়, পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন, হরি, কৃষ্ণ (স্বয়ংভগবান কৃষ্ণ নয়) এঁদের আকারে-বেশে পার্থক্য।

'স্বাংশ' হিসাবে অবতারের বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে। এর বিশেষ হল ঃ

১. পুরুষাবতার—ক্রিয়াশক্তি সংকর্ষণের মধ্যস্থতায় প্রথম পুরুষাবতার হলেন মহাবিষ্ণু। ইনি কারণার্ণবশায়ী। ঋগ্‌বেদে এঁকেই 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ইনি মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, ফলে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির ব্যাপারে মায়া হলেন আপেক্ষিকভাবে নিমিত্তকারণ, আর 'প্রধান' হ'ল উপাদান-কারণ। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি, আর প্রধান জড়। মহৎ-তত্ত্ব থেকে আরম্ভ হ'ল 'অহংকার'। এই নিয়ে সৃষ্টি হ'ল ব্রহ্মাণ্ডের। সৃষ্ট অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঐ প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণুর অংশ দ্বিতীয়পুরুষ বা নারায়ণ গর্ভোদকে শয়ান রইলেন। ইনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যক্ষ অধিপতি। এরই নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। এঁর নালে রইল চতুর্দশ ভুবন। এরপর ঐ মহাবিষ্ণুরই অংশর অংশরূপে আবির্ভূত হলেন ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় বিষ্ণু। ইনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন।

২. গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এঁরা যথাক্রমে রজঃ সত্ত্ব এবং তমোগুণের অধিপতি। মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলেও এঁরা মায়াযুক্ত হন না। এঁরাও আংশিক সচ্চিদানন্দ। জীবের সৃষ্টি পালন এবং ধ্বংসের কাজ প্রত্যক্ষভাবে এঁদেরই হাতে।

৩. যুগাবতার—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগে পৃথিবীতে ভগবানের এক এক অবতার আবির্ভূত হন। এঁদের বর্ণ, পরিচ্ছদ, অস্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। যেমন ভাগবতে গর্গবচন ঃ

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

অথবা, ভাগবতে অন্যত্র—দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। কলি-যুগাবতার সম্পর্কে ভাগবত-প্রমাণ ঃ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

অনুরূপ মহাভারতে ঃ

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

এঁদের মধ্যে কৃষ্ণই হলেন পূর্ণ ভগবান্ হয়েও অবতার।

৪. মন্বন্তরাবতার—যেমন স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষ প্রভৃতি, ব্রহ্মার একদিনের অন্তর্গত চোদ্দ মন্বন্তরের এক একটির অধিপতি।

এই সব অবতার ছাড়া স্বাংশের অন্তর্গত আবেশাবতারেরও উল্লেখ আছে। এই অবতারেরা জীবজগতের, তবে ঈশ্বরকোটির অন্তর্ভুক্ত—যেমন, পৃথু, নারদ, সনক। চৈতন্যলীলায় নকুল ব্রহ্মচারী।

মূল বিভাগ স্বয়ংরূপ এবং তদেকাত্মরূপ ছাড়া 'প্রকাশ' ব'লে ভগবান্ কৃষ্ণের অন্য এক বিভাগেও কথিত। প্রকাশ হ'ল একই কৃষ্ণরূপ যা একই সঙ্গে বহু জায়গায় প্রকাশ পায়। যেমন ষোল সহস্র মহিষীর বিবাহে কৃষ্ণ একই রূপে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তেমনি রাসস্থলীতে দুই দুই গোপীর মাঝে এক এক ক'রে বহু কৃষ্ণ একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিলেন প্রত্যেক গোপীকে তৃপ্ত করতে।

সৃষ্টিতত্ত্ব

প্রসঙ্গক্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ বা কর্তা হলেন ঈশ্বর কৃষ্ণ। উপাদান-কারণ হ'ল মায়াশক্তি বা জড়রূপা প্রকৃতি। 'কৃষ্ণ-ভগবান' স্বংকর্ষণ ও প্রথম পুরুষাবতারের সহায়তায় মায়ার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন। মায়া বা প্রকৃতি নিজে স্বাধীনভাবে জগৎ-রূপে পরিণাম পেতে পারেন না (সাংখ্যমতে অবশ্য এটিই সত্য)। মায়ার দু'রকমের কাজ হিসাবে মায়াকে বলা হয়েছে 'গুণমায়া' যা সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণে আবিষ্ট হয়ে বিশ্ব সৃষ্টি করে, আর 'জীবমায়া'—যা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দ্বারা জীবকে অভিভূত ক'রে রাখে। ঈশ্বর, জীব এবং মায়া ছাড়া আরও দুটি স্বীকৃত অনাদিতত্ত্ব হ'ল কাল ও কর্ম। কর্মকে জীবের অদৃষ্টও বলা হয়েছে। এরই জন্য জীব 'অনাদিবহির্মুখ'। যাই হোক, সৃষ্টির আদিতে ঐ কারণার্ণবশায়ী পুরুষ (সংকর্ষণের অংশ) প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ফলে প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়, যে তত্ত্বের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় 'মহৎ'। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, মহৎও ত্রিগুণাত্মক। মহৎ-তত্ত্ব থেকে অহংকারের উদ্ভব। এই অহংকারেও থাকে ত্রিগুণের ক্রিয়া। ফলে সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান-বোধ, রজোগুণ থেকে ক্রিয়া এবং তমোগুণ থেকে জড়বস্তুর প্রাদুর্ভাব হয়। মহৎতত্ত্বে যদিচ সত্ত্ব এবং রজোগুণ প্রধান, অহংকারে তমঃ এর আধিক্য। দ্রব্যময় অহংকার থেকে যথাক্রমে ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ এবং ক্ষিতি গ'ড়ে ওঠে। এই পঞ্চভূতের সূক্ষ্মরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রও আবির্ভূত হয়। অহংকারের সত্ত্বময় ও রজোময় অংশ থেকে উৎপন্ন হয় মন, আর দশ ইন্দ্রিয়। মায়ার ঐ পঞ্চভূতাদি পরিণাম নিয়ে এক একটি অণ্ডের সৃষ্টি হয়। অনন্ত অণ্ড নিয়ে হয় ব্রহ্মাণ্ড।

এমনও বলা যায় যে ঐ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর দেহ থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ বা বিরাট এবং ক্ষীরসমুদ্রশায়ী তৃতীয় পুরুষ তার মধ্যে এক একটিতে বিরাজ করতে লাগলেন। ঐ বিরাট পুরুষের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম এবং তিনিই প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টিকার্যে নিরত হলেন। ঈশ্বরের চিদংশ অথচ কর্মদোষে বহির্মুখ জীব এই সৃষ্টিচক্রের মধ্যবর্তী হয়ে দুঃখ ভোগ করে করে পরিশেষে ভক্তিপথে ঈশ্বরানুবর্তী হয়।

এখন আমরা স্বরূপশক্তির যা চিচ্ছক্তির বা মুখ্যতম লীলা, গোপীসহ প্রেমলীলা, তার মধ্যে প্রবেশ করছি।

বলা হয়েছে, নিজ স্বরূপশক্তির সহায়তায় লীলারসবৈচিত্র্যের আস্বাদনই কৃষ্ণের মুখ্য কাজ, অসুরাদি বিনাশ করে পৃথিবীর ভার হরণ নয়। এমনকি ধর্মপ্রচারও নয়। নবধর্ম প্রবর্তনের কাজ তাঁর অহেতুক লীলার মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবেই সিদ্ধ হয়। আর অধার্মিককে দূর করে বা দুষ্কৃতের বিনাশ ঘটিয়ে সাধুব্যক্তির রক্ষণ এ প্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণুর কাজ।

বৃন্দাবনলীলা

জীবজগৎ যেমন কৃষ্ণ সরাসরি নিজে সৃষ্টি করছেন না, সংকর্ষণের দ্বারা করছেন, অথবা আরও প্রত্যক্ষভাবে, সংকর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ প্রভৃতির দ্বারা করছেন, তেমনি তার ধারণ, পালন, ধ্বংসও করছেন এঁদেরই সহায়তায়। মূলের দিক দিয়ে বিচার করে এসব কাজ পূর্ণ ভগবানের একথা মনে করা গেলেও, বলা যায়, এ তাঁর বহিরঙ্গ কাজ। সৃষ্টি প্রভৃতিও তাঁরই লীলা, কিন্তু মুখ্য নয়, আনুষঙ্গিক। কারণ, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁর কোনো বাসনা থাকতে পারে না। তবে ভক্তদের চিত্তে আনন্দবিধানের জন্য হ্লাদিনী শক্তির বিস্তারবৈচিত্র্য তিনি প্রকাশ করেন। ব্রজলীলায় তিনি যথেচ্ছ বিহার করে অন্তর্ধান করেছিলেন। তবু পরে দুটি অতৃপ্তি তাঁর থেকে গিয়েছিল। এক 'রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা' তিনি অনুভব করতে পারেননি। দুই, ঐশ্বর্যমূলক নিম্নমানের ভক্তিকে সরিয়ে উন্নত প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি বা শুদ্ধ অহেতুক প্রীতিময় ভক্তি প্রচার করতে পারেননি। এজন্য কলিযুগে তাঁকে অবতার হয়ে আসতে হয়েছিল, কারণ, মহাবিষ্ণু, নারায়ণ, সংকর্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে প্রেমভক্তির উৎকর্ষ স্থাপন সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই মুখ্য-গৌণ, অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ লীলা-বিভাগ মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা-দর্শনে স্বরূপ গোস্বামীপাদ প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীরাও এ অভিমত শিরোধার্য করেছেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-পরিকরবৃন্দের ধারণায়, যেমন মহাপ্রভু তেমনি শ্রীকৃষ্ণ যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্যই এসেছিলেন। পরে অবশ্য গোস্বামীদের ধারণাই সর্বত্র সমাদৃত হয়, এবং কবিকর্ণপূরও এর দ্বারা প্রভাবিত হন।

কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা অহেতুক, মানুষ এর হেতু নির্ণয় করতে অক্ষম। স্থান এবং কাল হিসাবে কৃষ্ণলীলার দুটি বিভাগ। এক বিভাগে বৃন্দাবনলীলা—দ্বাপরে, অন্য বিভাগে নবদ্বীপলীলা—কলিযুগে। বৃন্দাবনলীলার আপাতপ্রতীয়মান হেতু জানাতে চরিতামৃতকার বলেছেন :

> প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন
> রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
> রসিক-শেখর কৃষ্ণ করুণ পরম।
> এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম॥

প্রেমরস-নির্যাস বলতে বৃন্দাবনের উদ্ধবাদির দাস্য, শ্রীদামাদির সখ্য, যশোদার বাৎসল্য এবং বিশেষতঃ গোপীদের এবং গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার কান্তাভাবের মাধুর্যসার বোঝায়। এ হল মুখ্য হেতু। যদি বলা যায়, বৈকুণ্ঠের অপ্রকট লীলায় তো তিনি সর্বদা প্রেমরস আস্বাদন করেই থাকেন, নতুন করে পৃথিবীতে এর স্বাদ-বাসনার কারণ কী? এর উত্তরে শাস্ত্রকার বলেছেন, ঐ বৈকুণ্ঠে, এমনকি তারই সূত্র ধরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের যে প্রেমলীলা চলে তা থেকে দ্বাপরে মর্ত্যে প্রকটিত ব্রজলীলার পার্থক্য আছে। বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে যে লীলা তা পরকীয়া-প্রীতিরসে উচ্ছলিত, আর, পরকীয়া-প্রীতিতেই যথার্থপ্রেমের সারভূত রমণীয়তা বর্তমান—"পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা অন্যত্র ইহার নাহি বাস।" অন্যত্র রাধা এবং গোপীগণ কৃষ্ণের স্বকীয়া। স্বকীয়ায় অপ্রাপ্তি জনিত বিরহোল্লাস নাই, নিষেধের দ্বারা শাসিত দুর্গমতার তীব্র আকর্ষণও নাই, সুতরাং স্বকীয়ার প্রণয় উপপতিভাবময় পরকীয়া রতির কাছে বর্ণবৈচিত্র্যহীন। এই পরমাশ্চর্য প্রীতিরসের জন্য লুব্ধ হয়েই সপরিকর পূর্ণভগবান কৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাব। চরিতামৃতে বলা হয়েছে :

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সেই লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিই না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম ছাড়ি রাগে দোহেঁ করয়ে মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে, দৈবের ঘটন॥

অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসস্থল হলেও দ্বারকা-মথুরায় প্রেমের এই চরম প্রকাশ নেই, সেখানে কৃষ্ণ ঐশ্বর্যময়! তিনি সত্যভামা, রুক্মিণী এবং আরও বহু মহিষীর পবম-গুরুপতি। সেখানে কৃষ্ণ পরিহাস করলেও সত্যভামা ভীত হয়ে পড়েন। মানে রুষ্ট হতেই পারেন না। নারায়ণশক্তি লক্ষ্মী গোপকৃষ্ণকে পাবার জন্য তপস্যা করেও পাননি। অথচ শ্রীরাধা কৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্তির সমাদরই করেন না। কৃষ্ণের নিমেষমাত্র ঔদাসীন্য দেখলে বক্রভাব অবলম্বন করে কঠোর কথা শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। আবার, মানিনী রাধিকার মানভঙ্গ করতে নিজের সমস্ত গৌরব বিসর্জন দিয়ে পদতলে লুটিয়ে পড়তেও কৃষ্ণের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। এই পরকীয়া প্রীতিতে গোপীরাই সমস্ত প্রেমের আশ্রয়, তাঁরাই গুরু, কৃষ্ণ শিক্ষানবীশ মাত্র। তাই কৃষ্ণই গোপীদের প্রসন্নতা ভিক্ষা করে কায়মনোবাক্যে আরাধনা করে থাকেন—'তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার।' স্বকীয়া অর্থাৎ বিবাহিত প্রেমে গুরুজন পরিজন সমাজ মধ্যস্থতা করে, এখানে করে কেবল কন্দর্প। এই প্রীতিরস নিত্য-নবীন, পরিণামহীন, চরিত্রে অসীম এবং স্বভাবে চিরঅতৃপ্তিময়—'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ, তভো হিয় জুড়ন ন গেল।' এর উপলব্ধিতে—'ন সো রমণ, ন হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জনি।' কন্দর্প দু'টি হৃদয়কে পিষ্ট করে এমনভাবে একীভূত করেছে যে পুরুষ-নারী ভেদভাব এতে তিরোহিত হয়ে গেছে। এ প্রণয় অভিলাষশূন্য, তিরোহিত-স্বার্থ, সুতরাং বিশুদ্ধ। চণ্ডীদাসের ভাষায় 'মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ।' চরিতামৃতের বর্ণনায় 'হেন প্রেমা নৃলোকে

না হয়।' আবার 'ব্রজ বিনা অন্যত্র ইহার নাহি স্থিতি'। ফলে মানুষে পরকীয়া প্রীতি দৃষ্ট হলেও ব্রজের কামগন্ধহীন অলৌকিক রতির সঙ্গে তা তুলিত হবার যোগ্য নয়। মর্ত্যের প্রণয়মাত্রেই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-অভিলাষের বিকার, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির ব্যাপার নয়।

প্রশ্ন হতে পারে, কৃষ্ণের এই প্রেমাস্বাদ বিষয়ে একক কান্তা বা রাধিকাই তো যথেষ্ট, গোপীদের কী প্রয়োজন? এর উত্তরে চরিতামৃত বলছেন :

গোপীপ্রেম ও সখী

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥

কৃষ্ণের অলৌকিক পরকীয়ারসলীলা মুখ্যভাবে রাধারই সঙ্গে। তিনিই গোপীশ্রেষ্ঠা এবং হ্লাদিনীর সারভূতা। অন্য গোপীদের প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে 'ভাব' পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। কেবল রাধিকাই 'মহাভাবে'র অধিকারিণী। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন-বিরহলীলায় গোপীরা নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন, রাধাপ্রেমকে মহাভাব-অবস্থায় উন্নীত করা গোপীদের সহায়তা ভিন্ন সম্ভবও ছিল না। সংবাদ বহন করে দৌত্যকার্য করা, মিলনের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করা, শ্রীমতীর প্রসাধন কুঞ্জসজ্জা, এমনকি কৃষ্ণকে সঙ্গদানের দ্বারা রাধিকার ঈর্ষামান বাড়িয়ে প্রণয়কে পরিপুষ্ট করা, প্রণয়ের নব নব বৈচিত্র্য উপলব্ধিতে কৃষ্ণকে সাহায্য করা, কখনও বিরহিণীর রাধার প্রতি, কখনও বা তাঁর দুর্জয়মানে নিতান্ত পীড়িত কৃষ্ণের প্রতি প্রেমাধিক্য প্রদর্শন করা। এইভাবে লীলারসপুষ্টির জন্য যা যা করণীয় গোপীরা তা সংসাধন করেন। এঁরা আত্মসুখ চান না, রাধাপ্রেমকে উপচিত করে কৃষ্ণসুখের জন্য আত্মসমর্পণ করে থাকেন। রাধাকে বাদ দিয়ে গোপীদের মধ্যে প্রধান হলেন 'চন্দ্রাবলী'। তারপর বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, অনুরাধা প্রভৃতি। এঁরা হলেন কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া এবং এই প্রধানাদের আবার নিজ নিজ যূথে রয়েছেন সহস্র সহস্র গোপীরা। রাধা এবং চন্দ্রাবলীর যূথে কোটি সংখ্যক ব্রজনারী রয়েছেন। এঁদেরই নিয়ে যমুনাপুলিনে রাসবিলাস করেছিলেন শ্রীহরি, যে রাসে সব গোপীর প্রতি কৃষ্ণের সমান সমাদর দেখে মানভরে স্থানত্যাগ করেছিলেন রাধিকা। চরিতামৃতকার বলেছেন :

রাধাসহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥

বস্তুতঃ কৃষ্ণের সর্বার্থসাধিকা, হ্লাদিনীসারবিগ্রহ রাধিকাই হলেন শ্রেষ্ঠা বৃন্দাবনেশ্বরী, কিন্তু বৈচিত্র্য-বিলাসের জন্য অন্য গোপীদের মূল্যও স্বল্প নয়। এঁদের সঙ্গে রাধিকার সম্বন্ধও নিত্য। এঁরা রাধিকার কায়ব্যূহ, বিভিন্ন অবয়বে প্রকাশ মাত্র। সখীশূন্য একক রাধিকা দীন, নিষ্প্রভ। সখীসহায়তা ব্যতীত লীলায় আশ্চর্য চমৎকারের উদ্ভব সম্ভব নয়। চরিতামৃতকার রায়-রামানন্দমুখে সখীদের গুরুত্ব প্রচার করেছেন এইভাবে :

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ক্রমোৎকর্ষ বিচারে সখীদের এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠসখী। লীলাসহায়তার দিক থেকেই এই বিভাগ। শেষোক্ত শ্রেণীতে পড়েন—ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দ্রলেখা, রঙ্গদেবী এবং সুদেবী। গোপীদের মধ্যে এঁরাই অগ্রগণ্যা। এঁদের প্রত্যেকের আবার স্বভাব এবং কার্যকারিতা হিসাবে বিশিষ্ট গণ রয়েছে। এছাড়া গোপীদের মধ্যে কেবল সেবিকার এক সম্প্রদায় রয়েছে। এদের বলা হয় 'মঞ্জরী'—যেমন, রূপমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী। এঁরা কেবল সেবা করেই পবিতৃপ্ত, সেবার ক্ষেত্রে এঁদের অধিকারও অন্য সখীদের চেয়ে বেশি। ভক্তিপথের সাধকেরা অনেকেই এই মঞ্জরীভাবের সাধনায় আগ্রহান্বিত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এবিষয়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

গোপীপ্রেমের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে চরিতামৃতকার প্রথমে কাম এবং প্রেমের পার্থক্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এবং লীলাশ্রবণোৎসুক ভক্তদের সাবধান করে দিয়েছেন যে সাধারণ দৃষ্টিতে জীবজগতের অনুরূপ কামকেলির বর্ণনা থাকলেও গোপীপক্ষে তা প্রেমবিষয়ক বলেই গ্রহণ করতে হবে। কারণ,

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

গোপীদের স্বসুখবাসনা নেই, কৃষ্ণসুখের জন্যই তাঁদের দেহের প্রসাধন এবং গেহসজ্জা। তাঁরা কেবল স্বার্থবাসনা-বিক্ষুব্ধ হয়ে কৃষ্ণকে চাননি। তাঁরা গুরুজন পরিজন সংসারধর্ম এমনকি লজ্জা, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হয়েছেন। কৃষ্ণপ্রেমগৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে তাঁরা স্বজনের তাড়ন-ভর্ৎসন, সমাজ ও লোকনিন্দাকে দেহের ভূষণ বলে বিবেচনা করেছেন। এমনকি দুস্ত্যজ পতিব্রত্যকেও তাঁরা বড় বলে মনে করেননি। প্রেমের জন্য এত বড় ত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পুরাণে আর কোথাও নেই। কৃষ্ণে এরকম দৃঢ় অনুরাগ স্বার্থময় কামের ব্যাপার হতেই পারে না। এ চিদ্‌গত শুদ্ধসত্ত্বের অলৌকিক বিকাশ। অতএব,

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম॥
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥

কৃষ্ণপ্রেমের এক অলৌকিক কার্যকারিতা হল এই যে, গোপীরা আত্মসুখ না চাইলেও কোটিগুণ আনন্দ অনুভব করে থাকেন। কারণ, কৃষ্ণসুখেই গোপীসুখের শেষ পর্যবসান। এ যেন, 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়'। কৃষ্ণের শোভা-মাধুর্য, কৃষ্ণের চরিতার্থতা বৃদ্ধি করলেই যেহেতু গোপীদের আনন্দ, সেইহেতু গোপীপ্রেমে কামদোষ থাকতে পারে না। প্রীতির বিষয়ের (অর্থাৎ কৃষ্ণের) আনন্দে যদি আশ্রয়ের (অর্থাৎ গোপীদের) আনন্দপ্রাপ্তি ঘটে তাহলে স্বার্থকলুষের প্রসঙ্গই আসতে পারে না। এই বিশুদ্ধ রাগাত্মিক গোপীপ্রেমের দৃষ্টান্তেই রাগানুগাপ্রীতিময় ভজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

অন্যবাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

এমনকি কৃষ্ণসেবার কাছে ভক্ত মোক্ষকেও তুচ্ছজ্ঞান করবেন। গোপীপ্রেমের এই সীমাতিশায়ী ঐশ্বর্যের কাছে কৃষ্ণ নিজ প্রেমকে নিতান্ত দীন মনে করেছেন। ব্রজলীলায় পরাজিত হয়ে গোপীপ্রেমের বিশেষতঃ রাধাভাবের স্বরূপ অনুভব করে কৃতার্থ হবার জন্য পুনরায় তাঁকে রাধার ভাব নিয়ে অবতার গ্রহণ করতে হয়েছে। গীতায় কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছেন—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—কিন্তু গোপীদের প্রেমোপাসনায় কৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, কারণ, গোপীদের লক্ষ্য করে ভাগবতে তিনি বলেছেন :

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

অর্থাৎ 'শুদ্ধাত্মা তোমরা, আমার সঙ্গে মিলন কামনায় তোমরা যে দুশ্চর তপস্যা করেছ তার প্রতিদান দিতে পারি সে সাধ্য আমার নেই। অতি দুশ্ছেদ্য সংসারবন্ধন তোমরা ছিন্ন করেছ, এর প্রতিদান তোমরা তোমাদের ত্যাগময় আশ্চর্য প্রেমের দ্বারাই লাভ করো।' অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে এতদূর সম্ভব ছিল না।

প্রেমসারসিদ্ধির জন্য নির্মিত শ্রীরাধার কায়ব্যূহসহ গোপীবৃন্দের মধ্যে রাধিকাই শ্রেষ্ঠা। কৃষ্ণের শক্তিসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম যে হ্লাদিনী শক্তি তারই ঘনসারবিগ্রহ এই রাধিকা—শ্রী লক্ষ্মী প্রভৃতি ঐশ্বর্যময়ী পরব্যোমনেত্রী থেকে প্রেমগুণে গরীয়সী এবং রুক্মিণী সত্যভামা থেকে কৃষ্ণের অধিকতর প্রেয়সী। কৃষ্ণের রাজকীয় ঐশ্বর্যের রূপ সহ্য করতে রাধিকা নিতান্তই অক্ষম। ইনি পরকীয়া-শ্রেষ্ঠা। গোপীদের মধ্যে ইনি কেবল রূপে গুণেই উৎকর্ষশালিনী নন, ত্যাগের দিক থেকেও আদর্শস্থানীয়া। পিতৃকুল এবং পতিকুলের মহৎ গৌরবের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করে কৃষ্ণের জন্য ইনি অকূলে পা বাড়াতে দ্বিধা করেননি। তাড়ন-ভর্ৎসন লাঞ্ছনা-অপবাদকে শিরোভূষণ করে নিয়েছেন। কৃষ্ণ-আরাধনায় নিজ দেহকে উপেক্ষা করে মৃত্যুর সমীপবর্তী হয়ে ইনি অন্য গোপীদের করুণাময় মমত্ব আকর্ষণ করেছেন, আবার প্রেমাধিক্যে কৃষ্ণকে এমনভাবে বশীভূত করেছেন যে কৃষ্ণও নিমেষমাত্র রাধাবিরহ সহ্য করতে অক্ষম; শ্রীমতী দীর্ঘশ্বাস মোচন করলে তাঁর অন্তরাত্মা চমকিত হয়।

রাধাভাব

গোপালতাপনীতে ইনি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্বী বলে কীর্তিত হয়েছেন, ঋক্-পরিশিষ্টে কৃষ্ণের সঙ্গে এঁর অবিনাভাব সম্বন্ধ কথিত, তামিল গীতে ইনি কৃষ্ণবল্লভা শ্রেষ্ঠা গোপী, ভাগবতে এবং গীতগোবিন্দে—ইনি প্রকৃষ্টভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করায় এককভাবে কৃষ্ণসঙ্গের অধিকারিণী হয়েছেন, আর ইনি মানভরে রাসমণ্ডলী ত্যাগ করলে কৃষ্ণ ব্যাকুলভাবে এঁর সন্ধান করেছেন এবং না পেয়ে পরিশেষে বিষণ্ণ-হৃদয়ে যমুনাতীরে আশ্রয় নিয়েছেন। আবার কখনও দূরভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কৃষ্ণ এঁকে স্কন্ধে আরোহণ করিয়ে বহন করতেও দ্বিধা করেননি। পরমস্বকীয়া হয়েও দৈববশে পরকীয়া এই প্রণয়িনীকে নিজাভিমুখী করার জন্য যে অক্লান্ত অধ্যবসায় কৃষ্ণ করেছিলেন তার ইতিবৃত্ত ফুটিয়েছেন রজকিনী-প্রণয়ী বড়ুচণ্ডীদাস।

তত্ত্বের দিক দিয়ে রাধা এবং কৃষ্ণ মূলতঃ অভিন্ন, শক্তিমান এবং শক্তির যেমন অভিন্নতা। লীলায় ভিন্নতা মাত্র। চরিতামৃতের কথায় :

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

কিন্তু তত্ত্বে যাই হোক, লীলা নিয়েই আমাদের যা কিছু আগ্রহ। লীলার স্বরূপ নিয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। এই লীলায় রাধিকা পরকীয়া নায়িকা, কল্পনায় প্রেমের সীমা যতদূর যেতে পারে তারও অতিরিক্ত সীমাহীন প্রেমের অধিকারিণী তিনি। স্বযং কৃষ্ণও এঁর প্রীতির পরিমাপ করে উঠতে পারেননি। তিনি জন্মাবধিই কৃষ্ণে অনুরাগবর্তী। কৃষ্ণের নামশ্রমণেই এঁর পূর্বরাগ হয় তারপর কৃষ্ণের মুরলীরব শ্রবণে, কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে; এবং এই পূর্বরাগ প্রগাঢ় হয় রূপ-দর্শনে। পূর্বরাগাবস্থায় ইনি লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, দেহের কৃশতা, জড়ত্ব, ব্যাকুলতা, ব্যাধি, উন্মাদ এবং মূর্চ্ছার অবস্থা ভোগ করেন। পরকীয়াভাবময় এই প্রণয়ের নিয়ম হল মিলনের দুষ্প্রাপ্যতা এবং ক্ষণিকতা। আদিতে মধ্যে এবং অন্তে বিরহই হল এর সর্বস্ব। তাই কী পূর্বরাগে, কী রূপানুরাগে, কী মানে, অভিসারে অথবা আক্ষেপানুরাগে সর্বত্রই শ্রীমতীর অপ্রাপ্তিজনিত তীব্র ব্যাকুলতা। চণ্ডীদাস-ভণিতার 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার' অথবা 'রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা' প্রভৃতি পদে রাধিকার নিতান্ত করুণ অবস্থা এবং বেদনার্ত চিত্তের প্রকাশ চিহ্নিত হয়েছে। পূর্বরাগের পর রূপদর্শনাদিতে রাগ প্রবৃদ্ধ হলে অনুরাগের অবস্থায় ব্যাকুলতা আরও বেশি, তন্ময়তাও প্রগাঢ়। জ্ঞানদাস কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে এই ভাবাবস্থার চমৎকার ইঙ্গিত দিয়েছেন :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

কৃষ্ণে লালসাময়ী শ্রীমতীর সর্বেন্দ্রিয়চিত্তকায় কৃষ্ণে সমর্পিত হওয়ায় যে বহিরঙ্গ দুর্বিপাক ঘটেছে তা বিবৃত করতে গিয়ে গোবিন্দদাস সখীমুখে বলছেন ঃ

শুনইতে কানু- মুরলী-রব-মাধুরী
শ্রবণ মিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ ঝাঁপলুঁ
তব মোহে রোখলি ভোর॥
...বিনু গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ তনু লাবণি
জীবইতে ভেলি সন্দেহা॥
ভরমহি যো তুহুঁ প্রেমতরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস আশে।
অব সো নয়ানক নীর দেই সীচহ
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

কৃষ্ণের জন্য অভিসারে এই কুলবতী নায়িকার প্রণয়ের পরীক্ষা। শ্রীমতী সে-পরীক্ষা সমুত্তীর্ণ হয়ে অভিলষিতের জন্য কৃচ্ছ্রবরণের চরম দৃষ্টান্ত দেখান। অথবা, যিনি কুলমর্যাদা আত্মমর্যাদা, সব কিছুই কৃষ্ণের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন, বর্ষণ-পরিষিক্ত দুরন্ত পথ ও ঝটিকাক্ষুব্ধ বজ্রবিদীর্ণ রজনীর বাধা তাঁর কাছে অতি তুচ্ছই। বাধা-বিপত্তির কথা তিনি ভুলেই গেছেন এবং কৃষ্ণভাবনায় নিজেকে অন্তরে-বাহিরে শ্যামময়ী ক'রে তুলেছেন। রাধার এই কৃষ্ণময়ীত্বের একটি সুন্দর ছবি গোবিন্দদাসের লেখনীতে ফুটেছে :

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল॥
পিয়া-অভিসারক লাগি।
কানু-অনুরাগে গোরী ভেলি শ্যামরী
কুহু যামিনী ভয় লাগি॥

কৃষ্ণ মথুরায় যাবেন এই সংবাদে শ্রীমতী অচৈতন্য হয়ে পড়েন, প্রবাসে না গেলেও তিলেক বিচ্ছেদকে যুগ যুগ বিচ্ছেদ ব'লে মনে করেন। এমনকি বিভ্রান্তচিত্ত হয়ে মিলনের মধ্যেও বিরহ অনুভব ক'রে বেদনাক্লিষ্ট হতে থাকেন :

দুহুঁ কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীএ।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ॥

বস্তুতই অবিদ্যা-বিমোহিত জীবের স্বার্থময় কৈতবযুক্ত প্রণয়ে এ হেন ভাবোৎকর্ষ সম্ভব নয়। শ্রীমতী স্বয়ং এ প্রণয়ের সীমা অনুভব করতে পারেন না, শুধু বিচিত্র স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারীর মুহুর্মুহু পরিবর্তমান দ্বন্দ্বের মধ্যে যন্ত্রবৎ ঘূর্ণিত ও পিষ্ট হতে থাকেন। এই অবর্ণনীয় প্রণয়-মহিমা সম্পর্কে তিনি সখীর কাছে উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে এর সীমাই পাওয়া যায় না, কোথায় পূর্ণতা?

সোই পিরিতি- অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নৌতন হোয়।
...কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ
তভো হিয় জুড়ন ন গেল॥

প্রেমের এই পরাকাষ্ঠা অন্য গোপীদের স্বভাবে অনুভূত হয় না। এতখানি কৃষ্ণতন্ময়তা এবং এত তীব্র বিরহদুঃখও তাঁদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। রাধার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে চরিতামৃতে বলা হয়েছে :

কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূরে॥

রাধা ছাড়া কৃষ্ণও অপূর্ণ, দীন॥ 'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ'। রাধার সঙ্গে অবস্থিত কৃষ্ণ মদনমোহন। নতুবা স্বয়ং মদনমোহিত। রাধার এই গুরুত্বের বিষয়টি গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারী-দ্বন্দ্বে সুন্দর ফুটেছে। রাধার জন্যই কৃষ্ণের নটবর বেশ, পীতবসন, মুরলী-ধারণ এবং 'চূড়ার টালনি বামে'। রাধাপ্রেমের অংশলাভের সৌভাগ্যও লক্ষ্মীর ঘটেনি। কৃষ্ণ বলছেন :

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

ললিতা বিশাখা এমনকি চন্দ্রাবলীর মত কৃষ্ণপ্রিয়াও কৃষ্ণের এই বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেননি। মহাজন গোবিন্দদাস কবিরাজ একটি পদে সুকৌশলে গোপীদের সঙ্গে শ্রীরাধার প্রেম-অনুভবের পার্থক্য এবং রাধিকার উৎকর্ষ খ্যাপন করেছেন :

আধক-আধ- আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শতকোটি কুসুমশরে জরজর
রহত কি যাত পরাণ॥

অর্ধেকের অর্ধেক, তারও অর্ধেক দৃষ্টিতে যখন থেকে কৃষ্ণকে দেখেছি তখন থেকে কত শতকোটি মদনবাণে জর্জরিত হয়ে প্রাণ যাবার মত হয়েছে।

সুনয়নী কহত কানু ঘনশ্যামর
মোহে বিজুরি-সম-লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত
হমার হৃদয়ে জলু আগি।

যে গোপী বলে কৃষ্ণ স্নিগ্ধ ঘনশ্যাম, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, সে সুনয়নী। আহা, তার নয়ন ভালো। আমার কিন্তু দেখামাত্রই বিদ্যুতের মত চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, জ্বালা করে। আর কৃষ্ণের স্পর্শলাভে যে ধন্য হয়, বিহ্বল হয়ে পড়ে, সে রসবতী ; তার জয় হোক। কিন্তু সে স্পর্শ আমার দেহমনে অগ্নিময় হয়ে ওঠে, আমি এমনিই মন্দভাগ্য!

প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজত
চপল জীবন মঝু সাধ।

প্রেমিকা প্রেমের জন্য আত্মদান করে আর ভাগ্যহত আমি এই চপল জীবনে বেঁচে থাকতেই চাই!

বলা বাহুল্য, শ্রীমতীর অন্তরে কেন বিষজ্বালা হয়, কেন তিনি প্রাণত্যাগ করতে চান না—তার কারণ রসিক ভক্তকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আর এর মধ্যে রাধাপ্রেম-প্রদর্শক মহাপ্রভুই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছেন সেও তাঁরা ইঙ্গিতেই বুঝবেন। গোপীপ্রেম থেকে রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ দ্যোতনা করতে চরিতামৃতে বলা হয়েছে :

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরানী।
সর্বগুণখনি সর্বকান্তাশিরোমণি॥

রাগাত্মিক প্রীতিরসের প্রথমাবস্থাকে যদি 'রতি' বলা যায়, পরবর্তী অবস্থাকে বলা যায় 'প্রেম'। রতির গাঢ়তাই প্রেমে ঘনীভূত, আরো ঘনীভূত হতে হতে ক্রমান্বয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাবে গিয়ে পৌঁছায়। সাধারণভাবে গোপীদের প্রেম এই 'ভাব'-অবস্থা পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু ভাবই এর সান্দ্রতম শেষ প্রকাশ নয়। ভাবের উপরে যে অলৌকিক অপরিমেয় মানসিক অনুভব রয়েছে তা হ'ল মহাভাব এবং এই অবস্থার অধিকারিণী হলেন শ্রীমতী স্বয়ং। সংসার এবং পাতিব্রত্য নিঃশেষে ত্যাগ এবং কৃষ্ণের আরাধনায় প্রাপ্ত গুরুদুঃখেও সুখানুভব এই মহাভাবের লক্ষণ। রাধিকার চিত্তেন্দ্রিয়কায় কৃষ্ণপ্রেমভাবিত, তাঁর সমস্ত বোধই কৃষ্ণপ্রীতিবোধ, তাই বিরহে অথবা স্বজন তাড়নাদিতে বাইরে কালকূট-বিষজ্বালা অনুভূত হ'লেও অন্তরে সুধানিস্যন্দবিশেষ স্বাদিত হয়, এজন্যই রাধাপ্রেম তুলনাহীন। এই বক্রমধুরিমার আস্বাদন বোঝাতে চরিতামৃতকার বলছেন :

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমা আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
জীভ জ্বলে না যায় ত্যজন।
হেন প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

এই মহাভাবের অবস্থায় স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারগুলি মুহুর্মুহু প্রকাশ পেলে তাকে বলে 'রূঢ়' মহাভাব, আর সাত্ত্বিক পরাকাষ্ঠা লাভ করলে বা সু-উদ্দীপ্ত হ'লে সে অবস্থার নাম হয় 'অধিরূঢ়' মহাভাব। অধিরূঢ় মহাভাবের আবার প্রকাশ-তারতম্যে দুই বিভাগ—মোহন এবং মাদন; এই হ'ল কৃষ্ণপ্রেমের পরিণামের অবস্থা—এর উপরে আর নাই। মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায় এই ভাবাবস্থা ভক্তেরা পুনঃপুন স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এ থেকেই ব্রজলীলায় রাধার অনুরূপ ভাবাবস্থা তাঁরা কল্পনা ক'রে নিয়েছেন। মোহন হ'ল প্রেমের বিরহাশ্রিত একত্বের সীমা, আর মাদন হ'ল মিলনগত একীভাবের ঘনীভূত অবস্থা।

মোহন-মহাভাব বিশেষ দশার আশ্রয়ে বিরহোন্মাদের আবির্ভাব ঘটায়। শ্রীমতী মথুরা থেকে কৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধবদর্শনে বিশেষতঃ ভ্রমরকে লক্ষ্য ক'রে উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ, রোদন, ক্রোধ, মান প্রভৃতি প্রদর্শন করেছিলেন। উদ্‌ঘূর্ণা, প্রলাপ, চিত্রজল্প প্রভৃতি হ'ল দিব্যোন্মাদের কার্য। চরিতামৃত বলছেন :

উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ স্মরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ বচনরীতি মদ গর্ব ব্যাজস্তুতি
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান॥

এই অবস্থায় প্রবল মানস-বিকৃতি দেহেরও বিকৃতি নিয়ে আসে। মহাপ্রভুতে লক্ষিত এই অলৌকিক ভাবাবেশের বর্ণনায় চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন :

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্‌গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥

গম্ভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্ত্যে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥
চটক পর্বত দেখি গোবর্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্ছা যান॥
কাহাঁ নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥

এই পরমাশ্চর্য ভাবাবস্থা এবং 'কোথা কৃষ্ণ' ব'লে অহরহ রোদন এক মহাপ্রভুর লীলায় দৃষ্ট সুতরাং রাধাপ্রেমে অনুমিত হয়েছে। এইজন্যই রাধিকা হলেন ব্রজকান্তাগণের শিরোমণি। তাঁর পক্ষে এ স্বাভাবিক, কারণ তিনিই কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, এক আত্মা—দুই দেহ, আর ব্রজগোপীরা তাঁর স্বাংশ নিয়ে গঠিত অনন্ত বিলাসমূর্তি মাত্র।

রাধাকৃষ্ণ যুগলপ্রণয়ের যে মিলনরসাস্বাদ, তার আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল উভয়ের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিলীন ক'রে শুধু ভাবসারাবস্থায় উপনীত করা। তখন কৃষ্ণের পুরুষ-ব্যক্তিত্ব এবং রাধার নারী-ব্যক্তিত্বের বিলোপ ঘটে। আস্বাদক এবং আস্বাদ্যেরও ভেদ থাকে না। উভয়ে প্রেমাত্মা-রূপে প্রেমসমুদ্রে ভাসমান হন। চরিতামৃত রামানন্দমুখে একে প্রেমবিলাস-বিবর্ত বলেছেন। বিবর্ত শব্দের অর্থ ভ্রান্তি বা অন্যথাবুদ্ধি। পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজেকে নায়ক আর শ্রীমতী তখন নিজেকে নায়িকা ব'লে মনে করেন না। এরকম বিহ্বলতা ঘটতে পারে মহাভাবের মিলন-পরিপাকাবস্থায়, মাদনাবস্থায়। বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি এবং প্রলাপাদি যেমন এক প্রেমপরাকাষ্ঠা, তেমনি মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ এবং ভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া এও প্রেমের এক পরিপাকাবস্থা। তবু স্বরূপ-বর্ণনায় একে বিবর্ত বা ভ্রমাভা বলা হয়েছে এইজন্য যে যথার্থই তো আর নায়ক-নায়িকা স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ ক'রে এক হয়ে যাচ্ছেন না। প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় দুয়েরই ঐ রকম মনে হয় ব'লে। মোহন অবস্থায় দিব্যোন্মাদ বা বিরহোন্মাদেও এবকম ভ্রান্তি, যার বিবরণ চৈতন্য-চরিতামৃত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রেমবৈচিত্ত্যেও প্রায় একই-প্রকার ভ্রান্তি, মিলনে বিরহবোধ। সুতরাং বলা যায়, মহাভাবের অবস্থাই হ'ল ভ্রমবিধায়ক। দিব্যোন্মাদের লক্ষণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেছেন :

প্রেমবিলাস-বিবর্ত

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে॥

যাই হোক, মিলনে ভ্রান্তিময় এই যে আশ্চর্য বিলাস এ বিষয়ে একটি পদরচনা রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে শুনিয়েছিলেন এবং শুনে মহাপ্রভু 'আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে' এই বোধে তাঁর মুখ আচ্ছাদন করেছিলেন। নানা কারণে রামানন্দের এই রচনাটি বিখ্যাত :

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি ন গেল॥

ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জনি॥
এ সখি, সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জনি॥
ন খোঁজল দূতী ন খোঁজল আন।
দুহুঁক মিলন-মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥

রাধিকা স্বপ্নে দেখছেন—মানভঙ্গের পর মিলিত হয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে কৃষ্ণ ভাবলেন শ্রীমতীর মান বোধ হয় নিঃশেষে ভাঙেনি। তাই ভালো ক'রে মান ভাঙাবার জন্য দূতীকে পাঠিয়েছেন। রাধিকা স্বপ্নেই সেই দূতীকে বলছেন—এমন নিরুপাধি এবং শুদ্ধতম প্রণয়ে আজ এমনতর সন্দেহ! তুমি তাকে আমাদের সেই প্রণয়ের ব্যাপারটি ভালো ক'রে স্মরণ করিয়ে দিও, সে সব ভুলে গিয়েছে বোধ হয়। তাই আজ দূতী ঠিক ক'রে মধ্যস্থতা করতে পাঠিয়েছে!

আসলে পদটিতে রাধাকৃষ্ণপ্রণয়ের পরমাশ্চর্য বৈশিষ্ট্যগুলি সবই বিবৃত হয়েছে। তা হ'ল—(১) এ প্রণয় দূতীর মধ্যস্থতায় নয়, এ শুধু চোখের দেখায়। এ 'তারামৈত্রক পূর্বরাগ'। (২) এ প্রণয় শুধু বেড়েই চলে, এর সীমা পাওয়া যায় না—এ নিত্য নব নব ব'লে প্রতিভাত হয়। (৩) এই শুদ্ধ স্বারসিকী রাগ উৎকর্ষ লাভ ক'রে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাতে নায়কের পক্ষে আমি পুরুষ নই এবং নায়িকার পক্ষে আমি নারী নই এরকম ভ্রম ঘটে। অর্থাৎ উভয়েই রসনির্যাসবিশেষে রূপান্তরিত অনুভব করে।

এর উপর আর গতি নেই। কলিযুগে মহাপ্রভু এবং দ্বাপরে শ্রীরাধা এই প্রেমের আশ্রয়। মহাপ্রভু প্রদর্শিত এই অধিরূঢ় মহাভাবের অনুসরণ ভক্তদের সাধ্যাতীত, এমনকি ভাবাদির অধিকারও সাধারণ ভক্তের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে রাগানুগার অনুকূল বৈধী মার্গ আশ্রয় করলে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁদের ঘটতে পারে এই আশ্বাস সিদ্ধান্তকারেরা দিয়েছেন।

গৌরকৃষ্ণ বা কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও নবদ্বীপলীলা

গয়া-প্রত্যাবৃত্ত গৌরাঙ্গের ভাবপ্রকাশের স্বল্পকালমধ্যেই তিনি পূর্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণস্বরূপ ব'লে নবদ্বীপ-লীলাপরিকরদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন। ভক্তিতত্ত্ববিৎ সাধক অদ্বৈত তাঁর পূজা ও স্তব করেছিলেন, পরিকরদের নিয়ে তাঁর অভিষেক করেছিলেন। আর নরহরি বাসুদেবাদি গৌররূপী নটবর কৃষ্ণের লীলা নিয়ে তখনই পদরচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই সময়ে ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গ প্রথমে দাস্যভক্তিভাবে, পরে কান্তা-ভাবে কৃষ্ণসঙ্গ লাভের জন্য সমুৎসুক, আবার কখনো কৃষ্ণভাবিত হয়ে রাধাসঙ্গ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল। অর্থাৎ তিনি কখনো গোপীভাবে, কখনো কৃষ্ণভাবে ভাবিত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে তাঁর ঐ কৃষ্ণভাবিত প্রকাশ অর্থাৎ রাধাপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা আর দেখা যায়নি, এখন থেকে কৃষ্ণের জন্যই তাঁর লালসা-উদ্বেগ-মূর্ছা, তাঁর অবিরল অশ্রুপাত। গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ

এই উপলব্ধিতে নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ প্রত্যয়বান্ হলেও এরকম ভাববিকারের তাৎপর্য তাঁরা সম্যক্ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁদের ধারণায় কৃষ্ণ যুগধর্ম প্রবর্তন করতে এসেছেন ভক্তভাব অঙ্গীকার ক'রে। এই যুগধর্ম হ'ল নামসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকে হরিভক্তির সহজ পথ প্রদর্শন। তিনি বিশেষভাবে এসেছিলেন তাদেরই জন্য, শাস্ত্র ও সামাজিক দম্ভ যাদের ধর্মের সুতরাং মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। যারা হীন এবং পতিত, বিধর্মী এবং বিজাতি ব'লে নিন্দিত। নবদ্বীপলীলাপরিকরদের এ অনুভব যথার্থ। কিন্তু এ ছাড়া শ্রীচৈতন্যলীলার গভীরতর তাৎপর্যের ইঙ্গিত তাঁর শেষ দ্বাদশবৎসরের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর স্বরূপ-দামোদর এবং সেই সঙ্গে গোস্বামী শ্রীরূপ ও রঘুনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। শেষ বারো বৎসরে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়ে বিরহমূলক কৃষ্ণপ্রেমার কল্পনীয় শেষদশা দিব্যোন্মাদের অবস্থা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। এই অবস্থায় কেবল অশ্রু-রোমাঞ্চ-কম্পই নয়, আরও এমন সব বিকার দেখা গিয়েছিল যা পূর্বে দেখা যায়নি, যেমন প্রলাপ—কখনো মানের ভাব এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণনিন্দা, ক্রোধ এবং গর্ব-প্রকাশ, কখনো দৈন্য এবং আর্তি ; বিষাদ গর্ব দৈন্যোক্তির পর্যায় শেষ হতে না হতেই বিপরীত সঞ্চারীর উদয় ; কখনো ভ্রমবশে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে তিনি পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করছেন, কখনো অসংবৃত অবস্থায় বেলাভূমির উপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন, দেবদাসীদের গান শুনে তাদের আলিঙ্গন করবার জন্য ছুটছেন, কখনো বা নিতান্ত বিকল অবস্থায় বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন এবং জগন্নাথ মন্দিরের গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ ঘসে মুখ রক্তাক্ত করছেন। এ এক অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য ব্যাপার। নবদ্বীপে এ লীলা দেখা যায়নি। সেখানে প্রায়শই কৃষ্ণভাবাবেশ এবং ঐশ্বর্যের প্রকাশ, যেমন, মুরারিগৃহে বরাহভাব, শ্রীবাসগৃহে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন, সাতপ্রহর ভাবাবেশ, 'আমি সেই, আমি সেই'-ভাষণ, নগরসংকীর্তন, কাজি-প্রবোধ, জগাই-মাধাই উদ্ধার, ভক্তবৃন্দকে আকর্ষণ। এরই সঙ্গে নৃত্য, কীর্তন, অশ্রুকম্পের মধ্য দিয়ে স্পষ্টতঃ যুগধর্ম প্রবর্তনের প্রতীতি সঞ্চার। অন্যপক্ষে নীলাচল-লীলায় বিরহপ্রলাপাদিতে তিনি নিতান্তই গোপীশ্রেষ্ঠা রাধা ব'লে প্রতীয়মান। দেহকান্তিতেও তিনি রাধারই দ্বিতীয় প্রতিমা। তা ছাড়া এ কথাও মনে হয়েছিল যে এরকম সুতীব্র ভাবোন্মাদ, সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ তো কেবল যুগধর্ম প্রচারের জন্য হতে পারে না। এই একদেহে দুই লীলার সংগতি ও সমাধান নীলাচল-জীবনের নিতান্ত অন্তরঙ্গ বিদগ্ধ ও বহুগুণশালী স্বরূপ-দামোদরের (এবং সম্ভবতঃ রামানন্দের) সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়ে। স্বরূপ সম্ভবতঃ নবদ্বীপলীলারও প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচললীলার ভাববিকারগুলি পর্যালোচনা ক'রে তার তাৎপর্য আবিষ্কার ক'রে তিনি সূত্রাকারে শ্লোকে কড়চা ক'রে রাখেন। শিক্ষণ-শিষ্য রঘুনাথদাস তা কণ্ঠস্থ ক'রে নেন এবং নীলাচলে রূপ-সনাতন এলে তাঁরাও এ বিষয়টি উপলব্ধি করেন (মহাপ্রভু-উচ্চারিত 'যঃ কৌমারহরঃ -শ্লোকের শ্রীরূপরচিত প্রতিশ্লোক 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ' এবং 'অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য' প্রভৃতিই তার প্রমাণ)। ক্রমে চৈতন্যলীলার এই তাৎপর্যটি কেবল নীলাচল-বৃন্দাবনেই সীমিত থাকেনি। প্রতিবর্ষে সমাগত নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দের হৃদয়েও অনিবার্যভাবে রেখাপাত করেছিল। বাসুদেব ঘোষ ও নরহরি সরকার এই নিয়ে পদও লিখেছিলেন।

চৈতন্যলীলার এই নিগূঢ় ব্যাপারটি, চৈতন্য-চরিতামৃতকারের মতে স্বরূপ দামোদর থেকেই যার প্রচার, তা হ'ল এই : কৃষ্ণেরই বৃন্দাবনলীলা এবং কৃষ্ণেরই নবদ্বীপলীলা। মূলে কৃষ্ণ তাঁর অন্তর্ভাস্বতী হ্লাদিনীশক্তিসহ অদ্বিতীয় একই ছিলেন, নিজসুখ নিজ অন্তরেই উপলব্ধি করতেন। কিন্তু অতিরিক্ত প্রেমসুখবাসনায় তিনি হ্লাদিনীকে তাঁর অন্তর থেকে বাইরে এনে পৃথক্ করলেন, নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন মিলনবিরহময় প্রেমলীলা অনুভব করার মানসে। কোনো এক দ্বাপরে বেণুকর দ্বিভুজ তমালশ্যাম মানুষমূর্তিতে নিজকে প্রকটিত করলেন আর তাঁর হ্লাদিনীকে আবির্ভূত করালেন গোপরমণীসহ রাধারূপে বৃন্দাবনে। ছিলেন এক, দুই হলেন। আবার অনিবার্য কারণে ঐ দুইকে মিলিত ক'রে নূতনভাবে একরূপে নিজকে আবির্ভূত করানোর প্রয়োজন হ'লে তিনি ঐ দ্বাপরেরই পরবর্তী কলিযুগে শচীগর্ভে গৌরাঙ্গ হয়ে আবির্ভূত হলেন। কৃষ্ণচৈতন্য নামে অভিনব লীলায় হলেন আবিষ্ট। স্বরূপ দামোদরের রচিত ব'লে কথিত নিম্নলিখিত শ্লোকে একই কৃষ্ণের এই দুই লীলাতত্ত্বের বিষয়টি উপস্থাপিত করা হয়েছে :

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

রাধা হলেন প্রেমঘন কৃষ্ণের প্রেমপরিণাম। শক্তিতত্ত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা ক'রে বলতে হয় হ্লাদিনীশক্তি। মূলে এই হ্লাদিনীশক্তিসহ কৃষ্ণ একবপুঃ হলেও তাঁরই ইচ্ছায় ঐ হ্লাদিনীশক্তি মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে রাধারূপে পৃথক্ হয়ে পড়েছিল। এটি ঘটেছিল কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রকট হওয়ার সময়ে। এখন কলিতে আবার সেই দুই একত্র হয়ে কৃষ্ণচৈতন্যমূর্তিতে প্রকট হয়েছে। অহো! নিগূঢ় এবং আশ্চর্যজনক এই কৃষ্ণলীলা। যেহেতু এখন তিনি বহিরঙ্গে, অর্থাৎ ভাবে ও কান্তিতে রাধা, কিন্তু অন্তরঙ্গে সেই দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামই।

প্রশ্ন হ'তে পারে, এক কৃষ্ণ দুই হলেন দ্বাপরে, প্রেমরসনির্যাস আস্বাদের বাসনায়, এ না হয় বোঝা গেল, কিন্তু পুনরায় বিপরীতভাবে এক হওয়ার কারণ? স্বরূপ-দামোদর আর একটি শ্লোকে এর অর্থ নির্দেশ করেছেন :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

অর্থাৎ, বৃন্দাবনে গোপীশ্রেষ্ঠা রাধার সঙ্গে যে মিলন-বিরহলীলা তিনি অনুভব করলেন তাতে তাঁর পূর্ববাসনার পূরণ ঘটলেও অন্যতর বাসনা জাগরিত হ'ল। কারণ, কৃষ্ণ এই দ্বাপর-লীলায় যা অনুভব করলেন তা তাঁর অভাবিত। এরকম ব্যাপার চাক্ষুষ করবেন তা তিনি পূর্বে কল্পনাও করেননি। সে ব্যাপারটি হ'ল রাধার প্রেমরহস্য। রাধার আন্তর অনুভব। পুরুষ কৃষ্ণ নিজের অনুভবের স্বরূপ হয়তো বা সম্যক্ জেনেছিলেন, কিন্তু তাঁর থেকে পৃথক্ তাঁর নারীরূপা শক্তির অন্তর? যদি বলা যায়, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হ'লে ঐ বিষয়টিই বা তাঁর অজানা থাকে কেমন ক'রে? তার উত্তরে বলা যায় যে, লৌকিক লীলায় যখন

কৃষ্ণ আত্মদান করলেন, তখন তিনি দৈবের হাতেও আত্মসমর্পণ করলেন। তখন তিনি ইচ্ছা করলেও রাধার মধ্যে যেমন একীভূত হতে পারলেন না, তেমনি রাধাচিত্তও তাঁর দুরবগাহই থেকে গেল। কিন্তু রাধার অনুভব বোঝবারই বা তাঁর কেন আগ্রহ জন্মাল? এর উত্তর চরিতামৃতকার নিম্নলিখিতভাবে দিচ্ছেন : রাধার তো কথাই নাই, গোপীদের প্রণয়ও উচ্চপর্যায়ের, কৃষ্ণের নিজপ্রণয় তার কাছেও যেতে পারে না। গোপীপ্রেম যেমন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ তেমনি একান্ত সীমাহীন। প্রেমবিষয়ে গোপীরা কৃষ্ণের গুরু। এই গোপীদের মধ্যে আবার সব বিষয়ে রাধার শ্রেষ্ঠতা। তিনি মহাভাবের অধিকারিণী। নিমেষ বিরহে তাঁর সুতীব্র আর্তি, বিরহভয়ে তিনি মিলনেও কাতরা। কৃষ্ণের জন্য তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ, এমনকি লজ্জা এবং আত্মমর্যাদা পর্যন্ত। তাঁর অশ্রু, রোমাঞ্চ, মূর্ছা, আক্ষেপ এবং উন্মাদ প্রভৃতি বিকার আর কোথাও দৃষ্ট হয়নি। এ প্রেম সহজ এবং স্পষ্টও নয়। এ মুহূর্তে মুহূর্তে নবায়মান, এ পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবের আধারও বটে। সুতরাং কৃষ্ণের কাছে এর স্বরূপ অনির্ণেয় এবং তা অপ্রাপ্যও। অথচ বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণ রাধার প্রণয় দেখে যতই বিস্ময় বোধ করেন ততই ঐ প্রেমের স্বরূপ নিজ অন্তর দিয়ে বোঝবার আগ্রহ তাঁর প্রবল হয়। কিন্তু তিনি তা পারেননি। কারণ, ঐ আশ্চর্য রাধাপ্রেমের তিনি বিষয়মাত্র, রাধাই আশ্রয়। আশ্রয়জাতীয় প্রেম লাভ করতে হলে তাঁকেও আশ্রয় অর্থাৎ রাধা হতে হয়। সে তো আর বৃন্দাবনলীলায় সম্ভব নয়। তাঁর ইচ্ছায় এই নবদ্বীপলীলায় তা ঘটল।

বিষয়টি সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণচিত্তের অপূর্ণতাবোধ থেকেই নবদ্বীপলীলার উদ্ভব। এই অপূর্ণতাবোধ মহাভাবরূপ রাধাপ্রেমের তিনটি বিষয় নিয়ে। প্রথমতঃ ঐ প্রেমের মহিমা কেমন, দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণের নিজস্ব রূপগুণে কী মাধুর্য আছে যাতে রাধাকে ঐভাবে ব্যাকুল করে, তৃতীয়তঃ কৃষ্ণের অনুভবে রাধাচিত্তে যে সুখ উৎপন্ন হয় তারই বা প্রকার কী।

ফলতঃ বাধার ভাব ও কান্তি নিয়ে তাঁকে আবার আসতেই হ'ল। পার্থক্য এই যে, বৃন্দাবনলীলায় তিনি স্বরূপে এসেছিলেন; এবার এলেন রাধারূপে। তাই গৌরাঙ্গ বাইরে রাধা, অন্তরে কৃষ্ণ। 'অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ'। দ্বাপরে তিনি যেমন নিজ লীলানুভব ছাড়া আনুষঙ্গিকভাবে রাগধর্মের প্রচার করেছিলেন, এবারেও তিনি তেমনি নামসংকীর্তনের আদর্শ দেখিয়ে যুগধর্ম প্রবর্তন করলেন। সেবার শুধু প্রিয়জনকে উদ্ধার করেছিলেন, এবার জাতিকুলসম্প্রদায়-নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে। গৌরলীলার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি ক্রমে ক্রমে ভক্তদের কাছে পরিস্ফুট হয়েছিল। গৌরলীলাদৃষ্টে কৃষ্ণলীলার নিগূঢ় স্বরূপ এবং রাগানুগভক্তি ধর্মের যাবতীয় সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যও ভক্তদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। নতুবা কৃষ্ণলীলা বিষয়ে এই ধারণাই জনসমক্ষে বিরাজ কবত যে কৃষ্ণ নারায়ণের অবতার মাত্র এবং তিনি অসুর সংহার ক'রে এবং কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা ক'রে যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্যই এসেছিলেন। এরকম ধারণায় শুদ্ধভক্তিমূলক প্রেমধর্মের সম্পদ থেকে বিশ্ব বঞ্চিত থাকত। ঈশ্বর মানুষ থেকে যেমন দূরে তেমনি দূরেই থাকতেন, আর জাতিবর্ণের দম্ভ, বিদ্যার ঐশ্বর্য, মুক্তির গর্ব তেমনি আধিপত্য বিস্তার ক'রে সাধারণ মানুষকে পীড়িত ও অভীষ্টলাভে বঞ্চিত করতে থাকত। শ্রীচৈতন্য পথ দেখালেন। পূর্ণচন্দ্রের মত অন্ধকার দূর করলেন, তাই আমরা দেখলাম। এই বিষয়টি স্মরণ ক'রে কোনো পদকর্তা (বাসুদেব? নরহরি?) লিখেছেন :

যদি গৌর নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতোঁ দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরি-
প্রবেশ-চাতুরি-সার।
বরজ-যুবতি- ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

কোনো পদকর্তা (গোবিন্দদাস কবিরাজ) রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণের বন্দনা নিম্নলিখিতভাবে করেছেন :

জয় নিজকান্তা -কান্তি-কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।

কোনো পদকর্তা (বলরাম দাস?) বিস্মিত প্রশ্নের দ্বারা কৃষ্ণের এই রাধাভাবরূপ গ্রহণের অপূর্ব অদ্ভুত বিষয়টি সাধারণের গোচরে আনতে চেয়েছেন :

শিখিপুচ্ছগুঞ্জাবেড়া মনোহর যার চূড়া
সে মস্তক কেশশূন্য দেখি।
যার বাঁকা চাহনিতে মোহে রাধিকার চিতে
এবে প্রেমে ছলছল আঁখি॥
সদা গোপী সঙ্গে রহে নানা রঙ্গে কথা কহে
এবে নারীনাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশী ধরি আকর্ষয়ে ব্রজনারী
সেই ভুজে দণ্ড কেনে লএ॥

বৃন্দাবনের গোস্বামীবর্গের মধ্যেও কৃষ্ণের রাধাভাব গ্রহণের তত্ত্ব প্রকাশিত অথবা প্রচারিত হতে খুব বিলম্ব ঘটেনি। শ্রীরূপের চৈতন্যাষ্টকের এরকম দু'টি শ্লোক চরিতামৃতে উদ্ধৃত হয়েছে। 'সুরেশানাং দুর্গং' এবং 'অপারং কস্যাপি'। এর মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকটিতে 'রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন' প্রভৃতি শ্রীল স্বরূপদামোদরের রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতম্ এরই প্রতিধ্বনি মনে হয়। যাই হোক, নীলাচল-বৃন্দাবনে গৃহীত চৈতন্যলীলা সম্পর্কে এই নূতনতর উপলব্ধি সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ও গৃহীত হতে বিলম্ব ঘটেনি। এইভাবে কৃষ্ণ এবং চৈতন্যের ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলার সমসূত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় ভক্তেরা বৈষ্ণবধর্মের নূতন এবং পূর্ণাঙ্গ পথের সন্ধান পেলেন এবং এর ফলে পূর্ব-প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কতকগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও সূচিত হ'ল। নোতুন রসশাস্ত্র গড়ে উঠল, পদাবলী তার সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি ত্যাগ না ক'রেও সূক্ষ্মতর রসবিবেচনার আদর্শ বরণ করে নিলে। যেহেতু গৌরাবির্ভাবের জন্যই নূতন ধর্মের পথ উন্মুক্ত হ'ল এবং তদনুযায়ী রসশৈলী প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং যেহেতু তাঁর লীলা বৃন্দাবনলীলাকেই স্পষ্ট, যথাযথ এবং গভীরতর তাৎপর্যে মণ্ডিত ক'রে প্রতিষ্ঠিত করলে, সেইহেতু তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ জীবনালেখ্য রাধাকৃষ্ণ-লীলাগানের পূর্বভূমিকারূপে গ্রহণ

ক'রে ভক্তেরা কীর্তন গানকেও পূর্ণাঙ্গ এবং তার ভাববস্তুকে প্রতীতিযোগ্য ক'রে তুললেন। রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণের বা গৌরের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র নিয়ে লেখা এই শ্রেণীর পদ 'গৌরচন্দ্রিকা' ব'লে কীর্তিত হ'ল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমধর্মের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় এখন সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে :

১. দ্বিভুজ বেণুকর গোপবেশ কৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান্ এবং তিনি দ্বাপরে বৃন্দাবনে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর হ্লাদিনীশক্তি রাধার সঙ্গে প্রেমলীলা আস্বাদন করার জন্য। (এ বিষয়টি পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে)

২. ব্রজবধূদের রাগাত্মিক এবং তদনুসরণে ভক্তদের রাগানুগমার্গে কৃষ্ণভজনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা পদ্ধতি।

রাগাত্মিক কৃষ্ণারাধনের বৈশিষ্ট্য হ'ল ঈশ্বরকে চিরাচরিত ঐশ্বর্য-মহিমার আসন থেকে মর্ত্যের মাটিতে নামিয়ে এনে তাঁকে আত্মীয়রূপে অনুভব করা এবং নিঃস্বার্থ প্রীতি দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করা। অন্য কোনো বাসনার জন্য নয়; শুধু আত্মার আত্মীয় বলেই তাঁকে পাবার অভিলাষ যে-মনোভাবে, তাকেই রাগময়ী প্রীতি বা শুদ্ধা ভক্তি বলা হয়েছে। এর অন্য কোনো মূল্য নেই। 'তত্র লৌল্যমপিমূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈন লভ্যতে'—এই নিঃস্বার্থ কৃষ্ণলালসা কোটিজন্মের বিনিময়েও পাওয়া যায় না। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে রাগাত্মিক ও রাগানুগ ভক্তিভাবের নিম্নলিখিতভাবে লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে :

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

অর্থাৎ, অভীষ্ট প্রিয় ব্যক্তিতে স্বাভাবিক এবং গাঢ় যে আবিষ্টতা তাকে বলা যায় রাগ। আর এই রাগময়ী যে কৃষ্ণভক্তি তা হ'ল রাগাত্মিকা ভক্তি। ব্রজবাসী জনের কৃষ্ণের প্রতি যে আকর্ষণ তা রাগাত্মিক। আর এই 'রাগাত্মিকা-মনুসৃত্য যা সা রাগানুগোচ্যতে।' এই ভাবমূলক রমণীয় উপাসনা-পদ্ধতির অনুসরণে আধুনিক ভক্তের রাগানুগ ভজন। এই প্রিয়তা কারণশূন্য, অহেতুক। কোনো শাস্ত্রের নির্দেশে অথবা কোনো অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এ প্রীতির আবির্ভাব হয় না। বরং সমস্ত ত্যাগের দ্বারা এবং দুঃখের মূল্যেই এ লভ্য। যে প্রেমের জন্য অকাতরে অপরিমেয় দুঃখ সহ্য করা যায় তাই হ'ল রাগধর্মী প্রেম। বিরহের জন্যই হোক আর স্বজনের তাড়ন-ভর্ৎসনের জন্যই হোক দুঃখ অত্যন্ত প্রবল হলেও আকর্ষণের মাত্রা প্রবলতর ব'লেই প্রীতিভঙ্গ ঘটে না। বরং তা বর্ধিতই হতে থাকে। চরিতামৃতকার চমৎকারভাবে কৃষ্ণপ্রেমের এই অদ্ভুত স্বভাবটি বুঝিয়েছেন :

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥ ইত্যাদি

চরিতামৃতকার আরও বলেছেন যে এই ধরনের আত্যন্তিকভাবে নিঃস্বার্থ প্রণয়ের দৃষ্টান্ত লৌকিকে বিরল। কারণ, সমাজ-স্বীকৃত বিবাহিত প্রণয়ে পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়ই প্রবল থাকে। শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ বোঝাতে শ্রীরূপ বলেছেন :

অন্যাভিলষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অর্থাৎ, "অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥"

অর্থাৎ এতে কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থ থাকবে না এবং জ্ঞান বা কর্মের উপর নির্ভরতাও থাকবে না। ভক্তির আবির্ভাবের পর সেই ভক্তির দ্বারাই জ্ঞান ও কর্ম পরিচালিত হবে। 'অন্য বাঞ্ছা' বলতে সুচিরপ্রসিদ্ধ মুক্তির অভিলাষকেও বিসর্জন দিতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই ধর্মের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার 'প্রোজ্‌ ঝিত-কৈতব' বিশেষণটির টীকা করতে গিয়ে শ্রীধরস্বামীপাদ বলেছেন 'প্র' উপসর্গের দ্বারা মোক্ষের অভিলাষকেও দূরে সরিয়ে রাখা হ'ল। চৈতন্য-পূর্ব ভক্তিধর্মের তাত্ত্বিকদের মতে মোক্ষই পরমপুরুষার্থ। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ ক'রে ভক্ত বৈকুণ্ঠে বাস করেন। এমন প্রাপ্তিকে কৃষ্ণসেবানন্দ থেকে নিম্নশ্রেণীর অতিতুচ্ছ প্রাপ্তি ব'লে রাগমার্গে কথিত হয়েছে। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধার করা হয়েছে :

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসবেনং জনাঃ॥

অর্থাৎ সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং একত্ব বা সাযুজ্য এই পাঁচরকমের মুক্তির গুণগান করা হয়ে থাকে, এ যদি আমি দিতেও চাই, তাহ'লে শুদ্ধ ভক্ত আমার সেবানন্দ বর্জন ক'রে এ ককনোই গ্রহণ করেন না। 'সিন্ধু'তে বলা হয়েছে, যেমন ভোগবাসনা তেমনি মোক্ষবাসনা—দুই-ই পিশাচী। এ দুয়ের একটি যদি অন্তরে লুকিয়ে থাকে তাহ'লে শুদ্ধাভক্তির অপূর্ব আনন্দ ধর্মপথচারী পাবেন না—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

এই নবধর্মের স্বরূপ সংক্ষেপে বিবৃত করতে গিয়ে চরিতামৃতকার কৃষ্ণোক্তিতে ব'লেছেন :

ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সর্ব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন।
তার প্রেমবশে আমি না হই অধীন॥
...মোর সখা মোর পুত্র মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে মোরে যেই করে শুদ্ধ রতি॥
আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

এখানে আত্মীয় সম্পর্কের প্রধান তিনটি মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে—সখ্য, বাৎসল্য এবং কান্তার ভাব। কিন্তু এর নিম্নে আরও দুটি রয়েছে, বাহুল্যভয়ে তা বলা হয়নি। সে-দুটির মধ্যে উত্তম হ'ল দাস্য, তার নিম্নে শান্ত। শান্ত রসে রাগাত্মিকতার অতি ক্ষীণ স্পর্শ মাত্র আছে, আর কান্তাভাব বা মধুররসে আছে পূর্ণতা। রসশাস্ত্রে এগুলির পারম্পর্য অনুসারে গুণাধিক্য বর্ণিত হয়েছে। এই পাঁচটি ভক্তিরস মুখ্য এবং পূর্বতন আলংকারিক অন্য সাতটি রস গৌণ ব'লে ঘোষিত হয়েছে।

এসব রসবৈচিত্র্য এবং তদনুযায়ী বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীর বৈশিষ্ট্য, গুণ ও অবস্থা

নিয়ে নায়ক-নায়িকার নূতনতর বিভাগ গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকে প্রচলিত সাধারণ রসশাস্ত্র থেকে পৃথক্ ও সূক্ষ্মতর করেছে। এই রসশাস্ত্র অনুসারেও পদাবলী রচিত হয়েছে এবং কীর্তনগানের পালা বিভক্ত হয়েছে। এসব সম্ভব হয়েছে গৌরকৃষ্ণের জীবনধারা দৃষ্টে। তিনি নিজ আচরণের দৃষ্টান্ত জীবকে অমূল্য রত্ন কৃষ্ণপ্রেমের অধিকার দিয়ে গেছেন। যা বেদে উপনিষদে নেই, যে বিষয়ে কোনো পূর্ব অবতার কিছু বলেননি, সেই রাগভক্তির আদর্শ এবং নামকীর্তনের পথ প্রদর্শন ধর্মজগতে মহাপ্রভুর নূতন অবদান।

৩. রাধাভাব॥ মূল রাধাভাব-প্রসঙ্গ পূর্বে বিবৃত হ'লেও এক্ষেত্রে আরও বিশেষ যা, তা প্রয়োজনক্রমে নির্দিষ্ট হচ্ছে। শ্রেষ্ঠা গোপী রাধার প্রণয় চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং লৌকিক সাহিত্যে কীর্তিত হলেও তা যে এত উচ্চকোটির এবং লোকোত্তীর্ণ তা মহাপ্রভুর ভাবজীবন নিরীক্ষণের পূর্বে কেউ ধারণাই করতে পারেননি। বলা বাহুল্য, বিশেষভাবে মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ অবস্থা থেকেই রাধাভাবের শ্রেষ্ঠতার বিষয় ভক্তদের চিত্তে উদিত হয়েছিল। পরবর্তী ধর্মসাহিত্যে, রূপগোস্বামীর ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বলরামদাস-জ্ঞানদাস-শেখর-গোবিন্দদাসের পদাবলীতে যে-রাধার চিত্র ফুটে উঠেছে তা নীলাচলবাসী মহাপ্রভুর চরিত্রেরই বিস্তার। গোপীভাবের একটি বিশেষ লক্ষণ হ'ল কৃষ্ণের জন্য স্বার্থত্যাগ এবং দুঃখবরণ। এর দৃষ্টান্ত দিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাগবত ও শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্তের সারসংক্ষেপ ক'রে বলছেন :

লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম॥
দুস্ত্যজ আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সপ্রেম সেবন॥

শ্রীরাধায় এই ত্যাগদুঃখময় প্রেমধর্মের পরাকাষ্ঠা। তা ছাড়া বলা হয়েছে যে, গোপীদের কৃষ্ণরতি 'সমর্থা'। এই সমর্থা রতির প্রৌঢ়তাও শ্রীমতীতে। চরিতামৃতকার রাধার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাকল্পে বলছেন :

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরানী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥
...কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
জগতমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরানী॥

অপিচ,

রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঁই।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥

যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব-বর্জিত॥
যাহা হৈতে সুনির্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার॥

রাধাভাবে প্রেমের বক্রতা, অনির্বাচ্যতা এবং অন্যান্য বিরুদ্ধ ধর্মের বিষয় মহাজন-পদাবলীতেও চমৎকার ফুটেছে। প্রেমবৈচিত্ত্য বা মিলনেও বিরহানুভব এরকম বৈশিষ্ট্যের একটি। এসবের বর্ণনা দিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের অসীমতা দ্যোতনা করেছেন বাঙালী বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি অনেকেই।

রাধাকেই প্রেমকল্পলতার মূলকাণ্ড ধ'রে তুলনায় অন্যান্য গোপীদের পুষ্পপল্লবপত্রে উপমিত করা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে ললিতা-বিশাখাদি প্রধানা গোপী এবং সহস্র সহস্র অপ্রধানা গোপী রাধিকারই কায়ব্যূহ, তাঁর অংশ এবং অংশাংশ। এঁরা রাধার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের নর্মবিলাসের সহায়িকামাত্র। রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠতা ব্যঞ্জনাক্রমে শ্রীমদ্‌ভাগবতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে, তামিল লোকগীতে এবং বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে কীর্তিত হলেও তত্ত্বে এবং কাব্যে রাধার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী যুগেই। অন্যান্য গোপীকে এযুগে প্রতিষ্ঠা দিয়েও তার মধ্যে রাধিকাকেই কৃষ্ণের একক নায়িকারূপে দেখা হয়েছে।

৪. মধুররসে পরকীয়া রতির শ্রেষ্ঠতা কীর্তন॥ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে প্রচলিত শাস্ত্র এবং লোকধর্মকে চরম উপেক্ষা দেখিয়ে নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এ বিষয়টিতে তা স্পষ্ট। গোপরমণীরা বৃন্দাবনের গোপদের ধর্মপত্নী। কিন্তু পতিতে তাদের আকর্ষণ নেই, কৃষ্ণেই একান্ত আসক্তি। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি যখন থেকে তাঁদের কর্ণগোচর হয়েছে তখন থেকেই তাঁরা গৃহসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছেন এবং ক্রমে গুরুজন, পরিজন, কুলশীল, বধূগৌরব, দুস্ত্যজ স্বামীধর্ম এবং পরিশেষে লজ্জা, আত্মমর্যাদা এবং আত্মসুখ, এক কথায়, সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। গুরুজনদের তাড়ন-ভর্ৎসন, লোকনিন্দা কিছুই তাঁদের পতিধর্মে এবং গৃহধর্মে ফেরাতে পারেনি। গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধার ত্যাগ এবং দুঃখবরণই সবচেয়ে বেশি, তাই তিনি শুধু প্রেমিকা নন, মহাভাব-স্বরূপা একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মহাজনদের পদে এই কুলত্যাগিনী কৃষ্ণময়ীর চিত্র প্রতিছত্রে এবং তা চমৎকারভাবে ফুটেছে, যেমন জ্ঞানদাস—

পরকীয়া তত্ত্বকথা

যাহার লাগিয়া কৈলুঁ কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিলুঁ দেহে গুরু গঞ্জনা॥
যার লাগি ছাড়িলুঁ গৃহের যত সুখ।
না জানি কি লাগি এবে সে জন বিমুখ॥
...কলঙ্ক রহল সব গোকুল নগরে॥
তিলেকে সে তেয়াগিঁলু পতি খুরধার।
শ্রবণে না শুনলুঁ ধরম বিচার॥
...দুখের উপরে দুখ পরিজন বোল।
সতীর সমাজে দাণ্ডাইতে হৈলুঁ চোর॥

যেমন গোবিন্দদাস—

গুরুজনবচন বধিরসম মানই
আন কহই শুন আন।
পরিজন-বচনে মুগধী সব হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

অথবা নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস॥

অথবা, অন্য কোনো পদকর্তার রচনায়,

ধৈর্যশীল-হেমাগার গুরুগৌরব-সিংহদ্বার
ধরম-কবাট ছিল তায়।
বংশীরব-বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করল আমায়॥
চিত্তশালে মত্তহাতী বাঁধা ছিল দিবারাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দম্ভের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ছুটি
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে॥
কালিয়া কুটিল বাণে কুল-শীল কোন্‌খানে
ডুবিল, উঠিল ব্রজের বাস।

বাঙলা পদাবলীতে পরকীয়া-ভাবের এই প্রাচুর্য নিঃসন্দেহে শ্রীরূপের রসসিদ্ধান্ত এবং শ্রীস্বরূপের ব্রজলীলা-গৌরলীলার পারস্পরিকতার অভিমতের প্রভাবে গঠিত, যা মহাপ্রভুর চারিত্র্যের দ্বারা উদ্দীপিত এবং ভাগবত-প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য চৈতন্য-পূর্ব পদরচনায়, বিশেষ, বড়ু চণ্ডীদাসের পদেও পরকীয়া রতির মহিমা উচ্চকণ্ঠে গীত হয়েছে, যেমন :

স্বামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোর কলঙ্ক তুলিআ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে॥

কৃষ্ণকীর্তনাদির ভিত্তিভূমিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধাদির গোপীচিত্র পরকীয়া নায়িকার এবং কৃষ্ণের চিত্র উপপতির। ভাগবতের নানা স্থানে তীব্র আকর্ষণ এবং অপরিমেয় ত্যাগের দিক্ লক্ষ্য করে গোপীদের পরকীয়াত্বের গুণকীর্তন করা হয়েছে। গোপীদের আশ্চর্য প্রেমের কাছে নিজ প্রেম নিষ্প্রভ বোঝাতে গিয়ে কৃষ্ণ বলছেন :

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

অর্থাৎ, 'তোমাদের এই যে প্রণয় এতে বিন্দুচমাত্র আবিলতা বা স্বার্থবাসনা কোথাও নেই। আমার প্রতি এই আশ্চর্য প্রেমের দ্বারা যে সাধু আচরণ তোমরা করেছ, দেবতাদের মত অজস্র পরমায়ু পেলেও তার ঋণ আমি কোনোদিনই শোধ করতে পারব না। কারণ, সংসারীরা যা সহজে ছিন্ন করতে পারে না এমন গার্হস্থ্যধর্মসংস্কারের শৃঙ্খল নির্দ্বিধায় ছিন্ন করে তোমরা আমার ভজনা করেছ। তোমাদের এ সাধুকৃত্যই সে ঋণ পরিশোধ করে নিক।' এই 'দুর্জরগেহশৃঙ্খলা'র অনুসরণেই সম্ভবতঃ গীতগোবিন্দে রাধার মহিমা ও রাধার বিশেষভাবে কৃষ্ণ-প্রেমপাত্রত্ব সূচিত হয়েছে :

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্[১]।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

ভাগবতে গোপীদের প্রতি 'নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ' প্রভৃতি উদ্ধববাক্যে লক্ষ্মী থেকে গোপীদের প্রেমের দিক্ দিয়ে উৎকর্ষ বোঝানো হয়েছে। এই অংশ মনে রেখেই মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বেঙ্কটভট্টকে ব্রজ-ভাব-ভক্তির উপদেশ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং যাবতীয় গোপীকৃষ্ণগীতের সারার্থ মহাপ্রভুর আচরণেই পরিস্ফুট হল। মহাপ্রভু যে ঔপপত্যময় পরকীয়া প্রীতির শ্রেষ্ঠতায় আস্থাবান ছিলেন তার আর একটি প্রমাণ রথস্থ ঐশ্বর্যমূর্তি ও শাস্ত্রবিধিতে পূজিত জগন্নাথকে দেখে তাঁর আক্ষেপ এবং 'যঃ কৌমারহরঃ' প্রভৃতি শ্লোকের উচ্চারণ। শ্লোকটির ভাবার্থ হল "যে আমার কুমারী অবস্থায় আমার সঙ্গে প্রণয়ে মিলিত হত, তার সঙ্গেই আমি বিবাহিত হয়েছি। কিন্তু তখনকার, পরকীয়-প্রীতিরসে যে অনির্বচনীয় সুখ ছিল, তা ধর্মানুগত দাম্পত্যজীবনে আর পাই না।" রূপ গোস্বামী তখন নীলাচলে। মহাপ্রভুর উচ্চারিত ঐ লৌকিক শ্লোকটির মর্মার্থ অনুধাবন করে তিনি তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনের ঔপপত্যময় অনুরাগই যে রাধার কাম্য এমন ভাবের একটি শ্লোক লিখেছিলেন। উদ্ধবের মুখ দিয়ে শ্রীশুক ভাগবতে পুনশ্চ বলছেন :

আসামহো চরণরেণুষুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

'অভিসারবতী এই গোপীদের চরণরেণু বৃন্দাবনের যে সব লতাগুল্মে পতিত হয়, তার একটি আমি যদি হতে পার! কেননা এই গোপীরা আত্মীয়স্বজন এমনকি দুস্ত্যজ পাতিব্রত্য ত্যাগ করে অপরিমেয় প্রেমে কৃষ্ণকে বশীভূত করেছে।'

বস্তুতঃ গোপীদের কৃষ্ণভক্তি অর্থেই নিঃস্বার্থ বা শুদ্ধা বা রাগময়ী ভক্তি এবং পরকীয়াত্বেই তার পরম উৎকর্ষ। পরকীয়াত্ব ছাড়া নিঃস্বার্থতা নেই।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে কৃষ্ণের নায়কত্ব বিবেচনে তাঁর ঔপপত্যের এবং নায়িকাবর্ণনে গোপীদের পরকীয়া প্রীতির উৎকর্ষ প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। উপপতির লক্ষণে তিনি বলছেন :

১. 'সংসার' শব্দের 'সম্যক্ সার' এরকম কষ্টকল্পিত অর্থের চেয়ে সাধারণ এবং সহজ অর্থ গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে করি। যার বন্ধন বেশি তার বন্ধনত্যাগের মহিমাও বেশি।

রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মং পরকীয়াবলার্থিনা।
তদীয়প্রেমবসতির্বুধৈঃ উপপতিঃ স্মৃতঃ॥

'পরকীয়া অবলার সঙ্গে প্রণয়ের জন্য যে নায়ক ধর্ম এবং সমাজ লঙ্ঘন করে সেই অন্যায়ত্তা নারীর প্রেমে মজে তাকে উপপতি বলা যায়।' এই ঔপপত্য সমাজে এবং কাব্যনাটকাদিতে নিন্দনীয় হলেও[১] কৃষ্ণপক্ষে নিন্দার প্রশ্ন নেই। কারণ তিনি অপ্রাকৃত নায়ক, এবং বৈষ্ণবীয় রতি, ভাব প্রভৃতি অলৌকিক। কৃষ্ণের নায়িকা দুই শ্রেণীর—স্বকীয়া এবং পরকীয়া। কৃষ্ণের বিবাহিত রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি স্বকীয়া আর ব্রজগোপীরা হলেন পরকীয়া। পরকীয়ার লক্ষণে শ্রীরূপ বলছেন :

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

'যাঁরা কেবল অনুরাগবশেই আত্মদান করেছেন, যাঁরা ইহকাল-পরকাল বিবেচনা করেননি, যে সব নারীর প্রেমে ধর্মের সমর্থন নেই, সেই রমণীরাই অর্থাৎ এখানে গোপীরাই পরকীয়া।' এবং এঁরাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা। দেখা যায়, কন্যা হলেও পরকীয়া হতে পারেন, কিন্তু বিধিমতে বিবাহিতা হলে তাঁরা স্বকীয়া হয়ে পড়বেন, কারণ তখন তাঁদের প্রেমে আর কোনো নিষেধ থাকবে না। গোপন আকর্ষণের গভীরতাও চলে যাবে এবং তাঁরা মাত্র প্রয়োজন-সম্পর্কে বা ধর্ম-সম্পর্কে কৃষ্ণে সঙ্গে মিলিত থাকবেন। আসলে গোপদের বিবাহিত রমণীরাই যথার্থভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত থাকবেন। আসলে গোপদের বিবাহিত রমণীরাই যথার্থভাবে কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা। পরকীয়া রতির উৎকর্ষের সমর্থনে শ্রীরূপ ভরত, বিষ্ণুগুপ্তসংহিতা প্রভৃতি থেকে প্রমাণ দিয়েছেন, যেমন :

বহু বার্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বং চ।
যা চ মিথো দুর্লভতা সা পরমা মন্মথস্য রতিঃ॥

'যেখানে আসঙ্গ-কামনায় সমাজ এবং ধর্মের বহু নিষেধ, যেখানে গোপনে প্রণয়ভাব পোষণ করতে হয়, যেখানে আসঙ্গ নিতান্ত দুর্লভ—সেইখানেই কন্দর্পের বেশি আধিপত্য।' একই কথা বলছেন রুদ্র :

বামতা দুর্লভত্বং চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা।
তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্॥

বিষ্ণুগুপ্তসংহিতাতেও—

যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্লভত্বং চ যন্মৃগাক্ষীণাং।
তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্যতে হৃদয়ম্॥

'যেখানে যত বেশি দুর্লভতা এবং বিধিনিষেধ সেখানে হৃদয়গত আকর্ষণও তেমনি সমধিক।' কৃষ্ণগোপীপক্ষে এই পরকীয়াত্বের অর্থাৎ প্রেমের চরমোৎকর্ষের স্থিতি সাব্যস্ত করে অবশ্য শ্রীরূপ লৌকিক প্রণয়ে এর অনুসরণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন। সে ভিন্ন কথা। গোপীপ্রেমে তিনি যে পরকীয়াবাদের স্থাপয়িতাদের অন্যতম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদিও

১. বলা বাহুল্য, আধুনিক সাহিত্যে এবং সাহিত্যবিচারে এ নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আর আলংকারিকেরা যাই বলুন, সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিতাতেও পরকীয়া প্রীতি নিয়ে শ্রেষ্ঠ কাব্যের উৎসার ঘটেছে।

একথা ঠিক যে, তিনি মহাপ্রভুর লীলা থেকে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে এর অবিসংবাদী সমর্থন পেয়েছেন।

শ্রীরূপের অভিপ্রায়সমূহের ব্যাখ্যায় 'লোচনরোচনী' টীকায় কিন্তু শ্রীপাদ জীব গোস্বামী গোপীদের বাস্তব পরকীয়াত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর মতে গোপীরা কৃষ্ণের একান্ত স্বকীয়া, নিত্যলীলায় কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে নিয়ত মিলিত। কেবল অবতার সময়ে প্রকটলীলায় পরকীয়াভাব অবলম্বন করে নেন। কৃষ্ণের ঔপপত্য বা গোপীদের পরকীয়াত্ব মায়িক। অর্থাৎ ঐভাবে প্রতীয়মান হয় মাত্র। প্রীতিসন্দর্ভেও তিনি মন্তব্য করেছেন 'পরমস্বকীয়াপি পরকীয়ায়মাণাঃ, শ্রীব্রজদেব্যো ন তু পরকীয়াঃ। শ্রীজীবের ব্যাখ্যার গতিপ্রকৃতি দেখে আমাদের মনে হয়েছে, তিনি খুব শিথিল যুক্তির উপর স্বকীয়ার বাস্তবতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্র বা গোপালতাপনীর উক্তিকে প্রমাণ মানার কোনো হেতু ছিল না। লৌকিক রসশাস্ত্রের অভিমত মান্য করারও সংগতি নেই। শ্রীরূপ গোস্বামীর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ভাগবতের 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ' প্রভৃতি শ্লোকের কষ্টকল্পিত অর্থ না করলে লক্ষ্মী এবং গোপীকে এক করে দেখা যায় না। মহাপ্রভুর অভিপ্রায় আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমাদের মনে হয়, শাস্ত্র-বিচার-ঘেঁষা শ্রীজীব এক্ষেত্রে নীতির বিপাকে পড়েছেন এবং বোধ করি একটু ভয়ও বা পেয়েছেন। ব্যাখ্যার শেষে তাই তিনি বলেছেন (?)— 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া'। তাঁর এই উক্তি যে প্রক্ষিপ্ত নয় তা তাঁর দোলায়মান টীকাই প্রমাণ করে। অন্যপক্ষে উজ্জ্বলনীলমণির অপর টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ শ্রীজীবের টীকার অভিপ্রায় খণ্ডন করে পরকীয়া তত্ত্বকেই বাস্তব বলেছেন। তাঁর মতে প্রকট এবং অপ্রকট লীলার দ্বৈত ভাবনা উচিত নয়। তা ছাড়া লীলাময় কৃষ্ণ, ভাগবতে চিত্রিত কৃষ্ণই যখন ভক্তের উপাস্য তখন ঔপপত্য-লীলার বাস্তবতা স্বীকার না করে উপায় নেই। আর বলাই তো হচ্ছে যে, এ একমাত্র কৃষ্ণলীলার ক্ষেত্রে চিন্তনীয়, অন্যত্র নয়। স্বকীয়াই যদি ব্যাস-শুকের অভিপ্রেত হত তাহলে তাঁরা তো স্বচ্ছন্দে দ্বারকার মহিষীদের মত গোপীদের কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহিত করে চিত্রিত করতে পারতেন। পরকীয়া-লীলাকে মায়িক, সুতরাং অনিত্য মনে করলে রাগাত্মিক ভক্তির ভিত্তিই নড়ে যায়, রাসলীলা মিথ্যা হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে, গোপীদের নিন্দাই ভূষণ, সুতরাং ভাগবতে গোপী-পরীক্ষণের জন্য কৃষ্ণমুখে গোপীদের ধর্মত্যাগের নিন্দা ব্যাজস্তুতি মাত্র। তা ছাড়া যেমন এখানে তেমনি 'নাটক-চন্দ্রিকা' গ্রন্থে শ্রীরূপ স্পষ্টই বলছেন :

যৎ পরোঢ়ৌপপত্যস্য গৌণত্বং কথিতং বুধৈঃ।
তত্তু কৃষ্ণং গোপীঞ্চ বিনেতি প্রতিপাদ্যতাম্॥

'অলংকারশাস্ত্রে পরকীয়াত্বকে রসাভাসের বিষয় এবং অঙ্গরসের বিষয় করা যেতে পারে, অঙ্গীরসের নয়, ইত্যাদিরূপ যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা কৃষ্ণ এবং গোপীদের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না।' এই সব স্পষ্টাভিমত থাকতেও শ্রীজীব প্রচলিত শাস্ত্রের ও ব্রাহ্মণ্য-তত্ত্ববাদীদের সঙ্গে আত্যন্তিক বিরোধ ঘটাতে চাননি বলেই বোধ হয় নিত্যে স্বকীয়া, মায়িকে পরকীয়া প্রভৃতি রূপ অভিমত প্রচার করেছেন। তবে তিনি 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' প্রভৃতি উপসংহারবাক্যে রাগভক্তির পথিকদের হয়ত বা রক্ষা করেছেন।

বিষয়টিকে এখন লৌকিক জীবের অর্থাৎ মানুষের দিক থেকে দেখা যেতে পারে। ধনজন স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে আমরা তো ঈশ্বরের পরকীয়ই এবং ঈশ্বরও তো আমাদের পরকীয়। 'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ'—আমরা তো এসবকেই স্বকীয় মনে করে সুখে সংসারজীবন কাটাতে চাই, কিন্তু ঘটনাচক্রে যদি বন্ধনে সামান্য চিড় দেখা যায়, কৃষ্ণ-কৃপায় কৃষ্ণে নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, তা ক্রমে বাড়তে থাকে, তখন কী অবস্থা হবে; তখন এই আত্মীয়স্বজন, পাতিব্রত্য, পত্নীপ্রেম প্রভৃতি, এমনকি সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে না? তখন কি পরকীয়ের প্রবল আকর্ষণ প্রবল দুঃখের মধ্য দিয়ে স্বকীয়কে ত্যাগ করতে বাধ্য করবে না? অতএব পবকীয়া রতি বাস্তব, মায়িক তো নয়। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধাকে কতকটা এই তত্ত্বের অনুগামী করে দেখানো হয়েছে। রাধা যদ্যপি লক্ষ্মীরই অবতার, জীব হয়ে জন্মাতেই তিনি পূর্বকথা ভুলে গেছেন। কৃষ্ণ তাঁকে উদ্বোধিত করতে চেষ্টা করছেন, বলপূর্বক এবং নানাভাবে যৌন-চেতনা জাগিয়ে রাধার পূর্বস্মৃতি ফিরে কিনা তার জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন। কিন্তু বিরাগিণী রাধার কিছুতেই মোহ ভাঙছে না, তিনি কুলগৌরব, পতিগৌরব, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন এবং কৃষ্ণকে তীব্র কটূক্তি করেছেন। অবশেষে তাঁর বহির্মুখত্ব ভাঙল, সে কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনে। তখন দুস্ত্যজ আর্যপথ, স্বজন-পরিজন কোথায় রইল পড়ে। তাঁকে যোগিনী হতে হল। মহাপ্রভুর জীবনেও এই ব্যাপারেরই পুনরাবৃত্তি দেখি। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে তিনি নিতান্ত কৃষ্ণবহির্মুখ। ব্যাকরণ-বিদ্যায় দাম্ভিক, অসহিষ্ণু, পরিহাসপ্রবণ। স্বেচ্ছায় বিবাহিত, সংসারের সম্বলচিন্তায় ব্যগ্র, স্মৃতিমূলক অনুষ্ঠান শিক্ষা করছেন। তারপর অকস্মাৎ কী হতে কী হয়ে গেল। বাহ্য স্বকীয় যা ছিল সব ত্যাগ করতে হল পরকীয়ের জন্য। এ তো বাঙালির চোখের সামনেই ঘটেছে। আমার তো মনে হয় ব্যাসদেব থেকে চণ্ডীদাস পর্যন্ত মরমিয়াগণ প্রচলিত ধর্মসাধনার ব্যর্থতার দিক মনে রেখেই গোপীভাব এবং পরকীয়াত্বের উপর রাধাকৃষ্ণলীলার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এখন শ্রীজীবের অভিপ্রায়কে সহানুভূতির সঙ্গে দেখা যাক। যদি শ্রীজীব মনে করে থাকেন যে, গোপীরা কৃষ্ণের নিতান্ত স্বকীয়, এই জন্যেই যে, তাঁরা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তি। এবং কৃষ্ণ নিজেই তো এই স্বকীয়কে পরকীয় করলেন এবং যোগমায়ার সাহায্যে ঔপপত্যময় লীলা করতে লাগলেন, তাহলে গোল চুকেই যায়। কারণ, এক হিসাবে সংসারই তো গোপীদের তথা চিৎকণ জীবের পরকীয়, ঈশ্বরই তো নিতান্ত স্বকীয়। অবিদ্যার বহির্মুখকে নিজের দিকে, বহির্মুখের যথার্থ আপন ঘরে আকর্ষণ করছেন কৃষ্ণ। গোপীরা ঈশ্বর-কোটি বলে সহজেই ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ, আর জীব মোহনিদ্রাবৃত, ঈশ্বরকৃপা ছাড়া তার উপায় নেই। কিন্তু এইভাবে সমাধান করা গেলেও মায়াকৃত বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন সাধক-জীবের পক্ষে লীলার বাস্তবতা কীভাবে অস্বীকৃত হতে পারে, এ প্রশ্ন থেকেই যায়। বৃন্দাবন-লীলা গৌরলীলাকে নিতান্ত মায়িক মনে করলে ভক্তের আর দাঁড়াবার উপায় থাকে না। বৈকুণ্ঠ যদি বাস্তব হয় মর্ত্যও বাস্তব।

দেখা যায়, রূপ-স্বরূপ-রঘুনাথাদির সিদ্ধান্তগ্রন্থের ও কথিত অভিপ্রায়ের সারনিষ্কর্ষ যিনি করছেন সেই চরিতামৃত-রচয়িতা পরকীয়া-পক্ষে তাঁর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাতত্ত্ব ও নবদ্বীপ-নীলাচল লীলাতত্ত্ব ব্যাখ্যানের প্রারম্ভে রাগাত্মিক ভক্তি সম্বন্ধে মূল কথা বলতে গিয়ে তাঁকে অনিবার্যভাবে পরকীয়া-প্রসঙ্গ তুলতে হয়েছে :

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ-গুণে হরে নিত্য দোঁহার মন॥
ধর্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥

অর্থাৎ নবরূপ ধরে তিনি নরজগতের প্রেমলীলার সারনিষ্কর্ষ দৈবপ্রভাবে আস্বাদন করলেন। 'বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি' অর্থে নিত্যলীলায় তিনি এ রস আস্বাদন করতে পারেননি। এখানে নিত্যলীলা থেকে প্রকটলীলার শ্রেয়ত্বই দ্যোতিত হয়েছে। নিত্যলীলায় স্বকীয়তা থাকলেও (শ্রীজীবের উপলব্ধি অনুসারে) প্রকটলীলার পরকীয়াত্বই প্রশংসনীয়। 'দোঁহার রূপ-গুণে' প্রভৃতির অর্থ হল কন্দর্পই এ প্রেমে মধ্যস্থতা করে, অগ্নি বিপ্র স্বজন গুরুজন নয়, দূতীও নয়। এই জন্যই স্পষ্ট করে বলা হল যে 'ধর্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে'। যেমন রায় রামানন্দের পদে—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি ন গেল॥
...ন খোজলুঁ দূতী ন খোজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলন মধ্যত পাঁচবাণ॥

অতএব রাগাত্মিক প্রীতি পরকীয়ারই স্বভাব। প্রীতি দাম্পত্য অথচ রাগাত্মিক এ পরস্পর-বিরোধী কথা। চরিতামৃতকার পুনশ্চ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা অন্যত্র ইহার নাহি বাস॥

অর্থাৎ লৌকিকে, সাহিত্যে, অলংকারশাস্ত্রে এর পূর্ণ প্রকাশদীপ্তি নেই।

পঞ্চতত্ত্ব ও গণোদ্দেশ

শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর পঞ্চতত্ত্ব অভিমত স্থাপন করেন। পরে তা সাধারণ্যে প্রচারিত হয় এবং কবিকর্ণপূর-সংকলিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় স্থান লাভ করে। এই অভিমতে নবদ্বীপ-লীলাপরিকরদের প্রধান পাঁচ মহাপুরুষকে পাঁচটি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা হয়েছে। মূল অনুভব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব নিয়ে গৌররূপে নিজকে প্রকটিত করলেন স্ববাসনা পূরণের জন্য। ভক্তিধর্মের প্রবর্তনের দিক দিয়ে এ বিষয়টিকে বলা যায়, ভক্তির মহিমা দেখাতে গিয়ে তাঁকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। সেই ভক্তের বা উপাসিকার চরম দৃষ্টান্ত বৃন্দাবনে বৃন্দাবনেশ্বরী এবং মানবরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ। কৃষ্ণলীলার আর এক স্বভাব হল তিনি শক্তি এবং ব্যূহ নিয়ে নিজকে প্রকটিত করেন। এই ব্যূহ তাঁর লীলা-পরিকরদের মধ্যে যাঁরা ঘনিষ্ঠতম তাঁদের নিয়ে। অপ্রকটলীলায় তাঁর সবচেয়ে

নিকটবর্তী হলেন নারায়ণ-বাসুদেব এবং সংকর্ষণ-বলরাম, তারপর মহাবিষ্ণু এবং তারও পরে গুণাবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। এঁরা কৃষ্ণের অংশের অংশ। যদি নিত্যলীলায় এবং বৃন্দাবনে এঁদের নিয়ে তাঁর লীলাবিলাস হয়ে থাকে, কারণ পরিকর ছাড়া তাঁর লীলা নেই, তাহলে চৈতন্যাবতারেও তা অল্পবিস্তর ঘটেছে নিশ্চয় এবং পরিকরদের নিয়ে মহাপ্রভুর ভক্তিলীলা সকলে প্রত্যক্ষও করেছেন। এই হিসাবে এক দিকে যেমন সাধারণভাবে চৈতন্য-পরিকরদের সঙ্গে ব্রজলীলার পরিকরদের (পুরুষ বা স্ত্রী) একত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। (গৌরগণোদ্দেশ) তেমনি মুখ্য পরিকরদের নিয়ে ভক্ত-ভক্তি-তত্ত্বের সমন্বয়ও সাধিত হয়েছে।

চৈতন্যলীলার মুখ্য পরিকর হলেন যথাক্রমে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর এবং শ্রীবাস। শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে পাঁচ। শ্রীবাসকে অন্য যাবতীয় পরিকরদের প্রতিনিধি হিসাবেও দেখা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বরূপ-দামোদরের বন্দনা-শ্লোক হল :

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

চরিতামৃতের আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে এই পঞ্চতত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ভূমিকায় কবিরাজ গোস্বামী বলছেন :

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥
রাসাদি-বিলাসী ব্রজললনা-নাগর।
আর সব যত দেখ তাঁর পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥

জীবনিস্তারের জন্য ভক্তরূপ গ্রহণ করেছেন যে কৃষ্ণ তিনি হলেন ভক্তরূপ; এখানে শ্রীচৈতন্য। ভক্তকে 'স্ব' বা তার নিজরূপে নিজভাবে প্রকটিত করায় 'ভক্তস্বরূপ'—প্রভু নিত্যানন্দ। তিনি নিজভাবরূপ অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যের সেবা এবং তাঁর ভক্তিধর্ম স্থাপনের লীলায় সহায়তা করেছেন :

যদ্যপি আপনে প্রভু হয়েন বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান॥

আবার, যারে দেখে তারে কয় দন্তে তৃণ করি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥

সারা বাঙলায় শ্রেষ্ঠভক্ত নিজভাববিহ্বল নিত্যানন্দপ্রভুই বাছবিচার না করে আচণ্ডাল-দ্বিজ সকলকে হরিভক্তি গ্রহণ করিয়েছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের দ্বারাই এই কার্য সম্পন্ন করেছিলেন, যেমন পূর্ব পূর্ব লীলায় বলরাম ও সংকর্ষণ দ্বারা গোষ্ঠলীলা ও সৃষ্ট্যাদি কাজ করেছিলেন। চরিতামৃত বলেছেন :

সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা দান॥

কবিকর্ণপূর বলেন 'নিত্যানন্দগণাঃ সর্বে গোপালা গোপবেশিনঃ।' বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় নিত্যানন্দ-বলরামের অনুচরেরা বেত্র, বংশী, ছান্দনদড়ি, গুঞ্জাহার প্রভৃতি নিয়ে গোপবালক-বেশে বৃন্দাবনলীলার অনুকরণ করতেন।

ভক্তিধর্ম-প্রচারে ভক্তরূপ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ এবং লীলাসহায় হলেন অদ্বৈত আচার্য। এঁকে ভক্তাবতার বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যসহ সমস্ত ভক্তের অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ইনিই দায়ী। মহাবিষ্ণু যেমন দায়ী সৃষ্টির জন্য। নবদ্বীপের যাবতীয় লীলাপরকিরদের মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীণতম। কথিত হয়, অধর্মের অভ্যুদয়ে ব্যাকুল হয়ে ইনিই পুনঃপুন প্রার্থনা করে গৌরাঙ্গবতার ঘটিয়েছিলেন। স্বরূপ-দামোদরের কড়চা অনুযায়ী অদ্বৈততত্ত্ব হল ঃ

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়ম্ অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ॥

এঁরই কার্যকারিতায় সপরিকর কৃষ্ণাবতার ঘটেছিল বলে ইনি আসলে সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কর্তা মহাবিষ্ণু। স্বরূপ-দামোদরের অদ্বৈতবন্দনা হল :

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ আচার্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তম্ অদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে॥

কৃষ্ণের সঙ্গে একত্বের জন্য তাঁকে অদ্বৈত এবং ভক্তি প্রচারের জন্য আচার্য বলা হয়। অদ্বৈতের ভক্তাবতারত্ব সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবত বলছেন :

পরম সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া অদ্বৈত প্রতি করিলা উত্তর॥
তোমার সংকল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুংকারে॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আম্মারে আনিলে সর্বজীব উদ্ধারিতে॥
যতেক দেখিলে চতুর্দিগে মোর গণ।
সভার হইল জন্ম তোমার কারণ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হইতে তাহা দেখিবেক সর্বজনে॥

অদ্বৈতপ্রভুকে মতান্তরে সদাশিবও বলা হয়েছে। ভক্তশক্তি হলেন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপে মহাপ্রভুর যখন কৃষ্ণভাব তখন এবং কীর্তন ভাবাবেশের সময় গদাধর সর্বদা মহাপ্রভুর বামপার্শ্ববর্তী থাকতেন। দক্ষিণে নিত্যানন্দ, ক্বচিৎ নরহরি এবং বামে গদাধর। গদাধরের লক্ষ্মী বা রাধিকার ভাব। সেই ভাবেই তাঁর চৈতন্যপ্রীতি। চৈতন্যের কৃষ্ণব্যাকুলতার আর্তি একমাত্র তিনিই প্রশমিত করতে পারতেন। তাই গদাধর ভক্তশক্তিস্বরূপ। চৈতন্যভাগবত বলছেন :

আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারেবার।
গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥

চরিতামৃত বলেন :

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস।
গদাধর জগদানন্দ স্বরূপের মুখ্য-রসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ॥

শ্রীবাসকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ভক্ত হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। নবদ্বীপ-লীলা-পরিকরদের মধ্যে শ্রীবাসের চারিত্র্য এবং ভক্তি অতুলনীয় ছিল ব'লেই তাঁকে ভক্তের তত্ত্বরূপে দেখা হয়েছে। শ্রীবাস-গৃহেই মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশ এবং যাবতীয় লীলা। শ্রীবাসগৃহেই নিত্যানন্দের অবস্থান এবং ভক্তসমাবেশ। অহোরাত্র ভক্তসমাবেশে এবং নৃত্য-কীর্তনে শ্রীবাস-গৃহ মুখরিত থাকত। শ্রীবাস এবং তৎপত্নী মালিনী প্রভুলীলার যাবতীয় ভার অকাতরে গ্রহণ করেছেন। তাই শ্রীবাস শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা ভক্ত-প্রতিনিধি। এই চার অন্তরঙ্গ মহাপুরুষ নিয়ে মহাপ্রভুর লীলা বা আত্মপ্রকাশ এবং ভক্তিধর্ম প্রচার। তাই সকলকে নিয়ে পঞ্চতত্ত্বের কল্পনা করা হয়েছে। বলা যায়, একই তত্ত্ব ভক্তিধর্ম স্থাপনের জন্য পাঁচরূপে প্রকাশিত, আবার ঐ পাঁচ মূলে একই। এঁদের মধ্যে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যকে মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ-অদ্বৈতকে প্রভু আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।

নবদ্বীপ, নীলাচল এবং বৃন্দাবনের মহাপ্রভু-পার্ষদগণ ব্রজলীলায় কে কোন্ স্থান অধিকার করেছিলেন তাই নিয়ে গৌরগণোদ্দেশের কল্পনা। এর পত্তন সম্ভবতঃ স্বরূপদামোদরেরই কীর্তি, কারণ, ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সব তাঁরই আয়ত্তে ছিল। মহাপ্রভু স্বয়ং কোনো কোনো পরিকরকে ব্রজের বা নিত্যধামের নামানুসারে আহ্বান করতেন। সেই দৃষ্টান্তেই হয়ত স্বরূপদামোদর বিষয়টি নিয়ে ও স্বভাব, চারিত্র্য, ভক্তিভাবুকতার বিশেষত্ব অধ্যয়ন ক'রে একালের লীলাপার্ষদদের ব্রজলীলায় স্থাপন ক'রে দেখেছিলেন। স্বরূপদামোদরের এই উদ্‌যোগ হয়ত বা কবিকর্ণপূরই সম্পূর্ণ করেছিলেন। যদিচ তাঁকেও তৎকাল-প্রচলিত নানান্ অভিমতের সমীকরণ করতে হয়েছিল। প্রাপ্ত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় পরবর্তী কোনো কোনো মনীষীর অভিপ্রায়ও নিবদ্ধ হয়েছে। ব্রজ-নবদ্বীপের একত্বের ধারণা অনুযায়ী—অদ্বৈত আচার্য সদাশিব, শ্রীবাসপণ্ডিত নারদ, বাসুদেব সার্বভৌম বৃহস্পতি, রামানন্দ রায় অর্জুন বা ললিতা, স্বরূপ-দামোদর বিশাখা, প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, সনাতন গোস্বামী লবঙ্গমঞ্জরী, রূপ গোস্বামী রূপমঞ্জরী, জীব গোস্বামী বিলাসমঞ্জরী, রঘুনাথ দাস রতিমঞ্জরী, হরিদাস ঠাকুর ব্রহ্মা, বাসুদেব দত্ত মধুব্রত, মুকুন্দ দত্ত মধুকণ্ঠ, নরহরি সরকার মধুমতী, রামানন্দ বসু কলকণ্ঠী, বৃন্দাবনদাস বেদব্যাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কস্তুরীমঞ্জরী, গৌরীদাস সরখেল সুবল, গোবিন্দ ঘোষ কলাবতী, উদ্ধারণ-দত্ত সুবাহু ইত্যাদি। কিছু কিছু মতভেদও আছে। বলা বাহুল্য, কালক্রমে গণোদ্দেশের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া গণোদ্দেশ প্রভৃতি গ্রন্থে নিত্যানন্দ-অনুচর কয়েকজন ভক্তকে ব্রজের দ্বাদশ গোপাল ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের স্তম্ভস্বরূপ চৌষট্টিজন

মোহান্তের উল্লেখও দেখা যায়। বৈষ্ণব-ভক্তেরা এঁদের অনেকেরই আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব পালন করেন এবং উৎসবাদিতে স্মরণ ক'রে থাকেন। বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী অবশ্য এঁদের থেকে বিশ্রুত। এঁদের সকলকে নিয়ে দৈবকীনন্দনের বিখ্যাত "বৈষ্ণব-বন্দনা"। যাঁদের নিয়ে নীলাচলে মহাপ্রভু তাঁর লীলাসার প্রকট করেছিলেন, বিশেষতঃ রায় রামানন্দ, সার্বভৌম, এবং স্বরূপ দামোদর, যাঁরা এই রাগধর্মের বিশেষ বোদ্ধাও ছিলেন, তাঁদের কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ করেনি। 'উপাদান' গ্রন্থে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার আক্ষেপ করেছেন যে কবিকর্ণপূর বিখ্যাত গ্রন্থকর্তা হ'য়েও গোস্বামীরূপে স্মরণীয় হননি। ঐ ষড়্‌গোস্বামীর কথা অবকাশক্রমে পরে আলোচিত হবে।

মহাপ্রভু-রচিত শিক্ষাশ্লোকাষ্টক

কৃষ্ণগৌর মহাপ্রভু নিজভাব আস্বাদন এবং নিজভাব বিদিত করণ—এই উভয় উদ্দেশ্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিগূঢ় স্বকীয় ব্যাপার সংসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল, এর জন্য তাঁকে পৃথক্ প্রযত্ন করতে হয়নি। 'সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।' পূর্ব পূর্ব অবতার এবং মহাপুরুষদের নিজ নিজ উপলব্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কর্মে অথবা প্রচারকার্যে নামতে হয়েছিল। মহাপ্রভুর ক্ষেত্রে তদ্বিপরীত, এই তাঁর আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য।

নিরন্তর স্ব-ভাববিহ্বল অবস্থায় যাপন করার জন্য লোকশিক্ষণের অবসরও তিনি পাননি। বরং লোকচেষ্টাময় লৌকিক লীলায় অবতীর্ণ হয়ে কালে কালে তিনি নিজে কিছু শিখেও নিয়েছিলেন, যেমন শিখেছিলেন রায় রামানন্দ ও রঘুপতি উপাধ্যায়ের কাছে, স্বরূপদামোদরাদির সঙ্গে আলোচনায়, এবং সম্ভবতঃ তারও পূর্বে, গয়ায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কাছে। আবার নিজ নির্মল জ্ঞানবুদ্ধিমতো অদ্বৈতবাদ নিয়ে তিনি বিতর্কও করেছেন, শ্রীরূপসনাতনকে কিছু নির্দেশও দিয়েছেন, আর দক্ষিণাত্য ভ্রমণে তত্ত্ববাদী-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে রাগধর্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের জন্য বিবিধ আলাপেও নিরত হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর মৌখিক শিক্ষণ গ্রন্থাদিতে যেভাবে বর্ণিত দেখা যায় তা সন্দোহাতীত না হ'লেও; নীলাচলে ভক্তসমাগমে ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে সহাস্য সগৌরব তিরস্কার এবং গৌড়াগত মুরারি, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, শংকর প্রভৃতিকে হাসপরিহাসচ্ছলে সংক্ষেপে যথাযোগ্য উপদেশ দান প্রভৃতির সত্যতায় ও যাথার্থ্যে অবিশ্বাসের কারণ নেই। রামকেলিতে সনাতন-রূপ আত্মসমর্পণ করার পূর্বে—"পরব্যসনিনী নারী" প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধার ক'রে উপদেশদানও সত্য ঘটনা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল যুবক রঘুনাথদাসকে শিক্ষণ। প্রথম যখন শ্রীপাদ রঘুনাথ শান্তিপুরে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সংসার ত্যাগের সংকল্প জানান তখন মহাপ্রভু তাঁকে বলেন, তোমার বৈরাগ্যের প্রয়োজন নেই, 'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া'। তার দু'তিন বৎসর পরে রঘুনাথ যখন যথার্থই সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে নীলাচলে এসে পড়লেন এবং মহাপ্রভুর উপদেশ চাইলেন তখন মহাপ্রভু মাত্র দু'চারটি কথা তাঁকে বলেছিলেন এবং শিক্ষণের জন্য নিতান্ত অন্তরঙ্গ স্বরূপদামোদরের হাতে তাঁকে সমর্পণ করেছিলেন। মহাপ্রভুর সে ক'টি উপদেশবাক্য হ'ল এই :

গ্রাম্যবার্তা না কহিবে গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

কথাগুলি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সপ্তগ্রামের জমিদার-তনয়কে প্রাথমিকভাবে দেওয়ার মত যোগ্যতম উপদেশ। অর্থের প্রাচুর্য এবং বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত যুবকের ভালো খাওয়া-পরা এবং কামবিষয়ক কথাবার্তায় আগ্রহ থাকতে পারে মনে ক'রে মহাপ্রভু সে বিষয়ে সাবধান করলেন, আর, ঐশ্বর্য ও প্রতাপের সংস্কার বিন্দুমাত্র থাকলে কৃষ্ণ সেই পরিমাণে দূরে থাকবেন তাও জানিয়ে দিলেন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ক'টি কথা ছাড়া এভাবে আর কোনো উপদেশ সম্ভবতঃ তিনি কাউকে দেননি। তাঁর জীবনকেই এবং নানান্ ক্ষেত্রে নানান্ আচরণকেই শিক্ষার প্রেরণা হিসাবে ভক্তদের সামনে রেখেছিলেন।

এইভাবে মৌলিক শিক্ষা বা নির্দেশ অবসরক্রমে যৎসামান্য দিতে পারলেও নিজ বিচিত্র এবং সূক্ষ্ম উপলব্ধিসমূহ লিখিত রচনার মধ্যে তিনি কিছুই গ্রথিত ক'রে যেতে পারেননি। এ বিষয়ে যা কিছু আমরা জানতে পেরেছি তা স্বরূপ-দামোদরের কাছে। তিনি তাঁর অনুভব সমূহের প্রত্যক্ষ অনুভাবক এবং লীলারত্নসমূহের ভাণ্ডারী ছিলেন। তবু আপন মনে থাকতে থাকতে কয়েকটি শ্লোক মহাপ্রভু রচনা করেন ব'লে প্রসিদ্ধ। রূপগোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলীতে 'ভগবতঃ' ব'লে এরকম আটটি শ্লোক গ্রথিত হয়েছে। সেখান থেকে চরিতামৃতকার সংগ্রহ ক'রে অন্ত্যলীলার শেষ পরিচ্ছেদে সেগুলির বর্ণন ও ব্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে লীলাজীবনের শেষের দিকে তিনি লোকশিক্ষা দিতে এগুলি নিজেই উচ্চারণ ক'রে আস্বাদ করতেন। বিচার করলে দেখা যাবে, এগুলির প্রথম তিনটি এবং ষষ্ঠটি নামমহিমা এবং নামসংকীর্তনের গুরুত্ব বিষয়ে। অন্যগুলি কৃষ্ণে অহৈতুকী রাগময়ী প্রীতি এবং মুখ্যতঃ দাস্যভাব নিয়ে রচিত। শ্লোকগুলি বিবৃত এবং যথাসাধ্য ব্যাখ্যাত হচ্ছে।

১. চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥

ব্রহ্মাস্বাদবিষয়ে মহর্ষিরা উপনিষদ্ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রে যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তা যে হরিনামসংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে অক্লেশে লভ্য, মহাপ্রভু এই শ্লোকের বর্ণনায় তা জানালেন। এই শ্লোকের অন্য আর এক ব্যঞ্জনা হ'ল এই যে, নামগ্রহণের পূর্বে ব্রহ্মচর্য যম-নিয়মাদি পুরানো রীতির কোনো সাধনের প্রয়োজন নেই। চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গৌণব্যাপার নামপ্রেমের মধ্যে অনায়াসেই সাধিত হয়।

শ্লোকার্থঃ। চিত্তরূপদর্পণ, যাতে বাসনাসমূহের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার মালিন্য হরিসংকীর্তনে নিঃশেষে মার্জিত হয়ে যায়। যে সংসারজ্বালা, জীবনের ত্রিবিধ দুঃখ, ধার্মিক ব্যক্তিদের ক্লেশদায়ক জ্ঞান কর্ম যোগ প্রভৃতি মার্গ অবলম্বন করিয়েছে এবং অনিশ্চিত ফল দিয়েছে, সেই সব দুর্বহ দুঃখ নামে-রুচি হলেই দূরে চলে যায়। উপনিষদ্ প্রেয় এবং শ্রেয়ের মধ্যে

তুলনা ক'রে যে শ্রেয়ঃকে ভূমা বা চরম প্রাপ্তব্য ব'লে উল্লেখ করেছে, সেই শ্রেয়োরূপ নির্মলস্নিগ্ধ কুমুদপুষ্পের লাবণ্যবর্ধক হ'ল এই নামরূপ চন্দ্রিকা। 'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে' প্রভৃতি উক্তিতে যে বিদ্যা বা শুদ্ধ জ্ঞানের গৌরবখ্যাপন করা হয়েছে সেই বিদ্যারূপ কাম্যবধুর প্রাণ হ'ল এই নামসম্পদ্। নামচন্দ্রোদয়ে প্রসিদ্ধ 'আনন্দ' ("আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি") রূপ মহাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়, এর প্রতি বর্ণেই শ্রুতিকতি অমৃতের স্বাদ পূর্ণভাবে বর্তমান। অনির্বচনীয় আনন্দ-অমৃতের অভিষেকে জীবের ইন্দ্রিয়াদি অন্তঃকরণসহ আত্মা শান্ত হয়ে পরিতৃপ্ত হয়। এমন হরিনামসংকীর্তন অবিদ্যাক্লিষ্ট জীবের সহজে কৃষ্ণলাভের জন্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক।

২. নাম্নামকারি বহুধা, নিজশক্তিযোগ-
স্তত্রার্পিতো, নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা, ভগবন্, মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

শ্লোকার্থঃ। অহো, নামের কত বৈচিত্র্যই না তুমি সৃষ্টি করেছ! ভিন্ন ভিন্ন জীবের বিভিন্ন মনোবৃত্তি অনুসারে এবং গীতোক্ত 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' প্রতিজ্ঞা স্মরণে রেখে হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, মাধব, শ্যাম প্রভৃতি অনন্ত নামে নিজেকে প্রকাশিত করেছ! সেই নামে আবার নিজের শক্তি যুক্ত করেছ—যাতে নামকীর্তনই যোগরূপে জীবের অনন্য আশ্রয় হয়। তার উপর নামের স্মবণকীর্তনে কালাকাল বিচার রাখোনি, এতদূর তোমার কৃপা! কিন্তু হায়, আমার এতদূর দুর্ভাগ্য (কর্মবিপাক) যে এত সুযোগ দেওয়া হলেও সেই তোমা-অভিন্ন নামে আমার আজও অনুরাগ জন্মাল না।

এই শ্লোকে নামের সঙ্গে নামীর অভেদ, ঈশ্বরের কারুণ্য, অন্যবিধ ধর্মপথে অনুষ্ঠানাদির ও কালাকাল বিধি-নিষেধের নিরর্থক দুঃসহতা এবং রাগমার্গের নিয়মশূন্যতা প্রভৃতি ব্যঞ্জিত হয়েছে। শেষাংশে মহাপ্রভুর নিজ দুর্ভাগ্য-প্রখ্যাপন লোকশিক্ষার্থে।

৩. তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্লোকটিতে নামকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অবহেলিত লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কারণ, তারাই বিশেষভাবে অমানী অথচ মানদ। আর মুখ্যতঃ এদেরই জন্য মহাপ্রভুর অবতারতা। অভিজাত ঐশ্বর্যশালী রঘুনাথকে তিনি এই উপদেশটিই দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

শ্লোকার্থঃ। তৃণের চেয়েও অবনত যিনি, যিনি তরুর মতই সহিষ্ণু, যিনি (মানী হ'লেও) মান বিসর্জন দিয়েছেন অথবা জীবসমাজে মান যাঁর কোনোকালেই নেই, অথচ যিনি অন্যকে যথাযোগ্য মানমর্যাদায় ভূষিত ক'রে থাকেন এমন ব্যক্তিই হরিস্মরণের যোগ্য, প্রকৃত বৈষ্ণব। এই ব্যাখ্যায় চরিতামৃত থেকে যৌক্তিকভাবেই আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। চরিতামৃতকার শ্লোকটির বিশ্লেষণে বলছেন :

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥

৪. ন ধনং, ন জনং, ন সুন্দরীং, কবিতাং বা জগদীশ, কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

এটি মহাপ্রভুর অহেতুকী বা শুদ্ধা প্রীতির কামনা। স্পষ্টতঃ লোকশিক্ষার্থে। সাধারণ মানুষ তোমার কাছে যা চায় তা হ'ল ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী, কবিত্ব বা বিদগ্ধতা—এইসব। তারা তোমাকে চায় না। হে ঈশ্বর, আমার যেন জন্মে জন্মে তোমাতেই শুদ্ধা ভক্তি থাকে।

মহাপ্রভু এখানে শ্রেয়ঃকামী সংসারী জীবের ভূমিকা অভিমান ক'রে প্রার্থনা করছেন। ব্যঞ্জনায় বলছেন যা পেলে পূর্ণকাম হওয়া যায় এবং ধনজনাদি তুচ্ছ হয়ে যায় তা হ'ল ঐ শুদ্ধা বা কেবলা প্রীতি, ঈশ্বরসেবার অধিকার। কৃপা ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়, তাই প্রার্থনা করতে হচ্ছে।

৫. অয়ি নন্দতনূজ, কিংকরং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

প্রিয় সম্বোধন ক'রে সুদুর্লভ দাস্যভক্তির জন্য প্রার্থনা। আমি অবিদ্যাক্লিষ্ট জীব, সংসারে গতাগতির বিড়ম্বনায় বিকলচিত্ত। আমি কি কৃপা-কণিকালাভেও বঞ্চিত থাকব। তোমার পাদপঙ্কজে কত ধূলিরেণু সংলগ্ন হয়ে থাকে, সেই একটি রেণু হওয়ার সৌভাগ্য আমাকে দাও। এগুলি স্পষ্টতই জীবের আবৃত্তির জন্য রচিত।

৬. নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

তোমার নাম নিতে কবে অশ্রু ঝরবে, কবে নামোচ্চারণে কণ্ঠ বাষ্পাকুল হবে, আর দেহে রোমাঞ্চ দেখা দিবে, সে শুভদিন আর কত দূরে?

নামে প্রীতিই যে কৃষ্ণপ্রীতি এখানে প্রকারান্তরে তাও বোঝানো হ'ল।

৭. যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

কৃষ্ণবিরহে এক নিমেষে আমার কাছে এক যুগ বলে মনে হচ্ছে! চোখে বর্ষা ঘনিয়ে আসছে, পৃথিবী সংসার শূন্য ব'লে মনে হচ্ছে।

চণ্ডীদাসাদির পদাবলীতেও রাধার এই বিরহভাব ফুটেছে। কবিরা কল্পনায় যা বর্ণনা করেছেন মহাপ্রভুতে তার প্রত্যক্ষতা দেখে রাগভক্তির যাথার্থ অনুধাবনীয়।

৮. আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্ অদর্শনাৎ মর্মাহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটঃ মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

তীব্র বিরহানুভব এবং বঞ্চনাক্লিষ্ট অবস্থাতেও কৃষ্ণ যে অনন্যাশ্রয় সে কথা বুঝিয়েছেন রাগভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধক। মধুরের অন্তর্গত দাস্য এ শ্লোকের রসভাব।

'একবার আলিঙ্গন ক'রে তারপর তিনি যদি আমাকে পদদলিত ক'রে নিষ্পিষ্ট করেন, অথবা চির অদর্শনের দ্বারা মর্মপীড়া দিতে থাকেন, এমনকি আমাকে ত্যাগ ক'রে অন্য বল্লভায় আকৃষ্ট হয়ে যদি আমার অপমান করেন বা আমার সঙ্গে যা-খুশি তাই ব্যবহারও করতে থাকেন, তবু তিনিই আমার সর্বস্ব, আর কেউ নয়'।

রাগভক্তির এক বিশেষ স্তরে তীব্র বিরহজ্বালা অনুভূত হয়। সেক্ষেত্রেও অনুরাগ থেকে ভক্ত বিচ্যুত হন না। মহাপ্রভুর ভাবাবস্থা দর্শনে রাগভক্তির এ বিষয়টিও নীলাচলের ভক্তদের কাছে পরিস্ফুট হয়েছিল। চরিতামৃতকার লিখছেন :

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমা আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
জীভ জলে না যায় ত্যজন।
হেন প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

'আশ্লিষ্য বা' প্রভৃতি বর্ণনায় মহাপ্রভুর নিজ অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে ব'লে মনে হয়। বৃন্দাবনদাস বিবরণ দিয়েছেন, গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কালে কানাইয়ের নাটশালায় গৌরাঙ্গের এক আশ্চর্য অনুভব ঘটে। তিনি দেখলেন, তমালশ্যামবর্ণ শিখিপুচ্ছধারী ও কন্দর্পকান্তি এক কিশোর তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে কোথায় লুকিয়ে গেল। সেই থেকেই তাঁর ভাবান্তর এবং অশ্রুকম্পপুলকাদির মুহুর্মুহু প্রকাশ।

শিক্ষাশ্লোকগুলি 'পদ্যাবলী'তে যে পারম্পর্য নিয়ে বিবৃত, সে পারম্পর্য চরিতামৃতকার রাখেন নি। ভাবসংগতির দিক্ থেকে সাজিয়ে নিয়েছেন। মহাপ্রভু কোন্ সময় কোন্‌টি রচনা করেছিলেন তা জানবার কোনো উপায় নেই।

বৈষ্ণবধর্ম ও সাম্প্রতিক কাল

বৈষ্ণবধর্মে সম্প্রদায়ভেদ এবং মতভেদ শ্রীল নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের তিরোভাবের পর গ'ড়ে উঠতে থাকে। জাহ্নবী ঠাকুরানী ও বীরচন্দ্র প্রভু এই ভিন্নমুখী ধারাগুলিকে সংহত এবং স্বসম্প্রদায়গত করার জন্য ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে অন্ততঃ অষ্টম দশম পর্যন্ত প্রভূত যত্ন ও পরিশ্রম করেন। এঁদের উদ্‌যোগ স্তিমিত হতে না হতেই মধ্যবঙ্গে আচার্য শ্রীনিবাস এবং উত্তরবঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের স্বপ্রকাশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সুবিন্যস্ত সুসংহত এবং ব্যাপক হয়ে ওঠে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রসসিদ্ধান্ত এবং কাব্য-নাটকাদি এই সময়েই বাঙ্‌লা দেশে প্রচারিত হয়। এই সময়ই জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বাঙালী বিদ্যাপতি, রায়শেখর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্তা মহাজনদের পদরচনার কাল এবং কীর্তনের বিস্তৃতির কাল। এ হ'ল ষোড়শ শতকের শেষ এবং সপ্তদশের প্রথমের দিক্। এই উজ্জীবনের প্রভাব সপ্তদশের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, যদিও ইতিমধ্যেই দলস্বার্থবাদী এবং ধর্মকঞ্চুক কিছু মোহান্ত এবং গোস্বামী যে এই লোকধর্মমার্গ ক্ষুণ্ণ না করেছিলেন এমন নয়। এই সময় থেকে আবার অনেক বৈষ্ণবই সহজিয়া পথ বেছে নিতে থাকেন। সহজিয়ারা বড় বড় বৈষ্ণব সাধক ও আচার্যদের নাম দিয়ে পদাবলী ও সাধন-গ্রন্থ লিখতে থাকেন।

তন্ত্রবাহিত সহজসাধনের এবং শাক্তমতের যে কণ্টকতরু একদা লোক-ধর্মের পথ সমাচ্ছন্ন করেছিল এবং রাগভক্তি ও নাম-প্রেমের প্লাবনে অদৃশ্যপ্রায় হয়েছিল, তা আবার মাথা তুলে শাখাপল্লব বিস্তার করতে আরম্ভ করলে এবং আঠারো শতকের মাঝামাঝি আধাশাক্ত আধা-বৈষ্ণব এবং আধা-বৈষ্ণব আধা-সহজিয়া এক বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালে। একই সঙ্গে গুরুবাদ তার মহিমা হারিয়ে প্রথাসর্বস্ব ও হীন হয়ে পড়ল। এই সময়ে ধনপুষ্ট সামন্ততান্ত্রিকতাও মহাপ্রভুর পূর্বকালের মত পুনরায় দেশব্যাপী হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষ যে মর্যাদা লাভ করেছিল তা হারালে। রঘুনন্দনকে সাক্ষ্য ক'রে বলশালীরা দুর্গাপূজায় ও অন্যান্য স্মার্ত অনুষ্ঠানাদিতে প্রবৃত্ত হ'ল ; বর্ণভেদ, উচ্চবর্ণের অহমিকা এবং অস্পৃশ্যতায় দেশ পরিব্যাপ্ত হ'ল, হিন্দুরা মুসলমানদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করলে। বাঙালী বলতে পৃথক্ পৃথক্ জাতিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সমাজের লোক বোঝাতে লাগল।

ইংরেজের আধিপত্যে সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর পরিবর্তন কিছুই ঘটল না বললেই চলে। উপরন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুতরাং পদমর্যাদার অধিকারী, এবং শিক্ষা-বঞ্চিত সুতরাং হীনবিত্ত ও মর্যাদাহীন, এই দুই শ্রেণীতে বাঙলায় তথা ভারতে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ল। সমাজগত বহু শ্রেণীর মধ্যে এ আর এক ভিন্নধরনের শ্রেণীবিভাগ। সামন্ততান্ত্রিকতার উপর উপনিবেশ-শাসনের মিশ্রণে অদ্ভুত এক জটিল সমাজ-পরিস্থিতি। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষাসংস্কৃতির আবির্ভাবে উচ্চশিক্ষিত সমাজে বিবেকের জাগরণ ঘটেছিল ঠিকই, বিবিধ কুসংস্কার থেকে মুক্তির আগ্রহও শিক্ষিত সমাজে সঞ্চারিত হয়েছিল, জাতীয়তাবোধের জাগরণও একালের উল্লেখ্য নবভাব এবং সর্বোপরি সাহিত্যিক, ধর্মপথিক, সমাজচিন্তক ও বৈজ্ঞানিক শত মনীষীর দুর্লভ সমাবেশও একালের সমাজে ঐতিহ্যরূপে সঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে উনিশ শতকের এই মানসিক পরিবর্তন সমগ্র সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশকে মাত্র স্পর্শ করেছে। সে অংশ শুধু শিক্ষিত নয়, উচ্চশিক্ষিত ; শতকরা হিসাবে দু'চার জন মাত্র। ক'লকাতা এবং শহরাঞ্চলে কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে এই উনিশ শতকের নবভাবুকতা সীমিত ছিল। এমনকি খাস কলকাতাতেও সাধারণজন সেই আঠারো শতকের চড়ক খেউড় বুলবুলির লড়াইয়েই কায়বাক্‌চিত্ত অর্পণ করেছিল। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অথবা দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের সমাজের নবজন্ম হয়ে গেছে এমন তত্ত্ব উচ্চকণ্ঠে কেউ কেউ প্রচার করলেও তা বাস্তব সত্য নয়। আর সত্য নয় ব'লেই আজকের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অবক্ষয়, অশিক্ষিতের সঙ্গে শিক্ষিতের, কুলীনের সঙ্গে অকুলীনের, ধনী ও নিঃস্ব হীনজাতি ও গ্রামীণ মানুষের যে কল্যাণ চেয়েছিলেন তা সামন্ততান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী পরিস্থিতিতে সম্ভব হয়নি। কুলীনদের স্বেচ্ছায় কৌলীন্য-বিসর্জনের ইতিবৃত্তও শাস্ত্রে লেখে না।

সাধারণের কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে রাষ্ট্রাধিকার স্বায়ত্তে এলেই কোটি কোটি মনুষ্যত্বহীনকে মানুষের অধিকারে আনা সম্ভব হবে। গান্ধীজীর মত ধর্মপ্রেমিক রাজনীতিককে তাঁরা প্রত্যক্ষও করেছিলেন। তাঁদের স্বপ্নসাধ নিষ্ফল হয়েছে। এ স্বাভাবিক। কারণ, যে গণতন্ত্রে রক্ষণশীল এমনকি কায়েমী স্বার্থবাদীরাই রক্ষক হওয়ার অধিকার পায় সে গণতন্ত্রে নিপীড়িত জনের মুক্তি সুদূরবর্তী হতে বাধ্য। তবু এরই মধ্যে শম্বুকগতিতে হয়ত সমাজ-উন্নয়ন কিছু কিছু চলছে এবং দু-চা'রজন সাধু ব্যক্তি যে বিভিন্ন রাষ্ট্রাধিকারে নেই

এমনও নয়। কিন্তু অল্পে অল্পে জাগরিত মানুষের চাহিদার কাছে এ কল্যাণ কিছুই নয়। তা ছাড়া এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভিন্ন ধরনের উৎপাত প্রশ্রয় পেয়ে জনজীবনকে পর্যুদস্ত করতে চলেছে। তা হ'ল ধনতান্ত্রিকতা। পণ্য-উৎপাদন ও মুনাফা-সঞ্চয় সীমিত কতিপয় ব্যক্তির করায়ত্ত হওয়ায় এবং উপযুক্ত প্রতিকার-ব্যবস্থা না থাকায়, বরং রাষ্ট্র সহায় হওয়ায়, যেমন এক পক্ষে অতিমাত্রায় ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, তেমনি অন্য পক্ষে নিঃস্বতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ফলে শুধু মেহনতী মানুষেরই নয়, জনসাধারণেরই জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মনুষ্যত্বে অহরহ আঘাত পড়ছে। মানবসমাজ দিশাহারা হয়ে উঠেছে, তার কোনো কোনো শাখা অতিমাত্রায়।

আমরা পূর্বেই বলেছি, উন্নত জীবনাচরণই একালের উপযোগী ধর্মাচরণ। সমাজজীবনকে বাদ দিয়ে কিছুই নেই, ধর্মও নেই। যে-মধ্যযুগে রাজভক্তিরূপ নবধর্মের অভ্যুদয়, তাতে শক্তি এবং প্রতাপের স্বরূপ ছিল ভিন্নতর। অন্নবস্ত্রের এত নিদারুণ ও ব্যাপক সংকট তখন দেখা দেয়নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনধারণের সংকটের সঙ্গে দ্রুত মানসিক অবনতি ঘটছে, কালে সামূহিক ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এমন অবস্থায় নবধর্মের জাগরণ কি সহসা সম্ভব হবে। জীবনরক্ষার মৌলিক আয়োজন সম্পূর্ণ না হলে ধার্মিকতার মানসিক প্রস্তুতি সম্ভব নয়। অর্থাৎ জীবনরক্ষার ব্যবস্থার সমসূত্রেই নূতন ধর্ম, যাকে আমরা পূর্বে মহামানবধর্ম বলে অভিহিত করেছি, তারও ভিত্তি হয়ত বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, কে জানে। এ বিষয়ে পূর্বাহ্ণে কিছুই বলা যায় না। কবির কথাই হয়ত ঠিক—

> এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
> আসে আমার নেয়ে।
> সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
> আসছে তরী বেয়ে।
> কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
> পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
> কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
> রয়েছে পথ চেয়ে।
> অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
> বিরহী মোর নেয়ে।

যদি বলা যায় ধর্ম বর্তমান ভারতবর্ষে নেই, অধর্মের অন্যায়ের ভয়ে ভীত হয়ে ধর্ম গুহাহিত হয়ে পড়েছে, তাহলে ভালো শোনাবে না বটে, কিন্তু সত্যকথন হবে। ধর্ম কি জীবনব্যাপী অসদাচরণে এবং ঢাক বাজিয়ে পুজো করায় অথবা সভা করে বক্তৃতা দেওয়ায়? ধর্ম কি মুনাফা সঞ্চয়ে এবং লোক-দেখানো মন্দিরাদি নির্মাণে? ধর্ম কি রাজনীতি বা শিক্ষার নামে কূট-কৌশলের ও দলীয় স্বার্থের পোষণে? ধর্ম কি অর্থকরী গ্রন্থনির্মাণে ও পল্লবিত বাগ্‌বিন্যাসে? ধর্ম কি কর্তব্য সম্পাদন না করে জীবিকার দাবিতে? ধর্ম কি প্রচারকার্যে ও প্রচ্ছন্ন স্বোদরপূরণে? ধর্ম যদি কেবল বাইরের কঞ্চুক হয়, তার চেয়ে অধর্মাচরণ আর কিছুতে হতে পারে না।

ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী এবং আসুরী প্রবৃত্তির দিক্ থেকে মানুষের দুই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এবং আসুরভাবাপন্ন মানুষের প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ভারতের ধর্মনীতিক অধোগতির মূলে ধনদর্পান্বিত ও দলীয়তাপুষ্ট শ্রেণীগুলির কার্যকারিতাই যে বিশেষভাবে দায়ী তা গীতোক্ত প্রমাণ থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে :

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতঃ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থম্ অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
আঢ্যোঽভিজনবানোঽস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশে ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে এরই একটা সীমিত সংস্করণ দেখা গিয়েছিল। মায়াসহায়ে এখন আবার তা প্রবল বেগে প্রসারিত হয়ে লোককল্যাণের নাম নিয়ে তার পথ অবরুদ্ধই করছে। কিন্তু তবু হয়ত আশা আছে। এই সাধারণ অবস্থার মধ্যেও অসাধারণত্ব লুকিয়ে নেই এমন নয়। দেশব্যাপী এই তমিস্রার মধ্যে আলোর শেষ রেখা ঐ মানুষপ্রেমময় সমাজসাম্য। এই নিতান্ত সহজ লোকধর্ম। রুচি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা প্রভৃতি থেকে স্বত-উদিত অন্তরের আশ্চর্য আলোক, যার উদয়ে কপট স্বার্থের আবিলতা দূর হবে, বাসনা-সংস্কারের জমাট হিমানী বিগলিত হবে। এ রাজনীতিকদের প্রচারিত ও মূল থেকে বিচ্যুত প্রেম-অহিংসা নয়, এ মানুষের মৌল স্বভাবধর্মের সঙ্গে একীভূত সমতামূলক সম্প্রীতি। বর্তমানে-প্রচ্ছন্ন, অশুদ্ধ অন্তঃকরণকে মসৃণ করে আবির্ভূত এক রম্যভাবের দীপ্তি। এই নরদেবতার প্রকাশে জীবে দয়া, মানবপ্রীতি সহজাতভাবে আপনা থেকে সমুদ্ভূত হয়, নতুবা জীব-সাধারণের প্রবৃত্তিই হল লোভ, ঈর্ষা, হিংসা। স্বার্থকাম ব্যক্তিদের রাজনীতিক বা সাংস্কৃতিক বক্তৃতার দ্বারা এর নিরাকরণ সম্ভব নয়। যথার্থ ধর্মের অভ্যুদয় চাই এবং সে ধর্ম আছে, উত্তাল স্বার্থকলহ এবং তথাকথিত ধর্ম-সংস্কৃতির ছদ্মবেশের মধ্যেও তা রয়েছে। রয়েছে সরল এবং অবহেলিত ঐ সাধারণ মানুষের মধ্যেই, যাদের মনুষ্যত্বে উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তা ছাড়া তিনি যে-ভাবসংস্কারের সম্পদে আমাদের ধনী করে গেছেন তার ঐতিহ্য আজও রয়েছে সাহিত্যে, চারিত্র্যে, আমাদের বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে। ধর্মের সুপ্তাবস্থা থেকে এই জাগরণ ভাবের পথেই ঘটবে। জঞ্জাল যা জমেছে তা নিঃশেষিত হওয়ার জন্য প্রাথমিক সংঘাতকে হয়ত ডেকে আনবে, কিন্তু তার পরই 'জয় জয় পরমা নির্বৃতি'। এই সংঘাত থেকে বোধ হয় পরিত্রাণ নেই। এতে মন্দও যাবে, তথাকথিত ভালোও কিছু যাবে। যা থাকবে তা নিয়ে স্বচ্ছন্দে চলবে কিছুকাল। পুনশ্চ অচলায়তন

যদি গড়ে, পুনশ্চ তিনি ভাঙবেন। এই হল ইতিহাস-বিধাতার লীলা। কুরুক্ষেত্রের পর মহামানবধর্মের প্রভাসলীলা। কখনো একভাবে প্রকাশ, কখনো ভিন্নভাবে, সবই অপ্রত্যাশিত, কারণ, 'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্'। অপিচ—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

বৈষ্ণবীয়তা ও রবীন্দ্র-অনুভব

রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় প্রেরণা এবং কাব্যানুভূতি পদাবলীতে প্রকাশিত বৈষ্ণব ধর্মভাবুকতার দ্বারা আংশিকভাবে অথবা বিপুলভাবে নিয়ন্ত্রিত—এমন কথা কোনো কোনো রবীন্দ্র-সমীক্ষক অথবা পদাবলী-বিচারক বলে থাকেন। এ বিষয়টি, ব্যাপকভাবে, রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব প্রভৃতি গতানুগতিক এবং আলোচকপক্ষে আত্মতুষ্টিময় নিরীক্ষার সঙ্গে সমসূত্রে বিচার্য, এবং এই ধরনের গড্ডলিকা-পদ্ধতির বিচার বিবেচনা সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আমাদের বক্তব্য সাধ্যমত নিবেদনও করেছি। বর্তমানে নানা কারণে বিষয়টির পুনরুত্থাপন করতে হচ্ছে।

বাঙ্‌লার বৈষ্ণবধর্ম পদাবলী-সমৃদ্ধ হয়ে এককালে বাঙ্‌লার শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং বর্ণনির্বিশেষে প্রায় সমস্ত মানুষকে ভাব-বিহ্বল করে সেকালকার বৈষয়িক ও হৃতধর্ম—সুতরাং হৃতসর্বস্ব, দীন জীবনের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিল এবং আনন্দময় মুক্তিকে সহজলভ্য করে তুলেছিল। বর্তমানে তা আধুনিক শিক্ষিত সমাজ থেকে দূরে সরে গেলেও, ভাবের একটা সংস্কারলেশ জাতীয় মানসে রেখে গেছে। যার জন্যে চিন্তা এবং মনন থেকে ভাবের মূল্য আমাদের কাছে বেশি। আমাদের তখনকার স্বদেশী-আন্দোলনই হোক আর সাম্প্রতিক প্রগতি-অভিলাষই হোক, রক্ষণশীলতাই হোক, আর বিপ্লবচেতনাই হোক, ইতিহাস-অধ্যয়ন অথবা সাহিত্য-বিচার হোক, ভাবের মূলেই এগুলির যথার্থতা আমরা পরীক্ষা করি। উনিশ শতকে শিক্ষিত সমাজের জাগরণের মূলেও পশ্চিমাগত ভাবেরই প্রেরণা, সেইজন্য সাহিত্য আশ্রয় করেই নবীনতার বিশেষ প্রকাশ। বাঙালি-চিত্তের এই সূত্র ধরে রোম্যানটিক্ সাহিত্যের প্রতি আমাদের পক্ষপাত, এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের মত কল্পনাপ্রবণ মহাগীতিকবির আবির্ভাব। আজ পর্যন্ত আমাদের ভাবসম্পদের দুটি তুঙ্গ-সীমা—এক বৈষ্ণব সাহিত্য, দুই রবীন্দ্র-কাব্যগীতি। একটি পুরোপুরি ধর্মীয়, অন্যটি পুরোপুরি সাহিত্যিক, ধর্মের আভাসযুক্ত। আভাস কেন? যথার্থ ধর্মীয়তা রবীন্দ্রকাব্যে নেই, এমন কথা বলা যায় কোন্ বিচারে? একথা বলা যায় তাঁর কাব্যস্বরূপ হৃদয়ংগম করে এবং পূর্ব পূর্ব ধর্মীয়তার সঙ্গে রবীন্দ্র-অনুভবের আত্যন্তিক প্রভেদ লক্ষ্য করে। মানুষসহ নিসর্গই রবীন্দ্রনাথের কাছে সর্বস্ব। গুহাহিত চরম রহস্য যদি কিছু থাকে তা বাস্তবের মধ্যেই নানাভাবে আভাসিত হচ্ছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এবং মানবিক স্নেহপ্রেমে। প্রকারান্তরে মানুষকেই তিনি চরম সত্য হিসাবে দেখেছেন, ব্যক্তি-মানুষকে না হলেও সমষ্টি-মানুষকে। সেই একজীববাদী ভাবনা-কল্পনা- বাসনার ঘনীভূত সারকেই তিনি মহামানব বলে অভিনন্দিত করছেন—'ঐ

মহামানব আসে'। প্রাচীন সমালোচকেরা কাব্যসৌন্দর্য বা কাব্যরসকে খুব উচ্চে তুলে ধরে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছেন আরও এক ধাপ উপরে। তিনি কাব্যস্বাদকেই ব্রহ্মাস্বাদ বলে অনুভব করেছেন, যেমন,—

আর নাই রে বেলা, নামলো ছায়া ধরণীতে,
এখন চল্ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।
জানি নে আর ফিরব কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।

অথবা— এই যে তোমার প্রেম,
ওগো হৃদয়হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।

অথবা শরৎ-সৌন্দর্য দেখে—

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশিরভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে।

এসবের মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টা নিসর্গসৌন্দর্যরসিকের সৌন্দর্যকেই চরম এবং পরম করে দেখার আগ্রহ পরিস্ফুট হয়েছে। 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'—এই কবিতা বা গানটিকে ভবকাণ্ডারীর উপলব্ধি, পরমাত্ম-স্তুতিবাক্য প্রভৃতি বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। অথচ এটি সচরাচর-দৃষ্ট নদীর উপব ভাসমান তরী-বেয়ে-যাওয়ার সৌন্দর্যের অতিশয়িত বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রমণীয়তাকেই কবি এমন চরমভাবে দেখেছেন যে, ঐ তরীর মাঝিকে তাঁর হৃদয়ের সর্বস্ব অর্পণ করতে চেয়েছেন। এ হল রোম্যান্টিক কবিকল্পনার বিশেষত্বের দিক্। 'সোনার তরী' কবিতার কল্পিত মাঝির ব্যাপারেও ঠিক তাই। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করে থাকেন এমন সুধী ব্যক্তি কেউ কেউ আজও 'খেয়া' কাব্যের শেষ কবিতা—'তুমি এপার ওপার কর কে-গো, ওগো খেয়ার নেয়ে'—প্রভৃতিকে অধ্যাত্ম-কবিতা মনে করেন। মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করলে দেখবেন, এটি রোম্যানটিক সুদূর-অনুভবের কবিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। 'খেয়া' এবং 'নেয়ে' কোনো সাংকেতিক ব্যাপার নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব। যে কাব্যের সুরে কবি গেয়েছেন 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে', সেই ভাবনাতেই এটি গাওয়া। ভাঙা হাট, সন্ধ্যার ছায়া, কালোজলের কলধ্বনি এবং এর সঙ্গে মন-কেমন-করা, কবির ঐ চির-উদাসী চির-বিষাদবিধুর ভাবাবেশই কবিতাটির অন্তর্নিহিত রসসত্য। আমরা ঐ শ্রেণীর অধ্যাত্মরসিকদের অনুরোধ করছি, কবির ঐ খেয়া, তরী, ঘর, পার,গোধূলি, সন্ধ্যা, ঘাট,

আঘাটা প্রভৃতির ইমেজকে তাঁরা তাঁদের অধীত অধ্যাত্মের সঙ্গে আগাগোড়া মিলিয়ে দেখুন অর্থসংগতি হয় কিনা। দেখবেন, ঠেকে যাচ্ছেন পদে পদে। 'বহুদিন হোল কোন্ ফাল্গুনে ছিনু যবে তব ভরসায়, এলে তুমি ঘন বরষায়',—এই 'তুমি' কি ঈশ্বর হতে পারেন? 'পসারিনী' কবিতার পসারিনী যদি পরমাত্মা হয়, তাহলে 'পসরা' কী হবে? তার আবার 'দুরাশা' কেন? তপ্ত বালুর কী সংকেত? 'ভরা দিঘি' বলতে কী বোঝাচ্ছে? এইভাবে তত্ত্বকথার জটিল জাল এমন সৃষ্টি হবে যে, শেষ পর্যন্ত অ-কার ক-কারের ব্যাখ্যায় কুলকুণ্ডলিনী, ডাকিনী হাঁকিনী প্রভৃতি ভাবতে হবে। আসল কথা—রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ নিসর্গরসিক কবি; আর এসব তাঁর অতি রমণীয় কাব্য-নির্মাণ— ভাষায়, ভঙ্গিতে, ধ্বনিতে, চিত্রে। এ-ই তাঁর সর্বস্ব এবং এই নিয়েই তিনি সুচিরকাল বেঁচে থাকবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গীতবিতানে সংকলিত গানগুলিকে যাঁরা প্রকৃতি, প্রেম, পূজা প্রভৃতি স্বকপোলকল্পিত আখ্যা দিয়ে পাঠকের সামনে প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন তাঁরা হয়তো পাঠক বা গীত-রসিকের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এরকম করেছিলেন, কবির সমর্থনও হয়ত পেয়েছিলেন, কিন্তু নিজেদের অজ্ঞাতে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। 'পূজা' শ্রেণীর অনেক গান যে স্পষ্টতঃ নিসর্গের তা তাঁরা দেখেও দেখেন নি।

কাব্যের রাজ্য এবং অধ্যাত্মের রাজ্য পরস্পর পৃথক। অধ্যাত্মের সঙ্গে রোম্যান্টিক শ্রেণীর কাব্যের আভাসে যোগ বা যোগের মত ভাব থাকতে পারে, বাস্তব যোগ নেই। মিস্টিক কবি যাঁদের বলা হয় তাঁরা রোম্যানটিকই, কবিই, মিস্টিক সাধক নন। এই কাব্যতুরীয়তাই রবীন্দ্রনাথে;—তাঁর উপাস্য হল কাব্যরসব্রহ্ম, সৌন্দর্যব্রহ্ম, জীবনব্রহ্ম; ভক্তিবাদের ঈশ্বর নয়। কিন্তু যেহেতু রসসত্তাকেই কবি অতিকৃত করে চরম করে দেখেছেন, সেইহেতু, লীলাময় এবং রূপমধ্যবর্তী সত্তার কল্পনা তাঁকে করতে হয়েছে। এই সত্তার সামগ্রিকতা আমাদের কাছে ঈশ্বররূপেই স্থানে স্থানে প্রতীয়মান হয়ে পড়েছে। কবির এই ঈশ্বর নিসর্গে সাহিত্যে ইতিহাসে জাতীয়তায় মানবমহিমায় রাষ্ট্রবিপ্লবে। যেমন পাশ্চাত্য দার্শনিক Hegel-এর Absolute Idea. তিনি লীলাপরায়ণ নটরাজ, প্রকাশময়। এরই ফলে কতকগুলি কবিতায় ও গানে তাঁর ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে। সেগুলিকে কেউ যদি ভগবদ্‌ভক্তির কবিতা বলতে চান আপত্তি নেই, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অদ্বৈতের ব্রহ্ম, অথবা যোগের অন্তর্যামী, কি ভক্তির বা বিশিষ্টাদ্বৈতের সঙ্গে ঠিক তার মিল নেই, —বেণুকর নবকিশোর গোপবধূবিটের সঙ্গে তো নেইই। তা ছাড়া তাঁর কতকগুলি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় গান, যাকে ব্রহ্মসংগীত বলা হয়, তা বহুলাংশে দেশ-কালের দাবিতে রচিত। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে প্রবল ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন; মহর্ষিপুত্র ছিলেন বলে নয়, নিজস্বভাবেই চরিত্রবান্ ও ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু তিনি আবার সমুচ্চ কাব্যকল্পনার অধিকারী এবং পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত আবির্ভূত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের অন্যতমও ছিলেন। তাঁর এই সাহিত্যিকতা, এই রহস্যময় কল্পলোক সৃজনকে ধর্মীয়তা বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। কবি কালিদাস কোথাও কোথাও কাব্যের প্রয়োজনবশে শিবস্তুতি উচ্চারণ করলেও একথা কি কেউ বলবেন যে, তিনি কুমারসম্ভব-শকুন্তলায় শৈবধর্মের প্রত্যভিজ্ঞা প্রতিপন্ন করেছেন? সুতরাং রবীন্দ্রনাথ পরবশে অথবা আত্মবশে শান্ত দাস্য মধুরের আভাসযুক্ত

কিছু কবিতা ও গান রচনা করলেও ভক্তিভাবের সাধক হয়ে পড়েন নি। আসলে আমরা তাঁর সাহিত্যকৃতিকে স্বরূপে বিচার করি না বলে এবং আমাদের মানস-ভূমি কাব্যরস গ্রহণের অনুকূল নয় বলেই তাঁর বিশুদ্ধ কাব্যে ঈশ্বর দর্শন করি। ভারতীয় বিভিন্ন ঐতিহ্যের আংশিক ও স্বাভাবিক অনুবর্তনকে প্রভাব বলে বিবেচনা করি। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুবর্তন করেছেন, আবার করেনওনি—এমনকি তার বিরুদ্ধাচরণও করেছেন। যেহেতু তিনি বৌদ্ধগাথা অবলম্বনে দু-একটি কবিতা লিখেছেন, 'নটীর পূজা'য় বুদ্ধের স্তবগান করেছেন অথবা গদ্যে কিছু লিখেছেন সেইহেতু তিনি বৌদ্ধ; যেহেতু তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে উপনিষদের মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন এবং অমৃত, আনন্দ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেইহেতু তিনি উপনিষদের ঋষি; যেহেতু তিনি ব্রহ্মসংগীত লিখেছেন, সেইহেতু তিনি ব্রাহ্ম; যেহেতু তিনি বাউল সুর এবং বাউল গানের ভাষা-ইমেজ ব্যবহার করেছেন, সেইহেতু তিনি বাউল; যেহেতু তিনি বঁধু, প্রাণেশ, প্রিয়, পরমধন, সুন্দর প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং কাব্যরসময় কল্পসত্তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়েছেন, সেইহেতু তিনি বৈষ্ণব—এরকম ধারণা প্রাকৃতজনসুলভ হতে পারে, বিদগ্ধসুলভ নয়। অন্ধের হস্তীদর্শনের বা মণি-বিচ্ছুরিত বিভিন্ন বর্ণের 'ন্যায়'ও এখানে অচল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বলে যে কবিব্যক্তি সে তো নিজেকে বহুধা বিভক্ত করে দেখাতে চায়নি, বিভিন্ন শ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্যেও কাব্য রচনা করতে বসেনি। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা, কবিমানস বা কল্পনাকুশলতার মধ্যে খণ্ডিত বহুত্ব নেই; বৈচিত্র্য আছে, বিরোধ নেই। কী সেই একত্ব কী সেই সূত্র যাকে পেলে কবিকে সঠিক ও সমগ্রভাবে পাওয়া যাবে? এসব বিষয নিয়ে আমরা পূর্বে পূর্বে বহু বাক্যব্যয় করেছি। এখানে আমাদের দেখতে হচ্ছে—তাঁর মৌল কবিধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের বিরুদ্ধ সম্পর্ক। বর্তমান আলোচনায় ধরে নেওয়া হয়েছে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে সজ্জন পাঠক পরিচিত ও সহানুভব-সম্পন্ন। এমন কথা যে উঠল, তার প্রমাণ সাম্প্রতিক একটি সংবাদ থেকে দিচ্ছি। অশ্লীলতাদোষে অভিযুক্ত কোনো উপন্যাসের বর্ণিত বিষয়ের সমর্থনকল্পে কোনো অধ্যাপিকা (নিশ্চয়ই তিনি বাংলায় এম. এ.!) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের মাতুলানী ভাগিনেয় সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অধ্যয়নে তিনি এটুকুও বোঝেননি যে, ওটি ধর্মীয় গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির বা ভগবৎপ্রীতির কাছে লোকসম্পর্ক বা শাস্ত্রচালিত সংসার-ধর্মের অতিতুচ্ছতা প্রতিপাদনই ছিল ধার্মিক কবির উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা পদাবলীকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের কোঠায় ফেলে তা দিয়ে লৌকিক সাহিত্যের অশ্লীলতা সমর্থন বিদগ্ধসমাজে গ্রহণীয় হবে কী? কিন্তু দোষ বোধ হয় তাঁর একারই নয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন, এমন উচ্চ ডিগ্রীধারী ব্যক্তিও যখন বলেন যে, জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস নিছক লৌকিক কাব্যই লিখেছিলেন—তখন অন্যে পরে কা কথা!

বৈষ্ণবদের বর্ণিত পরকীয়া রতির গোপীপ্রেমে এবং লৌকিক জগতের প্রেমে আশমান-জমীন্ পার্থক্য। একটি মায়াতীত, অন্যটি মায়িক। গোপীপ্রেম নিঃশেষে কামনাশূন্য, আর, নিঃস্বার্থতা এবং দুঃখময় ত্যাগ আমাদের কল্পনায় যতদূর যেতে পারে, রাধাভাব তারও উপরে। মর্ত্যপ্রেম যত উচ্চস্তরেরই হোক না কেন, বৈষ্ণবদের ধারণায় তা সকাম। চরিতামৃতের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলি স্মরণ করা যাক :

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা (= মর্ত্যপ্রণয়) তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥***
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন হেম॥***
আর এক অদ্ভুত গোপীপ্রেমের স্বভাব।***
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥

আবার—

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥

মহাজন-পদে গোপীপ্রেমের রাধাভাবের অনির্বচনীয় অতিমর্ত্য স্বভাবকে নানাভাবে প্রকাশ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কোনো সাধক-কবি বর্ণনা করেছেন :

সোই পরিতি অনু- রাগ বখানিতে
তিলে তেলে নৌতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ
তভো হিয় জুড়ন ন গেল॥

অপর একজন কৃষ্ণের রূপের অপ্রাকৃত প্রভাব এবং সেই সঙ্গে রাধাভাবের স্বরূপ বোঝাতে একটি পদে অতিশয়োক্তি, বিরোধ, বিষম প্রভৃতি অলংকারের একশেষ করেছেন :

আধক-আধ-আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শতকোটি-কুসুম-শর-জরজর
রহত কি যাত পরান॥ ইত্যাদি।

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ের অপ্রাকৃতত্ত্বের ব্যঞ্জনা এইভাবে পদাবলীর সর্বত্র। অবশ্য একথা হয়তো ঠিক যে, মর্ত্যের পরকীয়া প্রীতির দৃষ্টান্তে অনুমানে এই প্রণয়ের বহিরঙ্গবিন্যাস কল্পিত, তবু এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, মর্ত্যপ্রেম সীমিত—কৃষ্ণপ্রেম নিঃসীম। অন্ততঃ সেইভাবেই এই প্রীতি নির্দিষ্ট হয়েছে, কারণ মহাপ্রভুর আশ্চর্য বিরহোন্মাদ এই প্রেমকল্পনার যাথার্থ্য পরিস্ফুট করেছে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী পদাবলীতে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জয়দেব-বিল্বমঙ্গলে যা বর্ণিত হয়েছে তা যে সত্য, মহাপ্রভুই তার প্রমাণ। বস্তুতঃ পার্থিব প্রেম এবং ব্রজপ্রেম যে এক বস্তু নয়, এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপমূলক প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর 'বৈষ্ণব-কবিতায়—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?'—এই কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের অনুভবে পার্থিব প্রেমের মধ্যেই প্রীতির চরমোৎকর্ষ, এর উপরে আর কিছু নেই। তিনি নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করতে বৈষ্ণবীয়তার সঙ্গে তাঁর অনুভবের পার্থক্যের দিকটিই সুপরিস্ফুট করেছেন :

এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনবেলায়,

কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে :—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

কবি জানেন যে, বৈষ্ণব-অনুভবে দেবতা প্রিয় হয়েছেন,—কিন্তু প্রিয়জন দেবতা ব'লে অনুভূত হয়নি। বস্তুতঃ বৈষ্ণব দর্শনে সচ্চিদানন্দ স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণের এবং তাঁর স্বরূপশক্তি গোপীদের সঙ্গে মায়াবদ্ধ জীবের মৌলিক পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই আত্যন্তিক পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

রবীন্দ্র-অনুভব মর্ত্যসর্বস্ব, দেবতায়-মানুষে পার্থক্য মানে না। বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণহীন মায়িক অস্তিত্ব ক্লেশকর, ঘৃণার্হ। সেই দেহেন্দ্রিয়ই সার্থক যা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনে রত। কৃষ্ণসংস্পর্শহীন শ্রবণ-নয়নাদির নিন্দা নিম্নলিখিতভাবে করা হয়েছে :

বংশীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ মুণ্ডে তার পড়ু বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥***
কানাকড়ি-ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ
তার জন্ম হৈল অকারণে॥***
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥***

বিপরীত-তুলনায় রবীন্দ্রনাথের অনুভব সুপরিচিত :

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত, ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়।***
যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

সুতরাং রবীন্দ্র-অনুভব বৈষ্ণব-অনুভব থেকে মৌলিকভাবে পৃথক্। এরকম ক্ষেত্রে প্রভাবের প্রশ্ন ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হননি। পদাবলীর সাহিত্যধর্মের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, ভাষা-ভঙ্গি চিত্রকল্পও গ্রহণ করেছেন স্বচ্ছন্দে, যেমন গ্রহণ করেছেন কীর্তন গানের সুর নানান্ ক্ষেত্রে। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ পদাবলীর ভাষা ও রূপকল্প স্থানে স্থানে গ্রহণ করেছেন বলেই পাঠকের চোখে ধাঁধা লেগেছে, অন্তরঙ্গ ভাব সম্পর্কেও তাঁরা সাজাত্য ধ'রে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পদাবলী-প্রীতি ছিল, কিন্তু তা সাহিত্যিক, ধর্মীয় নয়। সাহিত্যিক দিকের অনুসরণ ঐতিহ্য হিসাবেই তাঁতে বর্তেছিল।

কৈশোরে পদাবলীর মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও ব্রজবুলির মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি অনুকরণাত্মক কিছু পদও লিখেছিলেন। কিন্তু তা নিতান্তই কাঁচা হাতের লেখা—তাঁর ভাষাতেই 'মেকি'।

রবীন্দ্র-ঈশ্বর যে ব্রজবিহারী কৃষ্ণ নন—'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোরধরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্'—প্রভৃতি বর্ণনার অনুরূপ কেবল-মধুর নন, রুদ্র ভয়ংকরও, তা তাঁর বহু কবিতায় গানে পরিস্ফুট। তিনি নটরাজ, তাঁর নৃত্যের দুই পদক্ষেপ, তিনি কখনো সুন্দর, কখনো ভয়ংকর। মহাকাশে, নিসর্গের মধ্যে তাঁর এই দুইরূপ সর্বদাই প্রকাশ পায়, মানব-সমাজের মধ্যেও। যুদ্ধ, বিপ্লব, প্লাবন, ভূকম্প, সূর্যতারকার রূপান্তর প্রভৃতি হ'ল ঐ রুদ্র ভয়ংকরের আবির্ভাবের মাধ্যম। বিশেষভাবে তিনি অনভিপ্রেত আঁধার ঘরেরই রাজা। কবির বক্তব্য হ'ল, বাহ্য রমণীয়তার মত এই ভয়ংকরতাকেও সাগ্রহে বরণ ক'রে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কেবল নিসর্গের নন, মানবসমাজেরও কবি। সেখানে তিনি চিরনূতনের পথিক। জীর্ণ সংস্কার, বিভিন্ন পুরাতন তন্ত্র বিসর্জন দিয়ে সংস্কারের মালিন্য সম্পূর্ণ মুছে ফেলে তিনি নূতনকে গ্রহণ করতে চান। সে নূতন সংস্কার-অবরুদ্ধ ব্যক্তির কাছে অপ্রিয়, অমঙ্গলকর এমনকি সর্বনেশে ব'লে প্রতীত হলেও তাকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—এই হ'ল তাঁর একটি বিশেষ বাণী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মও পুরাতন শাস্ত্রাদি বর্জন ক'রে বৈপ্লবিক নূতনের জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু তা যতটা ধর্মের দিক থেকে সে পরিমাণে বাস্তব জীবনের দিক থেকে নয়। অবশ্য বৈষ্ণব সমাজে জীবনাচরণ ধর্মাচরণের বশীভূত হয়ে পড়েছে, সে কথা স্বতন্ত্র। সমাজের মালিন্য মোচনের জন্য এবং নবজীবন গঠনের জন্য কবি নূতনকে এইভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন :

> প্রভাতসূর্য এসেছ রুদ্রসাজে,
> দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,***
> হে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে
> নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
> জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে ইত্যাদি।

অথবা

> 'জয় তব ভীষণ সব-কলুষ-নাশন রুদ্রতা'।

অথবা, স্পষ্ট ভাষায় মাধুর্যের প্রতিবাদ :

> নয় এ মধুর খেলা,
> তোমায় আমায় সারাজীবন
> সকাল সন্ধ্যা-বেলা।***
> তোমার প্রেমে আঘাত আছে
> নাইক অবহেলা॥

এ ছাড়া 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', 'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা', প্রভৃতি আরও শত শত কবিতায় ও গানে এই ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। আসলে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত 'ঈশ্বরে ভক্তি'র কবি নন, তিনি ইতিহাস, সমাজ, সংসার ও মানুষের কবি,—আর নিসর্গ-ব্যাখ্যার কবি। তবু রবীন্দ্র-রচনায় যে সব জায়গায় ভক্তিভাবুকতার আভাস লেগেছে এবং সাধারণ্যে যেগুলি বৈষ্ণবীর ভক্তি ব'লে আস্বাদন ক'রে থাকেন এমন দু'চারটি কবিতা বা গানের স্বরূপ আলোচিত হচ্ছে :

এক. তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নিচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে॥...ইত্যাদি।

এটি দৃশ্যতঃ বৈষ্ণব, কারণ এর কথার মধ্যে আনন্দ, প্রেম, ঈশ্বর, রসের খেলা, মনোহরণ, প্রভু, ভক্ত, মূর্তি, এমনকি যুগলসম্মিলনও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কাব্যার্থ অনুসরণে দেখা যায়, এতে তিনি বৈষ্ণবীয়তার প্রতিবাদ ক'রে তাঁর অভিপ্রেত মর্ত্যরসোপলব্ধি এবং মানুষের চরমতাই ব্যক্ত করেছেন। কোনো বৈষ্ণব একথা মানবেন না যে, তাঁকে নইলে কৃষ্ণের প্রেম ব্যর্থ। তিনি বলবেন, কোথায় সেই সর্বচিত্তহর অখিলরসামৃতমূর্তি সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ পূর্ণ ভগবান্, আর কোথায় আমি ক্ষুদ্র জীব, মায়ানিগৃহীত কামকাঞ্চনস্পৃহাজর্জর! অগণিত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মা নিয়ে যাঁর লীলা, সহস্র-সহস্র মহিষী, শত সহস্র গোপী যাঁর সুদুর্লভ সাক্ষাৎ পাবার জন্য ব্যগ্র, যাঁর অনন্ত লীলার কণিকা-লবলেশ স্পর্শ করতে পারলে জীব ধন্য হয়ে যায়,—আমাকে নইলে তাঁর প্রেম মিথ্যা হয়ে যাবে, এমন কথা শুনলেও পাপ। এবং বস্তুতঃ লীলাকীর্তনের মধ্যে এই পদটি যদি কেউ প্রবিষ্ট করিয়ে গান করেন, তাহ'লে যথার্থ বৈষ্ণব তা শোনামাত্র সভা ত্যাগ ক'রে উঠে যাবেন। এই কবিতাটিতে 'আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা' প্রভৃতি বাক্যে পার্থিব স্নেহসেবামাধুর্যময় জীবন-চর্যায় দিকে কবি যে ইঙ্গিত করেছেন, তাই হ'ল এখানে ঈশ্বরাভিপ্রেত রসের খেলা ; গোপীপ্রেমের অত্যাশ্চর্য বিরহদাহ নয়। আসলে এই জীবনের বিচিত্র সুখাস্বাদসমূহেরই চরমতা কবি খ্যাপন করেছেন, তাকেই অতিকৃত ক'রে ঈশ্বরীয় ব'লে অনুভব করেছেন। কবির এ ধারণা বৈষ্ণববিরোধী। শেষ পঙ্ক্তির 'যুগলসম্মিলন' বলতে মর্ত্যপ্রেমিক এবং রসরূপ ঈশ্বরের মিলিত একককে কবি বুঝিয়েছেন এবং তদনুযায়ী বিশ্বের মধ্যেই পরম পুরুষার্থকে লক্ষ্য করেছেন। বৈষ্ণব মতে এমন সব কথা যিনি উচ্চারণ করেন তিনি রসিক, তিনি কবি, ভক্ত নন।

দুই. তোমার আমার মিলন হবে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা।
* * *
তোমাব আমার মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধুর বেশে চলে চিরস্বয়ংবরা।

এর কাব্যার্থও অনুরূপ। সন্ধ্যা, উষা, আলোক, আকাশ, নিখিল-প্লাবী সৌন্দর্যস্রোত কবিচিত্তে রসাস্বাদরূপ কল্পিত অরূপের সঙ্গে মিলন-বাসনা জাগ্রত করেছে। তাঁর এই অরূপ পার্থিব রূপসাগরে ডুব দেওয়ার ফলে পাওয়া। বস্তুতঃ মর্ত্য-সৌন্দর্যের কাছেই কবি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেছেন। তাই বধূবেশের ছবি দিতে কবির কোন আয়াস হয়নি। এ বধূবেশে গোপীভাব ব্যঞ্জিত হচ্ছে না, আর 'তুমি' সর্বনামে নির্দিষ্ট ব্যক্তিও কোন মূর্তিধারী নয়. নিছক সৌন্দর্যসত্তা মাত্র।

তিন. কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মতো॥
পার হ'য়ে এসেছ মরু, নাই যে সেথায় ছায়াতরু—
পথের দুঃখ দিলেম তোমার গো এমন ভাগ্যহত॥

এর মধ্যে 'অভিসারিকা' চিত্রের ছায়াপাত মাত্র ঘটেছে, এ অভিসারিকা সংস্কৃত সাহিত্যেরও হতে পারে, বৈষ্ণবপদেরও হতে পারে। কিন্তু কবির বর্ণিত নায়িকা (এক্ষেত্রে কবিই) একালের এই পৃথিবীরই। সে বিরহিণী এবং প্রতীক্ষমাণা। মর্ত্যরসাবস্থার অখণ্ডতাবোধ থেকে কল্পিত মানবিকতা নায়ক হতে পারে। এর সঙ্গে তুলনীয়—'মনে হ'ল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।' দুটিই পার্থিব-প্রেমগীতি, রবীন্দ্রার্থে যার সঙ্গে ঈশ্বরপ্রেমগীতির পার্থক্য নেই। আমরা পূর্বেই বলেছি, পদাবলী থেকে বহু ইমেজ্ ও বাগ্‌ভঙ্গিমা আর্টিস্ট্ কবি নিয়েছেন। বাঁশিধ্বনির, কালো রূপের, কদমতলার, যমুনায় জল আনার এবং সর্বোপরি পার্থিব নায়িকাতে রাধার চিত্র আরোপিত হয়েছে ব'লে নিম্নলিখিত মর্ত্য পূর্বরাগের পরিহাসমধুর অপূর্ব গানটিকে কি কেউ বৈষ্ণবীয় গোপীপ্রেমের পোযাক ব'লে মনে করবেন?—

এখনো, তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশি শুনেছি।
মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি॥
শুনেছি মূরতি কালো
তারে না দেখাই ভালো,
সখি, বলো, আমি জল আনিতে
যমুনায় যাব কি?

ঠিক এই বিভ্রান্তিতেই 'জীবনদেবতা' নামীয় 'চিত্রা' কাব্যের কবিতাটি বৈষ্ণবীয় দ্বৈতভাবসাধনার কবিতা ব'লে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'জীবনদেবতা'য় নিতান্ত আত্মমুখী কবি তাঁর নিজ ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে ভাবের আলাপচারী করেছেন, অথচ ভাষাভঙ্গিতে বৈষ্ণবীয়তার আভাস আর্টের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই গ্রহণ করেছেন :

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা কিছু আছিল মোর।***
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর॥

জীবনদেবতার সঙ্গে একই সুরে গাঁথা 'অন্তর্যামী' কবিতা, যেখানে কবি ঐ অন্তরসত্তাকে (Subjective self) নারীরূপে বর্ণনা করেছেন, যা ঈশ্বর দ্বৈত অদ্বৈত প্রভৃতি ভ্রান্তি জন্মিয়েছে। কাব্যকবিতার রমণীয় মায়াসৃষ্টি যাঁদের অন্তর স্পর্শ করে না, দৈবীমায়ায় তাঁরাই এভাবে শুক্তিতে রজতবুদ্ধি পোষণ করেন।

চার. সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর—
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ, তাই এত মধুর।
কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে, কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর॥

কবি পার্থিব স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্যরম্যতার আস্বাদের আনন্দ নিয়ে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের আনন্দ অনুভব করেছেন। এও যা, আর 'যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে, তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে' অথবা 'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে। এস গন্ধে বরণে এস গানে' প্রভৃতিও তা। 'আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ' প্রভৃতির অস্মিতা বৈষ্ণবপদে দুর্লভ। 'সীমার মাঝে অসীম' বলতে বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদী বা হেগেলীয় ধারণার স্পর্শ যদি বা পাওয়া যায়, বিশিষ্টাদ্বৈতের মত জীববোধ এবং পার্থিব প্রবৃত্তির হেয়তাবোধ এর মধ্যে নেই। রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে নব্য হেগেল সম্প্রদায়ের মিস্‌টিক্ হতে পারেন, বৈষ্ণব নন।

পাঁচ. প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে॥

অথবা 'তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার'—এগুলি মোটামুটি প্রয়োজনবশে লেখা ব্রহ্মসংগীত। যেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত সেগুলিতে কবির উপলব্ধ বিশেষ ঈশ্বরের সঙ্গেই ভাব-পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, আমাদের পূর্বপরিচিত কোনো ঈশ্বরের সঙ্গে নয়। আমরা একথা বলছি না যে, রবীন্দ্রনাথ পরমতত্ত্বরূপে কোনো সত্তায় বিশ্বাসী নন। কিন্তু এ সত্তা তাঁর নিজের, এ সত্তা কাব্যিক, এ সত্তা নভোবৈজ্ঞানিক। কাব্যকল্পনার সূত্রে আগত সেই সত্তার সঙ্গে স্থানে স্থানে কবি স্বাভাবিক ভাবেই ভাববিনিময় করতে চেয়েছেন। যেমন নিম্নলিখিত দু'টি ক্ষেত্রে :

ছয়. দিনশেষে কর্মশালা ভাষা রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।
পড়ে থাক্ পিছে
বহু আবর্জনা বহু মিছে।
বারবার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,...

এবং যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।...ইত্যাদি
প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।...ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানবিক মনোভাব নিয়েই কবিতা লেখা হয়ে থাকে। উপরের পঙ্‌ক্তিগুলিতে যা জানানো হয়েছে তা বিদায়ী মানুষের সাধারণ মনোভাব। অবশ্য বিশ্বাসী মানুষের, অবিশ্বাসীর নয়। রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী ছিলেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ঐ সব কথা লিখেছেন। কিন্তু বিচার্য এই যে, কবির উপলব্ধ ঐ সত্তা ভক্তিধর্মচিহ্নিত ঈশ্বর কিনা। দেখা যাবে তা নয়। 'যেথা নাই নাম' ইত্যাদির মধ্যেই তা স্পষ্ট। বৈষ্ণবের ঈশ্বর একেবারে সবিশেষ—এমনকি, বিগ্রহধারী। ঐ বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, কবি ঠিক জানেন না কী সেই সত্তা। আভাসে অনুমানে মোটামুটি একটা এককের ধারণা ক'রে নিয়েছেন, অথচ, বৈষ্ণবেরা ঠিক জানেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান্, তিনি কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। 'জন্মদিনে' কাব্যের মধ্যে গ্রথিত কবির ঐ কবিতাটির মূল্য কবিতা হিসাবেই, নতুবা বিষয়বস্তুর দিক থেকে নতুন কিছু নয়, বিস্ময়করও নয়। পারের ডাক অনুভব করলে মানবচিত্তে ঐরকম ভাবনা চিরন্তনের ব্যাপার। বৈষ্ণবেরা এরকম মনোভাবকে ঈশ্বরীয় রতি বলেন না, বলেন রত্যাভাস। কোনো কারণে ক্ষণিকের জন্যে ঈশ্বরীয় ভাবের ছোঁওয়া মনে লাগে, তারপর তা মিলিয়ে যায়।

সাত. "ধুলা সাথে আমি ধুলা হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পূজারতি বরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,***
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে।
আছে তাঁরি পায়ে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী।"

উৎসর্গ কাব্যের এই কবিতাটিতে ঈশ্বরভাবুকতা আছে ঠিকই, কিন্তু সে ঈশ্বর পৃথিবীর সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছু নয়,—এর প্রমাণ কবিতাটির সর্বত্র। বস্তুতঃ মর্ত্যপরমতাই এই 'প্রবাসী' কবিতাটির কাব্যার্থ। 'তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা' 'ওরে মাটি তুই আমারে কি চাস'—প্রভৃতির মধ্যে তা স্পষ্ট। বৈষ্ণবীয় ভক্তি, তাঁদের কৃপাবাদ যে নেই তার প্রমাণ—"নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে"—কথাগুলির মধ্যে পাই।

এইভাবে দেখানো যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র পথের পথিক। তিনি যদি ঈশ্বর অনুভব ক'রেই থাকেন তো সে ঈশ্বর এযাবৎ আমাদের অপরিচিত। সে ঈশ্বর মর্ত্য ছাড়া এক অঙ্গুলিও উর্ধ্বে নন। অবশ্য জৈবতার মধ্যে তাঁর প্রকাশ দীপ্তিহীন তা বলাই বাহুল্য। দৃশ্য-গন্ধ-গানের, স্নেহ-প্রেম-দেশাত্মবোধের, চিত্র-কবিতা-দর্শনের, জীবনসংগ্রামে সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে ভাবময় যে সত্তা আভাসিত তাকেই তিনি চরম ও পরম ব'লে মনে করেছেন। তাঁর অনুভবে এই রসবোধেই মুক্তি ; সন্ন্যাসেও নয়, ভজন-সাধনেও নয়। 'রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে', এবং 'শুনবি রে আয় কবির কাছে তরুর মুক্তি ফুলের নাচে',—প্রভৃতি অসংখ্য পঙ্‌ক্তি এ বিষয়ে বিখ্যাত।

এ ব্যাপারে পাঠকদের কাছে আর একটি প্রমাণের বিষয় উল্লেখ করছি। সে প্রমাণ হৃদয়সাক্ষ্যের, "সচেতসামনুভবঃ"। বৈষ্ণব ভক্তিভাব বিষয়ে যাঁদের কিছুমাত্র অনুভব আছে এবং যাঁরা সেই সঙ্গে কাব্যরসেও অনভিজ্ঞ নন, তাঁরা কবীরের দোঁহায়, কি মীরা-সুরদাস-তুলসীদাসের গীতে, অথবা জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-নরোত্তম ঠাকুরের পদকীর্তনে, এমনকি, শ্যামাসংগীতেও যে অধ্যাত্মরাজ্যে নীত হবেন, রবীন্দ্রগীতিতে তা হবেন কি? কাব্যকে বাদ দিয়ে অন্যধরনের অধ্যাত্ম রবীন্দ্রনাথে নেই। তাঁর গীতাঞ্জলি প্রভৃতি মুখ্যভাবে কাব্য-লক্ষণাক্রান্ত। অন্যপক্ষে, কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-বৃন্দাবন যেখানে নেই বৈষ্ণবও সেখানে নেই। রবীন্দ্রনাথ নিঃশেষে বরণীয় কবি ও জীবন-ভাবুক। তাতেই তাঁর অতুলনীয় মূল্য। অধ্যাত্ম-বিষয়ক রসভাবুকতার উন্নতশ্রেণীর কবি ভারতবর্ষে সহস্র। একটি রবীন্দ্রনাথ দিয়ে তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি কবায় রবীন্দ্রনাথের কোনো গৌরবই থাকে না যে!

'রস' অর্থাৎ ভক্তিরস

পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ। পূজার্হ ব্যক্তিতে সম্ভ্রমবোধের অতিরিক্ত সাধারণ যে প্রিয়তা তাকেই বলে ভক্তি। কিন্তু যথার্থ ভক্তি ঐশ্বর্যবোধহীন। মমত্ব বা প্রিয়তা এর স্বরূপলক্ষণ। একে শুদ্ধা, কেবলা, অহেতুকী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়ে থাকে। এই ভক্তির পরম উৎকর্ষ, যতদূর মানুষের কল্পনা যেতে পারে—তার সাক্ষ্য হলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, তিনিই এর প্রদর্শক এবং প্রবর্তক। লোকশিক্ষার্থে তাঁর দৈন্যোক্তি হ'ল—'মম জন্মনি জন্মনি ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।' তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেকার ভাগবত সম্প্রদায়ের বা তত্ত্ববাদীদের যে ভক্তি তা সমুচ্চের প্রতি হীনম্মন্যের প্রসাদভিক্ষামূলক স্তুতিনতি। কৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শনে (গীতা, ১১শ) অর্জুনের যে মনোভাব তা এই ভক্তির পর্যায়ে পড়ে। সখ্যসম্পর্কে আবদ্ধ যে কৃষ্ণের সঙ্গে তিনি এতকাল বিশ্রম্ভালাপ এবং তর্কবিতর্ক ক'রে আসছিলেন, কৃষ্ণের করাল কালরূপ দর্শনে ক্ষণিকের জন্য তা স্তব্ধ হয়ে পড়ল, ভয়ে বিস্ময়ে অর্জুন তাঁর স্তব করতে লাগলেন এবং সখা মনে ক'রে যেসব সাহসিক উক্তি এতকাল তিনি ক'রে আসছিলেন, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। এই উক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাম্য নয়। এমনকি পতিজ্ঞানে রুক্মিনী সত্যভামাও কৃষ্ণের প্রতি যে সম্ভ্রমাত্মক প্রীতিভাব পোষণ করেন, তাও গৌড়ীয় অভিলষিত নয়। বৃন্দাবনে উদ্ধব-সুদাম-যশোদা-গোপীবৃন্দ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভক্তিরতির যে রম্যতা প্রদর্শন করেছিলেন তা-ই এই নবলোকধর্মের পথিকদের অভিলষিত বস্তু। অদ্বৈত-শ্রীবাস-রায়রামানন্দ · দামোদরস্বরূপ-রক্ষিত শ্রীচৈতন্য এই ভক্তির প্রকাশমূর্তি, সানুচর নিত্যানন্দ এর বিলাসমূর্তি, সনাতন-রূপ-জীব, মুখ্যতঃ শ্রীরূপ, গ্রন্থাদিতে এর উদ্‌গাতা এবং যাবতীয় বৈষ্ণব মহাজন এর প্রমাতা।

ভক্তি যে রসরূপে স্বাদিত হতে পারে এবং তার যে এত বৈচিত্র্য আছে, ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব মহাজনেরা তা দেখালেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটি অভিনব অধ্যায় তাঁরা সংযোজন করলেন। আর জাতিকুলনির্বিশেষে মানুষমাত্রেরই এই সম্পদ্ লাভের অধিকার স্মরণে রেখে এঁরা যেসব বিধিনিয়মের প্রবর্তন করলেন তাতে ধর্মাচরণেও এঁরা নূতন পথ দেখালেন। লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে যে আট-ন'টি ভাব ও তার পরিণামরূপ রস ব্যাখ্যাত হয়েছে তার মধ্যে ভক্তির স্থান নেই। অলংকারশাস্ত্রের উদ্ভবের পূর্বে উপলব্ধ উপনিষদে অবশ্য ব্রহ্মকে রস এবং আনন্দস্বরূপ ব'লে কোথাও কোথাও অভিহিত করা হয়েছে ('রসো বৈ সঃ', 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি', 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"), কিন্তু এর দ্বারা স্বাদের চমৎকারিতা জ্ঞাপিত হয়েছে কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ শংকর-রামানুজের ব্যাখ্যা থেকে তা পাওয়া যায় না। শৈব কালিদাসের বা অভিনবগুপ্তের কোনো বর্ণনা থেকেও বোঝা যায় না শিবভক্তিকে রাগাত্মিক ভাবে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। শিব-পার্বতীর

প্রণয়কথায় কালিদাস লৌকিক প্রণয়রসেরই মহিমা দেখিয়েছেন, আর প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের পথিক অভিনবগুপ্ত শান্তরসকে সমর্থন করলেও এর পৃথক্ রাগাত্মিকতা অনুভব করেননি। ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত 'যা ব্যাপারবতী'[১] প্রভৃতি শ্লোকে অনুভূত সত্য ধার্মিক ব্যক্তির প্রচলিত শান্তভাবের, রাগাত্মিকতার নয়। তবু ভক্তি যে সুখরূপে স্বাদিত হতে পারে তার সাক্ষ্য বিরলদৃষ্ট দু'চারজন ধার্মিকের অনুভবে নিশ্চয়ই ছিল। কবি জয়দেব তাঁর লীলাগীতের প্রারম্ভে বলেছেন 'যদি হরিস্মরণে সরসং মনো'। কৃষ্ণকর্ণামৃতের মধুর ভক্তি পূর্ণরসাত্মক হয়ে উঠেছে এ স্বীকার করতেই হবে। তারও পূর্বেকার আলবারদের গীত এবং পরবর্তী মিথিলা-বাঙলার বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণলীলাগীত ভক্তের অন্তরে রসরূপে স্বাদিত হয়েছিল। হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিচারে তার স্বীকৃতি ছিল না। আলংকারিকেরা ধর্মীয় সাহিত্যকে ভিন্নরাজ্যের ব'লে পরিহার করেই এসেছিলেন।

প্রকৃত কাব্য এবং ধর্মের এই দুস্তর ব্যবধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে লঙ্ঘিত হয়েছে। লৌকিকতা এবং ধর্মীয়তা এক হয়ে যায়নি ঠিকই, তবু দুয়েরই সীমা বিস্তৃত হয়েছে। ধর্ম স্বাদাত্মক হওয়ায় জনগণের অধিকারও গিয়েছে বেড়ে। আলংকারিকেরা শব্দের গুণরীতিময় বক্রতা লক্ষ্য করেছিলেন, মহাপ্রভু হরি-কৃষ্ণ-গোবিন্দাদি নামেরও রসবত্তা প্রদর্শন করেছেন। ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, বৈষ্ণব পদাবলী প্রাকৃত রসিকদের দ্বারা আজ কাব্য হিসাবেও গৃহীত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়লীলা যা মূলতঃ অপ্রাকৃত, তা প্রণয়লীলা ব'লেই এবং সুচারুভাবে নির্মিত ব'লে অপরিসীম কাব্যরসেরও অভিব্যঞ্জক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, যিনি মর্ত্যের অতিরিক্ত ধর্মজগৎ অনুভব করেন না, তিনি স্পষ্টতই কাব্যের সপক্ষতা ক'রে ধর্মীয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন :

হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রুআঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে।
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা

১. যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাৎ নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষযোন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমখিলং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশেয়ন ত্বদ্‌ভক্তিতুল্যং সুখম্॥

অর্থাৎ, একদিকে কবিকুল-প্রদর্শিত অপূর্ব কাব্যরস, অন্যদিকে বিজ্ঞানী পণ্ডিতবর্গের সূক্ষ্ম বস্তুবিচার—এ দুই পথ অবলম্বন ক'রে নিসর্গ পর্যবেক্ষণে আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম, তত্ত্ব কী তা আজও অনুভব হ'ল না। অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি আরোপ ক'রে চিত্তে যে সুখ অনুভব করেছি তার তুলনা নেই।

চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে!

যে ধর্ম চিরাচরিত স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনের পথ ত্যাগ ক'রে প্রণয়-বাৎসল্য, পূর্বরাগ-মান এবং আনন্দানুভবের প্রকাশক নৃত্যগীত, অশ্রু-পুলক-মূর্ছার পথ অবলম্বন করেছে সে ধর্ম সম্পর্কে রসিকের এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। ধর্ম এখানে লৌকিক সম্পর্কের রমণীয়তা আশ্রয় করেছে। এ ধর্মের মূল স্বরূপেই রয়েছে কাব্য, হৃদয়ভাবের সূক্ষ্মতা, এক আশ্চর্য স্বপ্নসাধ, আশা-দুরাশা পাওয়া না-পাওয়া মিলিয়ে এক অদ্ভুত বিশ্ব। অহেতুক প্রীতির বা শুদ্ধা ভক্তির আকর্ষণ রোম্যান্টিক্ কাব্যলক্ষণাক্রান্ত। এতে চিত্তের মুক্তি, মুক্তির আনন্দ এবং আনন্দের বিচিত্র ও বিস্তৃত ভাবোচ্ছ্বাস। ধর্ম এখানে পূর্ণাঙ্গ কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কাব্য কি ধর্মে উত্তীর্ণ হতে পারে? এ প্রশ্ন ধার্মিকের। তার উত্তর, বৈষ্ণব ভাবুকতায় ধর্ম কাব্যের পথ আশ্রয় করেছে মাত্র, কাব্যের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেনি। তাই কবির ঐ উচ্ছ্বসিত অভিযোগ। ধর্ম কাব্যের কাছাকাছি এসেও মিলে যায়নি। সমধর্মিতা এবং একত্ব এক কথা নয়। 'রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা' মর্ত্য থেকে সংগৃহীত হলেও বিষয়টির মূল অতিমর্ত্যের। দেবতা নবরূপে বাস্তবে লীলা করছেন মাত্র, এতে তাঁর ইচ্ছার তৃপ্তি এবং ভক্ত মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ দেবতা হতে পারে না, তার মহিমা যতই থাক। রবীন্দ্রনাথ নিঃশেষে কবি এবং সেইহেতু মানবসম্পর্ককে এবং কাব্যস্বরূপকে উচ্চতর সীমায় তুলে ধ'রে বলেছেন—'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।'[১]

আসলে সাধারণ কাব্য এবং ধর্মানুভবের কাব্যের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের তত্ত্বটি ফুটেছে অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনে, যাতে চিচ্ছক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে পার্থক্য রাখা হয়েছে। ভক্তির মূল হ'ল কৃষ্ণের হ্লাদিনী, যা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকণার মত জীবের অভ্যন্তরে রয়েছে চিদংশের সঙ্গে সঙ্গেই। এই ভক্তির সূত্রেই জীব ঈশ্বরের চিচ্ছক্তির অন্তর্ভূত হতে পারে। কিন্তু জীব অদৃষ্টবশে অজ্ঞান এবং জড়কে আশ্রয় ক'রে রয়েছে। তার জ্ঞানের জগৎ এবং প্রিয়জগৎ হ'ল এই মায়িক জগৎ, সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের জগৎ। লৌকিক প্রেম, স্নেহ, দেশপ্রীতি যত উচ্চস্তরেরই অর্থাৎ সাত্ত্বিক হোক না কেন, তা খণ্ডিত সীমিত। কৃষ্ণরতি থেকে এসবের পার্থক্য মৌলিক। বলা যেতে পারে, লৌকিক স্নেহপ্রেমে কৃষ্ণরতির আকার বা আভাস রয়েছে, স্বরূপ নেই। এজন্য চরিতামৃতকার লৌকিক প্রেমকে স্পষ্টতই কাম, কপট প্রেম, কৈতব প্রভৃতি ব'লে অভিহিত করেছেন। 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, হেন প্রেমা নৃলোকে না হয়।' 'দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ, সেহো মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।' জীবস্বভাব স্বার্থময়, কৃষ্ণপ্রেম নিঃস্বার্থ, সুতরাং শুদ্ধ। জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহ করতে করতে সৌভাগ্য বশতঃ কোনো জীবের চিত্তে যদি কৃষ্ণকথা শ্রবণে প্রবৃত্তি হয় এবং অনুকূলে বর্ধিত হয়ে সেই প্রবৃত্তি যদি রুচি, নিষ্ঠা, আসক্তিতে পরিণত হয় তা'হলে লীলার শ্রবণ কীর্তন স্মরণ প্রভৃতি সে অনুশীলন করতে থাকে এবং এর ফলে চিত্ত মসৃণ ও শুদ্ধ হ'লে কৃষ্ণরতির আবির্ভাব ঘটতে পারে।

কৃষ্ণভক্তির রতি এবং রসপরিণাম অচিন্ত্যভেদাভেদ-গত কৃষ্ণস্বরূপশক্তি ও জীবশক্তির

---

১. বৈষ্ণব ধার্মিকতা এবং রবীন্দ্র-কাব্যিকতার তুলনামূলক আলোচনা আরও বিস্তৃতভাবে পূর্বেই করা হয়েছে।

পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণভক্তি-ভাব অপ্রাকৃত, অ-লৌকিক, এর রসপরিণামের তো কথাই নেই। লৌকিক কাব্যশাস্ত্রে ভাবমাত্রই লৌকিক আর বিভাব এবং অনুভাব-সঞ্চারী-মিশ্র বিভাবের সহায়তায় ভাবের যে আনন্দাত্মক পরিণাম কেবল তা-ই অলৌকিক। আবার এ 'অলৌকিক' এবং কৃষ্ণরতির অলৌকিক সমার্থকও নয়। কাব্যরসের অলৌকিক অপ্রাকৃত নয়, অলৌকিক অর্থাৎ লৌকিক কার্যকারণ জন্য জনক প্রভৃতি সম্বন্ধবোধের অতিরিক্ত। রসাভিব্যক্তির ব্যাপারগুলিকে লৌকিক প্রমাণের দ্বারা ধরা যায় না, অনুভবই তার সত্যতার একমাত্র সাক্ষ্য, তাই অ-লৌকিক। আর বৈষ্ণবের অলৌকিক হ'ল যা লৌকিক বা মায়িক জগতের নয়, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক। শব্দ দুটি এক হ'লেও এদের বাচকত্ব পৃথক্। বৈষ্ণব ভক্তির রতি থেকে রসপরিণাম এবং তার কারণ কার্যসমূহ অর্থাৎ বিভাব অনুভাব (সাত্ত্বিক ভাব) এবং সঞ্চারী সবই অপ্রাকৃত ব'লে পরিগণিত হয়েছে। বৈষ্ণব আলংকারিক 'ভাব' থেকে রসপরিণামের মৌলিক সূত্র যদ্যপি মেনে নিয়েছেন এবং স্ববাসনার স্বাদবিশেষকেই রসাবস্থা ব'লে ধরে নিয়েছেন (অভিনবগুপ্তপাদের অভিমত), তবু বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রচলিত রসশাস্ত্রের বিভাগ বৈচিত্র্যগুলি মেনে নেননি, পৃথক্ পথ অবলম্বন করেছেন এবং স্থানে স্থানে উন্নতিবিধানেরও চেষ্টা করেছেন। এসব বিষয় আমরা পরে আলোচনা করছি।

"পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ" এ হ'ল সাধারণ বর্ণনা মাত্র, লৌকিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই প্রায়শঃ প্রযোজ্য। কিন্তু 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' এইটি হ'ল ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুরাগের, প্রিয়তাবোধের শ্রেষ্ঠতার কথা। এ হ'ল রাগভক্তি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা।

ভক্তি-বৈচিত্র্য

এই অনুরাগ জ্ঞান-কর্ম-বিমিশ্র হলে এবং লৌকিক বাসনা বা আধ্যাত্মিক অন্য কোনো বাসনার সঙ্গে বিজড়িত হলে তা উত্তম ব'লে বৈষ্ণব মহাজন স্বীকার করবেন না। শ্রীরূপ লক্ষণ নির্ণয় করছেন :

অন্যাভিলষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভক্তির জন্যই ভক্তির আচরণ, ধর্মের জন্যই ধর্ম ; সম্পদ বিদ্যা স্বর্গ এমনকি মোক্ষের কামনা যুক্ত থাকলেও ভক্তি উত্তম হবে না। জ্ঞান এবং কর্মের উপরে এই ভাক্তর স্থান। কর্ম ও জ্ঞানকে ভক্তির সচিব বলা হয়েছে। আবার, সংসারী জীবের সেই পর্যন্তই আনুষ্ঠানিক কর্ম আচরণীয় যে পর্যন্ত না চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়। পরবর্তীকালে ভক্তির পোষক কর্ম মাত্র বিহিত। 'আনুকূল্যেন' শব্দের অর্থ অনুকূল রুচি এবং প্রবৃত্তির দ্বারা। কায়-বাক্-চিত্ত কৃষ্ণে সমর্পণ ক'রে, জ্ঞান বৈরাগ্যের ভাব মনে উদিত হতে না দিয়ে। 'অনুশীলন' অর্থে শ্রবণ. মননাদি এবং সেবাপরিচর্যা। এই উত্তমা ভক্তিই হ'ল শুদ্ধা, অহৈতুকী, অব্যবহিতা। সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তির কামনা যার মধ্যে থাকে না। এবিষয়ে শ্রীরূপ দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত ক'রে বলেছেন :

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

সংসারে ভোগ এবং জীবনান্তে মুক্তি এ দুই কামনা পিশাচীর মত। ভক্তিসুখ-নির্ঝর পিশাচী শুষে নেয়। এই ভক্তি পাপঘ্ন, অবিদ্যাবিনাশক্ষম এবং শুভদ, আর, সর্বোপরি জাতিকুল নির্বিশেষে সমস্ত মানুষেরই এতে সমান আধিকার। সমস্ত ধর্মপথের মধ্যে শুদ্ধভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণমুখে বলা হয়েছে :

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥

শ্রীরূপ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শুদ্ধাভক্তিকে সাধন, ভাব এবং প্রেম এই তিনটি প্রাথমিক ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ তিনের প্রত্যেকটি আবার বৈধী এবং রাগানুগা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

বৈধী ভক্তি হ'ল শাস্ত্রনির্দেশ এবং প্রবৃত্তির ফলে অনুশীলিত মার্গ। যেমন, পদ্মপুরাণের নির্দেশ 'স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ' অথবা গীতার পরামর্শ 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে উৎসাহিত হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি ভক্তির আশ্রয় নেন এবং এরকম শাস্ত্রবাক্যে যদি তাঁর প্রবৃত্তি থাকে তাহলে তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই সাধনায় রত হন। এরকম ভক্ত তাঁর সাধনপথে আপনা থেকেই ভাব ও প্রেমের উদয় অনুভব করেন। ভাব ও প্রেমের অস্তিত্ব পূর্বে ছিলই না, সাধনার দ্বারা তা পাওয়া গেল এমন পরিস্থিতি ভক্তিশাস্ত্রকার স্বীকার করেন না, তাঁদের অভিমত এই যে ভাব ও প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু। কেবল ভগবানের চিচ্ছক্তির অধিকারের মধ্যেই নয়, জীবশক্তির মধ্যেও তা আংশিকভাবে রয়েছে, অবিদ্যা এবং জড়ে সমাচ্ছাদিত রয়েছে এইমাত্র। হ্লাদিনীর সার ভাব ও প্রেমকে সাধনার দ্বারা উৎপাদ্য মনে করলে এর নিত্যতার হানি ঘটে, অপ্রাকৃত না হয়ে তা লৌকিক বিষয়ের মত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির পর্যায়ে পড়ে। এতে কৃত্রিমতা দোষ আরোপিত হয়। আসলে ভাব ও প্রেমের নির্মাণ হয় না, কোনো সাধনও নেই। মানুষের হৃদয়ে এর জাগরণের নামই সাধন। এ বিষয়ে 'সিন্ধু'তে বলা হয়েছে :

বৈধী ও রাগানুগা

নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।

চরিতামৃত-এর অনুসরণে বলেছেন :

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য প্রভৃতি এবং আরও বহু বিধিনির্দিষ্ট বৈষ্ণবাচারই হল সাধনভক্তির অঙ্গ। রাগানুগা ভক্তিরও এসব সাধন রয়েছে। 'রাগানুগা' হল বৃন্দাবনের গোপীবৃন্দ, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, উদ্ধবাদির অনুগামী যে ভক্তি। 'রাগাত্মিকা'র অনুগত বলে রাগানুগা। গোপীদের কাছে কৃষ্ণ কাম বা প্রেমের বশীভূত। অন্যত্র পুত্র, সখা, প্রভু প্রভৃতি সম্বন্ধের বশীভূত। এজন্য রাগাত্মিক প্রীতির বৃন্দাবনে দুই রূপ। মানুষও নিজ প্রবৃত্তি ও রুচি অনুযায়ী এ দুয়ের কোনো একটা ভাব অনুসরণ করে ভক্তসাধনে রত হতে পারে। রাগাত্মিকে ঈশ্বরে ঐশ্বর্যবোধ বা পূজনীয়তাবোধ নেই—

মোর পুত্র, মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি॥
আপনারে বড় মানে, আমারে সম হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

এবং

ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যৈছে ছাড়ি ধর্ম কর্ম॥

আর রাগাত্মিক-রাগানুগা ভক্তিতে কৃষ্ণসেবার অকারণ লোভই হল বড় কথা। শাস্ত্র এবং যুক্তিতর্ক এখানে মূল্যহীন। অথচ বৈধমার্গের ভক্ত শাস্ত্রাদি অবহেলা করেন না। বৈধী ভক্তি অনুসরণ করতে করতে যখন ভাবের উদয় ঘটে তখন ভক্ত রাগানুগ-মার্গের অধিকারী হয়ে পড়েন। শাস্ত্রাদির নির্দেশ মানার প্রয়োজন তখন আর থাকে না। তবু তিনি যে কর্মে লিপ্ত থাকেন সে হল কৃষ্ণসেবার প্রয়োজনীয় কর্ম। বৈদিক-লৌকিক কর্ম নয়। আর, শ্রবণ কীর্তনাদি যা বৈধীতে বিহিত তা রাগানুগারও অঙ্গ। এইভাবে ভক্ত কৃষ্ণাসক্তি বশতই অনায়াসে এ সবের প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীরূপ রাগের লক্ষণ স্থাপনে বলেছেন, 'ইষ্টে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা'। লালসাই যার আবির্ভাবের একমাত্র কারণ, অন্য কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য যার মূলে নেই। এই আশ্চর্য প্রীতি ঔপপত্যভাবাপন্ন গোপীদের। ভিন্নভাবে যশোদাদিরও। তার অনুগামী মর্ত্যবাসীদের যে ভজন-পদ্ধতি তা-ই রাগানুগা। রাগানুগভাবেও ভজন-সাধন প্রয়োজন। সেইহেতু শ্রবণ-কীর্তনাদি রাগানুগারও অঙ্গ।

এরকম রাগ ভক্তের চিত্তে তখনও আবির্ভূত হয়নি, অথচ কৃষ্ণকথা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা জন্মেছে, রুচি এবং নিষ্ঠাও দেখা দিয়েছে, তিনি সাধুসঙ্গ করতে আরম্ভ করেছেন, এমন ভক্তির পথিকই বৈধী ভজনের অধিকারী। এরকম ভক্তির অধিকারীর আবার তিনটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। যাঁর শাস্ত্রজ্ঞানবশে চিত্তে দৃঢ়তা এসেছে তিনি উত্তম, যাঁর শাস্ত্রজ্ঞান নেই অথচ শ্রদ্ধা আছে তিনি মধ্যম, আর যাঁর স্বল্পশ্রদ্ধা তিনি কনিষ্ঠ। গীতায় অবশ্য ভক্তের চারটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে :

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

এবং এর মধ্যে জ্ঞানী ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। শ্রীরূপের মতে এর মধ্যে যে-কোনো শ্রেণীর মানুষই ঈশ্বরকৃপায় উত্তম ভক্তরূপে সাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে সাধনভক্তির পথে প্রবেশ করার প্রস্তুতি হিসাবে গুরু-আশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা,[১] ধর্মজিজ্ঞাসা, একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতির পালন, ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ, শাস্ত্রার্থ বিষয়ে বাদবিতণ্ডা বর্জন, অন্যদেবতাকে অনবজ্ঞা, কোনো প্রাণীকে উদ্বেগ না দেওয়া প্রভৃতি প্রধান কয়েকটি মানসিক এবং অন্য কয়েকটি কায়িক ও বাচিক বিধি অনুসরণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি গীতোক্ত ভক্তিযোগের ভক্ত-চারিত্র্যের সঙ্গে তুলনীয় ('অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং' ইত্যাদি ১২শ অঃ)। অন্যগুলি সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনদের উপলব্ধি অনুসারে সংযোজিত। যেমন বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, নির্মাল্য ধারণ, বিগ্রহ প্রদক্ষিণ, সম্মুখে নৃত্য, দণ্ডবৎ, অর্চন, পাদ্য-নৈবেদ্যের স্বাদ গ্রহণ, তুলসী সেবন, সেবাপরাধ নামাপরাধ বর্জন, শরণাপত্তি প্রভৃতি সব মিলিয়ে সংখ্যায় চৌষট্টি। এগুলি যে প্রসিদ্ধ পুরাণাদি থেকে সংগৃহীত সে বিষয়ে 'সিন্ধু' বহু প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। চরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষায় (মধ্য. দ্বাবিংশ) সাধনভক্তির অনুষ্ঠান বিষয়ে এসব কথা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

---

১. ভারতের অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মত বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও গুরুত্ব স্থান খুব উচ্চে। দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু উভয়েরই প্রস্তাব এইজন্য যে অন্তর্যামী রূপে ও গুরুরূপে ঈশ্বরই মন্ত্র এবং ধর্মশিক্ষা দেন। "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা কয়েন ভক্তগণে।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিকে মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছেন— আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা। গীতায় 'যৎকরোষি যদশ্নাসি' প্রভৃতি এবং 'সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু' প্রভৃতি শ্লোকে কৃষ্ণে কর্মার্পণের যে কথা বলা হয়েছে, যদনুসরণে রায় রামানন্দ 'কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার' এই প্রাথমিক অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তাকেই 'আরোপসিদ্ধা' ভক্তি বলা হয়েছে। 'সঙ্গসিদ্ধা' হল কর্মজ্ঞানমিশ্রা। ভগবৎপরিকরাদির সঙ্গ থেকে উদ্ভূতা। 'স্বরূপ-সিদ্ধা' ভক্তিতে জ্ঞানকর্মসংযোগের কোনো আবশ্যকতাই নেই। এই হল প্রত্যক্ষ ভক্তি এবং প্রায়শই অকৈতব। বৈধী এবং রাগানুগা হিসাবে এই তিন ভক্তি প্রসারিত হয়ে থকে। এখন বৈধী ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গগুলি বিবেচিত হচ্ছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে নবলক্ষণা ভক্তির বিষয়ে বলা হয়েছে :

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

এর সাহায্যেই কালে কৃষ্ণে ভাব ও প্রেম উদিত হয়ে থাকে। এগুলির একটি মাত্র অঙ্গ সাধন করলেও প্রেমার অধিকারী হওয়া যায়। রাগানুগার পথিক এবং সিদ্ধ ভক্তেরাও আত্মার আনন্দের জন্য শ্রবণ-কীর্তনের অভ্যাস করেন।

(১) শ্রবণ—সাধুসঙ্গের ফলে যাঁর শ্রদ্ধা উদ্‌গত হয়েছে এবং যিনি শরণাপত্তি বরণ করেছেন, আবার যিনি গুরুপদাশ্রয়ও গ্রহণ করেছেন, এমন সব ভক্ত কৃষ্ণকথা শ্রবণাদির দ্বারা ভক্তির আচরণ করবেন। শ্রবণ বলতে নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার শ্রবণ। শ্রীমদ্‌ভাগবত, কৃষ্ণকর্ণামৃত, মহাজন-পদাবলী এবং গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থের পাঠ এ শ্রবণ এই পর্যায়ে পড়ে।

(২) কীর্তন—'নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।' নাম ও লীলাদির রম্য সুরসংযোগে গান করাকেই বিশেষভাবে কীর্তন বলে। বহুব্যক্তির সম্মিলিত এবং নৃত্যবাদ্যাদি সংযুক্ত ঐ গীতকে সংকীর্তন বলা চলে। সাধারণভাবে কীর্তনের রীতি ধর্মসম্প্রদায়বিশেষে পূর্ব-প্রচলিত হলেও মহাপ্রভুই এ রীতিকে বিশেষভাবে সাধনের অঙ্গীভূত করে তোলেন। তাই বস্তুতঃ তিনিই কীর্তন গান এবং সংকীর্তনের প্রবর্তক। নীলাচলে অবস্থান কালে স্বীয় ভাবের তৃপ্তিবিধানের জন্য—

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

কীর্তনের মুখ্য দুই ভাগ, নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন। এছাড়া রূপ-গুণাদির কীর্তনও ভিন্নশ্রেণীভুক্ত হতে পারে। নামকীর্তনের ফল মহাপ্রভু নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন— "চেতোদর্পণমার্জনং" প্রভৃতি শ্লোকে। কলিযুগে নামকীর্তনেরই প্রয়োজনীয় শ্রেষ্ঠতা মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন এবং নির্বিচারে সমস্ত মানুষকে এর অধিকার দিয়ে গেছেন।

(৩) স্মরণ—পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুভবকে স্মরণ বলে। কৃষ্ণের রূপ গুণ চেষ্টা প্রভৃতির মানস-অনুভব। ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে।

(৪) পাদসেবন—পরিচর্যা। কৃষ্ণবিগ্রহের এবং তুলসীর। ব্যঞ্জনায় কৃষ্ণ-পরিকরদের তথা গৌর-পরিকরদের সেবাও এই পর্যায়ে পড়ে। সপরিকর মহাপ্রভুর গুণ্ডিচাগৃহমার্জন পরিচর্যার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

(৫) অর্চন—পূজা অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা উপচার সমর্পণ। দীক্ষাগ্রহণান্তর গৃহস্থের পক্ষে অবলম্বনীয়। হরিভক্তিবিলাস মতে অর্চন কর্তব্য। ভক্ত নিষ্কিঞ্চন হয়ে যদি অর্চনাভিলাষী হন তাহলে তিনি শুধু জল তুলসীর দ্বারাই অর্চন করতে পারেন। স্মরণীয়—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকল বর্ণের লোকেরই কৃষ্ণার্চনে অধিকার আছে।

(৬) বন্দন—কৃষ্ণের মহিমা ও বিবিধগুণ শ্রবণান্তর তাঁর স্তব, নমস্কারাদি।

(৭) দাস্য—দাস-অভিমান। এ দাস্য সাধারণ দাসভাবে ভজন মাত্র, রাগানুগা প্রেমভক্তির দাস্যরতি নয়।

(৮) সখ্য—বিশ্বস্ততা ও মিত্রবৃত্তি। বিধিমার্গে সখ্যভাবনা এরকম, আবার রাগানুগা মার্গে আর একরকম। বলা যেতে পারে বিধিমার্গে সখ্য আরোপিত, রাগানুগায় অনায়াসে আগত। বিধিমার্গে রতি বা ভাব নেই, তাই সখ্যের আভাস মাত্র বর্তমান।

(৯) আত্মনিবেদন—জ্ঞান, কর্ম, এমনকি কায়মনোবাক্যের সমর্পণ, আত্মবিক্রয়। যেমন, বিদ্যাপতি উল্লিখিত—

দেহ তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।

রাগানুগায় আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত হল চণ্ডীদাস লিখিত—

সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলুঁ দাসী॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রাগানুগমার্গের মঞ্জরীভাবের সাধক হয়েও সাধনভক্তির অঙ্গসমূহ কিভাবে প্রার্থনা করেছেন দেখা যাক :

আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার তেজি পরম আনন্তে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে পাব দরশন
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈয়া রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া
কান্দিয়া বেড়াইব উচ্চ রায়॥
নিভৃত নিকুঞ্জ যায়্যা অষ্টাঙ্গ প্রণাম হৈয়া
ডাকিব হা প্রাণনাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে পরশ করব নীরে
করে খাব করপুটে তুলি॥

আর কি এমন হব শ্রীরাসমণ্ডলে যাব
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট ছায়া পায়্যা পরম আনন্দ হৈয়া
পড়িয়া রহিব কবে তায়॥
কবে গোবর্ধন গিরি দেখিব নয়ান ভরি
রাধাকুণ্ডে কবে হব বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে
করে আশ নরোত্তম দাস॥

বৈষ্ণবগণ জ্ঞান বৈরাগ্যকে কোনক্রমেই ভক্তির সাধন বলে অঙ্গীকার করেন না। সাধুসঙ্গ, প্রবৃত্তি, রুচি, নিষ্ঠা, আসক্তি, শ্রবণ-কীর্তনাদির মধ্য দিয়ে, ভক্তি-ভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বৈরাগ্য আপনা থেকেই ভক্তির মধ্যে যুক্ত হয়ে পড়ে এই তাঁদের প্রত্যয় এবং অভিজ্ঞতা। সুতরাং জ্ঞানাদি হল ভক্তির পরিবার, অনুচর, কিংকর, সর্বতোভাবে অনুগামী। এখন শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট ভাবভক্তির বিন্যাস-প্রকার অনুসরণ করা যাক।

লৌকিক রসবাদী আলংকারিকেরা যে অর্থে 'ভাব' শব্দ প্রয়োগ করেছেন বৈষ্ণবশাস্ত্রকারও সেই অর্থেই গ্রহণ করেছেন, যদিও লৌকিকতার সঙ্গে অলৌকিকতার মৌলিক ভিত্তিভূমির পার্থক্য থেকেই গেছে। লৌকিক ভাব (emotion) মায়িকবৃত্তিগত, ভক্তিভাব হ্লাদিনীর অংশ। এই ভাব 'রতির' পর্যায়শব্দ। স্থায়ী এবং সঞ্চারী ভাবের দুই শ্রেণী পূর্বেকার আলংকারিকদের মতই এখানে স্বীকৃত। এই ভাবরতির ক্রমোৎকর্ষের কল্পনা কিন্তু বৈষ্ণবদের স্বকীয়। যেমন, রতি (বা ভাব) বর্ধিত হয়ে ক্রমে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং পরিণামে ভাব ও মহাভাব। এ উৎকর্ষ আলংকারিক রসপরিণামে নাই, এ হল অলৌকিক ভাবেরই প্রৌঢ়তর এবং প্রৌঢ়তম স্তরবিশেষ। অর্থাৎ প্রেমস্নেহাদিও স্থায়ীভাবই। ভক্তিরতিতে (বা ভাবে) ভক্তিস্থায়ীভাবের অঙ্কুরোদ্‌গম বলা যেতে পারে। চরিতামৃতকার তুলনা দিয়ে বলছেন :

ভাবভক্তি

সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ডসার॥
শর্করা সিতামিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব।

দেখা যায়, রতির পর্যায়শব্দ 'ভাব' হল সামান্য বা সাধারণ ভাব (emotion)-বাচক। আর পরিপাকাবস্থার 'ভাব' তারই উৎকর্ষ। 'ভাব' শব্দের এই প্রয়োগ-বিভ্রাট লক্ষ্য করে বোধ হয় চরিতামৃতকার স্থায়ীভাবের প্রথম সাধারণ অবস্থাকে আর 'ভাব' না বলে 'রতি'ই বলেছেন। 'প্রেম' ঐ রতিরই প্রগাঢ় অবস্থা। ভাবভক্তির লক্ষণ নির্ণয়ে শ্রীরূপ বলছেন :

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

শুদ্ধসত্ত্ব হল ভগবানের স্বরূপশক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনীর বৃত্তি। এই শুদ্ধসত্ত্ব হল যার মূল, যা প্রেমরূপ সূর্যের কিরণতুল্য আর ভগবৎসঙ্গলাভের অভিলাষে যা চিত্তকে মসৃণ বা স্নিগ্ধ করে তোলে তাই হল ভাব। অর্থাৎ পরবর্তী প্রেমের প্রাথমিক অবস্থাই হল ভাব। এতে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকের প্রকাশ স্বল্পমাত্রায় লক্ষিত হয়। এই কৃষ্ণরতির উদ্ভব ভক্তের চিত্তে ঘটে দুটি উপায়ে, এক সাধনে অভিনিবেশ, দুই কৃষ্ণকৃপা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সাধনপর্যায় ব্যতীত কৃষ্ণকৃপায় আপনা থেকেই ভক্তির উদ্‌গম দুর্লভ বললেই চলে। নারদ শুক, প্রহ্লাদ প্রভৃতি কতিপয় মহাপুরুষই এই ভক্তির অধিকার পেয়েছিলেন। সাধন-অভিনিবেশ থেকে উৎপন্ন ভাবভক্তির কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে কপিলদেবের মুখে এইভাবে বলা হয়েছে :

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদঃ ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

এই ভাব যেমন বৈধী সাধন থেকে, তেমনি রাগানুগা সাধন থেকেও আসতে পারে। ভাবোদ্গম হলে কী কী অনুভাবের দ্বারা অর্থাৎ কার্য বা বহিঃপ্রকাশের দ্বারা তা বোঝা যায়? এজন্য বলা হয়েছে—ক্ষান্তি অর্থাৎ অবিক্ষুব্ধতা বা ধীরতা, বিরাগ, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সর্বদা রুচি, গুণবর্ণনে আসক্তি, বৃন্দাবনাদিতে (নীলাচল, নবদ্বীপেও) প্রীতি প্রভৃতি। শ্রীরূপ এই কৃষ্ণরতি এবং মোক্ষকামী ব্যক্তিদের রতি (যা মাত্র রত্যাভাস), এ দুয়ের পার্থক্য স্মরণে রাখতে বলেছেন। এ ছাড়া ভক্তিহীন ব্যক্তির চিত্তেও ক্বচিৎ শ্রবণ-কীর্তন-তীর্থগমনের সংযোগে সাময়িকভাবে রতির আভাস বা ছায়া আসতে পারে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

প্রেমভক্তির লক্ষণে বলা হয়েছে :

প্রেমভক্তি

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

যা চিত্তকে সম্যকভাবে মসৃণ করে এবং যাতে মমত্বের আতিশয্য থাকে এমন গাঢ়তাপ্রাপ্ত ভাবকেই প্রেম বলে। এই প্রেমাও ভাবোৎপন্ন, আবার কৃষ্ণকৃপা থেকে উৎপন্ন হতে পারে এবং বৈধীসাধন-ও রাগানুগসাধন-নির্ভর হতে পারে। পার্থক্য এই যে, বৈধী সাধনের মধ্যে কৃষ্ণের মহিমাজ্ঞান এবং রাগানুগে মাধুর্যজ্ঞান অন্তর্লীন থাকে। সাধনভক্তি অবলম্বনেও ভক্তচিত্তে যে প্রেমের আবির্ভাব ঘটে তা কিন্তু স্বতঃ আবির্ভূত, সাধনভক্তির সঙ্গে তার জন্য-জনক সম্বন্ধ নেই। বৈষ্ণবদের এই অনুভবের বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে। এই বিষয়টি স্মরণে রেখে প্রেমভক্তির উদয়ের পূর্বেকার সাধনপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পুনশ্চ দেওয়া যেতে পারে :

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি॥

এই প্রেমের মহাভাব পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির বিষয়গুলি পরে স্থায়ীভাবের পর্যালোচনে বিবৃত হচ্ছে।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে ভক্তিরসের উপাদান এবং অঙ্গগুলির সাধারণ বিন্যাস দেওয়া হয়েছে এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে তা বিশেষভাবে, অলংকার-শাস্ত্রের প্রথায় বিবেচিত হয়েছে এবং সেখানে উজ্জ্বল বা মধুর রসের বৈচিত্র্যই আলোচিত হয়েছে। বিভাব্যনুভাব-ব্যভিচারীর

সংযোগে রসনিষ্পত্তির যে নির্ণয় লৌকিক-শাস্ত্রের পূর্বাচার্যেরা করে গেছেন বৈষ্ণবালংকারিক তারই সূত্র অনুসরণ করেছেন। অথচ কিছু কিছু বিশেষকেও তার মধ্যে সমন্বিত করেছেন। ভক্তির স্থায়ীভাবত্ব তথা রসের গৌণ-মুখ্য বিভাগ বৈষ্ণবদের অলৌকিকী কৃষ্ণভক্তির অনুসরণে, বিভাবাদির মধ্যে সাত্ত্বিকভাবের অনুপ্রবেশনও সেইমত। ভরতাদি পরিলক্ষিত সাত্ত্বিক ভাবের পূর্ণমহিমা গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাপ্রভুর দিব্য বিকারগুলির মধ্যে। এছাড়া আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতির মধ্যে নূতনতর ও সূক্ষ্মতর বৈচিত্র্যের সমাবেশও বৈষ্ণব মহাজনের নিজস্ব। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য ব্যাপার হল মধুররস বিবেচনে পরকীয়া রতির উৎকর্ষ নির্ধারণ। বস্তুত পরকীয়াই বৈষ্ণবদের শাস্ত্রের যাবতীয় বৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এমন বলা যায়। এইভাবে তাঁরা যে রসশাস্ত্র নির্মাণ করেছেন তা নিশ্চিতভাবে ভারতীয় রস-সমীক্ষাকে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃততর করেছে। এইসব বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অভিনব সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে সমৃদ্ধ পর্যবেক্ষণের জন্য অবশ্য মহাপ্রভু-প্রদর্শিত নব রসধর্মই হেতু। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই এর রচনায় ও প্রচারে পথিকৃৎ এবং অদ্ভুতকর্মাও। তাঁকে পুনঃপুন নমস্কার করে যথাসাধ্য এবং দ্রুতগতিতে তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্বণ করতে প্রয়াস করছি।

অবিরুদ্ধই হোক আর বিরুদ্ধই হোক, অন্য যে-কোনো ভাব যে-ভাবকে মুছে ফেলতে পারে না তাকে স্থায়ীভাব বলে, এই হল লৌকিক অলংকার শাস্ত্রোক্ত স্থায়ীভাব-লক্ষণ। শ্রীরূপ একেই পরিমার্জিত ক'রে বলেছেন—'অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবকে বশীভূত ক'রে যা রাজার মত অবস্থান করে'। বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীরূপ রাজসঙ্গী ছিলেন, তাই এই উপমা। শ্রীরূপ এখানে স্পষ্টতই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রতি দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এই অলৌকিক স্থায়ীভাব মুখ্য-গৌণ ভেদে দুই শ্রেণীর। মুখ্য হ'ল—শুদ্ধ (অর্থাৎ শম), প্রীত (অর্থাৎ দাস), সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা (অর্থাৎ মাধুর্য)। গৌণ হ'ল—লৌকিক অলংকার শাস্ত্রোক্ত রতি (= প্রেম) ও শম বাদে (যেহেতু ঐগুলি মুখ্যের অন্তর্ভূত পূর্বেই হয়েছে) সাতটি—হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। লৌকিক থেকে নেওয়া হলেও এগুলি বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে অলৌকিকই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতিরই অন্তর্ভুক্ত। ঐ পাঁচটি মুখ্যকে একক ধ'রে এর সঙ্গে সাতটি গৌণ স্থায়ী এবং তেত্রিশটি ব্যভিচারী (লৌকিকশাস্ত্রের অনুরূপ) যোগ ক'রে ভাবের সংখ্যা একচল্লিশ। এই একচল্লিশটি ভাব বিভাব-অনুভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রসপরিণাম লাভ করে। অবশ্য মুখ্যের অঙ্গরূপেই অন্যগুলির রসবত্তা এবং আটটি সাত্ত্বিকভাবকেও অঙ্গরূপে গণনা করলে সাঙ্গ মুখ্য-গৌণ রতি রসপরিণামে ঊনপঞ্চাশটি হয়ে থাকে। এই সব ভাব কৃষ্ণাদি ব্রজজনে থেকে বিষয়গত হয়, আবার ভক্তচিত্তে অবস্থান ক'রে আশ্রয়গত হয়। ভক্তের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই সবভাব ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-বৈচিত্র্য ধারণ করে। মুখ্যভক্তি পাঁচটির কোনো একটি কোনো আশ্রয়ে অবিমিশ্রভাবে থাকলে তাকে 'কেবলা', আর একাধিক ভিন্ন রতিসঙ্গে মিশ্রিত থাকলে তাকে 'সংকুলা' বলা হয়েছে। যেমন দাস্যের সঙ্গে সখ্যের মিশ্রণে উদ্ধবের প্রীতি সংকুলা। অপিচ,

স্থায়ীভাব ও রস

সেই বলদেব ইহ নিত্যানন্দ ভাই॥
বাৎসল্য-দাস্য-সখ্য—তিন ভাবময়।

অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারে কৈল ভক্তির প্রচার॥
সখ্য-দাস্য দুইভাব সহজ তাঁহার।
কভু কভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার॥

এ ছাড়া স্থায়ী রতির শীতত্ব উষ্ণত্বের বিভাগও শ্রীরূপ করেছেন। হর্ষ, হাস, উৎসাহ, গর্ব প্রভৃতি ভাব শীতস্বরূপ, আর উৎকণ্ঠা, শঙ্কা, দুঃখবিষাদের বোধ যাতে যা আছে তা উষ্ণস্বরূপ। উষ্ণ রতি, যা বিপ্রলম্ভে দুঃখাতিশয়ের কারক হয়, তা-ই বিশেষভাবে আনন্দজনক। সাতটি গৌণরতির মধ্যে জুগুপ্সা (ঘৃণা) 'বিষয়ে' অর্থাৎ কৃষ্ণে থাকে না, আশ্রয়ে অর্থাৎ ভক্তে মাত্র থাকে।

মুখ্য পঞ্চরসের পরিচয়

উপরি-লিখিত পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরতির পরিণামে পাঁচটি রসের নাম হ'ল যথাক্রমে শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বৎসল এবং মধুর। নামান্তরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং ব্যভিচারীর সংযোগে মুখ্যরতি এবং গৌণরতিগুলি স্বাদাত্মক রসে পরিণাম লাভ করে।

১. শুদ্ধ বা শান্ত—বিষয়ে বিরক্ত যোগীদের পরমাত্মা-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণে মমতাবর্জিত যে ভাবসম্বন্ধ তা-ই শান্ত রতির পোষক। তাঁরা এই ভাব আশ্রয় ক'রে ব্রহ্মানন্দের সুখানুভব ক'রে থাকেন। সনক, সনন্দ প্রভৃতি ঋষিরা এই শান্ত ভাবরসের সাধক। এ রসের আলম্বন বিভাব হলেন চিদানন্দঘনমূর্তি, আত্মারাম, পরমাত্মা, বিভু, শান্ত, দান্ত, হতারিগতিদায়ক শ্রীকৃষ্ণ। এর উদ্দীপন বিভাব হ'ল উপনিষদ্-শ্রবণ, জ্ঞানপ্রধান, ভক্তের সাহচর্য, চিত্তে চিদ্ঘন হরির স্ফূর্তি, তুলসীর সৌরভ, শঙ্খের ধ্বনি, পর্বত-অরণ্যাদি নির্জন স্থান, গঙ্গাদি পবিত্র নদী প্রভৃতি। অনুভাব—নাসাগ্রে দৃষ্টি, মৌনাবলম্বন প্রভৃতি। সঞ্চারী—ধৈর্য, স্মৃতি, মতি, ঔৎসুক্য. বিতর্ক। সাত্ত্বিক—নির্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প, স্তম্ভ।

২. প্রীত বা দাস্য—এই রতিকে প্রীত কেন বলা হয়েছে তার কারণ হিসাবে রসামৃতসিন্ধুতে বলা হয়েছে যে 'ইনি আরাধ্য এই বোধে আরাধ্য বিষয়ে আসক্তি বিধান করে এবং অন্যত্র প্রীতি বিনষ্ট ক'রে দেয়'। এই প্রথম মমতা বা আত্মীয় সম্পর্কের কাছাকাছি সেব্য-সেবক সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল ব'লে, যথার্থভাবে প্রেমভক্তির প্রথম পর্যায় হিসাবে নামকরণ—প্রীত। দাসত্ব এবং পালনীয়ত্ববোধে প্রীতভক্তির দুটি রূপ। সম্ভ্রমপ্রীত এবং গৌরবপ্রীত। সম্ভ্রমপ্রীতে আজ্ঞাবর্তীতা, বিশ্বস্ততা, প্রভুজ্ঞানে নম্রবুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষিত হয়। প্রভুতাজ্ঞান-জন্য সম্ভ্রম, কম্প ও চিত্তমধ্যে আদর স্থায়ী সম্ভ্রমপ্রীতের ভাববৈশিষ্ট্য। লালনীয়বোধে কনিষ্ঠত্ব অভিমান এবং পুত্রত্ব অভিমানও থাকে। এর আলম্বন—পরিচর্যাগ্রহণে অভিলাষী অথবা বৎসলতাবোধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ। দাস্যভাবের আশ্রয় ভক্ত উদ্ধব, এবং পারিষদরূপ সাত্যকি, বিদুর, শরণাগত কালিয়নাগ প্রভৃতি অথবা যদুকুমারগণ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি। শ্রীচৈতন্যপক্ষে মুরারি, শংকর, গোবিন্দ প্রভৃতির সম্ভ্রমপ্রীত। উদ্দীপক—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, চরণধূলি, অঙ্গসৌরভ, মুরলীধ্বনি শ্রবণ অথবা তাঁর বাসল্য। 'শান্তদাসরসে ঐশ্বর্য কাঁহাও উদ্দীপন।' অনুভাব—আজ্ঞাপালনে যুক্তকরতা। কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা, দণ্ডায়মানতা, আনন্দে নৃত্য, অথবা গৌরবপ্রীতে নীচাসনে উপবেশন প্রভৃতি। সাত্ত্বিক—স্তম্ভস্বেদাদি আটটিই। ব্যভিচারী—হর্ষ, গর্ব, বিষাদ, দৈন্য, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি,

আবেগ, লজ্জা প্রভৃতি চব্বিশটি। প্রীতভক্তি বর্ধিত হয়ে উত্তরোত্তর প্রেম, স্নেহ এবং রাগ এই তিনটিতে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

ব্রজবিহারী দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে দাস্যভাবরসের একটি পদ--

গোবর্ধন গিরিবর পরম নির্জন স্থল
রাই কানু করায়ব বিশ্রামে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
সুখময় রাতুল চরণে॥
কমল-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব বদন-কমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী রতন-নূপুর আনি
পরাইব চরণযুগলে॥
কনক-কটোয়া ভরি সুগন্ধি চন্দন পূরি
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে
চামরের বাতাস করিব॥

অথবা,

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াসিন্ধু।
পতিত উদ্ধার হেতু জয় দীনবন্ধু॥
জয় প্রেমভক্তিদাতা দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দাস পামরে॥
পূর্বেতে সাক্ষাতে যত পাতকী তারিলা।
সে বিচিত্র নহে যাতে অবতার কৈলা॥
মো হেন পাপিষ্ঠ এবে করহ উদ্ধার।
আশ্চর্য দয়াল গুণ ঘুষুক সংসার॥

৩. প্রেয় বা সখ্য--যাঁরা বয়সে বেশাদিতে এবং ভাবে কৃষ্ণের তুল্য তাঁদের কৃষ্ণের প্রতি মমত্বযুক্ত যে সমবোধ তাই হ'ল প্রেয়-স্থায়ীভাব বা সখ্যরসের বিষয়। শ্রীদাম সুদামাদি সখাগণ এবং অর্জুন, দ্রৌপদী প্রভৃতি এই ভাবরসের আশ্রয়গত আলম্বন। বিষয় হিসাবে দ্বিভুজ কৃষ্ণ তো আছেনই। চৈতন্যাবতারে রায় রামানন্দ এবং মুকুন্দাদি শুদ্ধ সখ্যের অধিকারী। সখ্যের মধ্যে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের বিশ্বস্ততামূলক সেবনের ভাব অন্তর্নিহিত থাকে, অধিক হ'ল বিশ্রম্ভতা ও সমবোধ। এই সখাদের বয়স্যও বলা হয়। বৃন্দাবনের বয়স্যদের চারটি শ্রেণী—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্মসখা। শ্রীদামাদি হলেন প্রিয়সখা ; সুবল, উজ্জ্বল প্রভৃতি প্রিয়নর্মসখা—কৃষ্ণের প্রেমলীলার সহায়ক। সখ্যরসে উদ্দীপন বিভাব হ'ল—রূপ, শৃঙ্গ, বেণু এবং পরিহাস ও বিবিধ ক্রীড়া। অনুভাব—বাহুযুদ্ধ, যষ্টিক্রীড়া, জলক্রীড়া, দ্যুত, 'কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে করায় রণ' একত্রে শয়ন-উপবেশন, পরিহাস, নৃত্য, গীত প্রভৃতি। সাত্ত্বিক—স্বম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, অশ্রু। ব্যভিচারী—উগ্রতা, ত্রাস ও আলস্য বাদে ত্রিশটি। এর মধ্যে মিলিতাবস্থায় এবং অমিলিতাবস্থায় এবং ব্যভিচারীর পার্থক্য ঘটে। সখ্য উৎকর্ষ লাভ ক'রে ক্রমশঃ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ পর্যন্ত

অগ্রসর হ'তে পারে। সখ্যের কৃষ্ণবিরহে মধুরের পূর্বরাগের মত দশ দশা লক্ষিত হতে পারে। সখ্য বা প্রেয়ভাবের পদ, যথা—

আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙিয়া পাগড়ী মাথে।
স্তোক-কৃষ্ণ অংশুমান দাম বসুদাম সাথে॥
কটি কাছনি বঙ্কিম ধটী বেণুবর বাম কাঁখে।
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে॥
ছান্দন-ডোর কান্ধহি শোভে কানে কুণ্ডল-খেলা।
গলে লম্বিত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ বালা॥
স্ফুট-চম্পক-দল নিন্দিত উজ্জ্বল তনু-শোভা।
পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর-মনোলোভা॥

অপিচ,
প্রভাতে উঠিয়া বরজরাজ।
তুরিতে চলিলা ধেনু-সমাজ॥
সখাগণ আসি মিলিল তাহি।
আনন্দ বাঢ়ল ও মুখ চাহি॥
গাভী দোহন করিয়া কান।
সুবলের সনে নিভৃতে যান॥
পুছত সুবল হেরিয়া মুখ।
কি ভেল আজুক রজনি-সুখ॥

৪. বৎসল ও বাৎসল্য—অনুকম্পার্হ ব্যক্তির উপর অনুকম্পাকারীর সম্ভ্রমশূন্য রতিভাবকেই বলে বৎসল। যথোচিত বিভাবাদির মিলনে বৎসলরতি বাৎসল্য রসে পরিণাম পায়। বাৎসল্যে এর নিম্নস্তরের রতির নিষ্ঠা, সেবন-পরিচর্যা, বিশ্রব্ধতা অন্তর্লীন থাকে, অথচ এর অতিশয় হ'ল মমতার আধিক্য, যার ফলে তাড়না, ভর্ৎসনা, বন্ধনাদি করা হয়ে থাকে। কৃষ্ণের গুরুজনেরা এই রসের আশ্রয় আলম্বন। গুরুবর্গ যথাক্রমে—যশোদা, নন্দ, রোহিণী, দেবকী, বসুদেব প্রভৃতি। শ্রীচৈতন্যপক্ষে শচীদেবী, মিশ্রপুরন্দর, মালিনী, শ্রীবাস, অদ্বৈত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি। এর উদ্দীপন বিভাব হ'ল কৌমারাদি বয়স, বাল্যচাপল্য, বাল্যক্রীড়া প্রভৃতি। অনুভাব—লালন, প্রতিপালন, উপদেশদান, মস্তকাঘ্রাণ, তাড়নাদি। সাত্ত্বিক ভাব—স্তম্ভ-স্বেদাদি আটটি, অধিকন্তু যশোদা পক্ষে স্তনদুগ্ধক্ষরণ। ব্যভিচারী হ'ল হর্ষাদি সখ্যরসের ত্রিশটি। এই রতির উৎকর্ষ প্রেমস্নেহাদি থেকে অনুরাগ পর্যন্ত। বাৎসল্যরস-বিষয়ক পদ, যথা—

আমার শপতি লাগে   না ধাইহ ধেনুর আগে
পরানের পরান নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু   পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বৈসে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে   আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয়্য   সঙ্গছাড়া না হইয়্য
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥

ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইয়্যা পথ-পানে চাহি যাইয়্যা
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কার বোলে বড় ধেনু ফিরাত্যে না যাইয়্যা কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥

অপিচ— নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইলা সবাই শান্তিপুরে,
মুড়ায়্যাছে মাথার কেশ ধর‍্যাছে সন্ন্যাসীবেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
করজোড় করি আগে দাণ্ডাইয়া মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিরা চাঁদমুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইল ভাগবত
একথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হৈব উপায়॥
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা যায়
কার বোলে হৈলা বৈরাগী॥

৫. মধুর—লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে যা 'রতি', 'আদি' বা 'শৃঙ্গার', বৈষ্ণবশাস্ত্রে তা-ই মধুর' বা 'উজ্জ্বল'। এই রতি বা নায়ক-নায়িকাগত প্রেমভাব সমুচিত বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারীর যোগে মধুররসে পরিণাম লাভ করে। এই রতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও প্রেয়সীবর্গ, প্রেয়সীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধিকা। আশ্রয় গোপীবর্গ ও ভক্তহৃদয়। উদ্দীপন—রাধাকৃষ্ণের রূপগুণ, মুরলী, যমুনাতট প্রভৃতি। ব্যভিচারী—আলস্য, উগ্রতা, ঘৃণা ব্যতীত সমস্ত। অনুভাব--কটাক্ষ-বিক্ষেপ হাস্যাদি অনেক। সাত্ত্বিক—স্তম্ভ স্বেদাদি সমস্ত। মধুররতিতে শান্ত-সখ্য-দাস্য-বাৎসল্যের সমস্ত গুণ, অধিকন্তু প্রেমের একাত্মতা-বন্ধন। মধুররতি উৎকর্ষ লাভ করতে করতে ভাব, মহাভাব পর্যন্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারে। অবশ্য এই মহাভাব-সম্পদে একমাত্র শ্রীরাধার অধিকার। মধুররতি ও রসের বৈচিত্র্য পরে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে। এবিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পদ :

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহু মন মনোভাব পেশল জনি॥ ইত্যাদি

এই প্রসঙ্গে চরিতামৃতে শ্রীরূপ-শিক্ষণ অংশে যেভাবে এই মুখ্য ভক্তিরস এবং সাধকশ্রেণীবিন্যাসের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

শান্ত ভক্ত নব যোগেন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্যভাব-ভক্ত সর্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত পিতা মাতা যত গুরুজন॥
মধুরস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥
পুন কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা কেবলা ভেদ আর॥
গোকুলে কেবলারতি ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য প্রবীণ॥
ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সংকুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য কেবলার রীতি॥
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য কাঁহা উদ্দীপন।
বাৎসল্য সখ্য মধুরেত করে সংকোচন॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য জ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল॥
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥
কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈল পরিহাস॥
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥
কেবলার শুদ্ধ প্রেমা ঐশ্বর্য না জানে।
ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥
শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ ইতি শ্রীমুখগাথা॥
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ তার কার্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥

শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসংকোচ, অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসংকোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

প্রীতিমূলক এই পাঁচটি মুখ্য স্থায়ীভাব উদ্দীপিত ক'রে কৃষ্ণের উপাসনা-রাগানুগ ভজনের প্রখ্যাত মার্গ। ভক্তের অভিরুচি এবং মানসিক গঠন অনুসারে এর কোনো একটি অবলম্বিত হয়ে থাকে। যিনি যে ভাব অবলম্বন করেন, কৃষ্ণ সেই ভাবেই তাঁর কাছে ধরা দেন। এবিষয়ে সূত্র হ'ল "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" কিন্তু এমনও হতে পারে যে ভক্ত সাধনার জোরে উচ্চতর এবং উচ্চতম পর্যায়ে আরোহণ করতে পারেন। এবিষয়ে কৃষ্ণকৃপা এবং পূর্ব পূর্বজন্মের সুকৃতির প্রশ্ন অবশ্যই রয়েছে।

গৌণ স্থায়ীভাব ও রস

রাগানুগায় গৌণভক্তি-স্থায়ীভাব সাতটির পরিচয় অর্থাৎ এগুলির আলম্বন, উদ্দীপন, ব্যভিচারী এবং পারস্পরিক সম্পর্ক লৌকিক অলংকারশাস্ত্রের অনুরূপ। এগুলি হ'ল হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, বিস্ময় ও জুগুপ্সা। রতি এবং শম মুখ্যেই স্থান পেয়ে গেছে। মুখ্যভক্তিরসগুলির প্রত্যেকটিতে এই সাতটির যে-কোনো একটি, দু'টি, অথবা সবগুলিই পোষকরূপে সহায়করূপে অবস্থান করতে পারে। যেমন দাস্যের হাস্য, দাস্যের ক্রোধ, দাস্যের শোক প্রভৃতি ; মধুরের শোক, মধুরের ক্রোধ প্রভৃতি। এই ভাবে গৌণমুখ্য মিলিয়ে স্থায়ীভাবের ও রসের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ দাঁড়ায়। এর

সঙ্গে স্তম্ভ-স্বেদাদি আটটি সাত্ত্বিক ভাব যোগ ক'রে তেতাল্লিশ সংখ্যা গণিত হতে পারে। সাত্ত্বিক ভাবগুলির স্বতন্ত্র রসপরিণাম লৌকিকে হয় না। লৌকিকে এগুলি অনুভাব মাত্র। ভক্তিমার্গে এগুলিও দিব্য অনুভব, সুতরাং এগুলির পৃথক্ রসপরিণাম না হোক, ঘনিষ্ঠ রসসম্পর্ক অবিসংবাদিত। হাস্যাদি রসের আলম্বন উদ্দীপন, অনুভাবাদি লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ হলেও স্বল্প কিছু বিশেষও আছে। তাই এগুলি নির্দিষ্ট করা হচ্ছে :

হাসরতি স্থায়ীভাব, হাস্য রস। কৃষ্ণ বা তদন্বয়ী ব্যক্তিরা আলম্বন বিভাব। ঐ প্রকার আলম্বনের বাক্য, বেশ, আচরণ প্রভৃতি উদ্দীপন। নাসা, ওষ্ঠ প্রভৃতির স্পন্দন, দন্তবিকাশ প্রভৃতি অনুভাব। হর্ষ আলস্য আকার-গোপন প্রভৃতি ব্যভিচারী। হাস্যের পরিমাণ ও প্রকারভেদে হাসরতিকে ছয়ভাবে দেখা যায়। স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত ও অতহসিত।

শোক স্থায়ীভাব, করুণ রস। আলম্বন কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রিয়বর্গ এবং কৃষ্ণভক্তিসুখ লাভ করতে পারছেন না এমন প্রিয়জন। ঔচিত্যের নিয়মে করুণে শান্তের বিষয় থাকতে পারে না। উদ্দীপন হ'ল কৃষ্ণের রূপ ; গুণ, চেষ্টা। অনুভাব—বিলাপ, দীর্ঘশ্বাস, ক্রন্দন, ভূপতন প্রভৃতি। ব্যভিচারী—স্তম্ভ; স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক এবং নির্বেদ, গ্লানি, দৈন্য, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল্য, ব্যাধি প্রভৃতি।

ক্রোধস্থায়ীভাব, রৌদ্র ভক্তিরস। কৃষ্ণ, কৃষ্ণের হিতকারী, কৃষ্ণের অহিতকারী আলম্বনের এই তিন বিষয়ভেদ। ভক্তরূপ আলম্বন বা আশ্রয় আলম্বনের দিক্ দিয়েও হিত ও অহিতের ভেদ হতে পারে। উদ্দীপন—গর্বময় হাস্য, বক্রোক্তি, অনাদর এবং কৃষ্ণের হিতপক্ষ অহিতপক্ষ ব্যক্তির চেষ্টা। অনুভাব—মুষ্টি-আস্ফালন, দন্তঘর্ষণ, ওষ্ঠদংশন, ভর্ৎসনা প্রভৃতি। ব্যভিচারী—স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক এবং আবেগ, গর্ব, অসূয়া, উগ্রতা প্রভৃতি। ক্রোধের তিন বিভাগ—কোপ, মন্যু এবং রোষ। শত্রুপক্ষে কোপ, বন্ধু বা আত্মীয়পক্ষে মন্যু এবং কৃষ্ণদয়িতাপক্ষে রোষ।

উৎসাহ স্থায়ীভাব, বীর ভক্তিরস। যুদ্ধ, দান, দয়া এবং ধর্ম এই চারিটি ক্ষেত্রেই বীরত্ব প্রযুক্ত হতে পারে। কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রিয়বর্গ বিষয়ালম্বন এবং ভক্তহৃদয় আশ্রয়হৃদয়। দর্প, স্পর্ধা-বিক্রম, আত্মশ্লাঘাদি, ভেরী-তুরী-ঢক্কানিনাদ, উল্লাস, করতালি প্রভৃতি এর উদ্দীপন। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক এবং সিংহনাদ, আক্রোশ. মদমত্তগতি, উদ্যম, ধৈর্য প্রভৃতি এর অনুভাব। গর্ব, আবেগ, হর্ষ, ব্রীড়া, স্মৃতি, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী। ধর্মবীরে সৎশাস্ত্রশ্রবণ, নীতি, আস্তিক্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি উদ্দীপন। এরকম অন্যগুলিতেও ভাবানুযায়ী।

ভয় স্থায়ীভাব, ভয়ানক রস। আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্ত। অপরাধী ও অপরাধী ভক্তপক্ষে কৃষ্ণ থেকে ভয়, আর কৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কা করেন এমন যশোদাদির চিত্তে ভয়। উদ্দীপন—ভ্রূকুটি প্রভৃতি। অনুভাব—মুখের শুষ্কতা, পশ্চাৎ-দৃষ্টি, গাত্রসংকোচন, উদ্‌ঘূর্ণা, আশ্রয়-অন্বেষণ প্রভৃতি। ব্যভিচারী—মোহ, অপস্মার, শঙ্কা। অশ্রু ব্যতিরেকে যাবতীয় সাত্ত্বিক।

জুগুপ্সা স্থায়ী, বীভৎস ভক্তিরস। শান্তমিশ্রিত ভক্তগণই এর অবলম্বন অর্থাৎ আশ্রয়ালম্বন। কৃষ্ণ বা তৎপ্রিয়-পক্ষে বিষয়রূপে এ থাকতে পারে না। দাস্য-বাৎসল্যাদিতেও এই রসের উপকারকতা নেই। উদ্দীপন—জঘন্য বিষয়াসক্তি। নিষ্ঠাবন, নাসিকাকুঞ্চন, অক্ষিসংকোচ

প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভ, কম্প, পুলক, ঘর্ম সাত্ত্বিক। গ্লানি, শ্রম, নির্বেদ, মোহ, দৈন্য, বিষাদ, জড়তা প্রভৃতি ব্যভিচারী।

বিস্ময় স্থায়ী, অদ্ভুত ভক্তিরস। আশ্রয়ালম্বন শান্ত থেকে মধুর পর্যন্ত সকল প্রকার ভক্ত। লোকাতীত কর্ম, রূপ, গুণ প্রভৃতির অধিকারী কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ-সম্পর্কিত স্থানাদি এর বিষয়। কৃষ্ণের রূপ, বেশ, কার্য প্রভৃতি উদ্দীপন। নেত্র-বিস্তার এবং স্তম্ভাদি যাবতীয় সাত্ত্বিক এর অনুভাব। আবেগ, হর্ষ, স্মৃতি, মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী।

উপরি-উক্ত সমস্ত ক্ষেত্রে বিষয়ালম্বন হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের মত শ্রীগৌরকেও গ্রহণ করতে হবে। আরও মনে রাখতে হবে শান্তাদি মুখ্য পাঁচটিই যথার্থভাবে হরিভক্তিরস। বর্ণিত হাস্যাদি গৌণগুলি প্রায়শই ব্যভিচারীভাবে অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ মুখ্যভক্তিরসগুলির সঙ্গে এবং ভক্তহৃদয়ে কোনটি কখনও যুক্ত হয়, কখনও হয় না। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হাস্যাদি গৌণরসগুলিও যে অঙ্গীভাবে অর্থাৎ প্রধানভাবে আস্বাদ্য না হতে পারে এমন নয়। সেরকম ক্ষেত্রে যে-কোনোটি অঙ্গী হলে অন্যগুলির অঙ্গভাবে থাকতে বাধা নেই, তা মুখ্যই হোক আর গৌণই হোক।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী মুখ্য এবং গৌণ রসগুলির পারস্পরিক মিত্রতা এবং বৈরীতা নিম্নলিখিতভাবে নিরূপণ করেছেন :

রস	মিত্র	বৈরী
শান্ত	প্রীত (দাস্য), প্রেয় (সখ্য); ধর্মবীরত্ব, অদ্ভুত, বীভৎস	মধুর, যুদ্ধবীরত্ব, রৌদ্র
প্রীতি (দাস্য)	শান্ত, বীভৎস, ধর্মবীর, দানবীর, করুণ, ভয়ানক	মধুর, যুদ্ধবীর (কৃষ্ণ), রৌদ্র (কৃষ্ণ)
প্রেয়ঃ (সখ্য)	মধুর, হাস্য, যুদ্ধবীর	বৎসল, রৌদ্র ভয়ানক
বৎসল	হাস্য, করুণ, ভয়ানক, অদ্ভুত	মধুর, যুদ্ধবীর, প্রীত, রৌদ্র
মধুর	হাস্য, প্রেয়ঃ, যুদ্ধবীর, ধর্মবীর	বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র, ভয়ানক
হাস্য	বীভৎস, মধুর, বৎসল	করুণ, ভয়ানক
করুণ	রৌদ্র, বৎসল	হাস্য, সম্ভোগশৃঙ্গার, অদ্ভুত
রৌদ্র	করুণ, বীর	হাস্য, শৃঙ্গার, ভয়ানক
বীর	অদ্ভুত, হাস্য, সখ্য, দাস্য	ভয়ানক
ভয়ানক	বীভৎস, করুণ	বীর, শৃঙ্গার, হাস্য, রৌদ্র
বীভৎস	শান্ত, হাস্য, দাস্য,	শৃঙ্গার, সখ্য
অদ্ভুত	বীর, শান্ত, প্রভৃতি মুখ্য পাঁচ	রৌদ্র, বীভৎস

উল্লেখিত সমস্ত রস স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির দিক থেকে অঙ্গহীন হলে অথবা বিরুদ্ধ স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব, প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে রসাভাস হয়ে ওঠে।

স্থায়ীভাব ও রসবৈচিত্র্য বিনির্ণয়ের পর ভক্তিরসের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

বিভাব, আলম্বন

ভক্তিরসপরিণামের কারণগুলির মধ্যে বিভাব প্রথমতঃ দুই প্রকার (লৌকিক অলংকারশাস্ত্রের মতোই)—(১) আলম্বন, (২) উদ্দীপন। আলম্বন বিভাব আবার বিষয়ের দিক্ থেকে (১) কৃষ্ণ বা গৌর, (২) কৃষ্ণসহায় বা গৌরলীলাপরিকর এবং আশ্রয়ের দিক্ থেকে (৩) গৌরকৃষ্ণভক্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত। শ্রীরূপ কৃষ্ণের অবয়ব ও চারিত্র্যে চৌষট্টিটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে পঞ্চাশটি মানুষের মধ্যে দৃষ্ট হলেও তা নিতান্ত আংশিকভাবে, একমাত্র কৃষ্ণেই তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। আর শেষ চারটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য শুধু কৃষ্ণই প্রাপ্তব্য। অন্য দশটি গুণ নারায়ণ, বিষ্ণু, বাসুদেবে এবং ব্রহ্মা শিব প্রভৃতিতে আংশিকভাবে প্রাপ্তব্য। এরকম কয়েকটি সাধারণ বিশেষণ হল—সুরম্যাঙ্গ, মহাপুরুষ-লক্ষণান্বিত, রুচির, তেজস্বী, বলবান, বিবিধ-ভাষাজ্ঞ, সত্যবাক্, প্রিয়বাক্, ধর্মতত্ত্বজ্ঞ, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, বিদগ্ধ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, শুচি, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, বদান্য, ধার্মিক, বীর, বিনয়ী, হ্রীমান্, ভক্তবন্ধু, শরণাগত-পালক। নারায়ণাদির অনুরূপ কৃষ্ণের পাঁচগুণ হল—(১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি (অর্থাৎ যুক্তিতর্কে ধরা যায় না এমন মহাশক্তি-সম্পন্ন), (২) কোটি-ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ (অর্থাৎ কোটিব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে বিরাজ করে), (৩) অবতারা-বলীবীজ (অগণিত অবতারের মূল), (৪) হতারিগতিদায়ক (নিহত শত্রুদের উত্তম গতি দান করেন আর যথার্থ ভগবৎ-দ্বেষীদের কর্মফল অনুসারে অধম গতি বিহিত করেন এমন), (৫) আত্মারামগণাকর্ষী (অর্থাৎ জ্ঞানতপস্যায় যে-সমস্ত মুনি আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন তাঁদেরও চিত্ত আকর্ষণ করে ভক্তি পথে নিয়ে আসতে সক্ষম)। একমাত্র কৃষ্ণেই প্রাপ্তব্য বিশেষ চারটি গুণ হল—

১. সর্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ
২. অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
৩. ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ
৪. অসমানোর্ধ্বরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ ॥

অর্থাৎ—যাবতীয় অপূর্ব চমৎকার লীলাতরঙ্গের মহাসমুদ্ররূপ। অতুলনীয় মধুর-রসাত্মক প্রেমের দ্বারা অগণিত প্রিয়দের অর্থাৎ গোপরমণীদের মণ্ডিত ও বিমুগ্ধ করেছেন এমন, ত্রিভুবনের যাবতীয় জীবের মনোহরণ করতে পারে এমন বংশীধ্বনি যিনি করেন এবং যার অধিক সম্ভব নয় এমনকি সমানও নয় এমন অলৌকিক রূপসৌন্দর্যের দ্বারা যিনি চরাচরের বিস্ময় উৎপাদন করেন। সংক্ষেপে বেণুমাধুর্য, রূপমাধুর্য, প্রেম-প্রিয়তা এবং লীলামাহাত্ম্য একমাত্র কৃষ্ণেরই বৈশিষ্ট্য।

এ ছাড়া রসামৃতসিন্ধুতে কৃষ্ণের আরও আটটি সত্ত্বভেদরূপ চারিত্র্যগত স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। তা হল, শোভা, বিলাস, মাধুর্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য, তেজঃ, ললিত ও ঔদার্য। যেহেতু তিনি একাধারে ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত নায়কের চূড়ামণি সেইহেতু ঐ আটটি স্বভাব অনায়াসেই তাঁর অন্তঃকরণে আশ্রয় পেয়েছে। এই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বর্য মাধুর্যাদি বিশিষ্ট গুণ নিয়ে দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, কিন্তু বৃন্দাবনেই পূর্ণতম।

কৃষ্ণের সহায় বলতে ধর্মাদি বিষয়ে গর্গ প্রভৃতি, যুদ্ধ বিষয়ে সাত্যকি প্রভৃতি, মন্ত্রণাবিষয়ে উদ্ধবাদি এবং বৃন্দাবনলীলায় শ্রীদাম সুদাম থেকে আরম্ভ করে ললিতাদি সখীরা পর্যন্ত সমস্ত লীলাপরিকরবৃন্দ। অনুরূপভাবে গৌরলীলায় নবদ্বীপ, নীলাচল ও বৃন্দাবনের লীলাপরিকরগণ।

কৃষ্ণভক্ত বলতে তাঁদেরই বোঝায় যাঁরা কৃষ্ণভাবিত-অন্তঃকরণ। ভক্তদের দুই শ্রেণী—সাধক এবং সিদ্ধ। সিদ্ধেরা আবার সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ ভেদে বিভিন্ন। নিত্যসিদ্ধ তাঁরাই যঁদের গুণ কৃষ্ণেরই মতো নিত্য এবং যাঁরা আনন্দস্বরূপ। যাদবগণ এবং বৃন্দাবনের গোপগোপী নিত্যসিদ্ধ-শ্রেণীভুক্ত। এরা লীলার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণের লীলাসংবরণের সঙ্গে নিত্যধামে চলে যান। আসলে এঁদের জন্ম-মৃত্যু হয় না, আবির্ভাব তিরোভাব ঘটে মাত্র। ভক্ত লীলাপরিকরেরা শান্ত, দাস, সুত, সখা, গুরুবর্গ ও প্রেয়সীবৃন্দ এই পাঁচ প্রকারের। অনুরূপভাবে নিত্যসিদ্ধ গৌরভক্তদের বিষয়ও বুঝতে হবে।

উদ্দীপন বিভাব

কৃষ্ণের বয়স, রূপ, গুণ, প্রসাধনাদি—যা আলম্বন বিভাবকে পূর্ণতা দান করে এবং যা ভক্তহৃদয়ে কৃষ্ণরতি উদ্দীপিত করে রস-পরিণামে নিয়ে যায়। কৃষ্ণের বয়স বলতে কৈশোর বুঝায়। 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্'। কৈশোর বলতে প্রথম কৈশোর, মধ্য কৈশোর, শেষ কৈশোর অর্থাৎ নবযৌবন। রূপ হল ভূষণাদিরও যা শোভার কারণ। নিতান্ত রমণীয়তা অসমোর্ধ্বতা প্রভৃতি হল কৃষ্ণরূপের বৈশিষ্ট্য। গুণের বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রসাধন হল কৃষ্ণের বেশভূষা—পীতবাস, ময়ূরপুচ্ছ, মাল্যগন্ধাদি। কেশবন্ধন, অনুলেপন, মাল্য, চিত্র, তিলক, তাম্বূল ও ক্রীড়াপদ্ম এসবকে এক কথায় 'আকল্প' বলা হয়েছে। কৃষ্ণের মণ্ডন হল কেয়ূর, কুণ্ডল, হার, নূপুর প্রভৃতি। বংশী তিন প্রকার, বেণু (বারো আঙুল দীর্ঘ, ছয়টি ছিদ্রযুক্ত), মুরলী (দু'হাত দীর্ঘ, মুখরন্ধ্র ছাড়া চারটি রন্ধ্রযুক্ত), বংশিকা (নয়ছিদ্রযুক্ত সতেরো আঙুল দীর্ঘ)। রাসলীলাতে কৃষ্ণের চেষ্টাগুলিও উদ্দীপন। এ ছাড়া তুলসী, কৃষ্ণজন্মদিন, দোলোৎসব প্রভৃতি। কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এই সব উদ্দীপন বিভাব লৌকিক অলংকার শাস্ত্রের বহির্ভূত। লৌকিক শাস্ত্রে কৈশোরের মহিমা বর্ণিত হয়নি, আর বংশী-ধ্বনির আশ্চর্য আকর্ষণের কথাও নেই। উল্লিখিত উদ্দীপনগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা হল মুরলীরবের, যেমন—

কৃষ্ণরক্তে ন্দু-নিষ্ঠ্যূতং মুরলীনিনদামৃতম্।
উদ্দীপনানাং সর্বেষাং মধ্যে প্রবরমীর্যতে॥

অনুভাব

অর্থাৎ আলম্বনের চেষ্টা বা কার্য, যার দ্বারা আলম্বনের অন্তবর্তী স্থায়ীভাবের অনুমান হয়। কৃষ্ণপক্ষে ভ্রূবিক্ষেপ, স্মিত, বিহসিত, মত্তগতি, গীত, মুরলীবাদন, চুম্বনাদি—মধুরে, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন চারটি রসে। রাধাপক্ষে সম্ভোগশৃঙ্গার এবং বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারভেদে কটাক্ষ, স্মিত, নতাননতা, দীর্ঘশ্বাস, গ্রীবাবক্রতা, হস্তাবরোধ প্রভৃতি অগণিত। পূর্বরাগান্বিতাবস্থার দশ দশার মধ্যে অনিদ্রা, দেহের কৃশতা, জড়তা, ব্যাকুলতা, জ্বরোত্তাপ,

উন্মত্তচেষ্টা, মূর্ছা প্রভৃতি বিখ্যাত। আশ্রয়ালম্বন-ভক্তপক্ষে গীত, নৃত্য, ভূলুণ্ঠন, হুংকার, দীর্ঘশ্বাস, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, লোকাপেক্ষা-পরিত্যাগ প্রভৃতি। এগুলি অবশ্য শ্রীরাধা-পক্ষেও অনুমেয়। এর মধ্যে লালাস্রাব, অট্টহাস, উদ্‌ঘূর্ণা প্রভৃতি যা লৌকিকে দেখা যায় না তাকে **উদ্‌ভাস্বর** বলা হয়েছে।

সাত্ত্বিক

লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে এগুলি অনুভাব পর্যায়ের হলেও ঠিক অনুভাব নয়। যেহেতু সত্ত্ব বা আত্মার বিজ্ঞান-আনন্দময় প্রকাশই এগুলির বৈশিষ্ট্য। শ্রীরূপ বলেছেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধী অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধানের ফলেও যে সব ভাব চিত্তকে অধিকার করে, তার মূল অবস্থাটিই হল সত্ত্ব। এর থেকে যে সব অনুভাব জন্মে তাদের সাত্ত্বিক বলা যায়। আসল কথা মনে হয়, ভক্তি-রসসিদ্ধান্ত অনুসারে এগুলির সঙ্গে অনুভাবের সম্পর্ক অভেদে ভেদরূপ নয়, একেবারে পৃথক্। ভক্তিরতির বিশেষ অনুভাবগুলিকে দিব্য মনে করা হলেও বলা যায় যে, নৃত্য গীত হাহাকার ভূলুণ্ঠনাদিতে বুদ্ধিপূর্বক প্রবৃত্তি, স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকে অনায়াস প্রবৃত্তি, এই পার্থক্য। শ্রীপাদ জীব এইভাবেই পার্থক্য বিনির্ণয় করেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রের বিশেষ হল, শ্রীরূপ সাত্ত্বিকভাবগুলিকে স্নিগ্ধ, দিগ্ধ এবং রুক্ষ এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং স্নিগ্ধাদির আবার গৌণ এবং মুখ্য এই দুই বিভাগ ধরেছেন। এই তিনভাগে বিভক্ত 'মুখ্য' হচ্ছে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় অর্থাৎ মুখ্যভক্তিরস-সম্বন্ধীয় আর গৌণ হচ্ছে গৌণ-ভক্তিরসযুক্ত। 'দিগ্ধ' হচ্ছে স্পষ্টভাবে মুখ্য-গৌণ রতি ছাড়া অনুগামী কোনও রতির উৎপন্ন সাত্ত্বিক। আর 'রুক্ষ' হচ্ছে রতিশূন্য জনের রত্যাভাসের ফলে উৎপন্ন সাত্ত্বিক।

সাত্ত্বিক ভাব হল আটটি—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (কম্পন), বিবর্ণতা, অশ্রু এবং প্রলয় (মূর্ছা)। হর্ষ, ভীতি, বিস্ময়, বিষাদ এবং ক্রোধ থেকে হয় স্তম্ভের প্রকাশ। স্তম্ভে বাক্যাদি বন্ধ হয়ে যায় এবং অবয়বগুলি নিশ্চল হয়ে পড়ে। হর্ষভয়ক্রোধাদি থেকে উৎপন্ন হয় ঘর্ম। আশ্চর্য-দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয় থেকে রোমাঞ্চ। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ, ভয় থেকে স্বরভঙ্গ। ত্রাস, ক্রোধ, হর্ষ থেকে গাত্রকম্পন। বিষাদ, ক্রোধ, ভয় থেকে দেহের বিবর্ণতা। হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ থেকে বিনা প্রযত্নে নেত্রে অশ্রুর উদ্ভব। সম্যক্ হর্ষ বা বিষাদ থেকে উদ্ভূত হয় জ্ঞানশূন্যতা বা মূর্ছা। 'মূর্ছা' সাত্ত্বিকে ভূপতন, হস্তপদাদির আক্ষেপ প্রভৃতি অনুভাব দেখা যায়।

শ্রীরূপ প্রদত্ত সূক্ষ্ম বিভাগ অনুযায়ী এই সব সাত্ত্বিক ভাবের আবার ক্রমোৎকর্ষ হয়ে থাকে। উৎকর্ষ বলা যায় যদি বহুকালব্যাপী হয়, বহুঅঙ্গব্যাপী হয় এবং স্বরূপতই তীব্রতর তীব্রতম হয়। এই রীতি অনুযায়ী ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত এই হল সাত্ত্বিক-ভাবের ক্রমবৃদ্ধি। অল্প প্রকাশে ধূমায়িত, দুই তিন সাত্ত্বিকের একত্র দর্শনযোগ্য প্রকাশে জ্বলিত , চার পাঁচ সাত্ত্বিকের একত্র প্রকাশে দীপ্ত এবং সমুদয় সাত্ত্বিকের পরিস্ফুট ও দীর্ঘকালব্যাপী প্রকাশে উদ্দীপ্ত হয়ে থাকে। প্রথম জগন্নাথ-দর্শনের পূর্বমুহূর্তে মহাপ্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই দেখে গোপীনাথ আচার্যের সহায়তায় সার্বভৌম নিশ্চয় করেছিলেন—"সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়"।

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী

স্থায়ীভাবের অভিমুখে চালিত হয়ে স্থায়ীকে গতি দান করে, প্রবৃদ্ধ করে এজন্য ব্যভিচারী। লৌকিক অলংকারশাস্ত্রের অনুরূপ ভক্তিশাস্ত্রেও তেত্রিশটি ব্যভিচারীর উল্লেখ করা হয়েছে। স্থায়ীভাবের সঙ্গে সংগতি অনুসারে ব্যভিচারীরও বিভাগ আছে। যেমন লজ্জা, হাস, নির্বেদ বিষাদ, শঙ্কা, ত্রাস, আলস্য, ব্রীড়া, হর্ষ প্রভৃতি মধুররসে ব্যভিচারী। নিদ্রা, আলস্য, অবহিত্থা প্রভৃতি হাস্যরসে; নির্বেদ, মোহ, অপস্মার, ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ, জড়তা প্রভৃতি করুণের ব্যভিচারী। এরকম এক একটি মুখ্য এবং গৌণ রসের পুষ্টিকারক বিভিন্ন ব্যভিচারী রয়েছে।

আলংকারিকেরা ব্যভিচারীর সন্ধি, শাবল্য, শান্তি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। দুই ভাবের মিলন-মিশ্রণে সন্ধি, বিরুদ্ধ ব্যভিচারীর সংমর্দে শাবল্য, প্রবল কোনো ভাবের বিনাশে ভাবশান্তি ঘটে। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি ভাবের বিবিধ ভক্তের বিশিষ্টতার জন্য তাঁদের চিত্তবৃত্তিও ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং চিত্ত অনুসারে ভাবগুলির উদয়, বিলয়, সন্ধি, শাবল্য ভিন্ন ভিন্ন রীতির হয়ে থাকে। নিম্নে (চৈতন্যভাগবত ও চরিতামৃত থেকে) এই সব সূক্ষ্ম ভক্তিরসদর্শন যে-প্রত্যক্ষের প্রেরণায় ঘটেছিল অনুভাব-সহ মহাপ্রভুর সেই আশ্চর্য ভাবচিত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উৎকীর্ণ হল :

যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে॥
সে ক্রন্দন দেখি হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর পাছে॥
যখন হাসয়ে প্রভু মহা অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস॥
দাস্যভাবে প্রভু নিজ মহিমা না জানে।
সেব্য সেবক প্রভু হৈলা আপনে॥
জিনিলুঁ জিনিলুঁ বোলে উঠে ঘনে ঘনে।
হাসিয়া বিকল প্রভু হএ সেইক্ষণে॥
ক্ষণে ক্ষণে আপনে গায়েন উচ্চধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গে হয় ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহো নহে অনুচর॥
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল॥
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হঞা করে অঙ্গনে ভ্রমণ॥
যখনে বা হএ প্রভু আনন্দে মূর্ছিত।
কর্ণমূলে হরি বোলে সভে অতি ভীত॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গে হএ মহাকম্প।
মহাশীতে বাজে যেন বালকের দন্ত॥

ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হএ কলেবরে।
মূর্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥
কখনো বা হএ অঙ্গ জ্বলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল॥
ক্ষণে ক্ষণে অদভূত বহে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হএ একপাশ॥ ... —চৈতন্যভাগবত।

গরুড়ের সন্নিধানে রহি করে দরশনে
সে আনন্দের কি কহিব বোলে।
গরুড়স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্নখালে
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥
তাঁহা হইতে ঘরে আসি মাটির উপরে বসি
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হা হা কাঁহা বৃন্দাবন কাঁহা গোপেন্দ্র নন্দন
কাঁহা সেই বংশীবদন॥ **
উঠিল নানা ভাববেগ মনে হৈল উদ্বেগ
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানল ধৈর্য হৈল টলমল
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥**
নানা ভাবের প্রাবল্য হৈল সন্ধি শাবল্য
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ॥
মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ তনু মন অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥**
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্ছিত॥ ... —চৈতন্যচরিতামৃত

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজবদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদগদ্‌বাচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি॥
—শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষঃ

শ্রীচৈতন্যের নীলাচললীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস সেই লীলার একাংশ স্মরণ করে বলছেন : একদিন কাশীমিশ্রের আবাসে কৃষ্ণবিরহে শ্রীচৈতন্য এমনই কাতর হয়েছিলেন যে ভাবের আধিক্যে তাঁর দেহে অদ্ভুত বিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্ধিগুলি শিথিল হয়ে গিয়েছিল, হাত পা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়েছিল। এমন অবস্থায় তিনি নিতান্ত বিকল হয়ে স্বরভঙ্গজনিত গদ্গদস্বরে আক্ষেপ ও রোদন করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন। সেই দৃশ্যটি আমার মনে হওয়ায় আজ আমার চিত্ত বিভ্রান্ত হচ্ছে। অপিচ—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে
চটক পর্বত দেখিলেন আচম্বিতে॥
গোবর্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হৈলা।
পর্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা॥
"হন্তায়মদ্রিরবলাঃ"—
এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে॥
ফুকার পড়িল মহাকোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শংকর॥
পুরী ভারতী গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবান্ আচার্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শক্তি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গাযমুনাধার॥
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা॥

—চৈতন্যচরিতামৃত।

মধুররসবৈচিত্রী

স্থায়ীভাব-প্রসঙ্গ : মনের অনুকূল বিষয় যদি শৃঙ্গার হয় তাহলে সেই বিষয়ে সুদৃঢ় মানসিক প্রবণতাই হবে শৃঙ্গার বা মধুরা রতি বা মধুর স্থায়ীভাব। মধুররতির চিত্তকে ব্যাপ্ত করার মূল কারণ হিসাবে শ্রীরূপ সাতটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন।

অভিযোগ—অর্থাৎ অভিপ্রেত নায়কপক্ষে নায়িকার এবং নায়িকাপক্ষে নায়কের ভাবপ্রকাশ থেকে ভাবোদ্‌গম। এ নিজে প্রত্যক্ষ করলেও হতে পারে, অন্যে প্রত্যক্ষ করে বিবরণ দিলেও হতে পারে। অভিযোগ, যেমন—

বাহু তুলিলে কেশ বন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলে বদনকমলে॥
আঙ্গভঙ্গ কৈলে কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
এবে আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে॥
কিসকে ঘুচাইলে রাধা নেতের আঞ্চল।
দেখায়িলেঁ কুচভার করায়িলেঁ বিকল॥
যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে।
তরল করিলেঁ কেহ্নে নয়নযুগলে॥
আধ মুখ ঢাকিলে সরুঅ বসনে।
তে কারণে রাধা ধরিতে নারোঁ মনে॥ —চণ্ডীদাস।

এখানে প্রত্যক্ষভাবে রাধার ভাবদর্শনে কৃষ্ণের ভাবোৎপত্তি। পরোক্ষে, যথা সখীমুখে কৃষ্ণভাবাবেশ সংবাদ—

ধনি ধনি রমণি-জনম ধনি তোর।
সব জান কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥**
কেশ পসারি যব তুহুঁ আছলি
উর পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥ ... —বিদ্যাপতি।

বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়লভ্য বিষয়ের যোগে, যথা—

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।**
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষয়ামৃতে একত্রে করিয়া।

অথবা, 'কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম' প্রভৃতিতে শব্দ রতির কারণ। আবার--

থির বিজুরি বরণ গোরি
পেখিনু ঘাটের কূলে।
ভল কএ পেখ ন ভেল।

অথবা,

মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু
হৃদয় শেল দই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।

প্রভৃতিতে রূপ কারণ। এরকম অন্যান্য বিষয়।

সম্বন্ধ—বহু রূপগুণের একাধারে সমন্বয়। যেমন,

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক ন তেজই অঙ্গ।**
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম। প্রভৃতি।

অভিমান—মানসিক নিশ্চয়তা, যেমন—

তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়॥ প্রভৃতি।

তদীয়বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণে পদাঙ্ক, গোষ্ঠ, গোবর্ধন, যমুনা, প্রিয়জন প্রভৃতি। উপমা—শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য-অনুভবে, যেমন কৃষ্ণলীলার অনুকর্তা নটের ভাব ও কার্যাদি দর্শন, মেঘ তমাল প্রভৃতি দর্শন। যেমন--

নবনীল মেঘ হেরি আকাশের গায়।
শূন্যে বাহু মেলি গোপী আলিঙ্গিতে চায়॥

স্বভাব—উপরে কথিত বাহ্যহেতু নয়, আপনা থেকে ভাবের উদ্ভবহেতু। বলা যেতে পারে, স্বতঃসিদ্ধ, প্রায়-অকারণ কৃষ্ণানুরাগ। অথবা কৃষ্ণের গোপীর প্রতি স্বাভাবিক রতি। এই স্বভাব-কারণতা একমাত্র কৃষ্ণপ্রেয়সী, বিশেষতঃ গোপীদের এবং মুখ্যতঃ শ্রীরাধার মধ্যেই লভ্য। এই দিক থেকে স্বভাব-কারণের দুই বিভাগ : (১) নিসর্গ, (২) স্বরূপ। নিসর্গ হচ্ছে সুদৃঢ় বাসনা বা সংস্কার। তা কখনও ভাবোদ্‌গমের কারণ হতে পারে। যেমন,

শুন লো মরম সই,
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই।

প্রভৃতি চণ্ডীদাসের পদ। 'স্বরূপ'-কারণ নিসর্গের থেকেও আর এক ধাপ উপরের। এর মধ্যে কৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপ সজ্জনমাত্রকেই আবিষ্ট করতে পারে। ললনানিষ্ঠ স্বরূপ একমাত্র

ব্রজগোপী, বিশেষে শ্রীরাধাতেই লভ্য। শ্রীরূপ বলছেন—'রতিঃ স্বভাবজৈব স্যাৎ প্রায়ো গোকুলসুভ্রুবাম্'। এই স্বাভাবিক কৃষ্ণরতির প্রকাশ যথা শ্রীগৌরাঙ্গে :

প্রভু বোলে 'ভাই সব, কহিলা সুসত্য।
আমার এসব কথা অন্যত্র অকথ্য॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ তাই, ভাই, বোলোঁ সর্বথায়॥
যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম॥

অথবা, শ্রীচৈতন্য-দর্শন মাত্রেই নিত্যানন্দের দৃঢ় সংস্কার বশতঃ ভাবাবেশ, যেমন—

নিত্যানন্দ-সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর-রূপ চায়॥
রসনায় লেহে যেন, দরশনে পান॥
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥ ...

—চৈতন্যভাগবত।

এ দৃষ্টান্ত দুটি যথাক্রমে ললনানিষ্ঠ এবং উভয়নিষ্ঠ স্বরূপের। প্রথমটি কেবল নায়িকার মধ্যে, কৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণ ব্যতিরেকে আপনা থেকেই কৃষ্ণস্ফুরণ। শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপী দুয়েরই স্বরূপ একত্র অভিব্যক্ত হলে উভয়নিষ্ঠ স্বরূপ হয়।

কৃষ্ণরতির প্রথম তিন বিভাগ : সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা

সাধারণী—যেখানে স্বসুখবাসনাময় সম্ভোগেচ্ছাই রতির হেতু, সেখানে সাধারণী। যেমন কুব্জাদি নাগরিকার। ভাগবতে বর্ণিতা কুব্জা বলছেন—'হে কৃষ্ণ! এসেছ যখন, কিছুদিন আমার সঙ্গে বাস করে আমাকে আনন্দ দাও। আমি যে তোমাকে ছাড়া থাকতে পারছি না।' ভোগবাসনা-যুক্ত বলে কুব্জাদি নায়িকার এই রকম রতি নিবিড় নয়। ভোগেচ্ছা তিরোহিত হলে রতিও তিরোধান করে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে এরকম রতিকে কৃষ্ণরতি পর্যায়ে ফেলা হল কেন? তার উত্তর এই যে, কিছু না থাকার চেয়ে স্বল্প হলেও কিছু থাকা ভালো এই অর্থে। কোনো সংসারী ব্যক্তি স্বল্পদিন কৃষ্ণসেবা করে যদি সংসারে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তার সেই স্বল্প সুকৃতিও কি মূল্যহীন হবে? এরকম সাময়িক কামগন্ধময় রতিও দুর্লভ বলে শ্রীরূপ একে 'মণি' বলেছেন, যদিও পরবর্তী উন্নততর উন্নততম শ্রেণীর রতিকে চিন্তামণি এবং কৌস্তভ মণির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কুব্জার মধ্যে রাগাঙ্কিত ভক্তিরতির (হোক তা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিজাত) আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই কৃষ্ণ এবিষয়ে সানন্দ সম্মতি দিয়েছিলেন। শ্রীরূপ সাধারণী রতিকে 'ধূমায়িত' বলেছেন, যেহেতু এতে সাত্ত্বিক ভাব একেবারে প্রকাশিত হয় না। আর এই রতির সীমা প্রেমের প্রারম্ভ স্তর পর্যন্তই, এই নির্দেশ দিয়েছেন।

সমঞ্জসা—এ রতি সাধারণীর ঊর্ধ্বস্তরের। কারণ, 'সাধারণী'তে সম্ভোগেচ্ছা সব

সময়েই পৃথক থাকে, আর সমঞ্জসায় কখনো কখনো মাত্র পৃথক থাকে। এ রতি পত্নীভাবের, কৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণ থেকে যাঁরা তাঁকে পতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন তাঁদের। অর্থাৎ দ্বারকার রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীদের এবং বৃন্দাবনের সেইসব গোপীর, যাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন 'কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥' বিবাহগত পত্নীত্বে লোকাপেক্ষা ধর্মাপেক্ষা থাকে। আর স্বসুখবাসনাও কদাচিৎ পৃথকভাবে থাকে, তাই এ রতি মধ্যবর্তী স্তরের। সাধারণী অনিবিড়, সমর্থা অতিনিবিড় আর এ হল নিবিড়। সমঞ্জসা রতির শ্রেয়স্করতার জন্য রুক্মিণীর চিঠি পাবামাত্র কৃষ্ণ দ্বারকা থেকে বিদর্ভ ছুটেছিলেন রুক্মিণীকে অপহরণ করার জন্য। কিন্তু আবার এও ঠিক যে, যৌনসম্ভোগের বাসনা নিয়ে ষোড়শ সহস্র মহিষী যখন তাদের ভাব, হাব, হেলা, কিলকিঞ্চিত প্রভৃতির দ্বারা কৃষ্ণকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন তখন কৃষ্ণ তাদের কাছে ধরা দেননি। শুদ্ধরতিসম্পন্ন গোপিকাদের কাছেই তিনি সর্বথা আত্মবিক্রয় করেছিলেন। সমঞ্জসা রতিতে দুটি একটি সাত্ত্বিক থাকে বলে জ্বলিত বা দীপ্ত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্দীপ্ত এবং সু-উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের অর্থাৎ সাত্ত্বিকের পূর্ণতর এবং পূর্ণতম প্রকাশের পরিচয় একমাত্র সমর্থাতেই প্রাপ্তব্য।

সমর্থা—কৃষ্ণের প্রার্থনীয়তম যে রতিতে সম্ভোগেচ্ছা বিন্দুমাত্র পৃথক থাকে না, রতির সঙ্গে একাত্ম বা বিলীন হয়ে যায় তাই হল সমর্থা। এতে স্ব-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিলালসা থাকে না। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই এর সর্বস্ব। এ রতির হেতু পূর্বোল্লিখিত স্বরূপনিষ্ঠতা। এ নৈসর্গিক, স্বতঃসিদ্ধ। একমাত্র ব্রজগোপীর মধ্যেই এর স্থিতি। শ্রীরূপ আরও বলছেন যে, এ রতি 'সর্ববিস্মারিগন্ধা', অর্থাৎ এতে ইহকাল, পরকাল, কুলধর্ম, লোকলজ্জা এমনকি দুস্ত্যজ আর্যপথ অর্থাৎ স্বামীধর্মও ভুলিয়ে দেয়। আর পরিণামে মহাভাব-অবস্থায় পৌঁছে দেয়। এ রতি নৈসর্গিক হলেও রূপাদি দর্শন থেকে এর 'আবির্ভাব' ঘটতে পারে (উদ্ভব নয়)। এ সান্দ্রতম বলে বহিরঙ্গ কোনোভাবেই একে প্রতিহত করতে পারে না। এ 'সর্বাদ্ভুতবিলাসোর্মিচমৎকারশ্রী'। এই গোপীভাবকে লক্ষ্য করেই কৃষ্ণ বলেছিলেন—এঁদের প্রেমের ঋণ আমি জন্মে জন্মেও শোধ করতে পারব না। এঁরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করে আমাকে ভজনা করেছেন। পরকীয়াত্বেই সমর্থা রতির প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণপ্রেমের জন্য ত্যাগ ও দুঃখ-সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত মহিমা একমাত্র পরকীয়া রতিতেই প্রাপ্তব্য।

সমর্থা রতির বিকাশ ও পরিণাম

কৃষ্ণরতির ক্রমোৎকর্ষ হল—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব। মহাভাবই এর চরমাবস্থা, এরপর আর কল্পনা করা যায় না। চরিতামৃত উজ্জ্বলনীলমণির অনুসরণে বলছেন :

প্রেম ক্রমে বাড়ে, হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
বীজ ইক্ষুরস গুড় তবে খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥

ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল, ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিতে তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥

রতির এই উৎকর্ষময় অবস্থাগুলি অবশ্য সাধারণভাবে 'প্রেম' নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। আর অগণিত গোপীদের মধ্যে স্বভাবের দিক দিয়ে একে অন্য থেকে অল্পবিস্তর,' বিস্তর বিভিন্ন বলে প্রেমের বৈচিত্রী আরও অগণিত হয়ে পড়ে। ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসবৈচিত্র্য অনুভব বাস্তব হয়ে ওঠে। এগুলি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হলেও গোপিকাদের, বিশেষতঃ শ্রীরাধার ক্ষেত্রে এগুলির আবির্ভাবে অগ্রপশ্চাৎ নির্ণয় করা কঠিন। স্নেহের থেকে একেবারে রাগ-অনুরাগের অবস্থা, পরে প্রণয়-মানের, এমনটি শ্রীমতীর ক্ষেত্রে কখনও দেখা যায়।

১. প্রেম—সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ॥

বিনষ্ট হবার বাহ্য অন্তরঙ্গ বহু কারণ থাকলেও যুবক-যুবতীর যে ভাববন্ধন কোনোমতেই বিনষ্ট হয় না, তাকেই প্রেম বলে। বাহ্য কারণ বলতে গুরুজনের তাড়ন-ভর্ৎসন, নিসর্গের বিরোধিতা, অন্য কার্যে নায়কের বিদেশ গমন ও সুদীর্ঘ প্রবাস এবং অন্তরঙ্গ কারণ বলতে ঈর্ষা, সংশয় প্রভৃতি। যেমন, চণ্ডীদাস-বর্ণনে :

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আম্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লঞাঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥**
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পোআল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলো।
গুপতে রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোর কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগি
মোক নেহ কাহ্নাঞির পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

অথবা গোবিন্দদাসের—

মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির-দুরন্ত পথ হেরই ন পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।

আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ পঙ্কজ পঙ্কহি বুড়ল
তাহে শত কণ্টক শেল।
তুয়া দরসন-আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল॥

গাঢ়ত্বের তারতম্য অনুসারে প্রেমের তিন বিভাগ—মন্দ, মধ্য ও প্রৌঢ়; অর্থাৎ গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম। মন্দ প্রেমে নায়কের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন মিলনের ফলে নায়িকার প্রতি কিছুটা অনাদর-ঔদাসীন্য ঘটতে পারে। আর নায়িকা-পক্ষে নায়কের সেবাসুখ সম্পাদনে কদাচিৎ বিস্মৃতি ঘটতে পারে। মধ্যপ্রেমে নায়ক অন্যান্য কান্তার ও প্রেয়সীর মধ্যে সমভাব পোষণ করতে পারেন। আর নায়িকাপক্ষে নায়িকা বিরহদুঃখ কোনো প্রকারে সহ্য করতে পারেন। নায়কের প্রৌঢ় প্রেমে নায়িকার মনোভাব, তাঁর দুঃখকষ্ট সর্বদা নায়কের বিচার-বিবেচনার মধ্যে থাকে। নায়িকার প্রৌঢ় প্রেমের লক্ষণ হল নিতান্ত বিচ্ছেদ-অসহিষ্ণুতা। সন্দেহ নেই গোপীশ্রেষ্ঠা রাধিকা এই প্রৌঢ় প্রেমেরই সর্বোচ্চ অবস্থার অধিকারিণী। অন্যান্য গোপীর সঙ্গে তুলনায় রাধাপ্রেমের উৎকর্ষের এই দিক্‌টি গোবিন্দদাস কবিরাজ নিম্নলিখিত পদে সুচারুরূপে বুঝিয়েছেন :

আধক-আধ- আধ দিঠি-অঞ্চল
যব ধরি পেখলুঁ কান। (পূর্বে উল্লিখিত)

তাছাড়া এই পদটিতে শ্রীরাধার যে বিশেষ প্রেমের বিকাশ ফুটেছে তার নাম হ'ল স্নেহ। এর লক্ষণ :

২. **স্নেহ** : আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে।
অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু॥

প্রেম প্রবর্ধিত হয়ে যদি চিত্তের সম্যক্ প্রকাশ হয়ে ওঠে, আর হৃদয়কে দ্রবীভূত করে তাহলে স্নেহ আখ্যা লাভ করে। স্নেহের অবস্থায় কেবল শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবোধেই পরিতৃপ্তিবোধ ঘটে না। এতে যে চিত্তদ্রব ঘটে তার আবার উত্তম মধ্যম ভেদ করা যায়। যে চিত্তদ্রব অঙ্গস্পর্শে উদ্ভূত তা কনিষ্ঠ, দর্শনে উদ্ভূত হলে তা মধ্যম এবং কেবল শ্রবণ-স্মরণ-জাত হলে তা উত্তম হবে। যেমন—

কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥ ইত্যাদি

অথবা, গোবিন্দদাসের—

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি আগি জলু অন্তর
জীবন রহুঁ কিয়ে যাব।

তোহে কি কহব ভঙ্গী।
প্রেম-অগেয়ান- দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহত পতঙ্গী॥
কহত সম্বাদ কহই নাহি পারই
কাহে বিশোয়াসব বালা।
অনুখন ধরণী শয়নে কত মেটব
সুতনু অতনুশর-জ্বালা॥
কালিন্দীকূল কদম্বক কানন
নামে নয়নে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
কৈছে জীয়বি বরনারী॥

কেবল ইন্দ্রিয়-অনুভবে অতৃপ্তি, যথা—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

অথবা, ছোট বিদ্যাপতির দৃষ্টান্ত :

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥**
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ
তভো হিয় জুড়ন ন গেল॥

এই দিব্য অতৃপ্তির বিষয় 'চরিতামৃতে' :

এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভালে না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুই॥

স্নেহের দুই প্রকারভেদ নির্ণয় করেছেন শ্রীরূপ—ঘৃতবৎস্নেহ ও মধুবৎস্নেহ। এ-দুই স্নেহের নিজস্ব পার্থক্য নয়, আধারগত বৈচিত্র্য মাত্র। স্নেহের স্বভাব হল চিত্তের দ্রবতা। এই দ্রবতা মাদকতাহীন এবং উষ্ণতাহীন হলে **ঘৃতস্নেহ** আর স্বাভাবিক মাদকতা ও উষ্ণতাময় হলে **মধুস্নেহ**। ঘৃতস্নেহে দাক্ষিণ্যের ভাগ বেশি, ক্বচিৎ কৌটিল্য। আর মধুস্নেহে বক্রতা অর্থাৎ কৌটিল্যের ভাবই অধিক। তা ছাড়া বলা হয়েছে যে, মধু স্বতই স্বাদযুক্ত আর ঘৃত স্বতই স্বাদহীন। ঘৃতের স্বাদত্বের জন্য অন্যবস্তু-সংযোগ এবং পাক প্রয়োজন। ভাবান্তরের যোগেই

ঘৃতস্নেহ স্বাদযুক্ত হয়ে ওঠে। মধুস্নেহে এই ভাবান্তর যোগের প্রয়োজন নেই। দৃষ্টান্তে শ্রীরূপ ঘৃতস্নেহরূপে চন্দ্রাবলীর প্রেম এবং মধুস্নেহরূপে শ্রীরাধার প্রেম উপস্থাপিত করেছেন। চন্দ্রাবলীর প্রেম স্বভাবতই স্নিগ্ধ, শান্ত, আত্মসমর্পণময়। রাধিকার প্রেম স্বভাবত তীব্র, মাদকতা এবং উষ্ণতাযুক্ত, সুতরাং স্বাদু এবং অসাধারণ বৈচিত্র্যময়। পার্থক্য বোঝাতে বলা হয়েছে প্রথমটি "তদীয়তাময়" অর্থাৎ "আমি তোমার" এই ভাবসম্পন্ন, দ্বিতীয়টি "মদীয়তাময়" অর্থাৎ "তুমি আমার" এই ভাবযুক্ত। দ্বিতীয়টিরই স্বাদাধিক্য এবং উৎকর্ষ। প্রথমটি সংকোচ এবং ভীতিতে কিছুটা জড়তাপন্ন, দ্বিতীয়টিতে প্রবল জোরের অধিকার আছে, আছে বিশেষ আত্মীয়তার আকর্ষণ। যদিচ মধুস্নেহেই কৃষ্ণ পরম বশীভূত, তবু বৈচিত্র্যের জন্য ঘৃতস্নেহও তাঁর কাম্য হয়ে থাকে।

৩. মান—স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাব্যাপ্তা মাধুর্যং মানয়ন্ নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে॥

স্নেহের অবস্থা যদি গাঢ়তা পায়, তাহলে তাতে আরও নূতন বৈচিত্র্য যুক্ত হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় নায়ক-নায়িকা প্রতিকূলতা বা বক্রতা পোষণ করে মিলনে প্রেমকে আকর্ষক ও উপচিত করেন। এই অবস্থাকে বলা হয় মান। মান বিশেষতঃ নায়িকাতেই বর্ণিত হয়। এ মান হচ্ছে প্রেমের সাধারণ উচ্চ অবস্থা। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে এরই বিশেষ দিকের প্রকাশ। মানাবস্থার প্রেমে নায়িকা প্রেমের গর্বে ভ্রূকুটি, ক্রোধ, তিরস্কার প্রকাশ করেন।

স্নেহের দুই বিভাগ অনুযায়ী তদাশ্রিত মানেরও দুই বিভাগ কল্পিত হয়। ঘৃতস্নেহে উদাত্ত মান এবং মধুস্নেহে ললিত মান। উদাত্ত মান দুই শ্রেণীর—দাক্ষিণ্যোদাত্ত এবং বাম্যগন্ধোদাত্ত। অভ্যন্তরে বাম্য, কিন্তু প্রকাশে দাক্ষিণ্য থাকলে হবে দাক্ষিণোদাত্ত মান। আসলে প্রতিকূল ভাব নেই, কিন্তু প্রকাশে বাম্য বক্রতা থাকলে বাম্যগন্ধোদাত্ত মান। ললিত মানে রাধাকৃষ্ণ-কেলিবিলাস বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়। ললিত মানের মূল হল শ্রীরাধার স্বাধীন-ভর্তৃকার মনোভাব। এই মনোভাবের বশে মধুস্নেহ কৌটিল্য এবং বক্রনর্মবিলাসের উদ্ভব ঘটালে ললিতমানাবস্থা হয়। শ্রীরাধার প্রচ্ছন্ন কোপ, আক্ষেপ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের বংশীখণ্ডে সুন্দর স্ফূর্তিলাভ করেছে। নিচে উদ্ধৃত পদে নর্মললিত মান চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে :

কিসের লাগিয়া রাই হইলা মানিনী।
ভাগ্যে মিলয়ে হেন মধুর যামিনী॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন রসময় কান্ত।
তোহে বিমুখ বিধি বুঝল নিতান্ত॥
অকারণ মানে খোয়লি নিজ দেহ।
ঐছে কুমতি দরশায়লি কেহ॥
ঐছন সহচরী শুনইতে বাদ।
সুবদনী হাসি ধুনায়ত মাথ॥
কো মানিনী? কাহে সাধসি এহ?
কিয়ে পরলাপসি না বুঝিয়ে থেহ।
নাগর কহ, সখি, কি কহসি বাণী।

কাহে তুঁহু এহ মানিনী অনুমানি?
শুনি সহচরী সব হাসি উতরোল।
সো সখী অবনত কছু নহি বোল।
বিলসই দুহুঁ তব বিবিধ বিলাস।
দূরহি নেহারই বল্লভদাস॥

৪. প্রণয়—প্রেমগর্বময় মানের ঘনীভূত নিতান্ত বিশ্বস্ততা-যুক্ত অবস্থার নামই প্রণয়। এই অবস্থায় প্রিয় একান্তভাবে আমারই এই স্বাধিকার-বোধ আসে, নায়িকা স্বাধীনভর্তৃকার মত প্রিয়ের সঙ্গে আচরণ করেন। কখনও নায়ক নায়িকাব প্রসাধন নির্বাহ করেন, কখনো নায়িকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নায়ককে আলিঙ্গনাদিদানে সুখী করেন। এই অবস্থায় নায়িকা লজ্জা-সংকোচ প্রভৃতি অনাবশ্যক এবং কেলিবিষয়ে শত্রু মনে করে পরিত্যাগ করেন। জয়দেব-বর্ণিত রাসের পদের নিম্নলিখিত অংশে গোপীদের এই অসংকোচ এবং একান্তবিশ্বাসময় কৃষ্ণপ্রীতি ফুটে উঠেছে :

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্॥
কাপি বিলাস-বিলোল-বিলোচন-খেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্।
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে॥
কেলি-কলা-কুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাবনকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে॥

কোনো গোপিকা কৃষ্ণের গণ্ডদেশে গণ্ড ন্যস্ত ক'রে কানে কানে রহস্যকথা শোনাবার ছলে চুম্বন করছেন অথবা উদ্যানশোভাবিমুগ্ধ কৃষ্ণকে লীলাস্থলে ফিরিয়া আনার জন্য বস্ত্র ধরে আকর্ষণ করছেন—এ প্রেমের অত্যন্ত বিশ্রব্ধ অবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়। নিম্নলিখিত বর্ণনেও প্রৌঢ় প্রণয়ের পরিচয় গ্রথিত হয়েছে :

হের দেখসিয়া যা।
নিন্দ যায় ধনী চাঁদ-বদনী
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু করিয়া শিখান
বিথান বসন-ভূষা।
নিশাসে দুলিছে রতন-বেশর
হাসিখানি তাহে মিশা।... জগন্নাথ দাস।

প্রকারান্তরে শ্রীমতী কৃষ্ণকে দিয়ে নিজের প্রসাধন করিয়ে নিয়ে অপূর্ব সুখানুভব করছেন :

আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জান।
বেশ বনাঅত নাগর কান॥
সিন্দুর দেঅল সীঁথি শিঙারি।
ভালহি মৃগমদ পত্রকি সারি॥

চিকুরে বনাঅল বেণী ললিত।
কুঙ্কুম কুচযুগে করল রঞ্জিত॥
যাবক লেখক রাতুল চরণে।
জীবন নিছাই লেঅল তছু শরণে।... —নরোত্তম দাস।

এ হ'ল প্রকারান্তরে শ্রীমতীর স্বাধীনভর্তৃকাভাব-বিলাস। শ্রীপাদ রূপ ভাগবত থেকে রাধিকার প্রণয়মহিমাসূচক নিম্নলিখিত দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করেছেন—

তেতো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥

'তারপর অরণ্যে প্রবেশ করে শ্রীমতী কৃষ্ণকে বললেন—আমি আর চলতে পারছি না, তোমার যেখানে খুশী আমাকে বহন করে নিয়ে চল।' উজ্জ্বলনীলমণিতে এই প্রণয়ের দুই বিভাগ করা হয়েছে—মৈত্র এবং সখ্য। আবার সুমৈত্র, সুসখ্যও হতে পারে। যেখানে বিশ্রম্ভের সঙ্গে বিনয় থাকে, যেখানে একটু সংকোচ থাকে সেখানে মৈত্র, আর যেখানে মুক্তসংকোচ স্বাধীন আচরণ থাকে সেখানে সখ্য। যেমন বলা যায়, বহুদিন পরে কৃষ্ণের দেখা পেলে গোপী সাগ্রহে তাঁর কর গ্রহণ করলেন। কিন্তু শ্রীমতী স্ববক্ষপীড়নের দ্বারা তাঁকে নির্দয়ভাবে আলিঙ্গন করলেন।

৫. রাগ—দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে।

প্রণয়ের উৎকর্ষ ঘটলে যদি এমন অবস্থা আসে যে প্রবল দুঃখও (বিরহ, লোকগঞ্জনা, পথের ক্লেশ প্রভৃতি জনিত) চিত্তে সুখ ব'লে প্রতিভাত হয় তাহ'লে সেই প্রেমের অবস্থার নাম 'রাগ' বলা যায়। এই অলৌকিক বৈষ্ণব রাগসম্পর্কেই চরিতামৃতকার বলেছেন :

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুতচরিত।

এ যেন রবীন্দ্র-কথিত 'ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে' অথবা 'এই করেছ ভালো, নিঠুর, এই করেছ ভালো। এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো' প্রভৃতি। লৌকিক অনুভব, তবু ভাবের দিক্ থেকে সাদৃশ্য আছে। দুঃখ প্রবলতম হ'লে তাতে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, ভূমানন্দের আবির্ভাব ঘটে। চৈতন্য-পরবর্তী দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে রয়েছে—

নিশি দিশি অনুখন প্রাণ করে উচাটন
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু।

অথবা, কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধুর লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

প্রভৃতির মধ্যে দুঃখে সুখানুভবরূপ রাগধর্ম ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই রাগের দুই প্রধান ভেদ

এবং তার মধ্যেকার অবান্তর ভেদও উজ্জ্বলনীলমণিতে করা হয়েছে। রঞ্জকত্ব ধর্মের দিক্ মনে রেখে শ্রীরূপ মুখ্য বিভাগের নামকরণ করেছেন নীলিমা এবং রক্তিমা। নীলিমার দুই প্রকার, নীলীরাগ এবং শ্যামারাগ। রক্তিমার দুই প্রকার, কুসুম্ভরাগ এবং মঞ্জিষ্ঠারাগ।

কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলীর প্রেম নীলীরাগের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রেম ব্যয়িত হয় না অথচ বাইরে এর প্রকাশও তেমন দেখা যায় না অর্থাৎ এতে ঈর্ষামানাদির বিকার তেমন লক্ষ্যগোচর হয় না। নায়িকা যেমন ধীর, শান্ত, বিপ্রলব্ধ হয়েও অচঞ্চল, তার প্রেমও তেমনি। ফলতঃ চন্দ্রাবলীর চিত্তে তীব্র দুঃখজ্বালাবোধ নেই, স্বয়ং অভিসারেও তাঁর তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসরমত বাসিয়ো'—এরকম ভাব। এতে ভীরুতারও অবকাশ থাকে। কী জানি কী হয়, না জানি প্রিয় কী মনে করেন, কাজ নেই বেশি মান ক'রে—এই ধারণা বর্তমান থাকে।

শ্যামারাগে কৃত্রিম ভীরুতা অর্থাৎ ভীরুতার ছল থাকে মাত্র, এ দীর্ঘকাল ধ'রে সাধ্য এবং নীলীরাগ থেকে কিছু প্রকাশশীলও হয়ে থাকে। 'দীর্ঘকাল ধ'রে সাধ্য' বলায় পরবর্তী রক্তরাগ থেকে এর পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

রক্তরাগের কুসুম্ভ শ্রেণীতে রাগ দ্রুতগতিতে চিত্তে সংসক্ত হয়। অন্য রাগের অর্থাৎ নীলী, শ্যামা এবং পরবর্তী মঞ্জিষ্ঠার ছবি নানাভাবে ব্যঞ্জনা ক'রে এবং এইভাবে বহিরঙ্গ বৈচিত্র্য নিয়ে যা শোভমান হয় তা-ই হ'ল কুসুম্ভরাগ। কুসুম্ভ-রাগ রঙ্ হিসাবে খুব স্থায়ী নয়। কুসুম্ভ = 'কুসুম' ফুল। কিন্তু আধার-বিশেষে এ স্থায়ী হতেও পারে। এই রাগ সাধারণভাবে শ্রীরাধার প্রিয়সখীদের মধ্যে দেখা যায়।

শ্রীরাধার রাগ হ'ল মঞ্জিষ্ঠা-রাগ-শ্রেণীর। এর মধ্যে যেমন দ্রুত সংসক্তিগুণ আছে তেমনি আছে সুদৃঢ়তা, অন্য কোনো ভাব বা বস্তুর (যেমন দূতী প্রভৃতির বা কোনো সাধন-সুকৃতির) প্রতি নিরপেক্ষতা এবং মুহূর্তে মুহূর্তে বর্ধনশীল উজ্জ্বলতা। মঞ্জিষ্ঠার রং পাকা স্থায়ী, আবার মঞ্জিষ্ঠা রাগের দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রকে ধৌত করলে তার বর্ণগৌরব বৃদ্ধিই পায়। রাধা-বিরহাদির দ্বারা এ রাগের উৎকর্ষই ঘটে।

এমন-পরিতি কভু না দেখি না শুনি
পরানে পরানে বান্ধা আপনা আপনি॥

প্রভৃতিতে অথবা নিম্নলিখিতরূপ বহুপদে অন্য কোনো সাধন-সুকৃতির প্রতি অপেক্ষা না ক'রেই কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব পরিস্ফুট করা হয়েছে :

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালা মুখখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরান হরিল রাঙা নয়ান-নাচনে॥
কি খেনে দেখিলাম্ সই নাগরশেখর।
আঁখি ঝুরে মন কান্দে পরান ফাঁফর॥
সহজে মূরতিখানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি॥
কুলেতে যতন করে কোন্ বা মুগধি॥ —বলরাম দাস

বাধার আধিক্যে প্রেমের উৎকর্ষ, যথা—

ছাড়িয়া ঘরের আশ করিব সে বনবাস
এই চিতে দঢ়াইলুঁ সার।
রাতি দিবস হাম হিয়ার উপরে থুব
না করিব আর আঁখির আড়॥
সই, তোমারেই কহিয়ে মরম।
জাতি মোর ভাসাইলুঁ কুলে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
ঘুচাইলুঁ ধরম করম॥
শাশুড়ী ননদী ডরে নিশাস না ছাড়ি ঘরে
এই দুখে হেন সাধ করে।
অঙ্গের উপর অঙ্গ থুইয়া চান্দমুখ নিরখিয়া
মনের কথাটি কব তারে॥
নয়ান না শুনে আন আন নাহি শুনে কান
যত দেখি সব লাগে ধন্দ।
বলরামদাসে বলে নাহি জানি কি করিলে
সে নাগর গোকুলের চন্দ॥

এই প্রেমে অনপনেয় দৃঢ়তা "কি আর বলিব, সই কি আর বলিব। যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব" প্রভৃতিতে অথবা মৃত্যুবরণ করেও মিলনলাভের আগ্রহে পরিস্ফুট, যেমন—

যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জোতি হোই তথি মাহ।
বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছে মিলই যব গোকুলচন্দ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥***
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

শ্রীরূপ স্নেহরাগাদির এই সব বিভেদ নির্দেশ করেছেন অন্যান্য গোপীদের ও মহিষীবৃন্দের প্রেমের সঙ্গে রাধাপ্রেমের পার্থক্য দেখাবার জন্যে।

৬. অনুরাগ—সদানুভূতমপি যঃ কুর্যাৎ নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥

অনুরাগ রাগের পরবর্তী অধ্যায়। এতে রাগ নিত্য নব নব রূপ ধারণ করে এবং সেই সঙ্গে সদাসর্বদা অনুভূত প্রিয়কেও নতুন নতুন ভাবে অনুভব করিয়ে প্রেমের এক বৈচিত্রী সম্পাদন করে। এ হ'ল 'নবরে নব নিতুই নব, যখনি হেরি তখনি নব'। এর ফলে

প্রিয়-স্বাদ-বাসনার তৃপ্তি কদাচ ঘটে না এবং প্রীতিও পরিণাম লাভ করে না। নিরন্তর বেড়ে চলতেই থাকে। কোনো বিষয়ের সীমা অনুভব করলেই তা স্থিতিময়, বাচ্য ও বর্ণনার যোগ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম অনির্ণেয়, অনির্বচনীয়-স্বভাব। এ যেন রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত :

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই॥

কৃষ্ণের রূপ, গুণ, চেষ্টা, মুরলীধ্বনি, সব কিছুকে অবলম্বন ক'রে অথবা একাংশকেও অবলম্বন ক'রে রাধিকার এই অতৃপ্তি ঘটে। চির-অতৃপ্তি এবং চির-ব্যাকুলতা নিয়ে শ্রীমতীর কৃষ্ণভাব বৈষ্ণবধর্ম তথা সাহিত্যের এক অপূর্ব বস্তু হয়ে রয়েছে।

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেন নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মন্মাধুর্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি॥

অপিচ— এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।

আস্বাদের এই নিত্য নবনবত্বের জন্য রাধাকৃষ্ণ পরস্পর নিতান্ত বশীভূত এবং তাঁদের মিলনের মধ্যেও অতৃপ্তিজনিত বিরহানুভব দৃষ্ট হয়। এরকম বিরহকে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলা হয়েছে (এ বিষয় পরে বিবৃত হচ্ছে)। এ ছাড়া অনুরাগের আরও দুটি তটস্থ লক্ষণ শ্রীরূপ বিবৃত করেছেন—বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি এবং অপ্রাণীতে জন্মলালসা। কবি শেখর রায়ের নিম্নলিখিত পদে এই অনুরাগ অবস্থার মূলভাবটির পরিচয় অসামান্য সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

কী পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নৌতন হোয়॥
জনম-অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥ —ইত্যাদি।

এই প্রেমাবস্থার নিতান্ত বশীভূতত্ব যথা—

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিল ন হোয়॥

এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেকে বরিখে।
যুগে মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখে নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥... —জ্ঞানদাস

মিলনে বিরহস্ফূর্তি বা প্রেমবিচিত্ততা—

নাগর সঙ্গে রঙ্গে সব বিলসই
কুঞ্জে সূতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী।
দারুণ বিরহ হুতাশে॥
আরতি কহন ন যাই।
আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঁই॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মদন দহনে রহু জাগি॥
রাইক বিরহে কানু ভেল সচকিত
বয়ানে বাণী নাহি ফুর।
প্রিয় সহচরি লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

বিরহে কৃষ্ণমূর্তি, যেমন 'গীতগোবিন্দ' :

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥

অথবা, ভাবোল্লাস পর্যায়ের বর্ণনায়, অথবা, শ্রীমন্মমহাপ্রভুর ভাবাবস্থায় :

এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাহা কৃষ্ণ রয় কদম্বের মূলে॥
কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্যে হরে জগন্নেত্রমন॥
সৌন্দর্য দেখি ভূমে পড়ে মূর্ছা হঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥
পূর্ববৎ সর্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল॥
পূর্ববৎ সভে মেলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন॥
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইলুঁ দর্শন।
যাঁহার সৌন্দর্যে হরে মোর নেত্র মন॥

পুন কেন না দেখিয়ে মুরলীবদনা।
তাঁর দরশন লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥***
প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞি এখনি পাইনু।
আপনার দুর্দৈবে পুন হারাইনু॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রহে এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে॥

অপ্রাণীতে জন্মলালসা, যথা, শ্রীমদ্‌ভাগবতে কথিত উদ্ধবের অভিপ্রায়ে—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

অর্থাৎ, অভিসারিকা গোপীদের চরণরেণুর স্পর্শ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে, বৃন্দাবনের এমন তরুগুল্মলতার একটি হয়ে যদি আমি জন্মাতাম। কারণ এই গোপিকারা দুস্ত্যজ পাতিব্রত্য, গুরুজন পরিজন ত্যাগ ক'রে, শ্রুতিরা পেতে পারেনি এমন কৃষ্ণসেবাকেই পরমতম বস্তু ব'লে গ্রহণ করেছে।

অথবা ; ব্যঞ্জনায়—

ধরণী হইল মাটি কী পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥
নূপুর হৈয়াছে সোনা কী পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥... —রঘুনন্দন।

৭. ভাব—অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

অনুরাগ নিজ বোধাত্মক অবস্থা লাভ ক'রে যদি সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা বাইরে প্রকাশ পায় এবং রাগের শেষ কল্পনীয় সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং স্নেহ-প্রেমাদির সমস্ত বৈচিত্র্যের ধারক হয় তাহ'লে তাকে "ভাব" বলা যায়। প্রবল দুঃখেরও সুখরূপে অনুভব হ'ল রাগ। এই বাগের ব্যাপ্তিবৈচিত্র্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র দুঃখের পরমসুখময় কেবল-বোধরূপে যার স্থিতি এবং সাত্ত্বিকাদির দ্বারা যা প্রকাশময় তা-ই হ'ল ভাব। 'ভাব' শব্দটির সাধারণ 'রতি' অর্থ সমাচ্ছাদিত ক'রে এখানে বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই স্ব-সংবেদ্যতা বা কেবল প্রেমবোধরূপে স্থিতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল রায় রামানন্দের নিম্নলিখিত পদাংশ—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি ন গেল॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি॥

অথবা, জ্ঞানদাস-লিখিত—

শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ
ভুলিয়া পিরিতি কৈলুঁ।

পিরিতি বিচ্ছেদে না রহে পরাণ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ॥
পিরিতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরম কথা॥
পিরিতি মিরিতি তুলে তৌলাইতে
পিরিতি গুরুয়া ভার।
পিরিতি বেয়াধি যার উপজয়ে
সে বুঝে না বুঝে আর॥

রাগের অতিস্ফুরণে সমূহ বৈচিত্র্যের বিকাশ, যেমন—

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥
জাগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান।
সো রস পরশ সপন করি মান॥
তো সঞে রহত বিচ্ছেদ।
বিপরীত চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ॥
ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল।
উতর না শুনইতে জীউ উতরোল॥
পুন উতকণ্ঠিত করইতে কোর॥
দূরে রহু পরশ দরশ ভয়ে চোর॥
ঐছল নিতি নিতি কত অনুতাপ।
পর সমঝায়ত ইহ বড় তাপ॥
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সংবাদ।
যতয়ে পিরিতি ততয়ে পরমাদ॥

কখনো আশা, কখনো আশঙ্কা, কখনো উল্লাস, ব্যর্থতার বেদনা ও গ্লানি এবং প্রণয় মানাদির একত্রে সম্প্রকাশের এই অপূর্ব চিত্র নিঃসন্দেহে মহাপ্রভুর ভাবোন্মাদ-দর্শনে পরিকল্পিত হয়েছিল :

উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণস্মরণ
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ বচনরীতি মদ গর্ব ব্যাজস্তুতি
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান॥

এই বিরহোন্মাদের বিষয় স্বল্প পরেই বিবৃত হচ্ছে।

শ্রীরূপের মতে 'ভাবে'ই প্রেমের চূড়ান্ত অবস্থা, আর এই ভাবই ব্রজদেবীদের বিশেষতঃ শ্রীরাধার ক্ষেত্রে "মহাভাব" বলে কথিত হয়। চরিতামৃতপাঠে মনে হয় কবিরাজ গোস্বামী মহাভাবকে ভাব থেকে উৎকর্ষযুক্ত একটি স্বতন্ত্র অবস্থা হিসাবেই গ্রহণ করতে চান এবং একমাত্র রাধাপ্রেমেই এই মহাভাবাবস্থা প্রত্যক্ষ করেন, যেমন—

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি সর্বকান্তাশিরোমণি॥

শ্রীরূপের অনুভবে কৃষ্ণের মহিষীবৃন্দ অনুরাগের অবস্থা যদিই বা পেতে পারেন, ভাব বা মহাভাবের কিছুতেই নয়। মহিষীদের সমঞ্জসা রতিতে স্বসুখবাসনা থাকে ব'লে এই কৃষ্ণসুখে পরমাত্মসুখের অবস্থা তাঁদের আসতে পারে না।

৮. **মহাভাব**—"বরামৃতস্বরূপশ্রী" পূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ অমৃতই যার সৌন্দর্য, অর্থাৎ যা পরমাশ্চর্যরমণীয় এবং যা মনকে ভাবৈকরসময় ক'রে তোলে, হ্লাদিনীর সারনির্যাসে রূপান্তরিত ক'রে দেয়—তা-ই হ'ল মহাভাব।

মহাভাবের দুই শ্রেণী, **রূঢ়** এবং **অধিরূঢ়**। রূঢ় শব্দের অর্থ প্রবৃদ্ধ। যে ভাব প্রবৃদ্ধ হয়ে পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। এ কিন্তু মহাভাবের প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় অতিশয় প্রবৃদ্ধ হ'লে পর বলা যাবে অধিরূঢ় মহাভাব। এগুলির ঠিক লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না। বলা যেতে পারে রূঢ় মহাভাবে স্তম্ভস্বেদাদি সাত্ত্বিক ভাব পূর্ণ প্রকাশিত হয়, আর অন্যান্য অনুভাবগুলির সাধারণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া চিত্তের কয়েকটি বিশিষ্ট ভাবস্ফুরণও রূঢ় মহাভাবের বিক্রিয়া। সেগুলি এই :

(১) নিমেষ-অসহতা, যেমন,

কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কী দেখিব মুই॥

অথবা, নয়ন-চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি নয়।

অথবা, এমন পিরিতি কভু না দেখি না শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা। —ইত্যাদি।

(২) আসন্ন-জনতাহৃদ্-বিলোড়ন, যেমন, মহাপ্রভুর ভাবাবস্থায়—

কম্প স্বেদ পুলক অশ্রুর অন্ত নাঞি।
মূর্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ হাথ।
সে কটাক্ষ স্বভাব বর্ণিতে শক্তি কাত॥
সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্।
চতুর্দিগে হরিদাস করে সাবধান॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িলা মূর্ছিত হই পৃথিবী-উপর॥
কোথায় বা গেল বুড়ী বড়াইর সাজ।
কৃষ্ণরসে বিহ্বল হৈলা নাগরাজ॥

যেইমাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।
সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভিতে॥
হুড়াহুড়ি হৈল কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
কারো গলা ধরি কেহো কান্দে উচ্চরায়।
কাহারো চরণ ধরি কেহো গড়ি যায়॥ —চৈতন্যভাগবত।

(৩) কল্পের ক্ষণিকতাবোধ—

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥

(৪) কৃষ্ণের সুখেও দুঃখাশঙ্কা, মঙ্গলেও অমঙ্গলাশঙ্কা—

রাসমণ্ডল ছোড়ি আমা সঞে গেলা।
পন্থক দুখ হাম কতহুঁ ন দেলা।
চলইতে অবলাক কত দিলা কোর।
নবনীত অঙ্গে হৈলা পরশ কঠোর॥
যমুনা কুঞ্জ মাহা রভসবিহার।
ছাপি রহু কৌন দুঠ করু পরচার॥
নিজ সুখ লাগি তোএ এত দুখ দেল।
তুয়া গৌরব নাশ মরমহি শেল॥

(৫) মূর্ছা ব্যতিরেকেও সব বিস্মরণ—

সুসর বাঁশীর নাদ শুনিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
শাকে দিলো কানাসোআঁ পাণী॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।
তা সুনিআঁ ঘৃতে মোঁ পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ।
সেই ত বাঁশীর নাদ সুনিআঁ বড়ায়ি
চিত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ
বিনি জলে চড়াইলোঁ চাউল॥

অথবা, রাধাবদন চাঁদ হেরি ভুলল
শ্যামল নয়ন চকোর।

ছান্দ বান্ধ বিনু ধবলী ধাওত
বাছুরি কোরে অগোর॥
শূনহি দুহত মুগধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গুলি করত গতাগতি
হেরি হসত ব্রজনারি॥
লাজহি লাজ হাসি দিঠি গতাগতি
পুন লেই ছান্দন ডোর।
ধবলিক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল
গোবিন্দদাস হেরি ভোর॥

(৬) ক্ষণকাল-বিষয়ে কল্পতাবোধ—

তুহুঁ রহু নিকরুণ মধুপুর মাহ।
নিতি নব নাগরি রস অবগাহ॥
যো খন মান তো বিনু যুগ-লাখ।
সো কি সহয়ে চির বিরহবিপাক॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই।
অবহুঁ জীবই ন জীবই রাই॥... —গোবিন্দদাস

অথবা, চান্দ সুরুজের ভেদ নাহি জানোঁ
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিনি মোর এঁবে একখন
...এক কুল যুগ ভাএ॥ ... —শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

অধিরূঢ় মহাভাব—এই অবস্থায় সাত্ত্বিকভাবসহ অনুভাবগুলি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়ে এক অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা লাভ করে। বলা যায়, সাত্ত্বিকভাবগুলি সু-উদ্দীপ্ত হয়। অধিরূঢ়ের দুই বিভাগ **মোদন-মোহন** এবং **মাদন**। মোদন সম্ভোগাবস্থার রূপ, এরই বিরহাবস্থায় মোদনকে 'মোহন' বলা হয় 'মাদন' নিত্যমিলিতাবস্থার এক অপূর্ব রসপ্রমত্ততা, যে অবস্থায় মিলন-বিরহ সুখ-দুঃখ সব একাকার হয়ে অনির্বচনীয় অখণ্ড রসাবস্থা স্ফুরিত হতে থাকে। বলা বাহুল্য, এ প্রেমতত্ত্ব প্রারম্ভ থেকে পরিণাম পর্যন্ত অলৌকিক দিব্য, তর্কের অগোচর, ভক্তগণের অনুভবগম্য এবং প্রিয়। 'অভক্ত উষ্ট্রের ইথে নাহিক প্রবেশ'।

মোদন—একান্ত মিলিতাবস্থায় রাধাকৃষ্ণ উভয়ের উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকসহ বিবিধ চমৎকার ফুটে ওঠে। যেমন—

পেখলুঁ রে সখি যুগল কিশোর।
কালিন্দী-তীর নিকুঞ্জক ওর॥
নব নব রূপ নিরূপম লাবণি
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।
নারী পুরুষ দুহুঁ লখই না পারিয়ে
অছু পরিরম্ভণ ভাঁতি॥
ঘন ঘন চুম্বনে লুবধ বন্ধ দুহুঁ
বিগলিত স্বেদ-উদ-বিন্দু।

হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল
কো বিধুমণি কো ইন্দু॥
সিন্দূর অরুণ চন্দন বিধুমণ্ডল
সঘনে উদিত অব মেলি।
গোবিন্দদাস কহই নব অপরূপ
রাধা-মাধব-কেলি॥

অথবা, দুহু রসে ভোর হেরি পাঁচবাণ।
কেলি-কলা কিয়ে করত সন্ধান॥
দেখ পুন চেতন দুহুঁ অবলম্ব।
পুনহি অচেতন যব পুন চুম্ব॥
বিপুল পুলকবর স্বেদ-সঞ্চার।
চিরথির নয়নে নীর অনিবার॥
কাঁপই থরহরি গদ গদ ভাষ।
দুহুঁ দুহাঁ পরশনে কতহুঁ উলাস॥ ... —রাধামোহন

শ্রীরূপ মোদনাখ্য মহাভাবের দুটি বিশেষত্ব নির্দেশ করেছেন—১. শ্রীমতীর এই অবস্থার প্রভাবে মহিষীগণসহ স্বয়ং কৃষ্ণের বিস্ময়-বিক্ষুব্ধতা, ২. যাঁরা প্রেমবতী বলে খ্যাত সেই রুক্মিণী, সত্যভামা, লক্ষ্মী, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি থেকেও প্রেমাতিশয্য। চরিতামৃতের বর্ণনা অনুসারে :

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁহার ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্যগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পায়েন পার।

শ্রীরাধা এবং তার যূথস্থ গোপীদের মধ্যেই এই মোদনের স্থিতি।

মোহন—মোদনেরই বিচ্ছেদাবস্থার নাম হল 'মোহন'। এখানে নিতান্ত বিরহবিবশতার জন্য সাত্ত্বিকভাবনিচয় সু-উদ্দীপ্ত হয়। মোহনের যাবতীয় বৈচিত্র্য মহাপ্রভুর মধ্যে স্ফুরিত হয়েছিল, বিশেষতঃ তাঁর অন্ত্যলীলায়। শ্রীরূপ নিশ্চয়ই সেই অবস্থা থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এই মোহন মহাভাবের অধিকার প্রায়শঃ শ্রীমতীতেই দেখা যায়। এই মহাভাবের মুখ্য সঞ্চারী-ভাব হল মোহ বা মূর্ছা।

মোহনের কার্যকারিতার বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এতে রুক্মিণী-সত্যভামা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি প্রেয়সীদের দ্বারা কৃষ্ণ আলিঙ্গিত থাকলেও এর স্মরণে বা অনুভবে কৃষ্ণের মূর্ছা, অসহনীয় বিরহদুঃখের পরিবর্তে কৃষ্ণের সুখের কাম্যতা, ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতা, পশুপক্ষীদেরও বেদনাবৈকল্য, মৃত্যুবরণ করে পঞ্চভূতময় হয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনবাসনা, আর, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি।

মোহনাবস্থায় শ্রীমতীর বৈকল্য, যথা, শ্রীমন্মহাপ্রভু—

প্রেমের ঔৎকণ্ঠ্য প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য নৃত্য সম্বরিলা॥
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাহিতে॥
আচার্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ॥
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্‌গদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥
"হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কী না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জারে।" **
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে॥
নির্বেদ বিষাদ হর্ষ চাপল্য গর্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য॥
জরজর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সব ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জন॥ —চৈতন্যচরিতামৃত

মহিষীকান্তাশ্লিষ্ট কৃষ্ণে রাধাবিরহ-বৈকল্যের সঙ্গে তুলনীয় ঐশ্বর্যমূর্তি জগন্নাথের সঙ্গে মিলনে মহাপ্রভুর বিচিত্র বিরহাবস্থা :

যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্তন।
তাঁহা এই পদ মাত্র করেন গায়ন॥
"সোই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ॥"
এই ধুয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লই ব্রজে যাই এভাব অন্তর॥
এইভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
যে শ্লোকের অর্থ কেহো নাহি বুঝে লোক॥
"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ—" **
এই মত মহাপ্রভু দেখে জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি তাতে॥
ত্রিভঙ্গসুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা বাঢ়ে অনুক্ষণ॥
রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে॥

বিরহ-দুঃখের পরিবর্তে কৃষ্ণের সুখের কাম্যতা, যথা, চণ্ডীদাস—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥

এ সব বৈচিত্র্যের মধ্যে **দিব্যোন্মাদই** বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মহাপ্রভুর শেষ-লীলায় এ অবস্থা প্রায়শই লক্ষীভূত হয়েছিল। পদাবলীকারেরাও এ-অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এতে উদ্‌ঘূর্ণা অর্থাৎ ভ্রমময় চেষ্টা এবং চিত্রজল্প অর্থাৎ পরিজল্প, বিজল্প, সংজল্প, অবজল্প প্রভৃতি প্রলাপের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। এগুলি পর পর বিবৃত হচ্ছে। বিরহোন্মাদ বা দিব্যোন্মাদের নিম্নলিখিতভাবে লক্ষণ-নির্ণয় করা হয়েছে :

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে॥

মোহনাখ্য মহাভাবের কোনো অবস্থাগতিকে চিত্তের বিভ্রান্তি ঘটে, উন্মাদের মত হাবভাব লক্ষিত হয়, একেই বলা যায় দিব্যোন্মাদ। চরিতামৃতকার বুঝিয়ে বলছেন :

উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণস্মরণ
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ বচনরীতি মদ গর্ব ব্যাজস্তুতি
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান॥

মহাপ্রভুর এই অবস্থার বর্ণনায় বলছেন :

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ॥
ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্‌গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্তে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কবাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥
চটক পর্বত দেখি গোবর্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥

উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্ছা যান॥
কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥

চরিতামৃত মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্‌ঘূর্ণা এবং প্রলাপের বিবরণ দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করে শ্রীমতীর বিবিধ প্রলাপোক্তিও প্রমাণ। পূর্বরাগের উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ দশাতেও মোহনের ও দিব্যোন্মাদের বৈচিত্র্যসমূহ লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যেই এই আশ্চর্য প্রকাশ দেখা গিয়েছিল।

শ্রীমতীর উদ্‌ঘূর্ণা বা ভ্রমকল্প কার্যকলাপের পরিচয়, যথা—

* * উন্মত ভাতি ধনি আছয়ে নিচলে।
জড়িমা ভরল যাতে পদ নাহি চলে॥
আধ আধ বচন কহিছে কার সনে।
পুন পুন পুছয়ে সবহু তরুগণে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া খেনে বাজায় মুরলী।
দেখিয়া কান্দয়ে সখী করিয়া বিকুলি॥
মথুরা মথুরা বলি উঠয়ে কাঁপিয়া।
ললিতার গলা ধরি পড়ে মুরছিয়া॥
হেন মতে বিরহিণী ভাবে বিভোর।
কি কহব রসময় না পাওল ওর॥

অথবা,

হিমকর পেখি অনত কর আনন
রহত করুণা-পথ হেরি।
নয়ন-কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহতহি টেরি॥ **
নয়নক নীর লেই সজল কমল দেই
শম্ভু পূজয়ে নিজ দেহ॥
পরভৃতকে ডর পায়স লেই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি। —বিদ্যাপতি।

চিত্রজল্পের বা প্রলাপের প্রকার :

(১) প্রজল্প—ঈর্ষা, অসূয়া, মদ প্রভৃতি সঞ্চারীভাব নিয়ে অবজ্ঞা দ্বারা প্রিয়ের অপটুতা প্রদর্শন, যেমন, শ্রীমদ্ভাগবতে ভ্রমরের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি :

মধুপ, কিতববন্ধো, মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভিনঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মামিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্যদূতস্ত্বমীদৃক্॥

"ওহে ভ্রমর, ওহে শঠের বন্ধু! যাও, যাও। আমাদের পা ছুঁয়ো না। তোমার গোঁফে এখনও

লেগে আছে সেই মালার কুঙ্কুম—যে মালা কৃষ্ণের মথুরা-প্রেয়সীদের বক্ষ শোভা করে থাকে। তুমি কার দূত হয়ে এসেছ? তারই না, যার মথুরা-মানিনীদের কাছে লাভ-করা অনুগ্রহ যাদবসভাতেও ধিক্কৃত হয়?"

অপিচ,

মুরলি রে! মিনতি করিয়ে বার বার।
শ্যামের অধরে রৈয়া রাধা রাধা নাম লৈয়া
তুমি মেনে না বাজিও আর॥
খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা সেকি ছাড়ে খলপনা
তুমি কেনে হও তার বশ॥ —উদ্ধবদাস

(২) পরিজল্প—কৃষ্ণের নির্দয়তা, শাঠ্য, চাপল্য প্রভৃতি প্রতিপন্ন করে কোনো ভঙ্গিতে নিজের বিচক্ষণতা প্রকাশ করলে পরিজল্প হবে। যেমন, শ্রীমন্মহাপ্রভু—

উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুখপুর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ
পরনারী বধে সাবধান॥ **
কুটিল প্রেমা অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান
ভালমন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণ-ডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাসিতে॥ **
কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার কভু করিবে অঙ্গীকার
সখি তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল যেন পদ্মপত্র-জল
ততদিন জীবে কোন জন॥
শত বৎসর পর্যন্ত জীবের জীবন অন্ত
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন ধন যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি॥

(৩) বিজল্প—অন্তরে প্রচ্ছন্ন মান, অথচ বাইরে অসূয়া-সহকারে কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষোক্তি। যেমন ভ্রমর-গীতা :

**শুন ওহে মধুকররাজ।
সে গুণ চরিত কথা শুনিতে মরমে বেথা
না কহিহ এ হেন সমাজ॥
ইবে তার আলিঙ্গনে অবিরত পরশনে
কুচরোগ মিটিল যাহার।

তা সভার আগে যাহ চপল-চরিত গাহ
মনোরথ পুরিবে তোমার॥ **

(৪) উজ্জল্প—গর্বমিশ্র ঈর্ষা এবং অসূয়ার সঙ্গে কৃষ্ণের কপটতা ব্যক্ত করে আক্ষেপ

(ওরে কালা ভ্রমরা) তোমার মুখেত নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
আমার মন্দিরে কি বা কাজ॥
ব্রজবাসিগণ দেখি নিবারিতে নারি আঁখি
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহ-অনল একে তনু খীন শ্যামশোকে
নিভান আনল দিলে জ্বালি॥
মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামের পাশ
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে দুখ দিতে মোর প্রাণে
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥

(৫) সংজল্প—দুর্বোধ্য পরিহাস-উক্তিতে কৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি খ্যাপন :

কপট বিনয় বহু জানত সোয়।
কৈতব বচনে ভুলত সব কোয়॥
তুহুঁ অনুচর বহু চাতুরি জান।
সো কি করব ইহ চতুরক ঠাম॥
হে ষট্‌পদ মঝু চরণে না ধরবি।
ঐসে কপটপন ইথে নাহি করবি॥
যাহে লাগি কুলশীল কুরু সমাধান।
সো পুন তেজি চলত আন ঠাম॥
জানলুঁ তোহোরি মুরুখ ব্যবহার।
ধরম করম তাহে নাহি বিচার॥ ... —ঘনশ্যাম

(৬) অবজল্প—ঈর্ষা বা ভয়ের সঙ্গে উচ্চারিত কৃষ্ণনিন্দাবাক্য .

পূর্বজন্মে রাম হৈয়া বালি কপি বিনাশিয়া
যেই কৈল ব্যাধের আচার।
সূর্পণখার নাসাকর্ণ তাহা কৈল ছিন্ন ভিন্ন
বড়ই নির্দয় মন তার॥
পুনশ্চ বামন হৈয়া বলির সর্বস্ব লৈয়া
পুন তারে করিল বন্ধন।
হেন কৃষ্ণবর্ণ যে তার সখ্য চাহে কে
তবু তারে নাহি ছাড়ে মন॥

এরকম (৭) অভিজল্প, (৮) আজল্প এবং (৯) প্রাতিজল্প। কেবল (১০) সুজল্পের ব্যাপারে এসব থেকে ভিন্নতা। সুজল্পের নায়িকা শ্রীরাধা নিতান্ত সরল এবং গম্ভীর। তাঁর ব্যাকুলত

এবং উৎকণ্ঠা আছে। কিন্তু তীব্র প্রণয়রোষ নেই। পরিহাসবাক্যও দুর্লভ, যেমন—

মাধব, কা সম্বাদব তোয়।
যব তুহুঁ আওব। সবহুঁ নিবেদব
মদন রাখয়ে যদি মোয়॥ **
তো বিনু দুখ যত তাহা না কহিব কত
দারুণ বিরহ-বিষাদ।
চম্পতি পতি প্রতি কহইতে ঐছন
বাঢ়ল প্রেম-উন্মাদ॥

'মাদন' মহাভাব

সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদননোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

হ্লাদিনী বা প্রেমরসের সারনির্যাস এই মাদনে স্নেহ, মান, প্রণয় প্রভৃতি সমস্ত ভাবের একাধারে বিকাশ হয় (সুতরাং সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ দুয়েরই মিশ্রণ থাকে)। এ ভাব হল শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র শ্রীরাধাতেই এর স্থিতি। সমস্ত ভাবের উদ্‌গম বলতে সাত্ত্বিক ভাবও গ্রহণ করতে হবে॥

মোদনের সঙ্গে মাদনের প্রভেদ এই যে, মোদনে হর্ষাধিক্য আছে, কিন্তু মাদনের মত প্রেম-মদমত্ততা নেই। এতে প্রবল সুখ দুঃখে. এবং প্রবল দুঃখ সুখে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সুখ দুঃখ, মিলনবিরহের অনুভব একত্রিত হয়ে শুদ্ধ প্রেমোন্মাদে চিত্ত বিবশ হয়ে পড়ে। মোদনে এই বিশিষ্ট পরিণাম ঘটে না। এর বিশেষত্ব এই যে, ঈর্ষার কোনো ব্যাপার না থাকলেও এই অবস্থায় প্রবল ঈর্ষা জাগরিত হয় এবং সম্ভোগ-শৃঙ্গারে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবধান না থাকলেও 'কৃষ্ণের গন্ধমাত্র বহনকারী' কোনো বস্তুর স্তব করা হয় অর্থাৎ রূপ-গুণ-লালসা এতে সর্বদাই বর্তমান থাকে।

মাদন অবস্থায় সমস্ত সাত্ত্বিকের পূর্ণতম প্রকাশ, যথা জগন্নাথ-মিলনে শ্রীমন্মহাপ্রভু—

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হুংকার।
চক্রক্রমি ভ্রমে হৈছে অলাত আকার॥
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগরী মহী শৈল করে টলমল॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানাভাবে বিবশতা গর্ব হর্ষ দৈন্য॥ **
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল॥
মাংস-ব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে মানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥

সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাত রক্তোদ্গম।
জজ জজ গগ গগ বলেন বচন॥
জলযন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম॥
কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয়॥ ...

—চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য

অথ শ্রীরাধা :

কহিতে কানুর বিলাস কথা।
ছল ছল ভেল নয়ন রাতা॥
গদ-গদ কণ্ঠ না সরে বাণী।
বিসরণ ভেল কী হৈল জানি॥
পুলকে পুরল সকল দেহ।
স্তবধ হইল না চলে সেহ॥
ঝরঝর বাহি পড়য়ে ঘাম।
খেনে থরথর কম্পমান॥
মুরছি পড়ল সখীর গায়।
হেরি সহচরী চমক পায়॥
কোলে করিয়া রহল তাই।
খেনেকে চেতন পাওল রাই॥
সখী কহে বিপরীত সে দেখি।
কহিতে এমন কোথা না লখি॥
আমরা পুছিয়ে সুখের কথা।
ইহাতে তোহর কী ভেল বেথা॥
রাই কহে মোর জীবন কানু।
সে কথা কহিতে অবশ তনু॥
শেখর কহয়ে রহিয়া তাই।
এমন প্রেমের বালাই যাই॥

অপিচ,

ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই।
নয়নক ওত করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই॥
করতল-কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে পুন পুন হেরই
আকুল গদ গদ বোল॥ ..

—গোবিন্দদাস।

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাঅল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন-গৌরব চৌর-সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥
এত দিনে ভাঙল ধন্দ।
কানু-অনুরাগ- ভুজঙ্গে গরাসল
কুল-দাদুরী মতিমন্দ॥
আপনক চরিত আগে নাহি সমুঝিয়ে
আন করত হোয় আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিত
গৃহপতি শপতিক ঠাম॥
নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই
না জানি কিয়ে ভেল-আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে
গোবিন্দদাস এক সাথী॥

ভক্তিরসের স্থায়ীভাবের বিবরণ সমাপ্ত হল। এরপর বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী প্রভৃতি।

ভক্তিরসের 'বিভাব'

'বিভাব' হল রসশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। লৌকিক জগতের যে সব উপাদান অবলম্বন করে কাব্যনাটক লেখা হয়, তা-ই গ্রথিত কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে বিভাব বলে পরিগণিত। এই বিভাব, অনুভাব সঞ্চারীর মধ্য দিয়ে পরিপুষ্ট হলে তবেই রতি প্রভৃতি স্থায়ীগুলি রসপরিণাম লাভ করে। ভক্তিরসের ক্ষেত্রে বিভাব সংখ্যায় অগণিত নয়, সীমিত। কৃষ্ণ, ব্রজগোপীবর্গ, মহিষীরা, অন্যান্য কৃষ্ণ-সম্পর্কিত ব্যক্তিসমূহ, দ্বারকা, মথুরা, বিশেষতঃ বৃন্দাবনের নিসর্গ। মহাপ্রভুপক্ষে তিনি এবং তাঁর পরিকরবর্গ, নবদ্বীপ, নীলাচল, গঙ্গা, সমুদ্র এই সব হল উপাদান, সুতরাং ভক্তিরসময় কাব্য-নাটক-পদাবলীর বিভাব। বিভাবের দুটি বিভাগ, যে-মানুষ বা বস্তুকে মুখ্যভাবে আশ্রয় করে কাব্যনাটকাদি প্রবর্তিত হয় এবং মুখ্যভাবে যার সহায়তায় পাঠক-দর্শকচিত্তে রসনির্বাহ হয় তা হল আলম্বন বিভাব। নরলীলাপরায়ণ কৃষ্ণ-রাধা এবং তাঁদের লীলাপরিকর বা মহাপ্রভু এবং তাঁর পরিকরবৃন্দ অথবা ভক্তেরা হলেন আলম্বন বিভাব। বিভাবের অবান্তর বিভাগ হল উদ্দীপন। বৃন্দাবন-নবদ্বীপ এবং নিসর্গাশ্রিত পশুপক্ষী, পদার্থ, ঋতুশ্রী এবং কৃষ্ণের মালা, চূড়া, বংশী, মুরলীধ্বনি, তুলসী, একাদশী প্রভৃতি হল উদ্দীপনের অন্তর্গত। ক্রমে এসবের বৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। মনে রাখতে হবে লৌকিক কাব্যের বিভাব অ-লৌকিক (অর্থাৎ লৌকিকেতর, ঠিক আধ্যাত্মিক নয়) কিন্তু বস্তু বা উপাদান লৌকিক; অথচ বৈষ্ণব কাব্যাদিতে কেবল বিভাবই অলৌকিক অধ্যাত্ম নয়, উপাদানও অলৌকিক। কৃষ্ণ সাধারর নায়ক নন, গোপীরাও নন, বৃন্দাবনধামও অলৌকিক, চিন্ময়। এবং শুধু নবরূপ কৃষ্ণ-রাধাই নন, তাঁদের বিগ্রহও চিন্ময়।

আলম্বন বিভাব—আলম্বনের দুই ভাগ, বিষয়ালম্বন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়ালম্বন শ্রীরাধা ও গোপীগণ।

ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত এই চার শ্রেণীর নায়কের সমস্ত গুণ এক কৃষ্ণেই বিদ্যমান। তা ছাড়া এই মধুররসবিগ্রহ নায়ক পঁচিশটি বিশেষ সদ্‌গুণেও মণ্ডিত, যেমন—সুরম্য, মধুর, সর্বসুলক্ষণ, বলীয়ান্‌, নবতরুণ, শাস্ত্রাদিতে যুক্তিতর্কপরায়ণ, প্রিয়ংবদ, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ, নিত্যনূতন, বংশীধ্বনি-নিপুণ, অতুলনীয়-কেলিসৌন্দর্যময় ইত্যাদি। পূর্ব অধ্যায়ে যে সব সদ্‌গুণের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে মধুররসে এগুলি বিশেষ।

নায়ক কৃষ্ণ পতি এবং বিশেষতঃ উপপতি। কোনো কোনো গোপকন্যা তাঁকে পতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিবাহিতা গোপরমণীকূলের উপপতি হিসাবেই কৃষ্ণের বিশেষ প্রতিষ্ঠা। উপপতি তিনি, যিনি অন্যের বিবাহিতা রমণীর সঙ্গে প্রণয়ে আসক্ত হন। যদি বলা যায়, নায়ক-নায়িকার ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব তো শাস্ত্রাদিতে এবং লৌকিক রসশাস্ত্রে নিষিদ্ধ বললেই চলে। সেক্ষেত্রে ঔপপত্য বর্ণনায় অধর্মেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এর উত্তর শ্রীরূপ দিয়েছেন। কৃষ্ণ লৌকিক নায়ক নন, পূর্ণভগবান; নররূপ ধরেছেন তাঁর লীলাবাসনায়। আবার হ্লাদিনীশক্তি থেকে ব্রজলীলা-পরিকর, হ্লাদিনীসার হলেন রাধিকা। সুতরাং প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা পক্ষে যা নিন্দনীয় রাধাকৃষ্ণপক্ষে তা নয়। তা ছাড়া ব্রজলীলায় কৃষ্ণ নবধর্ম প্রদর্শন করার জন্য এসেছিলেন। এ ধর্ম পূর্বপূর্ব শাস্ত্রানুগত ধর্ম থেকে পৃথক, সুতরাং পূর্বশাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধ এ লীলা বিষয়ে প্রযুক্ত হতে পারে না। প্রশ্ন হবে, তাহলে ধর্ম সাক্ষ্য করে বিবাহিত প্রেমের লীলা দেখালেই তো হত। এ বিষয়ে শ্রীরূপ যুক্তি দিচ্ছেন যে—অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ। ঔপপত্যময় লীলাতেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এ বিষয়ে তিনি নাট্যসূত্রসংগ্রাহক ভরত এবং অন্যান্য পূর্বসূরীদের বচন উপস্থাপিত করেছেন।[১] এবং বলেছেন যে স্বয়ং শুকদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণের ঔপপত্য এবং গোপ-রমণীদের পরকীয়াত্বের মহিমা কীর্তন করেছেন। শ্রীশুকবর্ণিত কৃষ্ণ বলছেন যে, আমি এই গোপরমণীদের প্রেমরূপ সাধুকৃত্যের প্রতিদান জন্ম-জন্মান্তরেও দিতে পারব না। কারণ, এঁরা স্বজন পরিজন এমনকি দুস্ত্যজ স্বামীধর্মকেও আমার জন্যে ত্যাগ করেছেন। আবার উদ্ধব বলছেন যে, হায়, কৃষ্ণের জন্য অভিসার করেন যে ব্রজরমণীরা, তাঁদের চরণধূলিলিপ্ত তৃণলতার একটি যদি আমি হতে পারতাম! আসল কথা এই যে, দুঃখবরণ এবং ত্যাগের চূড়ান্ত পরিচয়, স্বকীয়াতে তা থাকতে পারে না; সুতরাং পরকীয়াত্ব এবং ঔপপত্যই নবরাগ-ধর্মের ভিত্তি।

পরকীয়া রতি এবং উপপতি

আমরা পূর্বেই বলেছি, উজ্জ্বলনীলমণির টীকাকার অন্যতম গোস্বামী শ্রীপাদ জীব

---

১. বহু বার্যতে যত্র খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বং চ।
যা চ মিথো দুর্লভতা সা পরমা মন্মথস্য রতিঃ॥ (নাট্যশাস্ত্র)
বামতা দুর্লভত্বং চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা।
তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্‌॥ (রুদ্রসংহিতা)
যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্লভত্বং চ যন্মৃগাক্ষীণাম্‌।
তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্যতে হৃদয়মু॥ (বিষ্ণুগুপ্তসংহিতা)

পরকীয়াত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁর মতে নিত্যলীলায় অর্থাৎ মৌলভাবে গোপীরা কৃষ্ণের স্বকীয়াই, কেবল বৃন্দাবনলীলায় পরকীয়া অর্থাৎ পরকীয়ার মত প্রতীত হচ্ছেন মাত্র। এখানে সহজেই প্রশ্ন ওঠে, নিত্যলীলায় যদি কৃষ্ণ পরিতৃপ্ত থাকতেন তাহলে তাঁর ঔপপত্যময় বৃন্দাবনলীলার প্রয়োজনই বা কী ছিল। প্রেমের পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করতে এবং জানানোতেই তো তাঁর বৃন্দাবনলীলা। তা যদি হয়, তাহলে গোপীরা মূলতঃ কৃষ্ণের স্বকীয়া থাকুন বা না থাকুন তাতে কিছু যায় আসে না। শ্রীপাদ জীব কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির বিষয় বিবেচনা করেও একথা বলতে পারেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু লীলাহীনতার ব্যাপার এসে পড়ে। নরলীলা নিয়েই কৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তদের যা-কিছু প্রয়োজন। ফলতঃ শ্রীজীবের "পরমস্বকীয়াপি পরকীয়ায়মাণাঃ শ্রীব্রজদেব্যো ন তু পরকীয়াঃ ।।" এরকম উক্তি কৃত্রিম সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়াসই সূচিত করে। উজ্জ্বলনীলমণির অপর খ্যাতনামা টীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পরকীয়াত্ব বিষয়ে শ্রীরূপের অভিপ্রায় ও পরকীয়াত্ব স্থাপনের যথার্থতা নানাভাবে বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝিয়েছেন। তাঁর কথায়, রাসাদিলীলাকে মায়িক বললে ভক্তদের দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। উজ্জ্বল-নীলমণির নায়ক-নায়িকা প্রকরণে শ্রীরূপ খুব স্পষ্টভাবেই পরকীয়ারতির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করেছেন। এতে সংশয়ের কিছু নেই। নিত্যলীলার প্রসঙ্গ অবান্তর বলেই তিনি তোলেননি। যাই হোক, শ্রীরূপ এক কথায় পূর্বপক্ষকে এই বলে নিরস্ত করেছেন যে, কৃষ্ণপ্রসঙ্গে পরকীয়াত্বের দোষের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ কৃষ্ণ প্রাকৃত নায়ক নন, তিন ঈশ্বর।

নায়কভেদ

পতিই হোন আর উপপতিই হোন নায়কের পূর্বোক্ত ধীরোদাত্ত-আদি চারটি বিভাগের প্রত্যেকটির মধ্যে আবার অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট এই চার রকমের প্রভেদ দেখা যায়, এই হিসাবে নায়কদের বিভাগ হয়ে পড়ে ৪ × ৪ = ১৬। বলা বাহুল্য, বিচিত্রলীলাময় এক কৃষ্ণের মধ্যেই ঐ ষোল প্রকার নায়কের সমস্ত গুণ বিদ্যমান।

'অনুকূল' নায়ক তাঁকেই বলে যিনি একনায়িকানিষ্ঠ। কৃষ্ণ যখন অন্য নায়িকাপ্রসঙ্গ বর্জন করে শ্রীরাধাতেই আসক্তি প্রকাশ করেন তখন রাধাপক্ষে তিনি অনুকূল নায়ক। যেমন শ্রীমতীর নিজ উক্তি মতে;

গোকুল নগর মাঝে আর কত নারী আছে
তাহে কেনে না পড়ল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেনে বলে রাধা রাধা॥

অথবা কৃষ্ণোক্তি :

সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥

ধীরোদাত্ত-আদি মূল বিভাগ অবলম্বনে অনুকূল নায়কও চার প্রকৃতির হবেন।

'দক্ষিণ' নায়ক হচ্ছেন, তিনি, যিনি সমভাবে বহুনায়িকানিষ্ঠ, অথচ সেরকম হলেও প্রথমার প্রতি গৌরব ত্যাগ করেন না। যেমন, কলহান্তরিতা অবস্থায় শ্রীমতী বলছেন :

আন্ধল প্রেম　　　　পহিল নাহি জানলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে　　　　বাদ করি তা সঞে
অহোনিশি জ্বলত পরান॥ ইত্যাদি

অথবা,

মাধব, কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনি ঠামে॥
তোহোরি হৃদয়-অধিদেবী।
তাকর চরণ যাউ সেবি॥ ইত্যাদি।

শঠ—নায়িকার কাছে খুব প্রিয়ভাষী, কিন্তু অন্তরালে যথার্থই অপরাধী এমন নায়ক, যেমন—

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
করজোড়ে মাধব মাগে পরসাদ।
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥

অথবা,

কপট নেহ করি রাইক পাস।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥ ইত্যাদি।

ধৃষ্ট—অন্য নায়িকাসঙ্গ স্পষ্ট হলেও যে নায়ক নির্ভয়ে মিথ্যা বচনে তা লুকাবার ছল করে। যেমন—

বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনে দিবানিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগুবিন্দু দেখিয়া সিন্দুরবিন্দু কহ।
কন্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ॥ ইত্যাদি।

অপিচ,

কাঁহা নখ-চিহ্ন　　　　চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এহ নব কুঙ্কুম-রেহ।
কাজর ভরমে　　　　মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘনমৃগমদ-পদ এহ॥**
গৈরিঅ হেরি　　　　বৈরী সম মানসি
উর পর যাবক ভানে।
ফাগুক বিন্দু　　　　ইন্দুমুখী নিন্দসি
সিন্দুর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে　　　　জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি　　　　মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

লৌকিকে শঠতা এবং ধৃষ্টতা উন্নত সৌন্দর্যরুচির আধার না হলেও উপপতি কৃষ্ণে এর চমৎকারিতা অবিসংবাদিত এবং তা মনোরম কবিত্বেরও উদ্‌ভব ঘটিয়েছে।

রসশাস্ত্রে চেট, বিট, দূতী প্রভৃতি নায়কসহায় বলে কথিত। কৃষ্ণের ঔপপত্যময় প্রেমলীলায় বিশেষভাবে সহায়ের প্রয়োজনীয়তা লীলারসিকেরা উপলব্ধি করেছেন। এক্ষেত্রে শ্রীরূপ প্রচলিত রসশাস্ত্রের উপর কামশাস্ত্রের নির্দেশই অধিকতর মান্য করেছেন। তাই কেবল চেটবিটাদিই নয়, প্রিয়নর্মসখা এবং দূতীর বিবরণও তাঁকে দিতে হয়েছে। 'চেট' নায়কের সেবক মাত্র, সে দক্ষ এবং গূঢ়কর্মকৃৎ, কৃষ্ণপক্ষে গোপিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষক। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের এরকম কর্মকুশল সেবক হলেন ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার প্রভৃতি। 'বিট' হল কামশাস্ত্রে নিপুণ, সমালাপ-দক্ষ ধূর্ত-চরিত্র বিশেষ। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের একজন বিট হলেন—কড়ার। 'বিদূষক' মধুমঙ্গল অলংকারশাস্ত্রানুগত বিদূষকই। তিনি বিকৃত বাক্‌চেষ্টার দ্বারা কৃষ্ণপরিকরদের হাস্যবিধান করেন। 'পীঠমর্দ' অনেকটা সখার মত। তিনি নায়কের সদৃশ গুণবান্ হয়েও নায়কের অনুগত। কৃষ্ণের পীঠমর্দ হলেন শ্রীদাম, সখাদের মধ্যে যাঁর বিশেষ গুণবত্তা। কৃষ্ণের 'প্রিয়নর্মসখা' হলেন সুবল, যিনি কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের প্রণয়ের সব ব্যাপারই জানেন। আর যেমন কৃষ্ণের তেমনি গোপিকাদের প্রেমক্রীড়ার অতি বিশ্বস্ত সহায়, যাঁর কাছে উভয়পক্ষই গোপন কথা খুলে বলতে পারেন। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ে দূতীর ভূমিকাব গুরুত্ব স্বীকৃত হয়নি, কিন্তু প্রণয়ের পর মিলন বিষয়ে সংযোগ রক্ষায়, প্রবাস এবং মান পর্যায়ে নর্মসহায়তায় দূতীর ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। রাধাকৃষ্ণের স্বয়ংসিদ্ধ প্রণয়ের বিষয় বিবেচনা করে উভয়ের স্বয়ংদৌত্যও বৈষ্ণব কাব্যের মিলন-বিচ্ছেদ-লীলার একটি অন্যতম বিষয়। কৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য সাধিত হয় মুখ্যত তাঁর কটাক্ষ এবং বংশীধ্বনির দ্বারা। এছাড়া প্রণয়ের বিভিন্ন অবস্থায় আঙ্গিক এবং বাচিক দৌত্যেরও অবকাশ রয়েছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ দূতীপ্রেরণের বিষয়টিকে বলা হয়েছে আপ্তদৌত্য। বাক্‌পটু অতিশয় বিশ্বস্ত ব্যক্তি আপ্তদৌত্যের কাজ করে থাকেন। প্রবাস, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা এবং মানের অবস্থায় বিশেষভাবে আপ্তদৌত্যের প্রয়োজন। কৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য যেমন—

নায়কসহায় চেট, বিট্ট, দূতী

রসিক নাগর সাজি বাজিকর
সঙ্গেত সুবল সখা।
ঢোলক বাজাইয়া দড়ি দড়া লইয়া
ভানুপুরে দিল দেখা॥**
কতেক কুহক দেখায় কৌতুক
শিরে হাঁটি হাঁটি চলে।
ধনী হাসিমন বিচিত্র বসন
বাজিকর শিরে ফেলে॥
বসন না লয় আর ধন চায়
কহে সুবদনী পাশে।
ও হিয়ার মাঝে হেমঘট আছে
দিয়া পুর অভিলাষে॥

শুনিয়া নাগরী বুঝিলা চাতুরী
চমকিত হৈলা মনে।
হেন বাজিকর না দেখিয়ে আর
কত টাটপনা জানে॥... —উদ্ধবদাস।

অথবা, মানে স্বয়ংদৌত্য যথা—

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি॥
অভিমান দূরে করি চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরান চমকে যদি ছাড়হ নিশাসে॥... —জ্ঞানদাস

কৃষ্ণের আপ্তদূতীদের মধ্যে বীরা, বৃন্দা, মেলা, মুরলা প্রভৃতি। এর মধ্যে বীরা প্রগল্‌ভবাক্ এবং বৃন্দা চাটুপটুবাক্। আপ্তদূতীর তিনটি শ্রেণী : অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারিণী। অমিতার্থা দূতী ইঙ্গিতে নায়ক-নায়িকা দুজনের অথবা একজনের মনোভাব বুঝে নিয়ে স্বকৌশলে উভয়কে মিলিত করার চেষ্টা করেন। অপরপক্ষে নিসৃষ্টার্থা তিনি, যিনি কাজের ভার পেলে তবেই দৌত্য করেন। পত্রহারিণী চিঠিপত্র নিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করেন। কৃষ্ণপক্ষে কোনো সখা অথবা পরিচারকও পত্রহারী হতে পারেন। বিশেষ বিশেষ গুণ ও চারিত্র্য নিয়ে পত্রবাহকদেরও কয়েকটি বিভাগ কল্পিত হয়েছে।

নায়িকা বা কৃষ্ণপ্রিয়া

স্বকীয়া—স্বকীয়া এবং পরকীয়া ভেদে মূলত কৃষ্ণপ্রিয়াদের দুই বিভাগ। দ্বারকায় স্বকীয়া। এঁদের সংখ্যা ষোল হাজার একশ আট। এঁদের আবার গণ বা শ্রেণী আছে, আর আছে প্রত্যেকের সহস্র সহস্র সখী এবং দাসী। সখীরা মহিষীদের প্রায় তুল্যরূপগুণ, আর দাসীরা কিছু কম। এই সব মহিষীদের মধ্যে আটজনই হলেন মুখ্যা এবং কৃষ্ণের প্রিয়তমা—রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী। এঁদের মধ্যে আবার রুক্মিণী এবং সত্যভামা সর্বশ্রেষ্ঠ, রুক্মিণী রূপ ঐশ্বর্যের দিক থেকে, আর সত্যভামা সৌভাগ্যের দিক্ থেকে। এঁদের সকলেরই বিবাহিত পতি শ্রীকৃষ্ণ। এ ছাড়া কৃষ্ণ কোনো কোনো গোপকন্যারও পতি। এঁরা কৃষ্ণকে পাবার জন্য কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন এবং বিবাহিত না হলেও কৃষ্ণকে পতিরূপেই ভজনা করেছিলেন। ব্রজগোপীদের পরকীয়াত্ব এবং প্রচ্ছন্নপ্রেমভাবে সাধারণ লক্ষণ হলেও এক্ষেত্রে বিশেষত্ব বুঝতে হবে।

পরকীয়া—প্রেমের বশে যাঁরা ইহকাল পরকাল, শাস্ত্র গুরুবাক্য প্রভৃতি গ্রাহ্য না ক'রে পুরুষবিশেষে আসক্ত হন এবং ঐ পুরুষের সঙ্গে অগ্নি-বিপ্র সাক্ষ্য ক'রে পরিণয়বন্ধন যাঁদের কোনো কালেই ঘটে না, তাঁরাই পরকীয়া। পরকীয়া গোপীরা অবশ্য একক কৃষ্ণেই আসক্ত।

পরকীয়ার কন্যাও হতে পারেন, অন্যের বিবাহিতাও হতে পারেন। এই দুই ক্ষেত্রেই গোপন প্রেম কৃষ্ণের অভিনন্দনের বিষয়। তবে বৃন্দাবনে পরোঢ়া গোপরমণীরাই কৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়, কারণ, প্রেমের জন্যে এঁদের দুঃখবরণ এবং ত্যাগ অতুলনীয়। এই গোপরমণীরা

পতিদের সঙ্গে সংসক্ত হননি এবং সন্তানের জন্মও দেননি। নারায়ণরূপ কৃষ্ণের বক্ষস্থিত লক্ষ্মীর চেয়েও এঁরা কৃষ্ণের অধিক প্রীতিভাজন।

পরকীয়া নায়িকাদের শ্রেণী তিনটি। সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া। 'সাধনপরা' অর্থে সাধনায় নিরতা—একাকিনী অথবা যূথসহ। জন্মান্তরে এঁরা কেউ কেউ মুনি, কেউ কেউ শ্রুতি। কেউ বা সাধারণ মানুষই। পূর্ব পূর্ব জন্মে রাগানুগ ভজনে যাঁদের উৎকণ্ঠা ছিল তাঁরা ব্রজে গোপী হয়ে, হরিণী প্রভৃতি হয়ে জন্মলাভ ক'রে সুকৃতিবশে কৃষ্ণের সালোক্য লাভ ক'রে থাকেন। 'দেবী' হলেন তাঁরা যাঁরা নিত্যপ্রিয়াদের অংশ। কৃষ্ণের দেবযোনিতে অবতারের সময় তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য এঁরাও দেবীরূপে আবির্ভূত হন। এঁরা আবার ব্রজে নিত্যপ্রেয়সীদের সখী হয়ে কৃষ্ণলীলার বিস্তারবৈচিত্র্য সাধন করেছেন। কৃষ্ণের বল্লভাদের মধ্যে নিত্যপ্রেয়সীরূপে যাঁরা পুরাণে বিখ্যাত, তাঁরা হলেন—শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা চিত্রা, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি। এ ছাড়া লোকপ্রসিদ্ধ মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, খঞ্জনাক্ষী প্রভৃতিও আছেন। এঁরা সকলেই যূথাধিপা। নিজ নিজ যূথ নিয়ে রাগাত্মিক ভজনে নিরত। বিশেষ এই যে ললিতা, বিশাখা, পদ্মা এবং শৈব্যার কোনো দল নেই। সখীত্বেই এঁদের পরাকাষ্ঠা। ললিতা এবং বিশাখা শ্রীরাধার সখী, পদ্মা ও শৈব্যা চন্দ্রাবলীর।

শ্রীরাধা

রাধা ও চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীদের মধ্যে সর্বোত্তমা। এ দুয়ের মধ্যে আবার প্রেমের তীব্রতা ও গভীরতায় রাধার তুলনা নেই। তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনীর ঘনসারবিগ্রহ, মহাভাবের অবস্থার অধিকারিণী, 'সর্বগুণখনি সর্বকান্তাশিরোমণি'।

প্রশ্ন হতে পারে, গোপীশ্রেষ্ঠা এই রাধার বিষয় কি ইতিহাস-পুরাণে বিবৃত হয়েছে, না, এ কৃষ্ণোপাসক বৈষ্ণবদের উদ্ভট কল্পনা? তার উত্তরে শ্রীরূপ বলছেন—রাধা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা কৃষ্ণপ্রেয়সী, গোপালোত্তরতাপনী উপনিষদে তাঁকে গান্ধর্বী বলা হয়েছে। এবং ঋক্-পরিশিষ্টে "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেন চ রাধিকা" ব'লে রাধামাধবের যে অবিনাভাব সম্বন্ধের বিষয় বলা হয়েছে তাতে রাধার কৃষ্ণপ্রেয়সীত্ব পূর্বেই স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া পদ্ম-পুরাণেও ঐভাবে রাধার উল্লেখ রয়েছে।

শ্রীরূপ এইভাবে সমাধান খুঁজে পেলেও আজকের সংশয়দৃষ্টি ও ইতিহাস-চেতনার যুগে গোল এত সহজে মেটেনি। এবিষয়ে ভূমিকাংশে আমরা আমাদের বক্তব্য বলেছি, এখানেও প্রয়োজনবশে সংক্ষেপে তা বলতে হচ্ছে। আধুনিক অনুসন্ধিৎসুদের কারো কারো মতে রাধা লৌকিক সাহিত্যের প্রেমিকা হিসাবে প্রথমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, পরে ভক্তিগ্রন্থে স্থান পেয়েছেন। ঋক্-পরিশিষ্টে রাধার উল্লেখকে বৈষ্ণবদের প্রক্ষিপ্ত ব'লে তাঁরা মনে করেছেন। গোপালতাপনীতে রাধার নাম নেই। এমন কি যে-ভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাতেও রাধা নেই। অথচ অন্তত সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর লৌকিক সাহিত্যে রাধার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, হালের সংগৃহীত গাথাসপ্তশতীতে, আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকে, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহারের নান্দীশ্লোকে। অতএব সন্দিগ্ধ ঋক্-পরিশিষ্ট বা গোপালতাপনীকে রাধা-বিষয়ে অগ্রাধিকার না দিয়ে সাহিত্যকেই দেওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য : এ সব বিষয়ে যে-বিবেচনা প্রথমে করা উচিত, অথচ যা করা হয় না, তা হ'ল এই যে, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত দেবদেবীকে নিয়ে সাহিত্যে নায়ক-নায়িকা-ভাবের কাব্যনির্মাণের স্পৃহা ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। শিবপাবর্তী তো কালিদাসের পূর্বেই (এবং কলিদাসের লেখাতেও) ঈশ্বর-ঈশ্বরীত্বে প্রতিষ্ঠিত। আর কুমারসম্ভব তো লৌকিক কাব্য। কথা এই যে, লীলার অংশ নিয়ে রসময় কাব্য। রসশাস্ত্রে এ দোষের নয়। গাথাসপ্তশতীর বা আনন্দবর্ধনের উল্লিখিত কবিও ঐভাবে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণকাহিনী থেকেই তাঁদের সংক্ষিপ্ত কবিত্বের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বেশ বোঝা যায়, গাথাসপ্তশতীর গাথা অথবা আনন্দবর্ধন উল্লিখিত শ্লোকের মূলে রাধাকৃষ্ণ সংবলিত কোনো ধারাবাহিক কাহিনী রয়েছে। সে কাহিনী কি লৌকিক না ধর্মীয়? লৌকিক হ'লে তার আগে তা কোথায় ছিল? রাধা না হোন, কৃষ্ণ তো বহু পূর্ব থেকেই ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত। তাহ'লে কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে যে কবিতা, তা কি নিছক লোক-কাহিনী-মূল হতে পারে? শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধার নাম থাক না থাক, কৃষ্ণ এবং গোপীপ্রেম যে আধ্যাত্মিক সে বিষয়ে তো দ্বিমত থাকতে পারে না। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে কৃষ্ণের গোপীসহ লীলা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং গোপী এবং গোপীশ্রেষ্ঠ রাধাকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত লীলাকাব্যের এক একটি বিচ্ছিন্ন রম্য অংশকেই লৌকিক কবিরা কাব্যে ব্যবহার করেছেন—এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীরা মনে করেন ভাগবতের "অনয়ারাধিতো" এই শব্দার্থে রাধার নাম লুকিয়ে রয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়নি, কারণ, যে-গোপীমুখে একথা বলা হয়েছে তিনি কটাক্ষ ক'রে বলেছেন ব'লে নাম করেন নি। প্রধানা একজন গোপীর পরিচয় তো স্পষ্ট। রাধা যদি লৌকিক নায়িকাই হন, তাঁকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাই দায়ী নন। দশম-একাদশ শতাব্দীর ভক্তিরসিক বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতে রাধাপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য কাহিনীমূলক কোনো লীলা নয়। দ্বাদশ শতাব্দীর গীতগোবিন্দেই প্রথম প্রায়-পূর্ণাঙ্গ রাধাকৃষ্ণলীলার পরিচয় পাচ্ছি। এ কাব্যটিও ভাগবত এবং প্রচলিত অন্যান্য ধর্মীয় কাহিনীর অনুবৃত্তিমূলক বলেই মনে হয়। সে যাই হোক, যেহেতু রাধার নাম পাচ্ছি না এবং রাধানামসহ পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় আখ্যায়িকা দুর্লভ হচ্ছে, সেইহেতু লৌকিক সাহিত্যের ঐ প্রতিষ্ঠিতলীলানির্ভর দু' একটি বিক্ষিপ্ত রচনাকে ধর্মীয়তার পূর্বে স্থাপনের কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। বরং মহাপ্রভু এবং গোস্বামীদের ধারণা এবং যুক্তি মেনে নেওয়াই যুক্তিসংগত।

রাধা এবং চন্দ্রাবলী। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের প্রধানা প্রিয়াদের মধ্যে এই দুই হলেন সর্বোত্তমা এবং সবচেয়ে নিকটবর্তিনী। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হলেন শ্রীরাধা তিনি কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা। তাঁর দেহগঠন অতি সুসমঞ্জস, তিনি ষোড়শ প্রসাধনে নিত্যভূষিতা, দ্বাদশ আভরণে মণ্ডিতা। কৃষ্ণের মত তিনিও বহু গুণের অধিকারিণী, সুতরাং মধুররসের দিক্ থেকে শ্রেষ্ঠা নায়িকা। তিনি আশ্চর্যরূপময়ী, সমারূঢ় কৈশোরের যাবতীয় অভিনব দেহশোভার অধিকারিণী। মধুরমন্দ স্মিত তাঁর অধরোষ্ঠে, চারুসৌভাগ্যসুলক্ষণ তাঁর সর্বাঙ্গে। তিনি চারুবাক্, তিনি নর্মদক্ষা, বিনীতা, করুণাময়ী, বিদগ্ধা, লজ্জাধৈর্য-বিমণ্ডিতা অথচ বিরহে বিপরীতা, মানে অতীতীব্রা, আবার তিনি সখীপ্রণয়বশীভূতা।

শ্রীরাধার সখীবৃন্দও রূপে গুণে অধিক ন্যূনা নন। এই সখীরা তাঁর প্রেমলীলার সহায়। বিভিন্নতায় এঁরা পাঁচ প্রকারের : সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, আর পরমপ্রেষ্ঠসখী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই অষ্ট সখী হলেন পরমপ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধার ঘনিষ্ঠতমা ব'লে এঁরা কৃষ্ণেরও অতিপ্রিয়া, আর কৃষ্ণেও এঁদের পরমপ্রিয়তা।

নায়িকাভেদ

লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে নায়িকাদের বয়সোচিত স্বভাবভেদে তিনটি শ্রেণীভেদ দেখানো হয়েছে—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা। কিন্তু তা হ'ল স্বকীয়া অথবা পরকীয়কন্যকা (পশ্চাৎ স্বকীয়া) বিষয়ে ; পরোঢ়াদের সম্বন্ধে কদাপি নয়। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে নায়িকাদের মধ্যে পরোঢ়াই প্রধানা, এই বিশেষ।

ক. **মুগ্ধা**—মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতচেষ্টাসু সব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥

মুগ্ধার নবীন বয়স, প্রথমবাসনা, কামকলায় অনভিজ্ঞতা, রতিবিষয়ে প্রতিকূলতা, সখীদের আনুগত্য, অত্যধিক লজ্জার জন্য গোপন মনোভাবের বহিঃপ্রকাশে সাবধানতা। তিনি প্রণয়ীর অপরাধে শুধু রোদনশীলা কিন্তু অমানিনী, চাটু প্রিয়বাক্য অথবা অপ্রিয়বাক্য দুয়েরই প্রয়োগে অক্ষমা। যেমন, বিদ্যাপতি—

কত অনুনয় অনুগত অনুবোধি।
পতিগৃহ সখিহিঁ সুতাওল বোধি॥
বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোএ।
ভাগল দল বহুলাবএ কোএ॥
বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি।
মেল ন মিলএ দেলহু হেম কোটি॥
বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ।
বাদর তর সসি বেকত ন হোএ॥
ভুজ-যুগ চাপ জীপ জৌ সাঁচ।
কুচ কাঞ্চন কোরী ফল কাঁচ॥
লগ নাহিঁ সবএ করএ কসি কোর।
করে কর বারি করহি কর জোর॥

প্রকারান্তরে কৃষ্ণমুখে :

হামে দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু
হামে হেরইতে তনু ঝাঁপ।
সুরত শিঙারে আজি ধনি আয়লি
পরশিতে থরথর কাঁপ॥

(শুন হে) কানুক ইহ অবধারি।
সকল কাজ হাম বুঝঁলু বুঝায়লুঁ
না বুঝলুঁ অন্তর নারী॥
অভিমত কাম নাম পুন শুনইতে
রোখই গুণ দরশাই।
অরি সম গঞ্জয়ে মন পুন রঞ্জয়ে
আপন মনোরথ সাই॥
অন্তরে জীউ অধিক করি মানয়ে
বাহিরে লাগয়ে উদাসে।
কহ কবিশেখর অনুভব জানলুঁ
বিদগ্ধ কেলি-বিলাসে।

মানে অক্ষম বা মৃদু :

সুন্দরি, উপদেস ধরিঅ ধরি
সুনু সুনু সুললিত বাণী।
নাগরিপন কিছু কহবা চাহ
কহলহু বুঝএ সয়ানী॥
কোকিল কূজিত কণ্ঠ বইসাওব
অনুরঞ্জব রিতুরাজে।
মধুর হাস মুখমণ্ডল মণ্ডব
ঘড়ি এক তেজব লাজে॥
কৈতব কএ কাতরতা দরসাঅব
গাঢ় আলিঙ্গন দানে।
কোপ কইএ পরবোধল মানব
ঘড়ি এক না করব মানে॥ ইত্যাদি

অপিচ,

মুখ যব মাজল রসিক মুরারি।
সুন্দরি রহলি করহি কর বারি॥
প্রেম সবহুঁ গুণ দুহুঁ করি লেল।
মুদল নয়নযুগল কর দেল॥
করে কর বারিতে উপজল হাস।
দুহুঁ পুলকায়িত গদগদ ভাষ॥

ঘ. **মধ্যা**—'মুগ্ধা'য় রতি-অভিলাষকে সমাচ্ছন্ন ক'রে প্রবল লজ্জাই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। 'মধ্যা'য় লজ্জা এবং রতিবাসনা সমান সমান। মধ্যা উদ্ভিন্ন-নবযৌবনা, বাক্যে স্বল্প প্রগল্‌ভা, নর্মবিলাস-প্রার্থিনী এবং মানবিষয়ে কখনো কোমলা কখনো রূঢ়া। যেমন গোবিন্দদাস :

বেণুক শবদ— দূত মঝু অন্তর
পৈঠল শ্রবণক বাট।

হৃদিমাহা ধৈরজ অর্গল তোড়ল
উঘারল কুল কবাট॥
(সখি) কানু সে বরজ বাটোয়ার।
মঝু মন-গৃহপতি নিজ জোরে বান্ধল
কছু নাহি কয়ল বিচার॥
তৈখনে মদন সদন আসি ঘেরল
বাধল ধরম রাখোয়াল।
ধন মান যৌবন সব হরি লেঅল
উজোরি প্রেম উজিয়াল॥
সরবস লেই পালটি যব যায়ব
গৃহ মাহা দেয়ল আগি।
গোবিন্দদাস দূরহি দূর কাঁপই
শরম ভরম ভয় ভাগি॥

সাধারণভাবে মানবিষয়ে মধ্যার স্বল্প মান আছে, আবার স্বল্প অনুনয়ে এবং মিলনব্যাকুলতায় সে মান সহজেই পরিহার করার প্রবণতাও আছে, যেমন—

সো মুখ-চন্দ নয়নে নাহি হেরলুঁ
নয়ন-দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলুঁ
মধুকরধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব॥
সজনি, কাহে বাঢ়ায়লুঁ মান।
প্রেম-ভঙ্গ ভয়ে অব জীউ কাতর
তুহুঁ পরবোধবি কান॥
সো কর-কিশলয়- পরশ উপেখলুঁ
অব কিশলয়ে তনু ফোর।
নব নব নেহ সুধারস নিরসলুঁ
গরলে ভরল তনু মোর॥...

—গোবিন্দদাস।

কিন্তু এই মধ্যা নায়িকা মানের অবস্থাভেদে ত্রিবিধা হতে পারেন—ধীরা, অধীরা, এবং ধীরাধীরা। অপরাধী প্রিয়কে কেবল বক্রোক্তি প্রয়োগ ক'রেই যিনি তৃপ্ত হন তিনি 'ধীরা', যেমন—

(মাধব) কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনি ঠামে॥
তোহোরি হৃদয়-অধিদেবী।
তাক চরণ যাউ সেবি॥
যো যাবক তুয় অঙ্গ।
ততহুঁ করহ পুন রঙ্গ॥

সোই পূরব তুয়া কাম।
কী ফল মুগুধিনী ঠাম॥
এত কহ গদগদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥

অধীরা মধ্যা, যেমন—

ধিক রহু মাধব তোহোরি সোহাগ।
ধিক রহু যো ধনি তোহে অনুরাগ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ।
কৈ তব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ॥
সহজই অনলে দগধ ভেল অঙ্গ।
কাহে দেহ আহুতি বচন বিভঙ্গ॥
সিন্দুর কাজর ভালহি তোর।
ছল করি চরণে লাগায়সি মোর॥
কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ বলরাম ইহ প্রেম-তরঙ্গ॥

অধীরা অবস্থায় কোপ এবং রূঢ়ভাষণ-প্রবণতা থাকে। মুহূর্তে ধীরা মুহূর্তে অধীরা একরকম মিশ্রাবস্থায় হবে 'ধীরাধীরা'।

গ. **প্রগল্‌ভা**—প্রগল্‌ভা দেহশোভার দিক থেকে পূর্ণযৌবনের অধিকারিণী, শৃঙ্গাররতিবিষয়ে যেমন সমুৎসুক তেমনি উপভোগক্ষমা, রতি-হাস-শোকাদির মুহুর্মুহু অনুভবের অভিজ্ঞতাময়ী, রসবিদগ্ধতায় নায়ক যাঁর অনুগত, যিনি চতুর-বচনপ্রয়োগে এবং শৃঙ্গারচেষ্টায় নিপুণা, এবং মানে নিতান্তই রূঢ়া।

মুগ্ধা এবং প্রগল্‌ভার মধ্যবর্তিনী মধ্যা নায়িকাকেই যদ্যপি কাব্যনাট্যে এবং রসশাস্ত্রে অভিনন্দিত করা হয়েছে, এবং ব্রজরমণীদের ও বিশেষভাবে শ্রীমতীর যদিচ মধ্যাত্বেই স্থিতি, তবু তাঁদের সাময়িক প্রগল্‌ভা অবস্থার বিষয় বিবেচনা ক'রে 'প্রগল্‌ভা'র উল্লেখ করা হ'ল। আসল কথা, একই নায়িকা সময় ও অবস্থাভেদে ভিন্নস্বভাবসম্পন্ন হয়ে মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভ তিনটি আখ্যাই পেতে পারেন। শ্রীমতীর প্রণয়াধিক্য ব'লে মানে কদাচিৎ কোমলা, কদাচিৎ বিহ্বলা, কদাচিৎ কর্কশা। কখনো কৃষ্ণের দর্শনেই পরিতৃপ্তা, কখনো সম্ভোগলালসাময়ী।

শ্রীরাধার 'প্রগল্‌ভা' অবস্থার আভাস নিম্নলিখিত পদগুলিতে পাওয়া যাবে। সম্ভোগ-শৃঙ্গারে, যথা—

কুটিল-কটাখ- বিশিখ ঘন বরিখনে
দূরে করি বিবিধ তরঙ্গ।
নিজ তনু ওদধি সরস পরশ দধি-
লেশে থকিত করু অঙ্গ॥
(সুন্দরি) পীতাম্বরী তুহুঁ ভেলী।

একলি হিলোলি শ্যামরসসায়র
সবহুঁ সার হরি লেলী॥
দুর-অবগাহ- অন্তর-মাহা মন্থর
মদন-কমঠ অবগাহি।
উচকুচমন্দর হারভুজগবর
মেলি মথন নিরবাহি॥
অধর সুধা প্রিয়- প্রেম লছমী হিয়
বাহিরে নখপদ চন্দ।
প্রতি তনু ভাব- রতনে পরিপূরল
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥

বক্রোক্তি-পরায়ণা, যথা—

ভাল হৈল আরে বঁধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু তোমারে বলিহারি যাই॥
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই ধর্‌য়াছে রূপ কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনি-মনোলোভা॥
সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনকথা আইলা কিবা কাজে॥

মানে অতিকঠিনা, যথা—

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনি মানিনি পালটি ন চাহ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চীত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর জুড়ি ঠাঢ়ি বদন পুন জোয়॥

'মধ্যা' শ্রেণীর নায়িকার মত প্রগল্‌ভাতেও ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা ভেদ থাকতে পারে। তা ছাড়া প্রগল্‌ভা জ্যেষ্ঠা এবং কনিষ্ঠা ভেদে দু'রকমের হতে পারেন। কন্যকা নায়িকা সবসময়েই মুগ্ধা হয়ে থাকেন।

এই মুখ্য তিন শ্রেণীর পরকীয়া নায়িকা প্রেমলীলায় এক এক পর্যায়ে এক একটি অবস্থার অধিকারিণী হন। সেই সব অবস্থার বিচারে উক্ত নায়িকারা আটপ্রকারের বৈচিত্র্য ধারণ করেন, যেমন—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকা। এর মধ্যে প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকা অবস্থা স্বকীয়া নায়িকারও হতে পারে। যদিচ পরকীয়াতেই এগুলির মাধুর্য এবং গৌরব সমধিক। এগুলি যথাক্রমে বর্ণিত হচ্ছে :

১. অভিসারিকা—অভিসার শব্দের অর্থ কোনো সংকেত-স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। সাধারণভাবে যে-কোনো মানুষের যে-কোনো স্থানের অভিমুখে, যেমন সৈনিকের রণক্ষেত্রের অভিমুখে। কিন্তু শব্দটি ক্রমশঃ প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষেত্রেই রূঢ় হয়ে পড়েছে।

একান্ত মিলনব্যাকুলা যে প্রেমিকা স্বয়ং অভিসার করেন অথবা প্রেমিককে নির্বাচিত মিলনস্থলে অভিসার করান তাঁকে অভিসারিকা বলা হয়। এর মধ্যে নায়িকার অভিসারই রম্যতার আধিক্যের জন্য কাব্যাদিতে মুখ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, অভিসারের মাধুর্য পরকীয়াতেই সীমিত। পরকীয়ার মধ্যে আবার পরোঢ়াতেই বৈচিত্র্যের সীমা। এজন্য বৈষ্ণব কাব্যে রাধিকার অভিসার কবিরা এত অভিনিবেশ সহকারে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ অভিসারেই নায়িকার প্রেমের চরম পরীক্ষা। প্রেমের জন্য নায়িকা কতদূর ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন—কুল, যশ, লজ্জা, মর্যাদা সমস্ত কিছুকে তৃণজ্ঞান ক'রে, স্বদেহ এবং প্রাণের প্রতিও মমত্ব বিসর্জন দিয়ে স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণের কিরকম পরিচয় দিতে পারেন তার কষ্টিপাথর হ'ল এই অভিসার। শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তিকে কল্পনায় দেখে পরবর্তী পদরচয়িতারা অভিসারের ব্যঞ্জনাপূর্ণ নতুন ছবি এঁকেছেন।

বিভিন্ন কাব্য থেকে উপাদান চয়ন ক'রে আলংকারিকেরা কুলবতীদের অভিসারকাল এবং তৎকালোচিত প্রসাধনের বর্ণনা দিয়েছেন। কাল হিসাবে যেহেতু রাত্রিই প্রশস্ত, সেজন্য অভিসারিকার মুখ্য দুই বিভাগ—তমোভিসারিকা এবং জ্যোৎস্নাভিসারিকা। তমোভিসারিকার পরিধেয় শাটী হবে নীল, নীলকুসুমের আভরণ থাকবে এবং তিনি মৃগমদে অঙ্গ বিলিপ্ত করবেন। অপরপক্ষে জ্যোৎস্নাভিসারিকার পরিধেয় হবে শুভ্র ক্ষৌমবস্ত্র, তিনি মল্লিকার মত শ্বেতপুষ্পের মাল্য ধারণ করবেন এবং সর্বাঙ্গে চন্দনচর্চা করবেন। সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা মঞ্জীর-বলয়াদি আভরণকে নীরব ক'রে রাখার ব্যবস্থা করবেন এবং আত্মগোপনের জন্য অবগুণ্ঠনবতী হবেন, আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দেহের মধ্যে যতদূর সম্ভব মিলিত ক'রে পথ চলবেন—'সংলীনা স্বেষু গাত্রেষু মূকীকৃতবিভূষণা'।

শ্রীমতীর ভাবব্যাকুলতার কালাকাল-হীনতার বিষয় উপলব্ধি ক'রে বৈষ্ণব পদাবলীতে মহাজনেরা দিবাভিসারও (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন প্রভৃতি) বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া মূল বর্ষাভিসারের অনুসরণে হেমন্ত, শিশির, বসন্ত প্রভৃতি ঋতু-সময়োচিত অভিসারেরও সন্নিবেশ করেছেন। গোবিন্দদাস কবি রাজের নিম্নলিখিত পদটিতে তিমিরাভিসার বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে, ভাবে এমনকি রূপেও কৃষ্ণময়ী রাধিকার একটি অপূর্ব ছবি ফুটে উঠেছে। পদটির কাব্যাংশ সংস্কৃত থেকে গৃহীত হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব রাধাভাবের সমন্বয়ে তা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে :

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল॥
হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেলী শ্যামরী
কুহু যামিনী ভয় ভাগি॥

নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যামর সায়রে
লখই ন পারই কোই॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করু ঝংকার।
গোবিন্দদাস অতএ অনুমানল
রাই চললী অভিসার॥[১]

বর্ষণতিমিরাভিসারে শ্রীমতীর দুঃখবরণের চিত্রও গোবিন্দদাস এঁকেছেন :

(মাধব) কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ।
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির-দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভূজঙ্গ॥
এলে কুলকামিনী তাহে কুহু-যামিনী
ঘোর গহন অতিদূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পুর॥ ইত্যাদি

জ্যোৎস্নাভিসার, যথা--

সুন্দরী, মাধব তুয়া পথ হেরই
তুরিতে করহ অভিসার॥
গগন উপরে উয়ল বিধুমণ্ডল
বিমল কিরণ পরচার॥
সমুচিত বেশ করহ বর চন্দন
কপূর খচিত করি অঙ্গ।
দুগ্ধফেন-সিত অম্বর পহিরহ
কুঞ্জহি চল নিঃশঙ্ক॥
চরণ কমলে নূপুর তেজি সুন্দরী
চল তাহে শব্দ-রহিত।
এতহিঁ বচনে চললি বর-রঙ্গিণী
মনসিজ মদে উলসিত॥

---

১. মূর্তির্নীলদুকূলিনী মৃগমদৈঃ প্রত্যঙ্গপত্রক্রিয়া
বাহূ মেচকরত্নকঙ্কণভৃতৌ কণ্ঠেম্বুসারাবলী।
ব্যালম্বালকমঞ্জরীকমলিকং কান্তাভিসারোৎসবে
তৎ সত্যং তমসা মৃগাক্ষি বিহিতং বেশে তবাচার্যকম্॥

শ্রীরূপ বিধান দিয়েছেন যে নায়িকা একাকিনী যাবেন, তবে স্নিগ্ধা একজন সখী সঙ্গে থাকতেও পারে। তদনুযায়ী সখীসহ শ্রীমতীর অভিসারের চিত্র তুলে ধ'রে এর রূপসৌন্দর্যও ফুটিয়ে তুলেছেন কবি অনন্তদাস :

ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিণী রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী
সাজলি শ্যামবিহারে॥
চলইতে চরণ সঞে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥
কনকলতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী-রনরনি বঙ্করাজ-ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে॥
হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখী-কান্ধে।
অনন্তদাস ভণে মিললি কুঞ্জবনে
পুরইতে শ্যাম-মন-সাধে॥

সৌন্দর্য-আসক্ত কবি বিস্মৃত হয়েছেন যে কুলবধূরা অভিসারে যেতে অলংকারশিঞ্জিত সংগোপনই করবেন। মহাপ্রভুভাবে ভাবিত জ্ঞানদাসেরও অনুরূপ বিস্মৃতি-বিহ্বলতা ঘটেছে যখন তিনি রবাব-বেণু-বীণার নিনাদসহ শ্রীমতীর অভিসার-যাত্রা বর্ণনা করেছেন :

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমেল করিয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল জয় জয় দিয়া॥
নূপুরের রুনুঝুনু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে রাই আইল পারা॥

এ কীর্তন-মহোৎসবে বিলসিত মহাপ্রভুর চিত্র। এ প্রভাব স্বাভাবিক। আবার নিম্নলিখিত অংশে ভাব-ব্যাকুল অবস্থায় ধাবমান মহাপ্রভুর চিত্রাঙ্কনও স্বাভাবিকই হয়েছে :

সখীগণ সঙ্গ তেজি চলু একেসরি
হেরি সহচরীগণ ধায়।
অদভূত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥
চললী কলাবতী অতিশয় রসভর
পন্থ বিপথ নাহি মান।

২. **বাসকসজ্জা**—স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহং চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥

কথা আছে, প্রিয় এখানে আসবে, এমন ভাবনায় ব্যাকুলা যে নায়িকা নিজ গৃহ শৃঙ্গারানুকূল ভাবে সজ্জিত এবং দেহ প্রসাধিত করেন তাঁকে বাসকসজ্জা বলা হয়ে থাকে।

এই অবস্থায় নায়িকা, প্রিয় এলে কিভাবে অভ্যর্থনা করবেন আর মিলনাবস্থাতেই বা কী করবেন, এই সব চিন্তা ক'রে অভিভূত অবস্থায় থাকেন, পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন, সখীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করেন, মুহুর্মুহু দূতীর অনুসন্ধান করতে থাকেন। কবি জয়দেবের বর্ণনে বাসকসজ্জার প্রত্যাশা এবং তন্ময়তার চিত্র অপূর্ব হয়েছে। দূতী কৃষ্ণসমীপে শ্রীরাধার অবস্থা বলছেন :

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্॥
নাথ হরে। সীদতি রাধা বাসঘরে॥
ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী॥
বিহিত-বিশদ-বিস-কিশলয়-বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া॥
মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিত-লজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা॥

৩. **উৎকণ্ঠিতা**—অথবা বিরহোৎকণ্ঠিতা। এ বাসকসজ্জারই পরবর্তী অবস্থা। 'প্রিয়ের অন্য নারীর প্রতি কোনো সমাদর নেই অথচ তিনি বিলম্ব করছেন কেন'—এমন ভাবনায় যে নারী বিলম্বিত রজনীতে প্রতীক্ষমাণা অবস্থায় নিতান্ত ব্যাকুল হন তাঁকে উৎকণ্ঠিতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন—

হাম রহু সংকেত অনত রহু কান॥
একলি কুঞ্জে কুসুমশর হান॥
হৃদয়ে জলত মঝু আগি।
কঠিন পরান রহত কথি লাথি॥
যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই॥
কুলবতী চরিত পিরিতি লাগি খোই।
হা হা হরি করি কাননে রোই॥
পন্থ নেহারি নয়ন রয় লাগি।
টুটত রজনী বাঢ়ত অনুরাগি॥... ...গোবিন্দদাস।

৪. **বিপ্রলব্ধা**—'প্রিয়ঃ কৃত্বাপি সংকেতং যস্যা নায়াতি সন্নিধিম্'—সংকেতস্থান এবং সময় ঠিক করেও প্রিয় যদি না আসেন তাহলে নিতান্ত অবমানিতা এবং ব্যথিতা নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা অর্থাৎ বঞ্চিতা বিরহিতা বলা যাবে। যেমন—

গাঁথল পদুমিনী ভেল ভুজঙ্গ।
গরল উগারল মলয়জ-সঙ্গ॥
কুসুমশেজ ভেল শর-পরিষঙ্ক।
বজর-নিপাতন মধুকর-কঙ্ক॥
কোই নহত অনুকূল।
পাওলুঁ হরি সঞে প্রেমক মূল॥
কি করব কাহে পুন এহ।
যাওব কাঁহা নাহি পাইয়ে থেহ॥
দৈবক দোষ বুঝিয়ে অনুমান।
অতনুহ তনু ধরে কতহুঁ বিধান॥
কৈছন জীউ রহত ইহ দেহ।
নাশক ভেল মঝু বাসক গেহ॥
হরি রহ কৌন কলাবতী পাশ।
আওত কহ ঘনশ্যামর দাস॥

৫. **খণ্ডিতা**—শপথ উল্লঙ্ঘন ক'রে নায়ক অন্যনারীসমাগত হয়ে এমনকি সেই সমাগমের চিহ্ন বেশবাসে ও দেহে ধারণ ক'রে যে-নায়িকার কাছে প্রভাতে এসে দেখা দেন সেই নায়িকাকে 'খণ্ডিতা' বলা হয়ে থাকে। এই অবস্থায় নায়িকার রোষ, দীর্ঘশ্বাস, নীরবতা প্রভৃতি চেষ্টা দেখা যায়। যেমন শ্রীমতী :

দেখ সখি হোয় কিয়ে নাগররাজ।
বিপরীত বেশ বিভূষণ হেরিয়ে
কোন কয়ল ইহ কাজ॥
ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত
আওত ইহ মঝু কান্ত।
স্থলপঙ্কজদল মুদিত নয়নযুগ
যামিনী জাগি নিতান্ত॥
মুখবিধুরাজ মলিন অব হেরিয়ে
অরুণ-কিরণ ভয় লাগি।
অলক-নিকর উড় ভালগগন পর
নিশি অবসান ভয় ভাগি।**
টলমল চরণ যুগল মণিমঞ্জীর
ঝনন ঝনন ঝন বাজে।
কহ বলরাম দাস হই বিপরীত
হেরত নাগররাজে॥

এ বিষয়ে আরও দৃষ্টান্ত পরবর্তী 'মান' বর্ণন অংশে 'নখপদ হৃদয়ে—' প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

খণ্ডিতার পরবর্তী অবস্থা নিঃসন্দেহে মানের। তবু 'মানিনী' হিসাবে নায়িকার এখানেই যে বিভাগ করা হ'ল না, তার কারণ বোধহয় এই যে, মানকে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের অন্যতম পর্যায় রূপে বিবেচনা করা হয়েছে। এ কেবল নায়িকার অবস্থা-বৈচিত্র্য হিসাবে গণনার যোগ্য নয়।

৬. **কলহান্তরিতা**—খণ্ডিতা অবস্থা এবং তদনুসারী মানের মধ্যে একটা কলহের ভাব থাকে। সেই কলহ অনুতাপের দ্বারা অন্তরিত অর্থাৎ দূরীভূত হ'লে নায়িকার যে অবস্থা হয় তা কলহান্তরিতার, যেমন—

আন্ধল প্রেমে পহিল নাহি হেরলুঁ
সো বহু-বল্লভ কান।
আদর-সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥
(সজনি) তোহে কহি মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সো তাপিনী জগমাহ॥
যো হাম মান বহুত করি মানল
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ- শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহ সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক নেহ॥

৭. **প্রোষিতভর্তৃকা**—কার্যব্যপদেশে প্রণয়ী প্রোষিত (= প্রবাসগত) হ'লে প্রণয়িনীকে প্রোষিতভর্তৃকা বলা হয়। শ্রীমতীর ক্ষেত্রে ভর্তা শব্দটিকে লৌকিকভাবে গ্রহণ না ক'রে উপপতি কৃষ্ণকেই বুঝতে হবে। পূর্ব-প্রচলিত রসশাস্ত্র যা মোটামুটি স্বকীয়ার প্রণয়ই অঙ্কন করেছে, তা থেকে শব্দটি অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে।

'মাথুর' পর্যায়ে শ্রীমতীর অবস্থা প্রোষিতভর্তৃকার। এই অবস্থায় নায়িকা প্রিয়ের গুণকীর্তন ও বিলাপ করেন। তাঁর মানসিক চিন্তা ও শূন্যতাবোধ, দেহে মালিন্য ও জড়তা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বিদ্যাপতি :

পিয়া গেও মধুপুর হাম কুলবালা॥
বিপথ পড়ল যৈছে মালতীমালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিনরজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়াসঞ সুখ মঝু পাস॥

পরে 'মাথুর' পর্যায়ের বর্ণনায় প্রোষিতভর্তৃকার আরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে।

৮. **স্বাধীনভর্তৃকা**—নায়িকার যে অবস্থায় নায়ক কেবল তাঁর সদাসমীপবর্তী থাকেন এমনই নয়, অধিকন্তু প্রণয়ের অধিকার-গর্বিতা নায়িকার ইঙ্গিতে তাঁর প্রসাধনাদি কার্যও সম্পাদন করে দেন, সেই অবস্থার নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা যায় : স্বাধীনভর্তৃকার মধ্যে যার সঙ্গ কৃষ্ণ কখনোই ত্যাগ করেন না তাঁকে "মাধবী" বলা হয়। যেমন গীতগোবিন্দ :

"রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুধ কপোলয়োঃ" ইত্যাদি।

অথবা, গোবিন্দদাস :

(ধনি ধনি) রমণী-শিরোমণি রাই।
নয়নক ওত করত নাহি মাধব
নিশি-দিশি রস অবগাই॥
করতল-কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে পুন পুন হেরই
আকুল গদগদ বোল॥
লোচন-খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি-মূল।
অতসী-কুসুম-সিরি ললিত হৃদয়ে ধরি
কৃপণ হেম সমতুল॥
যাবক-চীত চরণ পর লিখই
মদন-পরাজয়-পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল
কানুক আরকত হাত॥

প্রণয়গত ঔদার্যের বিষয় গণনা করে ঐসব গোপরমণীদের উত্তমা মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা ভেদও কল্পনা করা যায়।

এর পূর্বে রাধা, চন্দ্রাবলী, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা প্রভৃতি যেসব যূথেশ্বরীর কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ-রক্ষণের দিক্ থেকে স্বভাবভেদ নিরূপণ করতে গিয়ে শ্রীরূপ অধিকা, সমা ও লঘু এবং এদের প্রত্যেকের প্রখরা, মধ্যা ও মৃদু এই নয় প্রকার বিভেদ দেখিয়েছেন। এরকম শ্রেণীবিন্যাসের ফলে স্বভাবের দিক থেকে এদের সমতা ও বিরুদ্ধতা বোঝার সুবিধা হয়।

নায়িকা-দূতী প্রসঙ্গ

পরকীয়া রতির ক্ষেত্রে দূতীর গুরুত্বের বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। নায়িকাপক্ষে যা বিশেষ তা-ই বলা হচ্ছে। স্বয়ংদূতী এবং আপ্তদূতী। রাগবশে ব্যাকুলা হয়ে লজ্জা ত্যাগ করে, মনোভাব মিলনকাল প্রভৃতি নিজে জানিয়ে এলে নায়িকাকে স্বয়ংদূতী বলা যায়। স্বয়ংদৌত্যে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন তিন রীতিতে হতে পারে। বাচিক, আঙ্গিক এবং চাক্ষুষ। বাচিক অভিপ্রায় প্রকাশ প্রায়শই ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে করতে হয়। এই ব্যঞ্জনা ধ্বনিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে

শব্দোদ্ভব হতে পারে, অর্থোদ্ভব হতে পারে। বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে যদি ব্যঙ্গ্যার্থ আনা যায় তাহলে ব্যঞ্জনা হবে শব্দোদ্ভব। আর শব্দভঙ্গির উপর জোর না দিয়ে বাচ্যার্থের সাহায্যে অভিপ্রেত ব্যঙ্গ্যার্থ জানাতে চাইলে বাচিক অভিযোগ হবে অর্থোদ্ভব। এছাড়া কোনো বিষয়ে শব্দে বা অর্থে নিষেধ জানিয়ে যদি সেই বিষয়ে প্রবৃত্তিই আসলে বোঝানো হয়, তেমন আক্ষেপমূলক ব্যঞ্জনা স্বয়ংদৌত্যে থাকলে তা চমৎকার হবে। অন্য কোনো বিষয়ের বর্ণনার ছলে স্বাভীষ্ট নিবেদনও আর এক বক্রতা। শৃঙ্গাররসের ব্যাপারটি নিতান্ত রমণীয় বলে এর বচনবিন্যাসেও রমণীয়তা রক্ষা করতে হয়। স্বয়ংদৌত্যে এরকম নানাপ্রকারে রসচমৎকার রক্ষা করা যায়।

স্বয়ংদৌত্য

সংস্কৃত-প্রাকৃত কাব্যে এভাবে ছল, আক্ষেপ, প্রভৃতির সাহায্যে-নায়িকার গূঢ় বাচিক আত্মরতিজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। পদাবলী থেকে দুটি দৃষ্টান্ত সমাহৃত হল :

পতি অতি দুরমতি কুলবতী নারী।
স্বামীবরত পুন ছোড়ি না পারি॥
তেঁ রূপযৌবন একু নহ উন।
বিদগধ নাহ না হোয় নিপুণ॥
এ হরি অতয়ে দেখায়ব পন্থ।
পূজব পশুপতি গৌরী একন্ত॥
সহজে বধূজন গতি-মতি-হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ নাহি চিন॥
না মিলল কোই বনহিঁ বন আন।
অনুসরি মুরলী আয়লুঁ এহি ঠাম॥
আয়লুঁ দূর পূরব নিজ সাধে।
একলী বোলি করহ জনু বাধে॥
তুঁহু যৈছে গোরী আরাধলী কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥

'আমার স্বামী অবিদগ্ধ, আমার রূপযৌবন ব্যর্থ হচ্ছে, সেজন্য পশুপতি পূজা করতে এসেছি। বহুদূর অরণ্য, আমি একাকিনী।' এরকম উক্তিতে শব্দ এবং অর্থ দুয়েরই উপর নির্ভর করে কৃষ্ণের কাছে শ্রীমতী অভিপ্রায় ব্যঞ্জিত করছেন। অপিচ ঘনশ্যামদাসের :

শীতলকর কর পরশহি মীঠ।
যাহে হেরি নিরমল হোওত দীঠ॥
এ হরি তোহোরি তিলক নিরমাণে।
হেরি নিশাপতি করি অনুমানে॥
অতএ সে লোচন পুন পুন চাহ।
ইথে জনি আন বুঝবি মন মাহ॥
বিধিনিরমিত কছু কহন ন জাত।
দিনপতি দরশনে দিঠি জরি যাত॥
কহ ঘনশ্যামদাস সুখ গোই।
কহইতে আন আন জনি হোই॥

এখানে অন্য বিষয়ের বর্ণনচ্ছলে স্বাভিপ্রায়-প্রকাশ। 'হে কৃষ্ণ, তোমার মুখের দিকে আমি তাকাচ্ছি না, তোমার চন্দনের ফোঁটা চাঁদের মত বলে চাঁদ দেখে চোখ ঠাণ্ডা করছি। সূর্য দেখে দেখে চোখ জ্বলে গেল যে'—এরকম উক্তি যে কৃষ্ণ আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করবেন না তা বলাই বাহুল্য।

আঙ্গিক স্বাভিপ্রায় প্রকাশের তালিকায় এই ব্যাপারগুলির উল্লেখ করা হয়েছে—অঙ্গুলি স্ফোটন, বক্ষ বদনাদি আচ্ছাদনের দ্বারা সম্ভ্রম জ্ঞাপন, চরণাঙ্গুলির দ্বারা ভূলেখন, কর্ণকণ্ডূয়ন, তিলকক্রিয়া, ভ্রূকম্পন, অধরদংশ, বেশসজ্জা, মণ্ডনশিঞ্জন, হারাদিগুম্ফন, সখী-আলিঙ্গন, সখী-তাড়ন, বাহুমূল প্রদর্শন, নায়কনামলেখন, এবং তরুতে লতাসংযোগ প্রভৃতি।

চাক্ষুষ অভিযোগের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে—নেত্রস্মিত, নেত্র-উন্মীলন, নেত্রান্তে দর্শন, নেত্রান্ত-সংকোচন, বক্রদৃষ্টিক্ষেপ, বামনেত্রে দর্শন এবং কটাক্ষ প্রভৃতি।

শ্রীমতীর আপ্তদূতীদের অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারিণীর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছেন শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, তপস্বিনীবেশধারিণী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী প্রভৃতি।

আপ্তদূতী

প্রয়োজনবশে সখীরাও দৌত্যে নিযুক্ত হন। সখী-দৌত্য নায়ক-নায়িকা উভয়নিষ্ঠ হয়ে থাকে এবং প্রকাশের দিক্ দিয়ে বাচ্য এবং ব্যঙ্গ্য রূপ লাভ করে।

সখী-প্রসঙ্গ

সখী তাঁরাই যাঁরা পরস্পরের মধ্যে আত্মাধিক প্রণয় পোষণ করেন, যাঁরা পরস্পর একান্ত বিশ্বস্ত এবং বয়স, বেশভূষা, রূপমাধুর্য, বিলাস-বৈদগ্ধ্যে যাঁরা সমান। পূর্বে কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীরাধার যূথবর্তী সখীসমূহের বিষয় উল্লেখ করে তাঁদের সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠসখী এই পাঁচ বিভাগ দেখানো হয়েছে। বর্তমানে সমস্ত যূথের সখীদের বিষয় সাধারণভাবে বলা হচ্ছে।

রাধাকৃষ্ণ-লীলায় সখীর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। লৌকিক অলংকার শাস্ত্রে সখীবিষয়ে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, মিলন সমস্ত ব্যাপারেই সখীরা এই প্রেমলীলাকে পুষ্ট করে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধতর করে তোলেন। "প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্ বিস্তারিকা সখী।" চরিতামৃতে এই লীলায় সখীভাবের গুরুত্ব ও সখীর স্থান রায়রামানন্দ-মুখে নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত হয়েছে—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতিগূঢ়তর॥
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর।
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলালা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পুষ্প পল্লব পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

সখীসমূহ হল শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। ভেদাভেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ। রাধাপ্রেম বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হলেই এঁদেরও সুখের চরমতা। প্রণয় কামহীন বিশুদ্ধ বলেই এরকম হওয়া সম্ভব। অপিচ—

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তাঁ সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম-ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥

সখীদের মধ্যে যূথেশ্বরী, অযূথেশ্বরী এবং যূথহীনা কতিপয়ের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যূথেশ্বরীদের মধ্যে অধিক, সম, লঘু এবং তাদের প্রখর, মধ্য, মৃদু প্রভৃতি বিভেদের যে পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে তা এঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক এক যূথে অবস্থিত গোপীদের মধ্যে অধিকা প্রখরা প্রভৃতি ভেদ রয়েছে। সখীদের মধ্যে যাঁর প্রেম, সৌভাগ্য এবং বিভিন্ন সদ্‌গুণ অধিক তিনি অধিকা। যূথেশ্বরীমাত্রেই অত্যন্তাধিকা। এঁরা কেউ বা প্রখরা, কেউ বা মৃদু, কেউ সম। প্রখরা হচ্ছেন সতত গৌরবযুক্তা, গরবিনী। এঁর বাক্য দুর্লঙ্ঘ্য। ইনি কখনো কারোর অতিবশংবদা হন না। এঁদের মধ্যে অধিকপ্রখরা হলেন শ্যামা, মঙ্গলা প্রভৃতি। অধিকমধ্যা হলেন শ্রীরাধা, পালিকা প্রভৃতি। অধিকা-মৃদু হলেন চন্দ্রাবলী, ভদ্রা প্রভৃতি। যূথেশ্বরীদের চেয়ে লঘু যে সব সখী (যেমন ললিতা, বিশাখা, চিত্রা প্রভৃতি) তাঁদের মধ্যে

সখীভেদ

একের তুলনায় অন্যে অধিকা হলে আপেক্ষিক-অধিকা হয়। আপেক্ষিক-অধিকারও প্রখরা, সমা, মৃদ্বী বিভেদ আছে। বলা বাহুল্য, এসব বিভেদ পারস্পরিক তুলনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাধিকার যূথে ললিতাদি আপেক্ষিক প্রখরাধিকা, বিশাখাদি অধিকমধ্যা, চিত্রা, ময়ূরিকা প্রভৃতি অধিকমৃদ্বী। একাত্মতার জন্য প্রণয়ে যাঁরা পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠ তাঁরা হলেন সম। এঁদের মধ্যে প্রখরাদি ভেদ থাকলেও প্রণয়ে তা কতকটা সাম্য লাভ করে। কৃষ্ণপ্রেমসৌভাগ্যাদির আধিক্য নেই এমন যাঁরা, তাঁরা লঘু। লঘুরা অত্যন্তাধিকা যূথেশ্বরীদের বিশেষ অনুকূলভাবে সব কাজ করেন। বস্তুতঃ যাওয়া-আসা, কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসা প্রভৃতি ব্যাপারে এই লঘুরাই বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকেন। লঘুদের দুই ভেদ —আত্যন্তিকী এবং আপেক্ষিকী। কুসুমিকাদি হলেন আত্যন্তিকী। শ্রীরাধার

তুলনায় ললিতাদি হলেন আপেক্ষিক লঘু। ললিতা আপেক্ষিক লঘু হয়েও প্রখরা। লঘুপ্রখরা সখীরা বামা এবং দক্ষিণা এ দুই শ্রেণীতে চিহ্নিতা হতে পারেন। বামা বলতে মান-বিষয়ে উৎসাহিনী, মানের শিথিলতায় কোপনা, নায়ক কর্তৃক প্রায়শঃ অভেদ্যা এবং নায়কের প্রতি নিষ্ঠুরাকে বোঝায়। যে নায়িকা এর বিপরীত তিনি মানভঙ্গে সুখী, যুক্তিবাদিনী এবং নায়কের প্রতি দক্ষিণা। লঘুমধ্যা এবং লঘুমৃদু সখীদের স্বভাবও অনুরূপভাবে কল্পনীয়। সখীদের ভেদ এইভাবে বারো রকমের দাঁড়ায়। অত্যন্তাধিকা, আপেক্ষিক-অধিকা, আপেক্ষিকসমা এবং আপেক্ষিক-লঘু এর প্রত্যেকের প্রখরা মধ্যা ও মৃদুভেদ। তা ছাড়া আত্যন্তিক সমা ও লঘু।

এঁদের দৌত্য বিষয়েও শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। অত্যন্তাধিকারা হলেন নিত্যনায়িকা, এঁদের মুখ্যদূতীভাব নেই, গৌণদূতীত্ব আছে। গৌণদৌত্য সমক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়বিধ। সমক্ষ দৌত্য সাংকেতিক অথবা বাচিক। সখীদ্বারা সখীর প্রেরণে পরোক্ষ দৌত্য হয়। এর মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত করাবার জন্য ছলপূর্বক সখীপ্রেরণও আছে। সাধারণভাবে লেখ্য, উপহার প্রেরণ পরোক্ষ দৌত্যের অন্তর্ভূত। নিত্যনায়িকার যাঁরা সখী সেই আপেক্ষিক-অধিকাদের নায়িকাপ্রায়া বলা হয়। আপেক্ষিক-সমাদের কখনো নায়িকার মত কখনো সখীর মত হতে হয়। অপেক্ষিক-লঘুরা সখীপ্রায়া আর আত্যন্তিক লঘু যাঁরা, তাঁরা নিত্যসখী। সর্বলঘু বলে এঁদের নায়িকাত্ব অসম্ভব। নিত্যসখীদের নায়িকাত্বে আগ্রহ থাকে না, কৃষ্ণ ইচ্ছা করলেও তাঁরা মিলনে সম্মত হন না। আপেক্ষিক-অধিকা প্রভৃতিদের মধ্যে কেউ কেউ নায়িকা হতে স্বল্প উৎসুক, কেউ কেউ একেবারে উৎসুক নন।

সখীকার্য

সাধারণভাবে সখীদের কাজ হল নায়ক বা নায়িকার কাছে তাঁদের পারস্পরিক প্রণয়-বিষয়ে প্রশংসা, পরস্পরের অসক্তিবর্ধন, অভিসার-সহায়তা, কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ, আশ্বাস, পরিহাস, শৃঙ্গারসজ্জাবিধান, পাখা-চামর প্রভৃতির দ্বারা সেবন, হৃদয়ভাব-উদ্‌ঘাটন, নায়িকার দোষত্রুটি আচ্ছাদন, নায়িকার পতি শ্বশ্রূ প্রভৃতিকে বঞ্চনা, হিত-উপদেশ দান, প্রয়োজনে মানাদি ব্যাপারে উভয়ের দোষ দেখিয়ে শিক্ষণ, সংবাদপ্রেরণ এবং নায়িকার জীবনরক্ষার প্রয়াস। এই সখীবৃন্দের কেউ কেউ নায়ক-নায়িকাতে সমান স্নেহ পোষণ করেন, কেউ বা নায়িকায় কেউ বা নায়কে অধিক স্নেহ ব্যক্ত করেন। এই হিসাবে এঁদের সমস্নেহা অসমস্নেহা বিভাগও করা যায়।

সেবিকা বা মঞ্জরী

রাগানুগ ভক্তি-সাধনায় ভক্তদের কাছে মঞ্জরী-ভাবের সাধনা নিতান্ত প্রার্থিত। মঞ্জরীরা সখীব্যূহের অন্তর্গত প্রধানা সখীদের অনুগামিনী রাধাকৃষ্ণ-সেবিকা মাত্র। সখীর সঙ্গে মঞ্জরীর পার্থক্য এই যে, সখীরা কদাচিৎ কৃষ্ণসঙ্গ-অভিলাষিণী হন, শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কখনো স্বেচ্ছায় সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন ঘটান এবং কৃষ্ণও তাঁদের অন্তরের ব্যক্ত বা অব্যক্ত অভিলাষ বুঝে সঙ্গসুখদানে কৃতার্থ করেন। কিন্তু মঞ্জরীদের কৃষ্ণসঙ্গাভিলাষ বিন্দুমাত্র থাকে না এবং কৃষ্ণ সঙ্গ দিতে চাইলেও তাঁরা ঐ অধিকার গ্রহণ করতে চান না। রাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জসেবা—তাঁদের বেশসজ্জা, গৃহসজ্জা, ব্যাজন, কর্পূরতাম্বুল প্রদান, পানীয় প্রক্ষালনাদির আয়োজন—এসব দায়িত্ব মঞ্জরীরা স্বেচ্ছায় সানন্দে গ্রহণ করেন।

সেবানন্দে যে পরম পরিতৃপ্তি তা-ই তাঁদের কাম। শ্রীরূপ তাঁর স্তবমালায় এবং অন্যত্রও মঞ্জরী-ভাব-সাধনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী এবং এঁদের অনুসরণে নরোত্তমদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ সাধকেরা মঞ্জরী-ভাবে কুঞ্জসেবার অধিকার প্রার্থনা করেছেন। এজন্য তাঁরা প্রকৃতি-ভাব অবলম্বন করেছেন। শুধু সাধনার অঙ্গ হিসাবেই নয়, সিদ্ধদেহেও তাঁরা সেবানন্দের অধিক কিছু প্রার্থনা করেননি। শ্রীরঘুনাথ দাস বলেছেন :

হে ভামিনি কবে পদাম্বুজ দুই তব।
জলধার দিয়া তাহা প্রক্ষালন করিব॥
গৃহান্তরে বসাইয়া নিজ বেশ দিঞা।
মার্জন করিব তাহা আনন্দ করিঞা॥
প্রাতঃকালে কর্পূরমিশ্রিত সুবাসিত।
যত্ন করি আনি জল মৃত্তিকা সহিত॥
এই সব সেবা দেবি কবে দিবা মোরে।
সেবা করি বসাইব পুন স্নান তরে॥
অভ্যঙ্গ করিবে আর গন্ধ তৈল পুরি।
উবটন করিবে কবে এ নব কিঙ্করী॥
গন্ধকর্পূর পুষ্প সুবাসিত বারি।
কলসী কলসী সুবাসিত জল ভরি॥
প্রণয়ে ললিতা সখী আগে আনি দিব।
তব বর-অভিষেক হা কবে করিব॥ ইত্যাদি[১]

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা হল :

ছাড়িয়া পুরুষদেহ
কবে হাম প্রকৃতি হইব।
টানিয়া বান্ধিব চূড়া
নবগুঞ্জা তাহে বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে
পরাইব সখীসঙ্গে
বদনে তাম্বূল দিব আর॥
দুহুঁ রূপ মনোহারী
সেখিব নয়ন ভরি
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া। ইত্যাদি।

বিখ্যাত বৃন্দাবনের ছ'জন গোস্বামী মঞ্জরী-ভাবের সাধনার জন্য দ্বাপরলীলার বিভিন্ন মঞ্জরীরূপে পরিগণিত হয়েছেন, যেমন শ্রীরূপ হলেন রূপমঞ্জরী, শ্রীসনাতন লবঙ্গমঞ্জরী, শ্রীজীব বিলাসমঞ্জরী, শ্রীরঘুনাথদাস রতিমঞ্জরী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট রাগমঞ্জরী, এবং শ্রীগোপালভট্ট গুণমঞ্জরী।

১. ডঃ শুকদেব সিংহ কর্তৃক 'শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

সখী প্রসঙ্গের উপসংহারে শ্রীরূপ যূথেশ্বরী ও যূথানুগতাদের স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, বিপক্ষ এবং তটস্থ পক্ষের বিষয় উত্থাপন করেছেন। প্রেমলীলারসের পরিপুষ্টির জন্য সখীদের এরকম পক্ষাপক্ষ অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রীরাধা বা চন্দ্রাবলীর বিপক্ষতা প্রণয়লীলাকে বক্রভাবে রমণীয়ই করে তোলে। পরিবেশ ও ঘটনা-সংস্থান হিসাবে এরকম বক্রতার সংখ্যা অগণিত। ভাবের সজাতীয়তায় স্বপক্ষতা, স্বল্প বিজাতীয়তায় সুহৃৎপক্ষতা, সাজাত্যের অল্পতা, তটস্থতা এবং বিজাতীয়তায় বিপক্ষতা নির্ধারণ করা যায়। স্বপক্ষ সর্বতোভাবে আনুকূল্য করে, সুহৃৎপক্ষ অভিলাষিত ব্যাপার ঘটায় এবং অনভিলষিত ব্যাপারে বাধা দেয়, তটস্থ কার্যক্ষেত্রে ঔদাসীন্যের দ্বারা বিপক্ষেরই সুহৃৎপক্ষের কাজ করে এবং বিপক্ষ ইষ্টনাশ ও অনিষ্টসাধন করে থাকে। শ্রীরূপেব প্রদত্ত দৃষ্টান্তে সখী পদ্মার চতুরতা ধৃষ্টতা, চাপল্য প্রভৃতির দ্বারা বিপক্ষভাবে রসের রম্যতা বর্ধনের প্রয়াস দেখা যায়।

বিভাবে উদ্দীপন

আলম্বন বিভাবে অর্থাৎ নায়কপক্ষ এবং নায়িকাপক্ষের যাবতীয় বৈচিত্র্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণসহায়, কৃষ্ণপ্রেয়সীবৃন্দ, সখী, দূতী প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। এখন শৃঙ্গার-স্থায়ীভাবের উদ্দীপনকারক যে সব বিষয় বা বস্তু, তার কথা বলা হচ্ছে। রাধাকৃষ্ণ বা গোপীকৃষ্ণ উভয়পক্ষেই ভাবস্থিতির জন্য উদ্দীপনও উভয়পক্ষীয় বলে পরিগণিত হবে।

প্রথমে গুণ। গুণ তিন প্রকারের : কায়িক, বাচিক, মানসিক। কায়িক হল বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য, সুকুমারতা প্রভৃতি। বয়স বলতে কৈশোর—প্রথম কৈশোর, মধ্য কৈশোর, পূর্ণ কৈশোর বা তারুণ্য। প্রথম কৈশোরের মধ্যে আবার বয়ঃসন্ধির রমণীয়তা। রূপ অর্থাৎ সহজ অঙ্গশোভা। লাবণ্য অর্থাৎ মুক্তার মধ্যবর্তী দর্পণের প্রতিভাস্বরূপ বস্তুর।[১] সৌন্দর্য অর্থাৎ গঠনের মনোরম সামঞ্জস্য। অভিরূপতা অর্থাৎ নিজগুণের দ্বারা নিকটবর্তী অন্যকেও সেরূপ গুণময় করে তোলা। মাধুর্য অর্থাৎ চিত্তকে দ্রব্য করতে পারে এমন অনির্বচনীয় কান্তি। মার্দব বা সুকুমাবতা অর্থাৎ কোমল বস্তুর সংস্পর্শ ও ক্লেশানুভবের গুণ।

তারপর 'নাম'। এই উদ্দীপনটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নূতন গ্রন্থন। তারপর চারিত্র্য অর্থাৎ চেষ্টা বা কার্য ('অনুভাব' শ্রেণীর) এবং লীলাপরায়ণতা। লীলা বলতে চিত্তাকর্ষক ক্রীড়া, নৃত্য, বেণুবাদন, গোদোহ, গোবর্ধনধারণ, রাস প্রভৃতি বোঝায়। অতঃপর মণ্ডন—বস্ত্র, ভূষা, রত্ন, অনুলেপন, মাল্যাদি ধারণ। এসব বিষয়েও বৈষ্ণব শাস্ত্রের অভিনবতা লক্ষণীয়।

অতঃপর 'সম্বন্ধী' নায়ক-নায়িকা সম্পর্কিত বস্তু। ব্যক্তি ছাড়াই স্বাধীনভাবে যেগুলি অনুভবের যোগ্য। লগ্নী এবং সন্নিহিত ভেদে সম্বন্ধী দু'রকমের। 'লগ্নী' বলতে বংশীরব, শৃঙ্গরব, গীত, অঙ্গ-সৌরভ, ভূষণশব্দ, পদাঙ্ক, বীণাধ্বনি, শিল্পকৌশল। এগুলি নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অচ্ছেদ্য নয় এমন হল 'সন্নিহিত', যেমন—নির্মাল্য, শিখিপুচ্ছ, গুঞ্জামালা, শিলাধাতু, গাভীবৃন্দ, বেত্র-লগুড়, বেণু, শৃঙ্গ, নায়ক-নায়িকার প্রিয়দেব দর্শন,

১. মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥

গোধূলি, বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবনের আশ্রিত নিসর্গবস্তু—পশুপক্ষী, ভ্রমর, কুঞ্জ, লতা, কদম্ব, কর্ণিকার, গোবর্ধন, যমুনা, রাসস্থল, শরৎ বসন্ত প্রমুখ ঋতু, চন্দ্র, জ্যোৎস্না, তামসী, মেঘ, বিদ্যুৎ, বাতাস প্রভৃতি।

বৈষ্ণব মহাজনদের পদসাহিত্যে এসব উদ্দীপনের মনোজ্ঞ বর্ণনা মুহুর্মুহু উপস্থাপিত হয়েছে।

অনুভাব

১. **অলংকার**—যৌবনে নায়িকাদের অর্থাৎ গোপীদের কান্তে (এখানে কৃষ্ণে) অভিনিবেশ বশতঃ সত্ত্ব-আক্রান্ত চিত্তের যে সব অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ তাকেই অলংকার বলা হচ্ছে। অলংকারের মধ্যে ভ্রূনেত্রগ্রীবাভঙ্গি প্রভৃতির প্রযত্ন থেকে উৎপন্ন তিনটি হল ভাব, হাব, ও হেলা। অ-চেষ্টাকৃত সাতটি যেমন—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য, ধৈর্য। আর নিতান্ত স্বভাবজ দশটি—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত। মোটামুটি লৌকিক অলংকার শাস্ত্রের অনুসরণে এসব বিস্তারিত। এগুলি যথাক্রমে ব্যাখ্যাত হচ্ছে।

ভাব—'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া'। নির্বিকার চিত্তের প্রাথমিক যে বিকার, এখানে শৃঙ্গারাত্মক উজ্জ্বল মধুরের যে আন্দোলন, তাই হল ভাব। চিত্তের অবিকৃতি হল ধীরত্ব বা সত্ত্ব। অভিযোগ কারণে সেই সত্ত্বের প্রথম বিকারই হচ্ছে ভাব, যেমন অঙ্কুরোদ্‌গমের পূর্বে বীজের প্রথম বিদীর্ণ হওয়া। এই ভাব আর রতির ভাব (emotion) এক বস্তু নয়, এ হচ্ছে বহিঃপ্রকাশরূপ, যেমন—

পৌগণ্ড বয়স শেষ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ভুরুর নাচনি করে কিবা সে অন্তর॥
লাজে অবনত মুখ আর আঁখি দুটি।
বুঝিতে নারিনু এই ভাব পরিপাটি॥
বামনয়নে পুন কটাক্ষ করয়।
মধুর মধুর স্মিত করে বুঝিল না হয়॥ ... —রাধামোহন।

অথবা,

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে। **
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি অণু শীতল করিয়া॥... —দ্বিজ চণ্ডীদাস।

অথবা,

কালি দমন দিন মাহ।
কালিন্দী কুলকদম্বক ছাহ॥

কত শত ব্রজ-নববালা।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা॥
তোহে কহোঁ সুবল সাঙাতি।
তব ধরি হাম না জানি দিনরাতি॥
তহিঁ ধনিমণি দুই চারি।
তহি পুন মনোমোহিনী এক নারী॥
সো রহু মঝু মন পৈঠি।
মনসিজ-ধূমে ঘুম নাহি দীঠি... —গোবিন্দদাস।

হাব—ভাব থেকে অধিকতর প্রকাশময় চেষ্টাসমূহ হল হাব। যেমন, গ্রীবার বক্রতা, ভ্রূনেত্রাদির বিকাশ প্রভৃতি। 'ভাবে'র প্রথম দৃষ্টান্তে শ্রীগৌরাঙ্গের বিক্রিয়া-চিত্রে ভাব ও হাব একত্রিত হয়েছে। শ্রীমতীর 'হাব' যথা বয়ঃসন্ধিতে :

খেনে খেনে নয়ন কোণ অনুসরই।
খেনে খেনে বসন ধূলি তনু ভরই॥
খেনে খেনে দশন ছটাছট হাস।
খেনে খেনে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥ ইত্যাদি।

হেলা—হাব থেকে আরও স্পষ্ট নিশ্চিত শৃঙ্গারসূচক বিক্রিয়াসমূহের প্রকাশ ঘটলে তাকে হেলা বলে। যেমন—

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বরকান।
গুরুজন সঙে লাজে ধনী নতমুখী
কৈসনে হেরব বয়ান॥
সখী হে অপরুব চাতুরী গোরী।
সব জন তেজি আগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেকল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী লেল॥... —বিদ্যাপতি।

শোভা—তারুণ্য, রূপ, সৌন্দর্যশক্তি প্রভৃতি নিম্নে যে প্রকাশ, যেমন কৃষ্ণমুখে :

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চাঁদ উজোরি॥
কুটিল কটাখ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর-ডম্বর অম্বরে ভেল॥

কাহ রমণী উহ কে উহ জান।
আকুল করি গেও হমারি পরাণ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিএ বারি।
চমকি চলিল ধনি চকিত নেহারি॥
তেঁ ভেল বেকত পয়োধর শোভা।
কনক-কমল হেরি কাহে ন লোভা॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচ-কুম্ভ কহি গেও আপন আশ॥ —বিদ্যাপতি

কান্তি—শোভাকেই কান্তি বলে—যদি সেই শোভা শৃঙ্গার-পুষ্টিকারক হয়, যেমন,—

(এ ধনি) আঁচরে বদন ঝাঁপাউ।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
অনত অনত চলি যাউ॥
মুখমণ্ডল কিয়ে শরদ সরোরুহ
ভালহি অটমীক চন্দ।
মধুরিপু মরমে ভরম যাঁহা ঐছন
তাহে কি গণিয়ে মতিমন্দ॥
জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব
ও থলকমল উজোর।
তঁহি নখ-চাঁদ ভরম ভরে ঐছন
ততহি পড়ত জনি ভোর॥
ভাঙু ধনুয়া কিয়ে সুতনু ধুনায়সি
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।
সো কিয়ে অতনু- পতগ শিরে ডারসি
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥

দীপ্তি—বয়স, দেশ, কাল, গুণে কান্তিরই বিস্তারিত পরিস্ফুট প্রকাশ হ'ল দীপ্তি, যেমন—

কাজর-রুচিহর রয়নী বিশালা।
তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে জইসন চোর।
নিশবদ পদগতি চললিহু থোর॥
উনমত চিত অতি আরতি বিথার।
গরুঅ নিতম্ব নব যৌবনভার॥
কমলিনী মাঝ খিনি উচ কুচ জোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥... —কবিশেখর।

মাধুর্য—নায়ক-নায়িকার চেষ্টা বা কার্যগুলির সকল অবস্থাতেই মনোজ্ঞতা। উদ্ধৃত অংশে রাধাকৃষ্ণের মিলিতাবস্থায় নিতান্ত মাধুর্য ব্যক্ত হয়েছে :

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।

দুহুঁক রূপের নাহিক উপমা
প্রেমের নাহিক ওর॥
হিরণ কিরণ আধ বরণ
আধ নীলমণি-জোতি।
আধ উরে বন- মালা বিরাজিত
আধ গলে গজমোতি॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল
আধ রতন-ছবি।
আধ কপালে চান্দের উদয়
আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভা ময়ূর শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক-কমল করে ঝলমল
ফণি উগারয়ে মণি॥
মন্দ পবন মলয় শীতল
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতারে
ডুবল শেখর রায়॥

অপিচ,

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু-তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী-চমক-মতি হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলক দল খলই॥ ইত্যাদি॥

প্রগল্‌ভতা—সম্ভোগশৃঙ্গারে নায়ক-নায়িকার পরস্পর আনুকূল্যে লজ্জা ত্যাগ করা। যেমন—

কি কহব রে সখি আজুক বিচার।
সো সুপুরুখ মোহে কয়ল শিঙার॥
হসি হসি বহু আলিঙ্গন দেল।
মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল॥
আঁচর পরশি পয়োধর হেরু।
জনম পঙ্গু জনি ভেটল সুমেরু॥
যব নীবিবন্ধ খসাওল কান।
তোহর শপথ হম কিছু যদি জান॥ —কবিশেখর।

ঔদার্য—সংযমময় উদারতা. যেমন—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরান গেলে॥

এতেক সহিলুঁ অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥... —চণ্ডীদাস।

ধৈর্য—চিত্তবৃত্তির নিঃশেষ স্থিরতা, যেমন, মহাপ্রভু-কথিত শ্লোক :

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনাৎ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

লীলা—রম্যবেশ এবং কার্যের দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণ, যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু :

কৃষ্ণাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচয়ে বিহ্বল হঞা, নাহি পরাপর॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব ত্রিভঙ্গ-সুন্দর।
প্রহরেক সেইমত আছে নিরন্তর॥
ক্ষণে ধ্যান করে, করে মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনারে বাসে॥
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলি কলমে॥
রুক্মিণীর পত্র সপ্তশ্লোক ভাগবতে।
যে আছে, পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে॥

অপিচ শ্রীরাধা,

বিরহে ব্যাকুল ধনি কিছুই না জানে।
আন আন বরণ হইল দিনে দিনে॥
আধ আধ বচন কহিছে কার সনে।
পুন পুন পুছয়ে সবহুঁ তরুগণে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া খেনে বাজায় মুরলী।
দেখিয়া কান্দয়ে সখী করিয়া বিকলি॥

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে কৃষ্ণবিরহে গোপিকারা কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি কার্যের অনুকরণ করেছিলেন।

বিলাস—প্রিয়মিলনে মুখ, নেত্র প্রভৃতির এবং গমন, আসন-পরিগ্রহ প্রভৃতির যে সব বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় তা হ'ল বিলাস, যেমন—

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
আপনি নেহারি হেরল মোহে জোর॥
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজ বান্ধি অলপ চলি গেল॥
কি কহব রে সখি নারী সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথ বাণ॥
হরি কত দূর সো পালটি নেহারি।
তোড়ল কানড় কুসুম উঘারি॥
বসনক ওর ঝাঁপল তব গোরী।
লীলাকমলে মুখ রোপলি থোরি॥
বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ।
কোন মুগধ তাহে ধরুন নিজ দেহ॥...

—জ্ঞানদাস।

বিচ্ছিত্তি—ভূষণ-পরিধান-জনিত শোভাবিশেষ, যেমন—

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণীমনোলোভা।

অথবা,

রাজিত চিকুর উপরে নবমালতী
অলিকুল অলকার পাশে।
মলয়জ মাঝে সাজে মৃদু মৃগমদ
তরুণীনয়নবিলাসে॥
(সজনি) কি পেখলুঁ শ্যামর চান্দে।
তরণিতনয়াতীরে তরু অবলম্বন
তরুণ ত্রিভঙ্গিম ছান্দে॥
ও মুখমণ্ডলে ও মণিকুণ্ডল
গণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্রনীলমণি মুকুর উপরে জনু
করু অবলম্বন অরুণে॥
তরুণ-তারাবলী অনিবার ঝলমলি
উরে গজমোতিম হারে।
জ্ঞানদাস কহ পীতধটি অঞ্চল
বিজুরি ঘন আন্ধিয়ারে॥

অথবা,

একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥...

—বিদ্যাপতি।

প্রিয়ের মনোহরণের জন্য নায়িকা এরকম স্বল্পমণ্ডন পরিগ্রহ করেন (যেমন খোঁপায় ফুল অথবা কর্ণে মঞ্জরী অথবা যুগোচিত অন্য কিছু), আবার ঈর্ষা-মানে দগ্ধ হয়ে চিত্তের অবৈকল্য দেখানোর জন্যও বিচ্ছিত্তি-বিশেষ পরিগ্রহ করতে পারেন।

বিভ্রম—আভরণসমূহের স্থান-বিপর্যয়। এরকম ঘটতে পারে প্রিয়সমাগমের উৎকণ্ঠায় আত্মবিস্মৃত হ'লে, যেমন, অভিসার-কালে :

রাই সাজে বাঁশি বাজে পড়ি গেও উল।
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আঁচড়ি রাই বান্ধে কেশভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেত নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিনী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ-পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥
বংশীবদনে কহে যাঙ বলিহারি।
শ্যাম-অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি॥

কিলকিঞ্চিত—প্রবল হর্ষবশতঃ যখন একই সঙ্গে গর্ব, অভিলাষ, রুদিত, স্মিত, অসূয়া, ভয় এবং ক্রোধ এই সাতটি সঞ্চারীর একত্র আবির্ভাব হয় তখনকার প্রকাশরূপ হ'ল কিলকিঞ্চিত।

অবনত আনন কএ হম রহলীহু
বারল লোচন-চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবয়ে ধাবল
জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহু সঞে হঠে হটি মোএ আনল
ধএল চরণএ রাখি।
মধুকর মাতল উড়অ ন পারএ
তৈঅও পসারয়ে পাখি॥
মাধব বোলল মধুর বাণী
তা শুনি মৃদু মোএ কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পাঁচবাণ॥
তনু পসেবে পসাহনি ভাসলি
পুলক তৈসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলয়া ভাঁগু॥

ভণ বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল ন যায়।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
সামর সুন্দর কায়॥

মোট্টায়িত—প্রিয়ের স্মরণে অথবা সংবাদে হৃদয় তদ্ভাবে ভাবিত হলে অভিলাষের বহিঃপ্রকাশ হ'ল মোট্টায়িত, যেমন—

চৌদিকে চকিত নয়নে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাঁহা শিখলী ইহ রঙ্গ॥
(সুন্দরি) কি ফল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানলুঁ হিয়-মাহা সাঁচি॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এতদিনে পেখল আঁখি॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি
জিতলী মনমথ রাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহি সমুঝলুঁ কাজ॥

অথবা, যেমন ভাবোল্লাসে :

কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল।
(আমার) চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥ ইত্যাদি।

কুট্টমিত—প্রিয় কর্তৃক স্তনাধরাদিগ্রহণে বাহ্যকোপপ্রকাশ।

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ॥
বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন।
কুট্টমিত নাম এই ভাব বিভূষণ॥ —চৈতন্যচরিতামৃত।

যেমন, একে অবলা অওকে সহজক ছোটি।
কর ধরইত করুণা কর কোটি॥

আঁকক নামে রহএ হিঅ হারি।
জনু করিকরতল খসল পঁআরী॥
নয়ন নীর ভরি নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিণ জইসে জীব ডোল॥
কৌশলে কুচকোরক করে লেল।
মুখ দেখি তিরিবধ সংসঅ ভেল॥ —বিদ্যাপতি।

অথবা,

কুচ করপরশনে চমকি উঠয়ে ধনি
লোচনে জল ভরিপুর।
দশনক ঘাতে অধর বিখণ্ডন
নীবি-বন্ধন করু দূর॥
কোরহি জোরি উবরি পুন সুন্দরী
চললি তেজি বর নাহ।
সহচরি ধাই বাহু ধরি আনল
দুর্লভ রস-নিরবাহ॥

বিব্বোক—অভিলষিত কান্তকে গর্ব-মান-সহকারে অনাদর প্রদর্শন। গর্বমুখে, যেমন—

বড়ায় বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাত কী॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতে না পারে॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

গর্বমিশ্র মানমুখে, যথা—

ধিক রহু মাধঁ তোহোরি সোহাগ।
ধিক রহু যো ধনি তোহে অনুরাগ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ।
কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ॥
সহজই অনলে দগধ ভেল অঙ্গ।
কাহে দেহ আহুতি-বচন-বিভঙ্গ॥
সো ধনি কামিনী গুণবতী নারী।
হাম নিরগুণ রতিরভসে গোআঁরী॥
সোই পুরব তুয়া হিয় অভিলাষ।
বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনি পাস॥
পুন পুন কাহে ধরসি মঝু পায়।
তুহুঁ বহু-বল্লভ তোহে ন জুয়ায়॥... —বলরামদাস।

ললিত—ভ্রূবিলাসাদি সুকুমার অঙ্গভঙ্গির মাধুর্য :

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন অঙ্গভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া॥

মুখে নেত্রে করে নানা ভাবের উদ্‌গার।
এই কান্তাভাবের নাম ললিতালংকার॥ —চৈতন্যচরিতামৃত।

যেমন,

গেলী কামিনী গজহুঁ গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুমসায়ক
কুহকী ভেলী বরনারী।
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহুঁ বয়ান সুছন্দ॥
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥... —বিদ্যাপতি।

বিকৃত—লজ্জা, মান, ঈর্ষা প্রভৃতির জন্য নায়িকা মনের কপাট খুলছেন না, অথচ তাঁর চেষ্টা অর্থাৎ কার্যের ফলে তা ব্যঞ্জিত হচ্ছে এমন অবস্থায় 'বিকৃত' হয়, যেমন, লজ্জাহেতু :

অবনত-বয়নী না কহে কিছু বাণী।
পরশিতে বিহসি ঠেলই পহুঁ-পাণি॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিনব নায়রি না মানয়ে বোধ॥
পিরিতি বচন পুন কহল বিশেষ।
রাইক হৃদয়ে দেখয়ে লবলেশ॥
পহিরণ বসন ধরল যব হাতে।
তব ধনী দীব দেই নিজ মাথে॥
রস-পরসঙ্গে কয়ল কত রঙ্গ।
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ॥
নাহক আদর অধিক বাঢ়ায়।
জ্ঞানদাস কহ এহ না জুড়ায়॥

মানে, যথা—

শুন শুন মানিনী না কহব তোয়।
অনুচিত মানে গোঙায়রি রোয়॥
তব নাহি শুনলি সহচরী বোল।
ফেরি রহলি মুখ ঝাঁপি নিচোল॥
রোই রোই মাধব সাধল তোয়।
কাহে কাতর দিঠে চাহসি মোয়॥... —ঘনশ্যাম।

অথবা,

রাই যব হেরল হরি মুখ ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর॥
যব পঁহু কহলহি লহু লহু বাত।

তবহুঁ করল ধনি অবনত মাথ॥
যব হরি ধরল হি অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাশ॥
যব পহুঁ পরশল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পূরল সব অঙ্গ।... —কবিশেখর।

মৌগ্ধ্য—যে বস্তু নায়িকার (বা নায়কেরও) জানা, মিলন-বিলাস-মুগ্ধাবস্থায় তা পুনরায় জানতে চাওয়া :

কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ।
এক জিউ বিহি সে গড়ল ভিন দেহ॥
কহিল যে কাহিনী পুছে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥... —কবিরঞ্জন।

চকিত—প্রিয়-সমীপে লীলায় ভীতি প্রকাশ (প্রকৃত ভয়ের বস্তু না থাকলেও) :

গোসাঞিঁ সোঁঅরি কাহাঞিঁ ঝাট বাহ নাএ।
মাঝ যমুনাত বহে বড় খর বাএ॥
যমুনার জলে টলবল করে নাএ।
চমকী চমকী উঠি মোর প্রাণ জাএ॥
ষোল শত গোপী মোর রহি চাহে বাটে।
মোহোর করমে নাএ ভাঁগিল পাটে॥
একবার রাখ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

এখানে ব্যঞ্জনাচ্ছলে কৃষ্ণসহ মিলনই প্রার্থনা করা হচ্ছে।

(পুনশ্চ 'অনুভাব' শ্রেণীভেদে)

২. **উদ্ভাস্বর**—কৃষ্ণ-গোপিকাদের দেহে অথবা ভাবাক্রান্ত ভক্তদেহে যেগুলি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। এগুলি হ'ল নীবী-ভ্রংশ, উত্তরীয়-স্খলন, কবরীবন্ধের বিগলন, গাত্রমোটন (অঙ্গমোড়া), জৃম্ভণ (হাইতোলা), ঘ্রাণ-আগ্রহে নাসাস্ফুরণ, বিলুণ্ঠন, গীত, চীৎকার, লোক-নিরপেক্ষা (ঔদাসীন্য) প্রভৃতি। এই উদ্ভাস্বরগুলি পূর্বোক্ত মোট্টায়িত এবং বিলাসের সঙ্গেও সংগত।

৩. **বাচিক**—আলাপ (প্রিয়ের চিত্তাকর্ষক উক্তি), বিলাপ, সংলাপ (উক্তি-প্রত্যুক্তি), প্রলাপ (বিলাপে নিরর্থক শব্দপ্রয়োগ), অনুলাপ (একই কথা বারংবার বলা), অপলাপ (অন্যের কথাকে অন্যপ্রকারে যোজনা), সন্দেশ (বার্তা প্রেরণ), অতিদেশ (একের কথাকে অন্যমুখে পরিস্ফুটন), অপদেশ (বক্তব্য বিষয়কে অন্য বিষয়ের দ্বারা ব্যঞ্জনাচ্ছলে প্রকাশ), উপদেশ এবং নির্দেশ (কিছু স্থির পূর্বক ভাষণ), ব্যপদেশ (অন্য কথার ছলে নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন)।

এই উদ্ভাস্বর এবং বাচিক অনুভাবগুলির সৌন্দর্য পদরচনার যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে ব'লে এগুলির দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হ'ল না।

(অনুভাবের অন্তর্গত) সাত্ত্বিক ভাব

'ভাব' শব্দটির পরিচিত পুরাতন অর্থ (emotion) রক্ষা ক'রেও শ্রীরূপ এর উপর আরও বিভিন্ন বাচকতা আরোপ করেছেন। যেমন 'ভাব' বলতে বিশেষভাবে শৃঙ্গাররতি বা 'ভাব' প্রেমের পরিণত অবস্থা—যার মহৎ-বিশেষণ-যোগে হয় 'মহাভাব'। আবার শৃঙ্গাররতির প্রাথমিক প্রকারচিহ্ন যেমন পূর্বোল্লিখিত ভাব, হাব ও হেলা। এই অর্থ অবশ্য অলংকারশাস্ত্রে শ্রীরূপের পূর্বেই আরোপিত। এখানে আবার বিশিষ্ট কয়েকটি অনুভাবই 'ভাব' নামে চিহ্নিত হয়েছে। গোস্বামীপাদের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, বিশিষ্ট অনুভাবগুলি (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি) একমাত্র মুখ্য ভক্তিরসেরই অনুগামী। ঐ মুখ্য ভক্তিরসের অন্তর্গত না হলে গৌণরসে স্বতন্ত্রভাবে যেহেতু এগুলির অস্তিত্ব থাকতে পারে না, সেইহেতু স্বতন্ত্র নামকরণ অপরিহার্য। তা ছাড়া রাগাশ্রিত ভক্তচিত্তের নিত্যসম্বন্ধী বলেও পরিণত-প্রেম 'ভাব' এর সঙ্গে সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যেও 'ভাব' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে এমন মনে করা যায়। 'সাত্ত্বিক' বিশেষণটিই এ-কে সাধারণ ভাব এবং অনুভাব থেকে পৃথক্ করেছে। বলা বাহুল্য, মহাপ্রভুর মধ্যে এইসব অনুভবের প্রকাশ দেখে ভক্তিশাস্ত্রে এগুলির গুরুত্ব অনুভূত হয়েছে, এবং একথাও ঠিক যে পূর্বতন আলংকারিকেরা লৌকিকেই এইসব সাত্ত্বিক অবস্থার স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

সাত্ত্বিক ভাবের সংখ্যা হল আট : স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়।

স্তম্ভ—দেহাদির নিশ্চল অবস্থা। ভক্তিসংগত হর্ষে, বিষাদে, ভয়ে, অক্ষমায়, বিস্ময়ে এই স্তম্ভাবস্থা; রাধাকৃষ্ণে এবং অদনুসারে ভক্তেও।

স্বেদ—ঘর্ম; হর্ষে ভয়ে ক্রোধে।

রোমাঞ্চ—আশ্চর্যদর্শনে, হর্ষে, ভয়ে।

স্বরভঙ্গ—অস্পষ্ট জড়িত গদ্‌গদ ভাষণ; বিষাদে, বিস্ময়ে, অক্ষমায়, হর্ষে, ভয়ে।

বেপথু—দেহের কম্পন; ত্রাসে, হর্ষে, অক্ষমায় বা ক্রোধে।

বৈবর্ণ্য—দেহের বর্ণের বিকৃতি; বিষাদে, ক্রোধে, ভয়ে।

অশ্রু—হর্ষে (মুখের প্রফুল্লতা ও রোমাঞ্চ সহ), রোষে (ওষ্ঠস্ফুরণ, কটাক্ষ-ভ্রূকুটি সহ), বিষাদে।

প্রলয়—মূর্ছা, নিস্পন্দতা; সুখে (যেমন শৃঙ্গারান্ত সৌখ্যাবস্থায়), শোক-দুঃখে।

উল্লিখিত সাত্ত্বিক ভাবগুলি ঈষৎ ব্যক্ত হলে অথবা এগুলির দুটি বা একটি ব্যক্ত হলে বলা যাবে 'ধূমায়িত'। দু'তিনটি একত্র প্রকাশিত হলে এবং সেগুলি চাপা দেওয়া আয়াসসাধ্য হলে বলা যাবে 'জ্বলিত'। আর চার পাঁচটি একত্র স্ফুরিত হওয়ায় সেগুলির নিবারণ অসাধ্য হলে হবে 'দীপ্ত'। এরকম পাঁচ থেকে আটটির আবির্ভাব ঘটলে 'উদ্দীপ্ত'। আর এরই চরমাবস্থা হচ্ছে 'সুদ্দীপ্ত'। এ সব বিষয় পূর্বেই বিবৃত হয়েছে এবং মহাপ্রভুর ভাবাবস্থা থেকে দৃষ্টান্তও সমাহৃত হয়েছে। বর্তমানে পদাবলীতে চিত্রিত সাত্ত্বিক স্ফুরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রথিত হল :

১. আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥

রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
খেনে খেনে গোরা-অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি খেনে খেনে মুরুছায়॥
পুলকে পুরল তনু গদগদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল॥

এখানে কৃষ্ণ-ভাবাপ্লুত গৌরাঙ্গের অশ্রু, মূর্ছা, পুলক ও স্বরভঙ্গের বর্ণনা।

২. নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব॥
স্বেদ-মরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব॥

এখানে অশ্রু, পুলক এবং স্বেদ।

৩. সহজে নুনিক পুতলী গোরী।
জারল বিরহ আনলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোহারি নাম॥
শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়।
সমতি না দেই সতত রোয়॥
অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥**

এখানে শ্রীমতীর বৈবর্ণ্য এবং অশ্রু।

৪. না বান্ধে চিকুর না পরে চীর।
না খায়ে আহার না পিয়ে নীর॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিহ্নে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলী রৈয়াছে চাই॥
তুলা খানি দিলুঁ নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিলুঁ শোয়াস আছে॥

এখানে শ্রীমতীর বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ এবং প্রলয় সাত্ত্বিক পরিস্ফুট।

৫. পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বয়ন নয়ন-জল খলই॥
হঠ-পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥

এখানে মুগ্ধা নায়িকার প্রথম মিলনে ভীতিবশতঃ কম্পন, বিষাদে অশ্রু।
মহাপ্রভুর সু-উদ্দীপ্ত ভাবের চিত্র পূর্বেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

মধুররসোচিত ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব

সাধারণ ভক্তিরস বর্ণনে ব্যভিচারীর বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তেত্রিশটি ব্যভিচারীর মধ্যে উগ্রতা এবং আলস্য ছাড়া বাকি একত্রিশটি মধুরে পরিপোষক। মৃত্যু সুপ্তি প্রভৃতি বর্ণনদক্ষতাক্রমে মধুরে পরিপোষক হতে পারে। এ ছাড়া সখীপ্রেম বা সখাপ্রেম উজ্জ্বলমধুরে একটি নোতুন সঞ্চারী বলে পরিগণিত হতে পারে।

নির্বেদ—দুঃখ-বিচ্ছেদ-ঈর্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্তব্য না করা এবং অকর্তব্য করার জন্য আত্মধিক্কার, যেমন মহাপ্রভুর :

দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ কপট প্রেমের বন্ধ
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ না দেখি সে চান্দমুখ,
যদ্যপি নাহি সে আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীত কেবল কামের রীত
প্রাণকীটেরে করিয়ে ধারণ॥... —চৈতন্যচরিতামৃত।

অথবা,

কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই
হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেমে করই জনি মান॥
(সজনি) অতএ মানিয়ে নিজ দোখ।
মান-দগধ জিউ অব নাহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোখ॥
—ইত্যাদি শ্রীমতীর, মানান্তে।

অথবা,

(বন্ধু) সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি কর্যাছি পিরিতি
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া
খাইলুঁ আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥
—ইত্যাদি আক্ষেপানুরাগে।

বিষাদ—অনুতাপের ভাব, অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্যের অসাফল্য, বিপত্তির উদ্ভব এবং আত্মাপরাধ হেতু এই সঞ্চারীর উদ্ভব। যেমন—

শুনইতে কানু- মুরলীরব-মাধুরী
শ্রবণ নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলুঁ
তব মোহে রোখলি ভোর॥
(সুন্দরি) তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়বি
জনম গোঁয়ায়বি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ তনু লাবণি
জীবইতে ভেলি সন্দেহা॥

—ইত্যাদিতে সখীমুখে ব্যঞ্জিত শ্রীমতীর বিষাদ।

অথবা,

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকল গরল ভেল॥

—ইত্যাদি বিপত্তি-অনুভবজাত।

দৈন্য—দুঃখ, ত্রাস, অপরাধ হেতু চিত্তের দৌর্বল্য। এটি গর্বের বিপরীত ব্যভিচারী। যথা—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে"—ইত্যাদি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী।

অথবা,

তোমার দর্শন বিনে অধন্য হই রাত্রি দিনে
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণাসিন্ধু
কৃপা করি দেহ দরশন॥ —ইত্যাদি মহাপ্রভুর।

অথবা,

হরি গেও মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয়সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিনরজনী॥
নয়নক নিদ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঞ দুখ মঝু পাস॥

অথবা,

চরণনখর-মণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লুটাঅল গোকুলচাঁদ॥

ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর।
কতরূপ মিনতি কএল পহু মোর॥
লাগল কুদিন কএল হম মান।
অবহু ন নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোস-তিমির অত বৈরি কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান॥
নারী জনম হম ন কএল ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ সুনু ধনী রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভল সমুঝাই॥

গ্লানি—শ্রম, মনঃপীড়া ও রত্যাদির দ্বারা কৃত দেহের ক্লান্তি ও বলের ক্ষয়, যেমন—

(দেখ দেখ) গৌরবর গুণধাম।
যো রূপলাবণি দেহ সুগঠনী
দেখি ঝুরে কোটি কাম॥
সোই ভাব-ভরে ক্ষীণ দীসই
পরম দুবর দেহ।
ততহুঁ দীপতি উজোর ঐছন
যৈছন চাঁদক রেহ॥

—ইত্যাদি মহাপ্রভুর।

বিনু গুণ পরখি পরক রূপ লালসে
কাহে সৌঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি
জীবইতে ভেলী সন্দেহা॥

—ইত্যাদি শ্রীমতীর।

অথবা,

(মাধব) দুবরী পেখলুঁ তাই।
চৌদশী চাঁদ জনু অনুখন খীয়ত
ঐছন জীবয়ে রাই॥

শ্রম—পথ-অতিবাহন নৃত্য ও রমণাদিজনিত খেদ, যেমন--

(দেখ) রাই করল অভিসার।
শিরিষ কুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার॥
যো থলকমল পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাঁহা তাঁহা কঠিন ধরণী মাহা
ডারত বড়ই নিশঙ্ক॥

—ইত্যাদি পথশ্রম।

রতি সুখশয়ন নিবেশহি সুন্দরি
প্রমুদিত মানস ভেলি।
বিছুরল আন আন কেলি কৌতুক
অনুগত নিধুবন-কেলি॥
অদভুত মদনবিলাস।
রাইক দেহ- দণ্ড পরিশোভিত
শ্রমজল-মুকুতা-বিকাশ॥

—ইত্যাদি রতিজাত।

মদ—আসব পান থেকে অথবা কামবিকার থেকে জাত মত্ততার ভাব, যেমন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥**
কি আর বলিব সই কি আর বলিব।
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব॥

অথবা,

(সজনি) অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে তনুমন মাতল
না গুণে ধরম-লব-লেশ॥

অথবা, অভিসারকালে :

কানু-অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহ।
গুরু দুরুজন ভয় কছু নাহি মানয়ে
চীর নাহি সম্বরু দেহ॥
(দেখ দেখ) নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগ ভয় শত শত
তবহুঁ না মানয়ে ভীত॥
সখীগণ সঙ্গ তেজি চলু একেসরি
হেরি সহচরীগণ ধায়।

—ইত্যাদি জ্ঞানদাস।

গর্ব—সৌভাগ্য, রূপযৌবন, উত্তম আশ্রয় এবং ইষ্টপ্রাপ্তির বশে অন্যের অবজ্ঞা, যেমন—

তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যমে বাহির করিব গো
তবে শ্যাম মধুপুরে যাবে॥

অথবা,

আঁচরে বদন ঝাঁপাউ।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
অনত অনত চলি যাউ॥
মুখমণ্ডল কিয়ে শরদ সরোরুহ
ভালহি অটমীক চন্দ।
মধুরিপু মরমে ভরম যাঁহা ঐছন
তাহে কি গণিয়ে মতিমন্দ॥
জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব
ও থলকমল উজোর।**
ভাঙু ধনুয়া কিয়ে সুতনু ধুনায়সি
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।
সো কিয়ে অতনু- পতগ শিরে ডারসি
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥

অপিচ,

** চীর চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক ন গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা॥

শঙ্কা—অপবাদ এবং মন্দলোকের দ্বারা কোনো অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, যেমন—

এই ভয়ে উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনু ছুটে॥
গড়ন ভাঙিতে সই আছে কত খল।
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দুখ পাই।
চাঁদমুখে হাসি হেরি তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥... —চণ্ডীদাস।

অপিচ,

ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতি।
জল মাঝে দেখিলোঁ কি মো নিশাপতি॥
পুন্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
তে কারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে॥

ত্রাস—বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝটিকা, উচ্চশব্দ প্রভৃতি থেকে সহসা উৎপন্ন ভয়ের মতো মনোভাব, যেমন—

কুর্বতি কিল কোকিলকুল উজ্জ্বলকলনাদং।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি রৌতি চ সবিষাদম্॥

নীলনলিনমাল্যমহহ বীক্ষ্য পুলকবীতা।
গরুড় গরুড় গরুড়েত্যপি রৌতি পরমভীতা॥

অথবা,

সরস চন্দন পঙ্কে।
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে॥**
বনের হরিণী যেহ্ন তরাসিলী মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়ানে॥ —ইত্যাদি।

আবেগ—চিত্তের সম্ভ্রম বা ত্বরাতাড়িত ভাব। এ ভাব প্রিয়দর্শন-শ্রবণ বা অপ্রিয়দর্শন-শ্রবণ থেকে উৎপন্ন হতে পারে। যেমন—

আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হমারি নিতান্ত আগুসরি
সংকেত-কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘনঘোর।
শ্যামনাগর একলে কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থরথর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার।
রায়শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সো বিঘিনি বিথার॥

অথবা,

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমদ নয়ন বয়ন করু হেঁট॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ॥
(এ সখি) অব মোরে কহব বিশেষ।
জানলুঁ কানু চলব পরদেশ॥ —ইত্যাদি।

অথবা,

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপর পুন রাখি।

নিজ কর-কমলে চরণযুগ মুছই
হেরইত চির থির আঁখি॥

উন্মাদ—অতিরিক্ত আনন্দ, উৎকণ্ঠা, বিপদ, বিরহ-বিষাদ থেকে উদ্ভূত চিত্তবিভ্রম। আনন্দ, যেমন মহাপ্রভু :

দেখত বেকত গৌচন্দ **
সহজে সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলি ঢুলি দুলি চলত খলত
মত্ত করিবর ভাতিয়া।
নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরণী খসত
শোহত পুলক পাঁতিয়া॥

উৎকণ্ঠায় শ্রীমতী :

মণিময় মঞ্জীর যতনে আনি ধনী
সো পহিরহ দুই হাথ।
কিঙ্কিণী গীম-হার বোলী পহিরল
হার সাজাওল মাথ॥
অপরূপ পেখলুঁ আজ।
হরি-অভিসার-ভরমভরে সুন্দরী
বিছুরল সাজ বিসাজ॥

বিরহে :

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥
ত্বরিমুপৈতি ন কথমভিসারম।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥

অথবা,

উনমত ভাতি ধনী আছয়ে নিচলে।
জড়িমা ভরল হাথ পদ নাহি চলে॥
আধ আধ বচন কহিছে কার সনে।
পুন পুন পুছয়ে সবহুঁ তরুগণে॥ —ইত্যাদি।

অপস্মার—চিত্তবিনাশ, মৃগীরোগে যেমন হয়। যথা মহাপ্রভু ঃ

কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয়॥

কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥
কভু নেত্রে নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে পড়ে যেন॥

—চৈতন্যচরিতামৃত।

অথবা,

কিয়ে সখি চম্পক-দাম বনায়সি
করইতে রভস বিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর
ব্রজপুর করি আঁধিয়ার॥
প্রিয়তম দাম শ্রীদাম আর হলধর
এসব সহচর সাথ।
শুনইতে মুরছি পড়ল সোই কামিনী
কুলিশ পড়ল জনু মাথ॥
খেনে খেনে উঠত খেনে খেনে বৈঠত
অবশ কলেবর কাঁপি।
ভণ যদুনন্দন শুনইতে ঐছন
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥

অথবা,

কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া কান্দয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে॥
কেহ কহে মাই ওঝায়ে ঝাড়াই
রাইয়ের পাইঞাছে ভূতা।
ঝাঁকি ঝাঁকি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃষভানু-সুতা॥

ব্যাধি—বিচ্ছেদ আনীত দেহতাপ প্রভৃতির মনোভাব :

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিরঝর-ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জ্বলতহি চন্দনপঙ্ক॥
অব অবধারলুঁ পরশক রঙ্ক।
নায়রি কোরে সঙরি তোহে মুরছই
অপরূপ মদন আতঙ্ক॥

অপিচ,

যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু-ভাতি।
গুপ্ত কহে একমাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িলা দেশে
নিদানে হইল কুহুরাতি॥

মোহ—মূর্ছা। হর্ষে বিচ্ছেদে ভয়ে বা বিষাদে, যথা কৃষ্ণের ব্যাধি ও মোহ :

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুন॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি॥
যত যত করি না হয়ে সুধি॥
না বান্ধে চিকুর না পরে চীর।
না খায়ে আহার না পিয়ে নীর॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
জপিয়া জপিয়া তোহার নাম॥
না চিহ্নে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলী রৈয়াছে চাই॥
তুলখানি দিলুঁ নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিলুঁ সোয়াস আছে॥
আছয়ে সোয়াস না রহে জীব।
বিলম্ব না সহে আমরা দীব॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔষধ রাধা॥

অথবা,

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা॥
হরি বৈমুখী হমারি অঙ্গ মদনানলে দহনা॥
কোকিলকুল কুহু কুহরয়ে ঝংকারে অলি কুসুমে।
হরিলালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে॥
সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত গাওত হরিলীলা।
ঐছন বাণী শুনি তৈখনি রাগিণী মোহ গেলা॥
ললিতা কোরে করু বৈঠল বিশাখা ধরু নাটিয়া।
শশিশেখর কহ গোচর যাওত জীউ ফাটিয়া॥

মৃতি—প্রাণত্যাগ। যথার্থ মৃত্যু বর্ণনীয় নয়। মৃত্যুর উদ্যমই বর্ণনীয়। শ্রীরূপ বলছেন, 'মৃতেরধ্যবসায়োঽত্র বর্ণ্যঃ সাক্ষাদিয়ং ন হি'। এ হল মৃত্যুর ব্যভিচারী ভাবের বিষয়। ভারতীয় কাব্যনাটক এবং রসশাস্ত্রের ঐতিহ্যেও মৃত্যুর ঘটনা প্রদর্শনীয় নয়। কারণ এতে রসহানি ঘটে। 'রসবিচ্ছেদহেতুত্বাৎ মরণং নৈব বর্ণ্যতে'। এবং মৃত্যুবর্ধন আবশ্যিক হলে আকাশবাণীর দ্বারা পুনর্জন্ম ঘোষণা করতে হবে। পরে রসপর্যায়বিভাগের মধ্যে আমরা

দেখব যে এটুকুও বৈষ্ণব মহাজন স্বীকার করেন নি। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের চারটি অবান্তর বিভাগের মধ্যে পূর্বপ্রচলিত করুণ বিপ্রলম্ভের স্থানে তাঁরা প্রেমবৈচিত্ত্য নির্দেশ করেছেন। মৃত্যুর উদ্যম, যথা—

কি কহলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শুনব
জীবনে ন বান্ধব থেহা॥
তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি॥... —গোবিন্দদাস।

অথবা,

শীতল তছু অঙ্গ হেরি সঙ্গসুখ লালসে
কয়লুঁ কুলধরমগুণ নাশে।
সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবন
আন সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণসঞ অধিক তুহুঁ রোয়সি রে কাহে সখি
মরিলে হাম করিহ ইহ কাজে।
অনলে নাহি দাহবি রে নীরে নাহি ডারবি
এ তনু ধরি রাখবি ব্রজমাঝে॥
হামারি দোন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বান্ধবি
শ্যামরুচি তরুতমাল ডালে। ...
—শশীশেখর।

আলস্য : প্রকৃত অলসতাকে শ্রীরূপ শৃঙ্গারের সঞ্চারী হিসাবে নিষিদ্ধ করেছেন, কারণ, আলস্য হ'ল কর্মকুণ্ঠা, সামর্থ্য সত্ত্বেও উদ্‌যোগ না করা। শান্তরসে এ-ব্যভিচারী প্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, অলস আলস্য প্রভৃতি শব্দগুলি আধুনিক কবিরা শৃঙ্গারে প্রায়শই ব্যবহার করেছেন এবং তা চমৎকারও হয়েছে। অবশ্য বলা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে প্রকৃত আলস্য নয়, জড়িমা মাত্র। যেমন 'মেলি রাগ-অলস আঁখি, সখি, জাগো' অথবা 'বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে, ছিলাম যখন নিলীন কুসুম শয়নে' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু বাসকসজ্জার রজনীশেষে নায়িকার নিম্নলিখিত অবস্থা কর্মে উৎসাহহীনতা ব'লে পরিগণিত হবে না কেন?—''শ্যাম না এল। (আমার) অলস অঙ্গ, শিথিল কবরী, বুঝি বা যামিনী বিফলে গেল।" অবশ্য এখানেও বলা যেতে পারে যে এ আলস্যের সঙ্গে অনিচ্ছার যোগ নেই। এও জড়তাই। যেমন জ্ঞানদাসেও 'খেনে খেনে আলসে মুদসি আধ আঁখি' ইত্যাদি পূর্বরাগোচিত বর্ণনা। 'রসালস' বলতেও যথার্থ আলস্য নয়, 'নিদ্রা' সঞ্চারী হবে।

জাড্য : অনিষ্ট বা ইষ্ট দর্শনে এবং বিরহে যে বিচারবোধহীনতা। 'মোহ' অবস্থার পূর্বে এবং পরে এর অস্তিত্ব। যেমন—

রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ানতারা।

অথবা,

'নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা॥'
লোচন যুগলে লোর পরিপূর।
কহইতে বয়নে বচন নাহি ফুর॥
চলইতে চরণ অচল সম ভেল।
কুলবতী ধরম করম দূরে গেল॥

ব্রীড়া : লজ্জা, অ-ধৃষ্টতার ভাব। নবসংগম, নিন্দিত কাজ, স্তব অথবা অবস্থা-প্রসূত মনোভাব থেকে জাত। যেমন, প্রথম সমাগমে—

থরথর কাঁপন লহু লহু ভাস।
লাজে না বচন করয়ে পরকাস॥
আজু ধনী পেখল বড় বিপরীত।
খন অনুমতি খন মানই ভীত॥
সুরতক নামে মুদএ দুই আঁখি।
পাওল মদন মহোদধি সাখি॥
চুম্বন বেরি করএ মুখ বঙ্কা।
মীলল চাঁদ সরোরুহ অঙ্কা॥
নীবিবন্ধ পরসে চমকি উঠে গোরী।
জানল মদন ভণ্ডারক চোরী॥
ফুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঁটি।
বাহির রতন আঁচরে দেই গাঁঠি...॥ —বিদ্যাপতি।

গুরুজন-নিন্দিত প্রণয়ে, যেমন—

গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখীসঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যামপরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোহর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জান কহে লাজঘরে ভেজাই আগুনি॥

কৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞায় সখী :

হেদে হে নিলাজ বঁধু নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ি কোন লাজে আস্য॥ ইত্যাদি।

অবহিত্থা : কোনো কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় মনোভাব থেকে উৎপন্ন চেষ্টাকে অবহিত্থা বলে। অর্থাৎ শৃঙ্গারের প্রকাশকে অন্য কার্যের দ্বারা গোপন করা। এ অবহিত্থা কৌটিল্যের থেকেও হতে পারে, দাক্ষিণ্যের থেকেও হতে পারে, আবার লজ্জা থেকেও উদ্ভূত হতে পারে। যেমন—

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥'

এসব অংশে লজ্জাবোধ থেকেই অবহিত্থা। অপিচ—

কেলি রভস যব শুনে—
আনত হেরি ততহি দেই কানে॥
ইথে কোই কর পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥

অথবা,

নাহি উঠল তীরে সো ধনি রাই।
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই॥
এ সখি পেখলুঁ অপরূপ গোরী।
বল করি চীত চোরায়লী মোরী॥
একলি চললী ধনী হোই আগুয়ান।
উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান॥

কৌটিল্যজাত ·

গুরুজন সনে আজু চলইতে বাট।
অন্তরে উপজল কানুক নাট॥
পুলকে পূরল তনু ঝর ঝর ঘাম।
অবশ হৈয়া কহে কানু কানু নাম॥
ননদি কহয়ে তহিঁ কানু কাঁহা হেরি।
ভানু ভানু করি কহয়ে পুন বেরি॥
অতিশয় তাপে তনুতে বহু ঘাম।
তাহে পুন পুন সে কহল ভানু নাম॥

স্মৃতি : সদৃশ বস্তু দেখে পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ, অথবা দৃঢ় অভ্যাসবশে পূর্বানুভূত বিষয়ের মানসপ্রতীতি, যেমন—

"পাসরিতে করি মন পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।"
"রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলীরবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥"
"কৈছে হৃদয় ধরি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥"

বিতর্ক : কারণ-অনুসন্ধানজনিত বা সংশয়জনিত বিচার-বিশ্লেষণ :

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
সূতি রহল হরি কিছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহ তোরি।
তবহি মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি॥
(সুন্দরি) ইথে নাহি কহ আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ॥
যোই নয়নভঙ্গি না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে স্রবে লোর-তরঙ্গ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীর্ঘ নিশ্বাস॥
বিদ্যাপতি কহ মিছ নহ ভাখি।
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ তাহে সাখি॥

অথবা,

হমে দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু
হমে হেরইতে তনু ঝাঁপ।
সুরত শিঙারে আজু ধনী আয়লি
পরশিতে থরথরি কাঁপ॥
(শুন হে) কানুন ইহ অবধারি।
সকল কাজ হাম বুঝলুঁ বুঝায়লুঁ
না বুঝলুঁ অন্তর নাবী॥

চিন্তা : অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত ধ্যানের নাম চিন্তা। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু :

ভাবাবেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজকরে নিবারয়ে প্রভুকর॥ —চৈতন্যচরিতামৃত।

কৃষ্ণ, যথা—
মন মাহা কোপ বেকত নাহি ভেল।
ঐছন মানিনি ঘর মাহা গেল॥
গুণি গুণি মাধব চলু নিজ বাস।
দন্দ পড়ল অব না পূরল আশ॥
মনহি বিচারয়ে রসময় কান।
কৈছনে আজুক টুটব মান॥
নিরজনে বৈঠিয়া রহল মুরারি।
তেজল গোঠক গমন বিহারি॥

শ্রীমতী, যথা—

তোম্মাকে সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাসে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মতি : কোনো বিষয়ে স্থিরনিশ্চয়ের ভাব, যেমন—

"তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যামবঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়॥"

"কি আর বলিব সই কি আর বলিব।
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব॥"

অথবা, সখীপ্রশ্নান্তে শ্রীমতীর অভিসারে মতি, যথা—

কুল-মরিযাদ- কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ-মরিযাদ- সিন্ধু সঞে পঙরলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধ॥
(সজনি) মঝু পরিখন কত দূর।
কৈছে হৃদয় ধরি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছুপর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেমদহন-দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু-অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ॥

ধৃতি : দুঃখনাশে ও অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে মানসিক অচাঞ্চল্য :

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সব সন্দেহা॥

সেই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

হর্ষ : অভীষ্ট প্রাপ্তিতে চিত্তের প্রসন্নতা, যেমন উপরি-উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে, অথবা—

'দুহুঁ দোহাঁ দরশনে উলসিত ভেল॥
আকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেল॥'
দুঁহ দিঠি দুহুঁ মুখ অবধি নাহিক সুখে
পুলকে পূরল দুহুঁ তনু।
বেঢ় সখীর ঠাট যৈছন চান্দের হাট
তার মাঝে সাজে রাধা কানু॥

ঔৎসুক্য : ব্যগ্রতা। অভিপ্রেত বস্তুর দর্শন বা প্রাপ্তির জন্য বিলম্ব-অসহিষ্ণুতা। যথা—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালংকৃতিঃ
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি
নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্‌বিধিম্॥

...ললিতমাধব।

কঁহো সে ত্রিভঙ্গ ঠাম কাঁহা সেই বেণুগান
কাঁহা সেই যমুনাপুলিন।
কাঁহা রাসবিলাস কাঁহা নৃত্যগীতহাস
কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥**
তোমার দর্শন বিনে অধন্য হই রাত্রিদিনে
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণাসিন্ধু
কৃপা করি দেহ দরশন॥
উঠিল ভাব চাপল মন হৈল চঞ্চল
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন কেমনে পাব দরশন
কৃষ্ণঠাই পুছেন উপায়॥**
নানা ভাবের প্রাবল্য হৈল সন্ধি শাবল্য
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈদ্য
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ॥

--চরিতামৃত।

উগ্রতা : অন্যের অপরাধ ও অসদ্ব্যবহারজনিত ক্রোধ। মধুররসে পুষ্টিকারক নয়।

তবে শ্রীমতীর প্রতিটি জটিলা বা ননদের বাক্য দৃষ্টান্ত হিসাবে গৃহীত হতে পারে। দেখতে হবে খণ্ডিতাবস্থায় শ্রীমতীর রোষ বা অসূয়া আছে, ঠিক ক্রোধের অবকাশ নেই। অবস্থান্তরে অবশ্য শ্রীমতীর কপট ক্রোধ থাকতে পাবে। কুটিলার উগ্রভাব, যেমন—

"উপরে থাকিয়া কুটিলা কহিছে
রাঙা করি দুটি আঁখি।
তোর চতুরতা আজি বুঝিয়াছি
নিতি নিতি দাও ফাঁকি॥
উপরে যেমন বরণ কালিয়
ভিতরে তেমনি কালি।
দূর হ রাখাল কুল-মজানিয়া
নতুবা খাইবি গালি॥"

শ্রীমতীর কপট উগ্রতা, যেমন—

সব সহচরি সহ বিনোদিনী রাই।
উঘাড়িলা মঞ্জুষা নিকটেতে যাই॥
দেখিতে পাইল শ্যাম নব জলধরে।
রাধিকা কপট ক্রোধে কহে ললিতারে॥
এ দুষ্ট ভূষণ মম সব চুরি করি।
অভিসার করিয়াছে পতিশিরে চড়ি॥
দিতে বল সখি মোর ভূষণ ফিরায়ে।
নতুবা যে শাস্তি দিব রাজারে কহিয়ে॥

—অকিঞ্চনদাস।

অমর্ষ : নিন্দাজন্য অথবা অপমানবোধ-জন্য অসহিষ্ণু। নিন্দাজন্য যথা শ্রীকৃষ্ণের :

গোপকুমারসমাজমিমং, সখি,
পৃচ্ছ কদানুগতোঽহং।
কথমিব মামনুপশ্যসি দিশিদিশি
কথমিব কলয়সি মোহম্॥

খণ্ডিতাবস্থায় অবমানিতা শ্রীমতীর :

আওত পর- বঞ্চক শঠ
নাগর শতঘরিয়া।
রমণীপদ- যাবক পরি-
সব বক্ষসি ধরিয়া॥**
যা যা দূতি বারহ বারহ
নিয়ড়ে জনি আওয়ে।
ঐছন বাণী শুনি তৈখনি
শশিশেখর ধাওয়ে॥

অসূয়া : প্রতিপক্ষ-বিষয়ে দ্বেষ, যেমন—

শুন মাধব, কোন কলাবতি সোই।
প্রেম হেম গহি আপন রঙ্গ দেই
এ হেন সাজায়লি তোই॥

অথবা,

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥
নূপুর হৈয়াছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥
বনমালা হৈল পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া॥
মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও-অধরামৃত খাইয়া খাইয়া॥ ইত্যাদি

চাপল্য : চিত্তের লঘুতা, গাম্ভীর্যের অভাব। প্রণয়ব্যাকুল অবস্থায় এই সঞ্চারীর উদ্ভব। তুঁ চরিতামৃত—"উঠিল ভাব চাপল, মন হৈল চঞ্চল, ভাবের গতি বুঝন না যায়।" যেমন—

"তুহাঁরি হৃদয় অধিদেবী।
তাক চরণ যাউ সেবি॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততহিঁ করহ পুন রঙ্গ॥"

অথবা,

"অধরে মুরলী যব ধরু বনমালী।
ফোই কবরী ধনি বান্ধি শিঙারি॥"

নিদ্রা : চিত্তের নিমীলিতাবস্থা, "ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্" (কালিদাস)।

চললহি মন্দিরে নওল কিশোরি।
হেরইতে হরি-মুখ অলখ বিলোচন
চেতন-রতন চোরায়লি গোরী॥

অথবা,

হরি হরি, অব দুহুঁ শ্যামল গোরি।
দুহুঁক পরশ রভ- -সে দুহুঁ মুরছিত
সূতল হিয়ে হিয় জোরি॥

বিরহে, যথা—

ঝর ঝর লোচনে শশিমুখী রোই।
অলখিতে আওল লখই ন কোই॥
সহচরিগণ মেলি শেজ বিছাই।
অলসে অবশ ধনি সূতলি তাই॥

সুপ্তি : পূর্ণনিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদর্শন :

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমঝিম শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত-দাদুরী-বোল
কোইল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঞ্ঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেনকালে॥...

—জ্ঞানদাস।

প্রবোধ : জাগরণ। উদ্ধৃত পদের উপসংহারে। যেমন—

পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইলুঁ হারা॥

তুঁ রবীন্দ্রনাথ—

"জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে।"

উল্লিখিত সঞ্চারীগুলির 'উৎপত্তি' 'সন্ধি' 'শবলতা' এবং 'শান্তি' এই চা'রপ্রকার অবস্থাও আলংকারিকেরা লক্ষ্য করেছেন। কোনো স্থায়ীভাবের অবস্থায় কোনো সঞ্চারীর উদ্ভবে 'উৎপত্তি'। দুই সজাতীয় অথবা বিজাতীয় সঞ্চারীর মিলনে 'ভাবসন্ধি'। কয়েকটি সঞ্চারীর উত্তরোত্তর প্রকাশ, যাতে একটি ভাবের সমাপ্তি না ঘটতে ঘটতে অন্যটি তার উপর এসে প'ড়ে সংঘর্ষ বা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় 'ভাবশাবল্য'। ভাবের সমাপ্তিতে 'শান্তি'। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার এরকম সন্ধি-শবলতার বিষয় উত্থাপন ও বর্ণন করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

নানা ভাবের প্রাবল্য হৈল সন্ধি শাবল্য
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ॥
মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন
গজযুদ্ধে বনের দলন।

শৃঙ্গাররস-বিভাগ

পূর্ব পূর্ব অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত শৃঙ্গাররসকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী 'উজ্জ্বল' বা 'মধুর' আখ্যা দিয়েছেন। উজ্জ্বল শব্দটি শৃঙ্গারের ভরত প্রদত্ত বিশেষণ থেকে নেওয়া। শৃঙ্গারের দুই বিভাব : সম্ভোগ (অর্থাৎ মিলন) এবং বিপ্রলম্ভ (বিচ্ছেদ)। সম্ভোগ-শৃঙ্গারকে শ্রীরূপ প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। মুখ্য সম্ভোগ হ'ল পরিস্ফুট জাগ্রৎ এবং সচেতন অবস্থার। গৌণ সম্ভোগ হ'ল এক অদ্ভুত বিচিত্র স্বপ্নাবস্থার। এ স্বপ্নাবস্থা লৌকিকের মত নয়। অলৌকিক অপ্রাকৃত ভাবাবস্থা। মুখ্য এবং গৌণ সম্ভোগ প্রত্যেকে চা'র ভাগে বিভক্ত—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্। প্রচলিত অলংকারশাস্ত্র থেকে এখানে এই হ'ল বিশেষ।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার প্রচলিত অলংকার-শাস্ত্রে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত : পূর্বরাগ, মান, প্রবাস এবং করুণ। শ্রীরূপ এগুলির মধ্যে 'করুণ'কে বর্জন ক'রে তার জায়গায় 'প্রেমবৈচিত্ত্য'কে স্থাপন করেছেন। করুণে নায়ক-নায়িকার একজন মৃত হন। অবশ্য, চিরতরে মৃত্যু বর্ণনার নিয়ম অলংকারশাস্ত্রে না থাকায় পরে পুনর্জন্মও দেখানো হয়। রাধাকৃষ্ণপক্ষে এরকম মৃত্যুবর্ণনার অসম্ভাব্যতা দেখে এবং সেই সঙ্গে পরকীয়া প্রীতির একটি অনিবার্য বাস্তব অবস্থার বিষয় উপলব্ধি ক'রে শ্রীরূপ করুণের স্থানে নূতন পর্যায়বিভাগ 'প্রেমবৈচিত্ত্য' নির্ধারণ করলেন। পূর্বরাগের দশ দশার শেষটি 'মৃত্যু' ব'লে অভিহিত হ'লেও মৃত্যুর চেষ্টা ; 'মৃত্যুবৎ'-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন শৃঙ্গারের বিভাগ-বৈচিত্র্য যথাসম্ভব দৃষ্টান্তের দ্বারা বর্ণিত হচ্ছে :

ক. মুখ্যসম্ভোগ :

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে॥

নায়ক-নায়িকার সুখতাৎপর্যময় দর্শন-আলিঙ্গন-চুম্বনাদিযুক্ত যে মিলিতাবস্থা তাই হ'ল সম্ভোগ-শৃঙ্গারের বিষয়। এর মধ্যে মুখ্যসম্ভোগ হ'ল নায়ক-নায়িকার পরস্পর জাগ্রত ও ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি নিয়ে সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থার। মুখ্য সম্ভোগ চা'র ভাগে বিভক্ত।

১. **সংক্ষিপ্ত**—পূর্বরাগান্তে নায়ক-নায়িকার লজ্জা-সম্ভ্রমের বাধাহেতু চকিত চুম্বনালিঙ্গন পর্যন্ত যে ব্যাপার তা হ'ল 'সংক্ষিপ্ত'। যেমন—

যব কানু নিয়ড়ে যাই কিছু বোলি।
লাজে কমলমুখী রহু মুখ মোড়ি॥
আরতিল নাহ বিনয় বেরি বেরি।
ধনি মুখচাঁদে আধ আঁচল দেলি॥
রাধা কানুক পহিল আলাপ।
মনমথ মাঝে মন্ত্র করু জাপ॥

বাহু পসারল গোকুলনাহ।
আছইতে আশ না করে নিরবাহ॥
ভুখিল মনোরথ না পূরয়ে আশ।
চান্দকলা নহে তিমির বিনাশ॥
ভাবে বিভোর পহুঁ লহু লহু হাস।
রাই শিথিলমুখ বহ নিশোয়াস॥
পরশিতে চিবুক নয়নে ভেল রঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহ উল্লসিত অঙ্গ॥

২. **সংকীর্ণ**—নায়কের পূর্বকৃত উপেক্ষা বা প্রবঞ্চনার পর অর্থাৎ মানাদির পর যে মিলন। এতে চুম্বনালিঙ্গনের মাধুর্যের সঙ্গে বঞ্চনাদির স্মৃতির জ্বালা মিশ্রিত থাকে। ফলে এ মিলনও বাধাহীন পূর্ণ মিলন হয় না। যেমন—

নিজ অপরাধ মানি যব মাধব
কোরে অগোরল ধাব।
সরস বিরসময়ী ইঙ্গিতে রসবতী
অসমতি সমতি বুঝাব॥
রাই কি করব নৈরাশে।
মান জলদ সঞে নিকসয়ে মুখশশী
কানুক দীঘ নিশাসে॥
কনয়াচলরুচ উচকুচচুচুকে
সরসহি পরশই নাহ।
মানক লেশ- শেষ-রস-সূচক
আধ-মুদিত দিঠি চাহ॥
অধর সুধারস পিবইতে যব ধনি
বঙ্কিম করু মুখ আধা॥
জগদানন্দ ভণ তবহুঁ দূরে গেও
হরিমন-মনসিজ-বাধা॥

৩. **সম্পন্ন**—অদূর প্রবাসের পর ব্যাকুলিত অবস্থায় পরস্পর যে মিলন তা হ'ল 'সম্পন্ন'। প্রেমবৈচিত্ত্যের পর বা ভাবী ও ভবন্ বিরহের পরমুহূর্তে যদি মিলন হয়ে যায় তাহ'লে তাও সম্পন্নের অন্তর্গত হবে। তা ছাড়া বিরহাবস্থায় ভাবোল্লাসময় মানস-কল্পিত মিলনও 'সম্পন্নে'র অন্তর্গত হবে। রূঢ় মহাভাবের অন্তর্গত চিন্তাধিক্যজাত ভাব-সাক্ষাৎকার অতিশয় চমৎকারজনক। প্রতিবন্ধকতার বা বিরহের তারতম্যানুসারে মিলন গাঢ় থেকে প্রগাঢ়তম হবে। সম্পন্ন সম্ভোগের দুই রীতি। আগতি বা প্রবাস থেকে আগমন এবং প্রাদুর্ভাব বা আকস্মিক আবির্ভাব। যেমন, চিরায়িতা শ্রীমতীর কৃষ্ণসমীপে আগমনে :

দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ধন্দ।
রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ॥

চীত পুতলি যেন রহু দুহুঁ দেহ।
না জানিয়ে প্রেম কেমন অছু নেহ॥
এ সখি দেখ দেখি দুহুঁক বিচার।
ঠামহি কেহ লখই নাহি পার॥
ধনি কহে কাননময় দেখি শ্যাম।
সো কিয়ে গুণব মঝু পরিণাম॥
চমকি চমকি উঠে নাগর কান।
প্রতি তরুতলে দেখে রাই সমান॥
দোঁহে দোঁহে যবহুঁ নিচয় করি জান।
দুহুঁক হৃদয়ে পৈঠল পাঁচবাণ॥
দোঁহে দুহুঁ মীলল বাহু পসারি।
দোঁহ সুখে মাতল নব সুকুমারি॥... —রায়শেখর।

অপিচ, বিরহিত গোপীসমীপে কৃষ্ণের অতর্কিত আবির্ভাব, ভাগবতে :

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

আকস্মিক ভাব-সাক্ষাৎকার, যথা—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ-চন্দা। ইত্যাদি পূর্বেই উদ্ধৃত।

৪. **সমৃদ্ধিমান্**—পরাধীনতার জন্য যেখানে নায়ক অথবা নায়িকাকে দূর প্রবাসে কালযাপন করতে হয়, সে-অবস্থার সুদুর্লভ মিলন হ'ল সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের অন্তর্গত। এ মিলন প্রবাসান্ত হতে পারে, আবার প্রবাস-মধ্যবর্তী আকস্মিক মানস-সাক্ষাৎকারও হতে পারে। এই মিলন যেমন প্রেমের দিক থেকে আশ্চর্য রমণীয়, তেমনি এতে শৃঙ্গারের যাবতীয় উপচারের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। যেমন—

অধর-সুধারসে লুবধল মানস
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
মুখ অবলোকনে অনিমিখ লোচনে
কৈছে হোয়ত নিরাবাহ॥
রাধা-মাধব প্রেম।
দুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশন গাঁঠিক হেম॥
আনন্দ-নীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে
তবহি পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন
সুরত-জলধি-অবগাহ॥
মধুরিম হাস- সুধারস বরিখনে
গদগদ রোধয়ে ভাষ।

চিরদিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন
কহতহি গোবিন্দদাস॥

'চিরদিনে' অর্থাৎ বহু বিলম্বে। অপিচ,

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দির মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ হেরইতে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তভো হম পিয়া দূরদেশ ন পঠাই॥...

—বিদ্যাপতি।

অথবা,

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরান গেলে॥... —চণ্ডীদাস।

প্রবল বিরহমধ্যে প্রিয়ের মূর্তি-চিত্রাদি দর্শনে প্রত্যক্ষ মিলন-অনুভবেও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হবে।

খ. **গৌণ সম্ভোগ**—স্বপ্নযোগে প্রত্যক্ষবৎ সম্মিলন। এরও সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণাদি চার বিভাগ। ভক্ত বৈষ্ণবগণ এ-মিলনকেও সত্য ব'লেই অনুভব করেন, কারণ, কৃষ্ণেচ্ছায় শ্রীরাধা অথবা তদনুসারে ভক্ত এইভাবে অভীষ্টপূর্তি লাভ ক'রে থাকেন। যেমন—

আজু হাম স্বপনে সমুখে এক মুনিবব
হেরি করলুঁ পরণাম।
সো মোহে কহল অচিরে তুয়া মঙ্গল
পূরব মানস-কাম॥
ইহ পুন কহ জনি কোই।
রজনিক শেষ সময় অরুণোদয়
স্বপন বিফল নাহি হোই॥
আওব কানু পুনহুঁ কিয়ে ব্রজমাহা
ঐছে মনহি যব কেল।
তবহুঁ একজন ফুকরিয়ে আওত
তত বিহি-ইঙ্গিত ভেল॥
ফুরয়ে বাম- নয়ন ভুজ ঘন ঘন
হোওত মনহি উল্লাস।
ঐছন সুলক্ষণ আন নহত পুন
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥

অপিচ,

চিরদিনে মীলল রাইক পাস।
উঠই না পারই বিরহ হুতাশ॥

বাম পাণি দেই দক্ষিণ ধারে।
চেতন হোয়ল হাতক ভারে॥
আঁখি মেলি হেরি উঠই না পার।
নাগর লেয়ল কোরে আপনার॥
বিরহিনি বামে করি বৈঠক কান।
বিরহিনি মানল স্বপন সমান॥
পূরল যতহু মরম অভিলাষ।
কছু নাহি বুঝল বলরামদাস॥

এ-প্রসঙ্গে বাৎসল্যরসের বিষয় মাত্র তুলনায় উল্লেখ করা যেতে পারে। নবদ্বীপে অবস্থান ক'রেই শচীদেবী নীলাচলাবস্থিত নিমাইয়ের সাক্ষাৎ পেতেন। শ্রীচৈতন্যের আশ্বাসবাক্য ছিল যে, শচীদেবী যখনই ইচ্ছা করবেন নিমাইকে কাছে পাবেন। এ-বিষয়ে বাসুদেব ঘোষ বিরচিত নিম্নলিখিত অংশ দ্রষ্টব্য :

আজিকার স্বপনের কথা শুন লো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে॥
ঘরেতে সুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম
নিমায়ের গলার সাড়া পাঞা।
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুন কাঁদে গলায় ধরিয়া॥ ইত্যাদি।

দিবা-স্বপ্নবৎ সাক্ষাৎকার, নিশা-স্বপ্নে দর্শনদান প্রভৃতির মূল্য বৈষ্ণবের কাছে অপরিসীম।

সম্ভোগ-শৃঙ্গারের জ্ঞাপক অনুভাব হিসাবে শ্রীরূপ নিম্নলিখিত কয়েকটির উল্লেখ করেছেন : সন্দর্শন, জল্প (কৌতুকালাপ), স্পর্শ, পথরোধন, রাস, বৃন্দাবন-ক্রীড়া, জলকেলি, নৌবিলাস, লীলাচৌর্য, দানলীলা, আত্মগোপন-ক্রীড়া, মধুপান, বধুবেশ-ধারণ, কপটনিদ্রা, দ্যুতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখাঘাত, অধর-সুধাপান, সম্প্রয়োগ। পদকর্তা মহাজনদের রচনায় এগুলি যথাসম্ভব পরিস্ফুট করা হয়েছে। শ্রীরূপ পূর্ব পূর্ব বিদগ্ধ অলংকারিকদের সঙ্গে একমত হয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যে এগুলির মধ্যে সম্প্রয়োগ (প্রকৃত সংগম) অপেক্ষা অন্যান্য অনুভাবগুলিই অধিকতর মনোহারী।

বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার

সম্ভোগের পুষ্টিকারক এই বিপ্রলম্ভে পূর্বে-মিলিত অথবা অ-মিলিত নায়ক-নায়িকার অভীপ্সিত মিলন না পাওয়ার মনোভাব বিশ্লেষিত হচ্ছে। বিচ্ছেদই মিলনকে পরিপুষ্ট পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। পূর্বরাগ, মান, প্রবাস এবং প্রেমবৈচিত্ত্য, বিপ্রলম্ভের এই মুখ্য চা'র ভেদ এবং এগুলির আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে প্রদত্ত হচ্ছে।

ক. পূর্বরাগ

রতির্যা সংগমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলিত প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥

প্রকৃত মিলনের পূর্বে পরস্পর দর্শন প্রভৃতি থেকে জাত নায়ক-নায়িকার (সমুচিত সঞ্চারীভাব ও অনুভাবের দ্বারা পুষ্ট) মিলনেচ্ছাময় যে রতি, তাকেই বলে পূর্বরাগ।

দর্শন প্রত্যক্ষ হতে পারে, চিত্রগত এবং স্বপ্নগতও হতে পারে। আর শ্রবণ ঘটতে পারে দূতীমুখে, বন্দিমুখে, সখীমুখে অথবা সংগীতাদি থেকে। কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণে রাধার পূর্বরাগোদয় বৈষ্ণব কবিদের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। আবার কেবল নাম-শ্রবণে পূর্বরাগের ব্যাপারটি চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব রসিক-সমাজে সমাদর লাভ করেছে। উদাহরণসমূহ :

(১) মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শন, যেমন, চৈতন্যভাগবত :

কানাঞির নাটশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিলুঁ সেই স্থান॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ—লখিতে না পারি॥
হাথেতে মোহন বংশী পরম-সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন-অলংকার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহব সে পীতধটীর পরিধান।
মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইল কোন ভিতে॥

(২) শ্রীমতীর প্রত্যক্ষ, যথা—

এ সখি পেখলুঁ এক অপরূপ
সুনইত মানবি সপন স্বরূপ॥
কমল জুগল পর চাঁদক মাল।
তা পর উপজল তরুণ তমাল॥
তা পর বেঢ়ল বিজুরিলতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি জাতা॥**
এ সখি রঙ্গিণি কহল নিশান।
হেরইত পুনি হমে হরল গেয়ান॥ —বিদ্যাপতি।

(৩) চিত্রে দর্শন যথা—

হাম সে অবলা হৃদয়ে অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।

বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল্য আনি॥... —চণ্ডীদাস।

(৪) স্বপ্নে দর্শন যথা—

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিপুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥ ...জ্ঞানদাস।

(৫) নামশ্রবণে পূর্বরাগ, যথা—

কে বা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো...
—চণ্ডীদাস।

(৬) মুরলী শ্রবণে, যথা—

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে... —যদুনন্দন।
কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঞাঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥... বড়ু চণ্ডীদাস।

পূর্বরাগাবস্থার সঞ্চারী ভাব হল—ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লান্তি, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, জাগরণ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু। কৃষ্ণ-বিষয়ক রতির সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থার অনুযায়ী পূর্বরাগেও সাধারণ, সমঞ্জস এবং প্রৌঢ় এই তিন শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রৌঢ় পূর্বরাগে দশটি প্রধান সঞ্চারীভাব প্রবল হয়ে 'দশা'রূপ লাভ করে। এগুলি হল—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব, (কৃশতা), জড়িমা, বৈয়গ্র্য (ব্যগ্রতা) ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু। সমঞ্জস পূর্বরাগের দশ দশা স্বল্প ভিন্ন। যেমন, অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপ উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু। এ থেকে প্রমাণ হয় যে প্রৌঢ় পূর্বরাগ থেকে সমঞ্জস নিম্নমানের। সাধারণ আরও নিম্নমানের, কারণ, এর দশার সংখ্যা মাত্র ছ'টি, তাও কোমলভাবে অনুভূত হয় মাত্র। এখন প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশ দশার স্বরূপ প্রদর্শিত হচ্ছে :

১. **লালসা**—কৃষ্ণের দর্শনাদি প্রাপ্তি-বিষয়ে তীব্র লোভ, গাঢ় তৃষ্ণা যেমন—

অবনত আনন কএ হম রহলিহ
বারল লোচন-চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জানি সে চাঁদ চকোর॥

ততহুঁ সঞে হঠে। হটি মোঞে আনল
ধএল চরণহি রাখি।
মাতল মধুপ উড়ই ন পারএ
তইঅও পসারএ পাখি॥
মাধবে বোললি সুমধুর বাণী
তা সুনি মৃদু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পাঁচ বাণ॥
তনু-পসেবে পসাহনি ভাসলি
পুলক তৈসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলয়া ভাঁগু॥

—বিদ্যাপতি।

২. **উদ্বেগ**—মনের চাঞ্চল্য। এর অনুভাব হল দীর্ঘশ্বাস, চিন্তা, অশ্রু, বিবর্ণতা, স্বেদ প্রভৃতি। যেমন,

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই কেনে বা এমন হৈল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেবা পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥... —চণ্ডীদাস।

৩. **জাগরণ**, যেমন—

তুহুঁ মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগুধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥
নিশি দিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরথরি কাঁপি পড়য়ে সোই ঠাম॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজে উঠই তব রোয়॥
সখীগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাপে ততহি নাহি ভায়॥...

—কবিশেখর।

পদটিতে নীলাচলবাসী মহাপ্রভুর বিরহচিত্রের ছায়া পড়েছে।

৪. **তানব**, যেমন,

** মাধব, শুন শুন বচন হমারি।
তুয়া লাগি সুন্দরী অতি ভেল দুবরি
গুণি গুণি প্রেম তোহারি॥
ধরণী ধরিয়া ধনী কত বেরি বৈঠই
পুন তহি উঠই ন পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা॥
তোহোরি বিরহে দিন খেনে খেনে তনু খিন
চৌদশি চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লছিমা দেবী পরমাণ॥

৫. **জড়তা**, যেমন—

রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ানতারা॥
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥... —চণ্ডীদাস।

অপিচ,

**গুরুজন-বচন বধির সব মানই
আন কহই শুন আন।
পরিজন বচনে মুগধী সব হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

৬. বৈয়গ্র্য—অন্তর-নিরুদ্ধ ভাবের বিক্ষোভজনিত অসহিষ্ণু অবস্থা :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥**
গুরু-গরবিত মাঝে রহি-সখীসঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করু কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥ —জ্ঞানদাস।

৭. ব্যাধি, যেমন—

সোনার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥
গলয়ে সঘনে লোর।
মুরছে সখিক কোর॥
দারুণ বিরহজ্বরে।
সো ধনি গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে এ জ্ঞানদাস॥

৮. **উন্মাদ** (ভ্রান্তির অবস্থা)। নিম্নলিখিত পদে একত্র তানব, জড়িমা, ব্যাধি ও উন্মাদের প্রকাশ :

(মাধব) দুবরী পেখলুঁ তাই।
চৌদশি-চাঁদ জনু অনুখন খীয়ত
ঐছন জীবন রাই॥
নিয়ড়ে সখীগণ বচন যো পুছত
উতর না দেয়ই রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি অনুখন
তুয়া মুখ হেরইতে সাধা॥
সরসহি মলয়জ- পঙ্কহি পঙ্কজ
পরশে মানয়ে জনু আগি।
কবহু ধরণি-শয়নে তনু চমকিত
হৃদি-মাহা মনমথ জাগি॥
মন্দ মলয়ানিল বিষসম মানই
মুরছই পিককুল-রাবে।
মালতি-মাল পরশে তনু কম্পিত
ভূপতি কহ ইহ ভাবে॥

অথবা,

নিজ-কর-পল্লব অঙ্গে না পরশই
শঙ্কই পঙ্কজ-ভানে।
মুকুর-তলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরি
শশি বলি হরই গেয়ানে॥...

—কবিশেখর।

৯. মোহ—মূর্ছায় নিশ্চলতা, ভূপতন প্রভৃতি। যেমন—

তেজল গুরুকুল-গৌরব লাজ।
তেজল গৃহ গৃহপতিক সমাজ॥

তেজল লোক নগর ঘর-বসতি।
তেজল ভূষণ অশন-রস-পিরিতি॥
তেজল হৃষিক-করণ অভিলাষ।
তেজল বদনে অমিয়াময় ভাষ॥
তেজল নয়নে নিমিষ অবিরাম।
তেজল কিশলয়-শয়নক নাম॥
শুন শুন বজর-কঠিন পীতবাস।
তেজল অব ধনি জীবন-আশ॥
তেজল বিরহিণি সবহু গেয়ান।
নবমী দশা সভে করু অনুমান॥
অব যদি যাই করহ অবসাদ।
মাধব তোহারি চরণ ধরি কাঁদ॥

১০. মৃত্যু—মৃত্যুর উদ্যম মাত্র বুঝতে হবে, যেমন—

যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছে মিলয়ে যব গোকুলচন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধরশ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

সমঞ্জসাদির পূর্বরাগে চিন্তা, স্মৃতি, অভিলাষ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত পূর্বনির্দিষ্ট অনুভাব সঞ্চারীর বর্ণনেই দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত গুণকীর্তন, মাল্যার্পণ, লেখ্যপ্রেরণ।

খ. মান

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥

নায়িক-নায়িকা পরস্পর অনুরক্ত এবং নিকটে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যে বিশেষ মানসিক অবস্থা উভয়ের মিলনে বাধা জন্মায় তা-ই হল মান। প্রণয় না থাকলে মানের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। নির্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ, অসূয়া, গর্ব, অবহিত্থা (ভাব-গোপন) প্রভৃতি এতে সঞ্চারীর কাজ করে। নায়কেরও অভিমান হতে পারে (যেমন স্বল্পদোষে অথবা বিনাদোষে ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে), কিন্তু নায়িকার মানই সমধিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। অনুরক্ত অথচ কৃতাপরাধ নায়ক মানাবস্থায় নায়িকাকে ভয় করবেন, আর নায়িকা পোষণ করবেন ঈর্ষা এই হল প্রণয়ের

লীলা। প্রতিপক্ষকে নায়িকা কদাপি সহ্য করতে পারেন না, এতে নায়কের উপর তাঁর গাঢ় আকর্ষণই প্রকাশ পায়।

মানের দুই প্রকার—সহেতু ও নির্হেতু। যথার্থ কারণ থাকলে অর্থাৎ ভিন্ন নায়িকার প্রতি নায়কের পক্ষপাতের প্রমাণ পাওয়া গেলে 'সহেতু', যেমন খণ্ডিতা অবস্থার পর মান। আর, কোনো কারণ না থাকলে বা ভ্রমবশতঃ কোনো কারণ মনে মনে ভেবে নিয়ে (কারণাভাসে) যে মান তা-ই হল 'নির্হেতু'। এই অকারণ মান প্রণয়লীলাবিলাসের একটি বিশেষ অঙ্গ, আর বৈষ্ণব মহাজনেরা তা নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রেমের এই আশ্চর্য স্বভাবের কারণ নির্দেশ করা যায় না। শুধু বলা যায় যে প্রণয় স্বভাবতই কুটিলপথগামী— 'অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।' এ ছাড়া পরিণাম হিসাবে মানের ভিন্নতায় লঘু, প্রগাঢ়, দুর্জয় প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রগাঢ় বা দুর্জয় মান ভাঙাতে অপরাধী নায়ককে প্রায়শই নায়িকার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হয়।

১. সহেতু মান বা ঈর্ষামান তিন প্রকারে ঘটতে পারে :

অন্য নায়িকার সঙ্গে মিলন—প্রত্যক্ষ দর্শন-শ্রবণে, অনুমানে অর্থাৎ নায়কের বেশভূষা মুখের ভাব প্রভৃতি দেখে, অথবা প্রতিপক্ষ নায়িকার দেহে নায়ক-প্রদত্ত অলংকারাদি দেখে এবং অন্য কারো কাছ থেকে শুনে। এর মধ্যে প্রত্যক্ষের ফলে মানের দৃষ্টান্ত হল :

(সই) মিছা নেহ তার সাথে।
মন্দিরে আছিল আন ছলা ধরি
বাহির হইল পথে॥
সন্দ ভেল মনে আমিহ তৈখনে
ঘরের বাহির হৈনু।
যা ভাবিল তাই দেখিল নয়নে
কপট বেকত পাইনু॥
বিশাখার করে কর রাখি শঠ
সরস বারতা ভণে।
বড় পাপ ছিল পূরব জনমে
মরণ না হৈল কেনে॥
যে হৌক সে হৌক আর কভু তারে
আসিতে না দিবি হেথা।
কভু দেখি যদি খাইব গরল
ঘুচাব মনের বেথা॥

—ক্ষুদিরাম দাস।

অনুমান তিন প্রকারে হতে পারে। প্রিয়গাত্রে বিপক্ষ-মিলন-চিহ্ন দর্শনে বা বিপক্ষদেহে প্রিয়মিলনচিহ্ন দর্শনে, গোত্রস্খলনে অর্থাৎ ভুল করে অন্য নায়িকার নাম উচ্চারণে এবং প্রেমিকের স্বপ্নাবস্থার আচরণে।

অসংগতি অলংকারের সাহায্যে ভোগাঙ্ক অনুমান, যথা—

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥

অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি।
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁ কহ গদগদ ভাব॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরি তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহি গোবিন্দদাস॥

শুকমুখে শ্রবণে, যথা—

তরু পর রৈয়া শুক ফুকারিয়া
কহয়ে আপন স্বরে।
কানুরে লৈয়া চলিল ধাইয়া
পদ্মা সহচরী ঘরে॥
শুকের বচন শুনি বিনোদিনী
অরুণ যুগল আঁখি।
অবনত মুখে মৃদুমন্দ স্বরে
কহে গদগদ ভাখি॥
পদ্মা সখির সঙ্গতি সুন্দর
শ্যাম মধুকররাজ।
যৈছে রসবতী তৈছন রসিক
মোর সনে নাহি কাজ॥...

—উদ্ধবদাস

২. **নির্হেতু ও কারণাভাস মান :**

যমুনা সমীপ নীপ তরু হেলন
শ্যামর মুরলীক রন্ধে।
রাধা-চন্দ্রাবলিত বিমলমুখী
গাওয়ে গীত পরবন্ধে॥
শুনি ধনি রাই রোখে ভেল গরগর
থর থর কম্পিত অঙ্গ॥
চন্দ্রাবলি বলি বংশী বাজাওত
বিলসয়ে তাকর সঙ্গ॥
এত কহি মানে মলিন ভেল বিধুমুখ
ঢর ঢর অরুণ নয়ান।

কহতহি চপল- চরিত সঞে পীরিতি
আজু হোয়ল সমাধান॥

এখানে গোপীমুখে চন্দ্রাবলী-ধ্বনি শুনে কারণাভাসে মান।

হের দেখসিয়া মু মলুঁ হাসিয়া
গবাক্ষ দুয়ারে চাই।
প্রাণনাথ সনে একত্র শয়নে
মানিনী হৈয়াছে রাই॥
প্রেমের কুটিল গতি।
নহিলে বা কেনে দুঁহার মিলনে
কলহ উপজে নিতি॥
আপনার নখ- পদ পরতেখ
দেখিয়া নাগর উরে।
কানু-পিঠ করি বসিলা সুন্দরি
নাগর কাঁপিছে ডরে॥...

—উদ্ধবদাস।

এক্ষেত্রে নির্হেতু মান। নখপদরেখা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। অনুরূপ—

মরকত দরপণ শ্যামহৃদয়-মাহা
আপন মূরতি দেখি রাই।
গুরুয়া কোপে অধর ঘন কাঁপই
অরুণ নয়ান ভৈ যাই॥
দেখ দেখ কানুক রঙ্গ।
আনহ রমণি হৃদয় করি বঞ্চই
ঐছন না দেখিয়ে ঢঙ্গ॥...

—প্রেমদাস।

আসলে এগুলি উপলক্ষ্যও নয়। মাঝে মাঝে মান করতে আপনা থেকেই মন চায়—তাই একটা উপলক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া। নায়কের ক্ষণিক উদাসীনতাও মানের উপলক্ষ্য হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মানের রীতি হবে লঘু বা কোমল। সহেতুক মান মধ্যম স্তরের অথবা প্রায়শই দুর্জয় হয়ে থাকে। মধ্যম মান নায়কপক্ষ থেকে পুনঃপুন কাতরোক্তির পর অথবা নায়িকার আক্ষেপ ও শাণিত বিদ্রূপ প্রয়োগের পর শান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্জয় মান নায়ক পদতলে লুণ্ঠিত হলেও ভাঙে না। যেমন, মধ্যম মান—

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈলশিখরে এক পাণি॥
অব বিপরিত ভেল সে সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ সজনি, না বোলহ আন।
কী ফল আছয়ে ভেটব কান॥

অন্তর বাহিরে সম নহ রীত।
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরিত॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার।
বিষঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরি বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত প্রেমসুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠিনি কপটে কহ মোয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়॥

দুর্জয় মান—

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মীললি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জীউ জরি যব যায়ব
তবহুঁ দেখবি ইহ রঙ্গে॥
কী ইহ জিদ্দ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পাঙ-রি উতারব পার॥
শ্যামর ঝামর নলিন মলিন মুখ
ঝর ঝর নয়নক নীর।
পীতাম্বর গলে পদহি লোটায়ল
হিয়া কৈছে বান্ধলি থির॥
সাধি সাধি ছরমী ঘরমী মহা বিকল
ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস।
মনমথ দাহ দহনে মন ধসি গেও
রোখে চলল নিজ বাস॥
অবিরোধি-প্রেম- পন্থ তুহুঁ রোধলি
দোষ-লেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি
হমারি ওর নাহি চাহ॥

মানভঙ্গ—নানা কারণে মানভঙ্গ ঘটে। নায়কের কাকুক্তি ও পাদপতন, স্বল্প কারণে নায়িকার মানদৃষ্টে নায়কের উপেক্ষা ও মান-অবলম্বন (তুঁ—মান কৈলি তো কৈলি, আমরাও তোর মানে আছি রাই), কালক্রমে মানবেগ-শৈথিল্য। প্রচলিত সাহিত্যদৃষ্টে শ্রীরূপ মানভঙ্গের অন্য দুটি কারণও নির্দেশ করেছেন। নৈসর্গিক কারণে রসান্তব ঘটলে (যেমন বজ্রপাত ভূকম্পন প্রভৃতিতে) এবং বুদ্ধিপূর্বক রসান্তর ঘটালে (যেমন, নায়ক বৃশ্চিকদংশন বা অন্যবিধ আকস্মিক পীড়ার ভান করলে)। নিম্নলিখিত অংশে কৃষ্ণের অকপট আনুগত্য শ্রীমতীর মানভঙ্গের কারণ হয়েছে :

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশাসে॥
কত পরখসি মোরে আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাই তুয়া চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া মোর চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরিতি-পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বরূপগোস্বামীপাদের বর্ণন উল্লেখ ক'রে নায়িকাভেদে গোপীদের মানবৈচিত্র্য নিম্নলিখিতভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে :

সম্যক গোপীর নাম না যায় কথন।
এক দুই ভেদ করি দিগ্ দরশন॥
মানে কেহ হয় ধীরা কেহ ত অধীরা।
এই তিন ভেদে কেহ হয় ধীরাধীরা॥
ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান॥
হৃদে কোপ, মুখে কহে অধীর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁরে করে আলিঙ্গন॥
সরল ব্যাভারে করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ বাক্যে প্রিয়নিরসন॥
অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায় বন্ধন॥
ধীরাধীরা বক্রবাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগলভা তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য বিভেদ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয়বাক্যে হয় পরসন্ন॥
মধ্যা প্রগল্ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সভার স্বভাব তিন ভেদ॥

কেহ মুখরা কেহ মৃদ্বী কেহ হয় সমা।
স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় রসসীমা॥
প্রাখর্য মার্দব সাম্য স্বভাব নির্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ॥

*   *   *

বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা একগণ।
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন॥
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্ন-খনি॥
বয়সে মধম্যা তেঁহো স্বভাবেতে সমা।
গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর বামা॥
বাম্য স্বভাবে উঠে মান নিরন্তর।
তার বাম্যে বাঢ়ে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর॥

গ. প্রবাস

'অদূর প্রবাস' কৃষ্ণের কালিয়-দমন, গোষ্ঠে যাত্রা প্রভৃতি অবলম্বনে। কৃষ্ণকীর্তনকার তাঁর 'রাধাবিরহে' কৃষ্ণের চকিত অন্তর্ধানে রাখার আক্ষেপ বর্ণনা করেছেন। তাও অদূর প্রবাসের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রচলিত পদাবলীর 'আক্ষেপানুরাগ' পর্যায় পরকীয়া রতিতে মিলনের সাধারণ বাধা-প্রতিবন্ধকের উপর ভিত্তি ক'রে বিরচিত ব'লে এও অদূর প্রবাসের পর্যায়ভুক্ত হবে। যদিও আক্ষেপানুরাগের সূক্ষ্ম রসতাৎপর্য অনুধাবন ক'রে একে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের একটি পৃথক পর্যায় হিসাবে গণনা করাই সংগত।

'সুদূর প্রবাস' বলতে কৃষ্ণের কার্যোপলক্ষ্যে বা পারতন্ত্রের বশে মথুরাগমনকে বোঝায়। কংসের নিমন্ত্রণে অক্রূর এসে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে কৃষ্ণ কংসবধাদি স্বকার্যও সাধন করেন। রসান্তর ঘটবে ব'লে পদাবলীতে কংসবধাদি বর্ণিত হয়নি। এই দূর প্রবাসের বিরহাবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত ক'রে দেখা যায় - ভাবী বিরহ (যে বিরহ অদূর ভবিষ্যতে হবে), ভবন্ বিরহ (যা ঘটতে চলেছে) এবং ভূত বিরহ (যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে গেছে)। এ বিন্যাস পূর্বপ্রচলিত অলংকারশাস্ত্রেও দেখা যায়। অক্রূর কৃষ্ণকে নিতে এসেছেন, তাঁর রথ দেখা গেছে, এমন অবস্থায় গোপীদের ভাবী বিরহের অবস্থা। যাত্রার সাজগোজ চলছে, এখনই কৃষ্ণ মথুরা যাত্রা করবেন এমন অবস্থার মনোভাব ভবন্ বিরহের, আর কৃষ্ণ চলে গেছেন, শীঘ্র ফিরবার সম্ভাবনা নেই, এমন অবস্থা ভূত বিরহের।

তত্ত্বের দিক্ থেকে দেখলে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের কোনো বিরহ সম্ভব নয়, কারণ কৃষ্ণ সর্বদাই গোপীদের সঙ্গে রাসলীলাপরায়ণ অবস্থায় বৃন্দাবনেই থাকেন, তবে প্রকট লীলার বৈচিত্র্য হসাবে প্রবাসাদি দেখাতে হয়, কারণ বিপ্রলম্ভেই শৃঙ্গার পরিপুষ্ট ও পূর্ণ হয়। শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে নির্দেশ দিচ্ছেন :

বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ॥

দেখা যায়, শ্রীরূপ কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং দ্বারকালীলা এ দুইকে একত্র ক'রে একখানি নাটক রচনা করতে যখন প্রবৃত্ত হন তখন স্বপ্নদৃষ্টে এবং মহাপ্রভুনির্দেশে ঐ প্রয়াস বন্ধ ক'রে অবশেষে দ্বারকালীলা এবং বৃন্দাবনলীলা নিয়ে পৃথক্ দু'খানি নাটক রচনা করলেন—বিদগ্ধমাধব এবং ললিতমাধব। শ্রীরূপকে উপদেশদানে মহাপ্রভুবাক্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে॥
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে॥

—চৈ-চ, অন্ত্যঃ ১ম।

যামলমুনিও পূর্বে নির্দেশ দিয়েছিলেন :

কৃষ্ণোন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥

যদুকুলসম্ভূত কৃষ্ণ গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ থেকে পৃথক্। মাধুর্যলীলারসসার গোপকৃষ্ণ বৃন্দাবনে চিরস্থায়ী। কেন, এ প্রশ্ন পূর্ণভগবান কৃষ্ণসম্পর্কে সমুত্থাপিত হতে পারে না, কারণ, তাঁর জন্ম কর্ম সবই দিব্য, অলৌকিক। অতএব প্রকটলীলায় রসবিস্তারবৈচিত্র্যের জন্য এবং ভক্তদের অনুগ্রহের জন্য কৃষ্ণের প্রবাসগমন।

প্রবাস বিষয়ে শ্রীরূপ বলছেন :

পূর্বসংগতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানং তু যৎ প্রাজ্ঞৈ স প্রবাস ইতীর্যতে॥

পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশান্তর প্রভৃতির দ্বারা যে ব্যবধান তাকে প্রবাস বলে। এই প্রবাসের কারণে বিপ্রলম্ভও প্রবাস-বিপ্রলম্ভ আখ্যা পেতে পারে। কৃষ্ণ লীলাকাহিনী অনুসারে গিয়েছিলেন মথুরায়। এজন্য এই বিপ্রলম্ভকে 'মাথুর'ও বলা হয়। হর্ষ, গর্ব, মদ, ব্রীড়া এই ক'টি সঞ্চারী বাদ দিয়ে শৃঙ্গারের সব সঞ্চারীই এতে পাওয়া যায়। প্রবাস দু'রকমের—বুদ্ধিপূর্ব এবং অবুদ্ধিপূর্ব। নিজ কার্যবশে বিদেশগমন হ'লে বুদ্ধিপূর্ব। পরবশে যেতে হলে অবুদ্ধিপূর্ব। কৃষ্ণের মথুরাগমন বুদ্ধিপূর্ব এবং অবুদ্ধিপূর্ব দুই-ই। কংসর নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন সুতরাং অবুদ্ধিপূর্ব এবং কংসবধাদি কার্যানুরোধে যাচ্ছেন সুতরাং বুদ্ধিপূর্ব। এ দুই প্রথমতঃ অদূর প্রবাস এবং সুদূরে প্রবাসে ভেদে দ্বিবিধ। আবার এ দুই রীতির প্রবাসেই বিরহ তিনভাগে বিভক্ত হতে পারে—ভাবী বিরহ, ভবন্ বিরহ এবং ভূত বিরহ। এই বিপ্রলম্ভে পূর্বরাগের মতই স্বল্প ভিন্ন দশ দশার উদ্ভব হয়—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব (কৃশতা), মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু। উদ্ধৃত পদগুলিতে ঐরূপ অবস্থার পরিচয় যথাসম্ভব জ্ঞেয়।

মাথুরে ভাবী বিরহ, যথা—

কিয়ে সখি চম্পক- দাম বনায়সি
করইতে রভস-বিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর
ব্রজপুর করি আঁধিয়ার॥
প্রিয়তম দাম শ্রীদাম হলধর
এ সব সহচর সাথ।

শুনইতে মুরছি পড়ল সোই কামিনি
কুলিশ পড়ল জনু মাথ॥
খেনে খেনে উঠত খেনে খেনে বৈঠত
অবশ কলেবর কাঁপি।
ভণ যদুনন্দন শুনইতে ঐছন
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥

অপিচ,

নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজমাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ-অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ॥
রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে র[illegible]নমালি॥
যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধহ
বান্ধহ যামিনীনাথে।
নখতর চান্দ বেকত রহু অম্বর
যৈছে নহত পরভাতে॥
[illegible]লিন্দী দেবী সেবি তাহে তাখহ
সো রাখউ নিজ তাতে।
কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥

মাথুরে ভবন্ বিরহ :

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।
সে হেন রসিক প্রিয়া পিরিতি-পূরিত হিয়া
কাহে ভেল শিথিল-সনেহ॥
চল চল সহচরী অকুর-চরণে ধরি
তিল এক হরি-বিলম্বাহ।
করুণা-ক্রন্দন শুনইতে ঐছন
জানি ফিরয়ে বর-নাহ॥
পরিহরু গুরুজন হসউ বা দুরজন
কি করব পরিজন পাপ।
কানুবিনে জীবন জলতহি অনুখন
কো সহ হেন সন্তাপ॥
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন-অঞ্জলি ভরি
পিবইতে জীউ করে সাধ।

গোবিন্দদাস ভণ সো বিহি নিকরুণ
যো করু ইহ রস-বাধ॥

ভূত বিরহ :

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
ন ভেল যুগল-পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখলব ভৈ গেল নৈরাশা।

অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই।
কে জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজন।
অনুভবি কানু- পিরিতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস পূর॥

দূতী-সংবাদে রাধাবিরহ :

কুল-মরিয়াদ রহল পরিবাদহি
তুহুঁ মন হরি রহু দূর।
বচন আদি করি সকল শকতি হরি
মদন মনোরথ পূর॥
তোহে পুন কি কহব আর।
জগতে খোয়লি সোই ধনিক কলেবর
শোভা-রতন-ভাণ্ডার॥
অঞ্জন লেই তনু রঞ্জল নব ঘন
দামিনি দ্যুতি হরি নেল।
লেই যৌবন-ছিরি নব-অঙ্কুর করি
মধুবন ঘন বন ভেল॥
তহিঁ পুন এক লতা তুয়া রোপিত
আশা যাকর নাম।
তা সঞে জড়িত কণ্ঠগত নিরখত
অবহুঁ জীবন ঘনশ্যাম॥

অদূর প্রবাসে বিরহ, যথা—

যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ (বড়ায়ি)
না মানিলোঁ লঘুগুরু জনে।

হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥
কতদুখ কহিব কাহিনী॥
দহ বুলি ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল (ল)
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পোআল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতে রাখিতে কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোর কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
মোক নেহ কাহ্নাঞির পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ুচণ্ডীদাসে॥

ঘ. প্রেমবৈচিত্ত্য

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তি স্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচতে॥

নায়ক-নায়িকা পরস্পর সমীপবর্তী হ'লেও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ স্বাভাবিক বিচ্ছেদকাতরতাময় যে আর্তি তাই হ'ল প্রেমবৈচিত্ত্য। বৈচিত্ত্য শব্দের অর্থ চিত্তের অন্যথাভাব, বিচিত্ততা। মিলিতাবস্থাতেও বিরহ-অনুভব সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক এবং কাব্যিক প্রবৃত্তি। গোপীপ্রেমে, বিশেষতঃ মহাভাবময় রাধাপ্রেমে এই ভাবের স্ফূর্তি আরও বিশেষভাবে হয়ে থাকে। লৌকিক প্রেমে বিরহের একাধিপত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ "মেঘদূত" প্রবন্ধ লিখেছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি কালিদাস, ভবভূতি, বৈষ্ণব কবিকুল এবং ইংরেজি রোম্যান্টিক কবিদের ভাবনার সঙ্গে তাঁর নিজের স্থির বিরহ-ভাবুকতা মিলিয়ে নিয়েছেন। অধ্যাত্মের দিক দিয়ে বলা যায়, রাধাকৃষ্ণপ্রেমে মিলনের অবকাশ যৎসামান্যই। কারণ, হ্লাদিনীর সারভূত শক্তিকে যখন পূর্ণভগবান্ রাধারূপে বাইরে নিয়ে এলেন তখন শক্তি-শক্তিমানের পুনরায় একত্র হবার আকৃতিই প্রবল হ'ল। তখন থেকে মিলনেও অতৃপ্তিবোধ জেগে রইল। এই চির অপূর্ণতা-অতৃপ্তিময় অদ্ভুত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের বিষয়টি কয়েকটি বৈষ্ণব পদেই পরিস্ফুট হয়েছে, যেমন বলরামদাসের নিম্নলিখিত রচনা :

তুমি মোর নিধি, রাই, তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবসরাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি।

তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
দরপণ নীরস সুদূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শারদ চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়ে যদি ছানিয়ে বিজুলি।
অমিয়ার সাঁচে যদি রচিয়ে পুতলি॥
রসের সায়র মাঝে করাই সিনান।
তবু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতর থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির॥

চূড়ান্ত অতিশয়োক্তি দিয়েও প্রিয়ার স্বরূপ নির্দেশ করা গেল না। আরও দেখা গেল নিকটতম প্রাপ্তির মধ্যেও সম্যক্ পাওয়া যায় না। একটা অপ্রাপ্তির কাতরতাই এ প্রেমের মৌল বিশেষত্ব। বাঙালী বিদ্যাপতি এই প্রেমের অনির্ণেয় স্বভাব অনুভব করেই বলেছেন :

কত মধু-যামিনী রভসে গোয়াঁয়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ
তভো হিয় জুড়ন ন গেল॥

প্রেমবৈচিত্ত্য বিষয়ে গোবিন্দদাসকৃত পদ :

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥
(এ সখি) আরতি কহন না যাই।
আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঞি॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মদন-দহনে রহু জাগি॥
রাইক বিরহে কানু ভেল সচকিত
বয়ানে বাণী নাহি ফুর।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

কীর্তনগান ও রসপর্যায়

প্রেমভক্তির অনুভবের সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্যের নিত্যসম্বন্ধ। মহাপ্রভুর অন্তরে প্রেমভক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে কীর্তনগীতে ও নৃত্যে ঐ প্রেমের প্রকাশ অনিবার্য হয়েই দেখা দিয়েছিল। পার্ষদগণের চারিত্র্যেও ঐ ভাবপ্রকাশ সঞ্চারিত হতে বিলম্ব হয়নি। 'পূর্বভূমি' প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে সূফী প্রেমিকরাও অনুরূপ অবস্থার বশীভূত হতেন এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এবিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে—হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ। এই সেদিনও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রকাশের প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁর গীতপ্রীতি ও লোকবাহ্য নানান্ অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রেমিক ভক্তের অভিলাষ হল—'আমায় দে মা পাগল ক'রে, আমার আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে'। সাধক রামপ্রসাদের বক্তব্য হল—'আমার মন-মাতালে মাতাল কৈল, মদ-মাতাল্যে মাতাল বলে'। কর্মী এবং যোগী, আর সেই সঙ্গে নির্যাতিত মানুষের দুঃখে পরম কারুণিক বিবেকানন্দ রাগভক্তির তত্ত্ব অবগত হলেও ও-পথে যান নি। রবীন্দ্রনাথ তো স্পষ্টই 'উচ্ছলফেনভক্তিমদধারা' প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমনকি গৌর-ঐতিহ্যের নামধারী সাম্প্রতিক কোনো কোনো তাত্ত্বিক ও শুচিবায়ুগ্রস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে নৃত্যগীত-রোমাঞ্চ-অশ্রু-কম্প-মূর্ছার পথ প্রত্যাখ্যান করে নামহীন বৈধী-ভক্তির প্রচারকার্যেই নিরত থাকতে দেখা যায়। বৃন্দাবনদাস ভালোভাবেই দেখিয়েছেন যে সপার্ষদ মহাপ্রভুর নবদ্বীপে ভাবপ্রকাশের সময় এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা ব্যাপারটিকে পাগলামি মাতলামি এবং এঁদের উৎপাতস্বরূপ মনে করতেন। এ নিয়ে অবশ্য খেদ করে এবং বিরোধ ডেকে এনে লাভ নেই, যেমন লাভ নেই ভক্ত-বৈষ্ণবের লোকাপেক্ষা করে। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে অবশ্য প্রচারসম্বল কপটতা দূষণীয় নিশ্চয়ই।

কথা এই যে, মহাপ্রভু এবং তাঁর নবদ্বীপ-নীলাচল পরিকরদের ভাবমুহূর্তগুলি অনিবার্যভাবে নৃত্যে, গীতে এবং নানাবিধ দৈহিক বিকারের মধ্য দিয়ে মূর্তিমান হতে চেয়েছিল। গীতে এর প্রকাশকে 'কীর্তন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'কীর্তন' শব্দের মূল অর্থ বর্ণন, নামোচ্চারণ। লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ হল সুরযোগে গীত, গীতাকারে নাম, রূপ-গুণ এবং লীলার বর্ণন। শ্রীরূপ কীর্তনের লক্ষণ নির্ণয়ে এর ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন 'উচ্চৈর্ভাষা'। বস্তুতঃ যে-কীর্তন গীতরূপী তার বিশিষ্ট কোনো নামকরণ সম্ভবপর হয়নি, যেমন হয়নি অন্য কোনো পর্যায়ের গীতবৈচিত্র্যের। রাগসংগীতের গুর্জরী, কানাড়া, মালকোশ, ভূপালী প্রভৃতি স্থান হিসাবে নাম। মেঘ, শ্রী, দীপক, বসন্ত প্রভৃতি নামের মধ্যে ভাবজ্ঞাপকতা হয়তো বা কিছু রয়েছে, কিন্তু এও পর্যাপ্ত নয়। ঠুংরি অর্থেও কোনো এক রীতির গান, টপ্পা এবং তর্জা অর্থেও তাই। যাই হোক, এই নব্য দেশীয় রীতির কীর্তনগানকে বাঙলা ভাষায় নামকীর্তনের মধ্য দিয়ে প্রসারিত করলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি শুধু উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণই করেননি, কৃষ্ণের বিভিন্ন নামকে সাজিয়ে তাতে সুরসংযোগও করেছিলেন।

খোল-মন্দিরা সহযোগে এবং সহায়কদের মিলিত কণ্ঠে গীত এই নাম-কীর্তনকে বলা হয়েছিল সংকীর্তন। চৈতন্য-জীবনের ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে মহাপ্রভুকেই সংকীর্তনের জন্মদাতা বলেছেন। যেমন, "সংকীর্তন আরম্ভে মোহর অবতার" (চৈ-ভা), "সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" (চৈ-চ)। প্রেমাবেশের একেবারে প্রারম্ভে দেখা যায় নিমাই পণ্ডিত তাঁর পাড়ুয়াদের নাম-কীর্তন শেখানোর প্রয়াস করছেন—'হরয়ে নমঃ—'। "দিশা দেখাইয়া প্রভু হাথে তালি দিয়া। আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া।" স্বল্প সময়ের মধ্যে মহাপ্রভুর ভাবাবেশসমূহের অলৌকিকতায় সুতরাং তাঁর ঈশ্বরত্বে পরিকরবর্গ নিঃসন্দেহ হলে খোল-করতাল সহযোগে সম্মিলিত সংকীর্তনের প্রারম্ভ হয়। মহাপ্রভু নিজেই এই উদ্‌যোগ করেন।

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি বিশেষভাবে একদিন সংকীর্তনের আয়োজন করেছিলেন বলে পদকর্তা পরমেশ্বরদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন। তারপর পূর্ণাঙ্গ সংকীর্তনের বিশেষ আয়োজন হয় ব্যাসপূজার অনুষ্ঠানে, তাঁর অভিষেকের দিনে এবং কাজি-প্রতিরোধ-প্রসঙ্গে নগর-সংকীর্তনে। চৈতন্য-ভাগবতকার বলছেন নগরসংকীর্তনের মধ্যে ভজনাঙ্গ আত্মনিবেদনের একটি পদ শ্রীচৈতন্য গেয়েছিলেন এবং এইটি তাঁর প্রযুক্ত আদি সংকীর্তনের পদ—"তুয়া পদে মন লাগল রে"। এ ছাড়া "হরি বোল মুগুধা, গোবিন্দ বোল রে" প্রভৃতির মত নামগ্রহণের মনোভাবের পদরচনা ও সুরে প্রয়োগও মহাপ্রভুর মুখে অনায়াসেই স্ফুরিত হওয়া সম্ভব। মহাপ্রভু নিজে যে গাইতেও পারতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় চরিতকারদের উক্তি ও গৌরবিষয়ক পদ-কর্তাদের বিবরণ থেকে।

কিন্তু মহাপ্রভুকে সংকীর্তন-প্রবর্তক ধরলেও একমাত্র নামকীর্তনের ক্ষেত্রে ছাড়া লীলা বা আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রে তিনি সুরস্রষ্টা ছিলেন এমন মনে করা হয়ত সম্ভব নয়। এজন্য নয় যে, প্রথমতঃ তাঁর পরিকরদের মধ্যে অনেকেই সংগীতে নিপুণ ছিলেন। কিন্নরকণ্ঠ মুকুন্দ, গোবিন্দ-মাধব-বাসু ঘোষ তো বটেই, এমনকি অদ্বৈত আচার্যও কীর্তনগীতবিৎ ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর রাঢ়-ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে যেদিন শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতগৃহে, সেদিন অদ্বৈত বিদ্যাপতির পদ—'কি কহব রে সখি, আনন্দ ওর' গান আরম্ভ করেছিলেন। আর মুকুন্দ ধরেছিলেন চণ্ডীদাসের 'হা হা, প্রাণপ্রিয় সখি...'। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, চণ্ডীদাসের (অর্থাৎ বড়ু চণ্ডীদাসের) বিস্তৃত লীলাকীর্তন ও বিক্ষিপ্ত রচনার পদ তখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। আর ছিল বিদ্যাপতি ও জয়দেবের গীত, যা নীলাচলেও মহাপ্রভু স্বরূপ-রামানন্দের মুখে শুনতেন ও আস্বাদন করতেন। চণ্ডীদাসের লীলাকাব্য (যার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাম দেওয়া হয়েছে) যাত্রারীতিতে-প্রযুক্ত গীতের সমাহার-বিশেষ। যে আকারে তা আমাদরে সামনে এসেছে তাকে পালাগায়কদের প্রযুক্তির চিহ্ন স্পষ্ট। এর সংস্কৃত শ্লোকগুলি এবং দণ্ডক, চিত্রক, লগনী, প্রকীর্ণক প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে প্রযুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূল বিষয় কী, একটি পাত্রের মনোভাব অথবা ক'জনের আলাপ পদে বর্ণিত হচ্ছে, পদের মধ্যে কোনো ঘটনার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে কিনা, অপর কোনো পাত্রের প্রবেশ হচ্ছে কিনা এ সব ব্যাপার নির্দেশ করতে শ্লোক এবং সংকেতের ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রতিটি পদের প্রারম্ভে রাগ-রাগিণীর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এ সব নির্দেশ অবশ্য মূল

কবির নয়, পালা-গায়কের। রাগ-রাগিণীগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তখনকার বাঙালী গায়কেরা উত্তর ভারতে প্রচলিত শুদ্ধ মিশ্র সমুদয় রাগের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন, দেশী সংগীত পদ্ধতির সঙ্গে তো বটেই। তাছাড়া দেখা যায় কৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ পদই চারভাগে এবং ষোল চরণে বিভক্ত। প্রবন্ধগীত বলে পদের এই বিভাগ এতে স্পষ্টভাবে নির্দেশিতও হয়েছে। ঐ বিভাগগুলিকে প্রচলিত ভাষায় স্থায়ী, অন্তরা, আভোগ এবং সঞ্চারী নাম দিলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। গীতমধ্যে ধ্রু-চিহ্নিত অতিরিক্ত আবেগ-উদ্দীপক এক বা একাধিক ধ্রুবপদের নির্দেশও কৃষ্ণকীর্তনের প্রায় সমস্ত পদে রয়েছে। সুতরাং ধ্রুবকার বা দোহারও ছিল। ছন্দ ও অর্থের সংগতি অসংগতি বিচার করে আমরা ধ্রু-গুলিকে বহু ক্ষেত্রে পালাগায়কের যোজনা মনে করেছি। সুতরাং মহাপ্রভুর পূর্বে রূপ-গুণ-লীলা-কীর্তনের স্বরবৈচিত্র্য সকলের অজ্ঞাত ছিল এমন মনে করা যায় না। শুধু এই কথা বলা যায় যে, হরিনাম-মূর্তি মহাপ্রভু নামকীর্তনের এবং খোল-করতাল যোগে সম্মিলিত কীর্তনের উদ্ভব ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন। আর, এর পর থেকে কীর্তনগানের প্রচার দেশব্যাপীও হয়।

পরিকরদের সঙ্গে নৃত্য ও কীর্তনানন্দে বিভোর মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবাদির কীর্তন এবং কাষ্ঠ-পাষাণ-দ্রবকারী গৌরপদগীতেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। কিন্তু এ পর্যায়ের কীর্তনের সুরতাল-বৈচিত্র্য ঠিক কী ধরনের ছিল, রসপর্যায় বিভাগ ছিল কিনা এবং তাতে 'আখর' দেওয়া হত কি না বলা যায় না। সাম্প্রতিক গবেষণার যুগেও এ-বিষয়ে সঠিক সংবাদ পাবার উপায় নেই। অবশ্য, পরবর্তী পদসংগ্রহ-গ্রন্থে দেখা যায় প্রতি পদের উপরে অবলম্বনীয় রাগের (দেশীয় অথবা মার্গরীতির) নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। কিন্তু এ অতি-ব্যাপক একটা কাঠামোর নির্দেশমাত্র। কীর্তনগানের বিকাশের এই প্রথম অধ্যায়ের পর পূর্ণবিকাশের পরিচয় মিলে খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে খেতুড়িতে, নরোত্তম ঠাকুর-প্রবর্তিত বৈষ্ণব মহোৎসবের মধ্যে। এই ঐতিহাসিক মহোৎসবের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে দেওয়া রয়েছে। নিত্যানন্দদাস মহোৎসবের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং গীতে বিশেষতঃ বাদ্যে নিপুণ ছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, উৎসবের পূর্বে খোলকরতালের পূজা করা হয়। পরের দিন ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে গৌরাঙ্গবিগ্রহ সহ কৃষ্ণের পাঁচটি বিগ্রহের স্থাপন সাঙ্গ হ'লে কীর্তন আরম্ভ হয়। প্রথমে গোকুলদাসের অনিবদ্ধ গীত, পরে নরোত্তমেব নিবন্ধ গীত গাওয়া হয়। দেবীদাস, গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি খোল ও করতাল বাদ্য করেন। কীর্তন এবং সংকীর্তন এই মহোৎসবের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রেমবিলাসের বর্ণনা থেকে গীতোৎসবের ভিতরের ব্যাপার অর্থাৎ সুরতালের ও আখরের প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। শুধু জানা যায় কীর্তন দু-এক দিনের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে যায়নি, বেশ কিছুদিন ধ'রেই চলেছিল এবং এটি বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছিল। আর, নিশ্চয়ই পদাবলী কীর্তনের মূল চারটি নির্দিষ্ট বিভাগ—নরোত্তম প্রবর্তিত গড়ের হাটের গড়ানহাটি, জ্ঞানদাসের বাসভূমি মনোহরশাহ পরগনার মনোহরশাহী, হুগলির নিকটবর্তী বর্ধমানের রানীহাট অঞ্চলের রেনেটি এবং বাঁকুড়া-মেদিনীপুর সংলগ্ন অঞ্চলের মান্দারন পরগনার মান্দারিনী—এই গীতমহোৎসবের মূল্যবান সুফল। এই সময় থেকেই সম্ভবতঃ শ্রীরূপ-প্রবর্তিত রসপর্যায়ের অনুসরণে পালাবদ্ধ গীত গাওয়াব পদ্ধতিও স্থিরভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এবং 'আখর' দেওয়ার চমৎকারিতাও প্রদর্শিত হয়। তবে একথা

ঠিক যে এসব বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য পূর্ব থেকেই অল্পবিস্তর প্রচলিত না থাকলে কেবল একটা অনুষ্ঠানেই প্রারব্ধ হওয়ার কথা নয়। দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যেই জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, কবিরঞ্জন, মনোহরদাস প্রভৃতি পদকর্তা এবং কীর্তন-সাধকেরা তাঁদের সাধনার ফল বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতিতে অর্পণ করেছেন। অনুমান হয় শ্রীল নরোত্তম বৃন্দাবন-মথুরা অঞ্চলে কাটিয়ে শুদ্ধ ও মিশ্র রাগগীতে এবং নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ সংগীতে নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, ফলে এসবের মিশ্রণে কীর্তনকে নবজীবন দান করার আগ্রহও তাঁর ছিল। ঐ সময়ে অর্থাৎ আকবরের সময়ে উত্তর-মধ্য ভারতে সংগীতের আন্দোলন প্রসিদ্ধ। কিন্তু পূর্বে কী ছিল, এবং পরে কী হ'ল তার কোনো পরিচয়ই প্রেমবিলাসের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ নিত্যানদের 'প্রেমবিলাস' বহু অলৌকিক কথায় এবং অসম্পূর্ণ অবাস্তব বিবরণে পূর্ণ। কিন্তু শুধু কি নিত্যানন্দদাস? পরবর্তীকালে যে ঘনশ্যাম-নরহরি তাঁর বিখ্যাত ভক্তিরত্নাকরে ধ্রুপদাদি সংগীতে অভিজ্ঞতা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনিও কীর্তনগান বিষয়ে কোনো বিচার রেখে যাননি। আর কীর্তন বিষয়ে সম্প্রতি যেসব বই লেখা হয়েছে তাতেও হয় আত্মকথা, নয় কীর্তনিয়াদের আসরের কথা, নয় পরিচিত রসপর্যায়ের কথাগুলিরই পুনরুচ্চারণ করা হয়েছে। আমাদের মনে হয়, খেতুড়ির গীতমহোৎসব থেকেই ধ্রুপদাদি রাগসংগীতের ধারায় কীর্তন-গানের পুনর্বিন্যাস ঘটে। সাধক নরোত্তমই এ-বিষয়ে প্রবর্তনার সঞ্চার কারেন। কারণ, নরোত্তম সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং মধ্য-উত্তর ভারতের ধ্রুপদ-বৈচিত্র্য এবং নবাগত খেয়ালের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। লীলাকীর্তনের সূক্ষ্ম রসপর্যায় বা পালাবিভাগ, 'গৌরচন্দ্রিকা' দিয়ে পালারম্ভের আবশ্যিকতা, বাঙলায় তৎকাল-প্রচলিত কীর্তনের বহু-বিভিন্ন গায়ন-পদ্ধতি ও ঘরানার বর্গীকরণ এ সবই এই মহোৎসবের অমৃতময় ফল। অবশ্য কীর্তনগানে এর পরবর্তী সময়েও অল্পবিস্তর বৈচিত্র্য অনুপ্রবেশ করেছে। রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণবদাস, দীনবন্ধুদাস প্রভৃতি মহাজনপদের সংকলকেরা প্রায় সকলেই গীতজ্ঞ ও গায়ক ছিলেন। এঁরা এবং নিঃসন্দেহে আরও কেউ কেউ স্বকীয় উপলব্ধিমত রসনির্ভর রম্যতার সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। এর মধ্যে সামান্য অথচ উল্লেখযোগ্য হল 'টেঞার ছপ্' ও 'মধুকানের ঢপ্'। 'টেঞার ছপ্' অর্থে বৈষ্ণবদাসের নিবাস টেঞা গ্রাম থেকে উদ্ভূত সুরতালের চমৎকারবিশেষ। অবশ্য কী সে চমৎকার, তা আমরা বলতে অক্ষম। আঠারো শতকের শেষের দিকে টপ্পার সুরে বাঙ্‌লার বৈঠকী সংগীতের আসর জমাট হয়ে ওঠে। টপ্পা (বা ডপ্পা) কীর্তন, টপ্-কীর্তন, ঢপ্-কীর্তন। ঢপ্ শব্দে রকম বা ধরনও হতে পার। কীর্তন এবং পাঁচালি গীতরীতি বহুদিন ধরে বাঙলায় পাশাপাশি অবস্থান করায় উভয়ের বিমিশ্রণও অনিবার্য হয়েছে। আবার উনিশ শতকের শেষ ও এই শতকের প্রথমের দিকে জ্যোতিরিন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদ কীর্তনের ঢঙের সঙ্গে রাগ বা রাগাংশের বিমিশ্রণ ঘটিয়ে আধুনিক মনের উপযোগী রসবৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন। কথার ঐন্দ্রজালিক ও সুরমিশ্রণের নবীন রাসায়নিক রবীন্দ্রনাথ কীর্তনকে বহুমান করেছেন, কারণ কীর্তনেই কথার সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য পূর্ব থেকে পরিস্ফুট। লক্ষণীয় এই যে, যার সঙ্গে ধর্মসাধনার অনিবার্য সম্পর্ক ছিল, তার সুরবৈশিষ্ট্য নিয়ে আজ আমাদের লৌকিক রস-পিপাসাই চরিতার্থ হচ্ছে। অবশ্য কৃষ্ণগৌরের সাধন-ভজনে অনুরাগী ধার্মিকের প্রার্থিত কীর্তন বা

সংকীর্তনের ধারা আজও একেবারে লুপ্ত হয়নি, খাঁটি কীর্তনিয়া কেউ কেউ হয়তো বা যথাসাধ্য তা রক্ষা করে চলেছেন, কিন্তু এ কথা ঠিক যে কীর্তনের বাপক অনুশীলন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে, বৈষ্ণব-পাড়ায় যখনই গিয়েছি, তখনই খোলের কসরৎ ও পদের আলাপ শুনেছি, দেখেছি কীর্তনিয়াদের রেওয়াজ ও উৎকর্ষসাধনের বিপুল আগ্রহ, বৈষ্ণব তরুণদের ও বিভিন্ন কীর্তনিয়াদের মধ্যে নানান্ রসবিতর্ক। বড় বড় গ্রাম-সংলগ্ন সেই বৈষ্ণব পল্লীগুলি এখন প্রায় নির্মূল বললেই চলে। গোময়লিপ্ত দাওয়ায় এবং তুলসী-আন্দোলিত অঙ্গনে পদরচনা ও কীর্তন এখন আর সুলভ নয়। এখন নব্যরুচিব শ্রোতাদের জন্য সময়ের ছকে-আঁটা কীর্তন ও লোকগীতের ভার নিয়েছে আকাশবাণী। বাউলের মুখে শোনা কথা—"বাবু, আমরা এখন বোবা হয়ে গেছি।" এখন যন্ত্রবাহিত ঘর্মাক্ত জীবন, এখন যা-কিছু বাসনা তা জীবনসিদ্ধিতে সমর্পিত। আর্ট, শিল্প, গবেষণা এমনকি ধর্মও বৈষয়িক জীবনের চর্যাতেই আত্মদান করছে, এখন ভাবের আন্দোলনে রাজনীতির মুখ্য অধিকার। গ্রামীণ জীবন-যাত্রার ধারাও আজ রূপান্তরিত। সুতরাং "যা যায় তা আর ফিরে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কে কোথায় দেখিয়াছ?"

কীর্তন কি লোকসংগীত? পশ্চিমী-বই-পড়া আধুনিক লেখক যাই বলুন, কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক স্বত-উৎসারিত প্রাথমিক প্রণয়কলহ-মিলনবিরহের কাব্য, পরিশীলিত রসতত্ত্বের বাইরে লেখা সর্বজনপ্রিয় ছন্দোময় রচনাকে যেমন লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত করাই সমীচীন, তেমনি দেশীয় সুর-বিশিষ্ট লৌকিক কীর্তন ভাটিয়ালি প্রভৃতিকেও। এ সুর রাজসভাকক্ষ থেকে আসেনি, কুশলী শিল্পীদের হাতে গায়নপদ্ধতির রূপান্তর ঘটলেও এর আদিম সরল মূর্তিটি আজও চিনে নেওয়া যায়। ঠিক তেমনি রামপ্রসাদী সুর। কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালিতে হিন্দু-মুসলমান, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই সমান আকর্ষণ। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাস-রায়শেখরের রচনা ঠিক লোকমূল সাহিত্য নয়, কিন্তু যে সুরপদ্ধতি এগুলিকে বহন করে চলেছে তা নিঃসন্দেহে লৌকিক। যে কীর্তনের মাধ্যমে চার-পাঁচ শতাব্দী ধরে পাঁচ-ছ' কোটি মানুষের একটা জনতা নিজ মর্মের নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করেছে, লুপ্তির পথে শতাব্দীর শেষে তাকে নমস্কার জানাই।

রসপর্যায়

পালাবদ্ধ কৃষ্ণযাত্রা-গীতের পরিচয় গৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের উদ্ভবের পূর্বেই যদ্যপি পাওয়া যায় (গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দ্রঃ), এর সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিস্তারবৈচিত্র্যের অভ্যুদয় গৌরলীলাদৃষ্টে কৃষ্ণলীলার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবনের পর থেকেই। শ্রীরূপের রসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল-নীলমণি এ দুই রসশাস্ত্রে পরবর্তী পদসমূহের বিষয়বিন্যাসের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরূপ স্বয়ং কবিপ্রতিভার অধিকারী হওয়ায় তাঁর পক্ষে নূতন রসশাস্ত্রের গ্রন্থন সহজ ও বাস্তব হয়েছিল। তাঁর নির্মিত শাস্ত্রে পূর্বতন লৌকিক অলংকারশাস্ত্রের অনেক কিছু গৃহীত হয়েছে, অনেক বিষয় গৃহীত অথচ রূপান্তরিত হয়েছে। আবার নূতনতর প্রয়োজনে বহু নূতন বিষয়েরও অবতারণা করা হয়েছে। রসাধ্যায়ে আমরা এগুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করেছি, কীর্তনগীতি-সংলগ্ন বিশেষ যা তা-ই এখানে কথিত হচ্ছে।

কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কীর্তন-পালাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর কতক নির্দিষ্ট ব্যাপার বা আখ্যান-অনুসারী, কতকগুলি রসবৈচিত্র্য-অনুসারী, যদিচ একথা ঠিক যে একেবারে রসবিহীন কোনো ব্যাপার নেই, আর ঘটনা-বিহীন রসও নেই। বিষয় বা ঘটনা অনুসারে পালাবিভাগ,—দান-লীলা, নৌকালীলা, কুঞ্জভঙ্গ, বনভোজন, গোবর্ধন-ধারণ, ফাগুলীলা, অক্রুর-সংবাদ, নন্দবিদায়, পুতনাবধ ; গৌরাঙ্গলীলা নিয়ে যেমন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, নিমাই-সন্ন্যাস প্রভৃতি। রসানুসারে যেমন—পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা আক্ষেপানুরাগ, রসোদ্‌গার প্রভৃতি। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, গোস্বামীদের গ্রন্থনির্মাণের পর পদকর্তা মহাজনেরা যে আক্ষরিকভাবে তারই অনুসরণ করে পদরচনা করতে লাগলেন এমন অনুমান অযৌক্তিক। শ্রীরূপের রসবিবেচন খ্রীস্টীয় ১৫৮০ এর আগে গৌড়-বাঙলায় গৃহীত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। অনুবাদ এবং অনুসরণে লিখিত গ্রন্থ আরও পরের।[১] এমনকি গৃহীত হবার পরও মহাজনেরা যখন যেমন ভাবের অধিকারী হয়েছিলেন তেমনি ভাবের পদই লিখে গেছেন। পদসংকলয়িতারা ও কীর্তনগায়কেরাই বরং রসশাস্ত্রের ভাণ্ডারী ছিলেন। কবিদের যাবতীয় রচনা এঁরাই সুসজ্জিত ক'রে রসোচিত পর্যায়-বিভাগে ফেলেছিলেন। তবু স্বাভাবিকত্বের পথ অনুসরণ করেও কদাচিৎ শাস্ত্রের অনুবর্তন করার প্রয়োজন যে রচয়িতারা উপলব্ধি করেন নি এমনও নয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর রাধামোহন ঠাকুর, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ প্রভৃতির রচনায় গোস্বামীদের শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের প্রভাব স্পষ্টভাবেই অনুভূত হয়। তখন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির বঙ্গানুবাদও প্রচারিত হয়েছিল।

পদকর্তারা শ্রীরূপের আক্ষরিক অনুসরণ যে করেননি, বরং ভাবানুসরণ করেছেন এবং ইঙ্গিত গ্রহণ ক'রে নূতনতর পথে পদক্ষেপ করেছেন তার প্রমাণ রসোদ্‌গার, রসোল্লাস, ভাবোল্লাস, রূপোল্লাস প্রভৃতি সম্ভোগ-শৃঙ্গারের এবং রূপানুরাগ, রূপাভিসার, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের পদ রচনা। বিদ্যাপতি প্রবর্তিত বয়ঃসন্ধির রচনাও পরে স্বতন্ত্র পালাবিভাগের মর্যাদা লাভ করেছে। গায়কেরাই এসব সমাহরণ ক'রে একত্র গ্রন্থন করেছিলেন লেখকদের প্রায়-স্বাধীন রচনা অবলম্বন ক'রে। আমরা পূর্বে অনুমান করেছি যে বিশেষভাবে খেতুড়ির মহোৎসবে বহু রসপর্যায় মোটামুটি সংগঠিত রূপ লাভ করে। উল্লিখিত নোতুনত্বগুলির সঙ্গে আর একটি অসামান্য অভিনবতাও ক্রমশঃ যুক্ত হয়ে খেতুড়ির মহোৎসবেই পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা পায়, সেটি হ'ল 'গৌরচন্দ্রিকা'।

এখন রসবিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থী-সাধারণের জন্য দু'চার কথা বললে বোধ হয় অনপেক্ষিত-ভাষণ হবে না।

'বয়ঃসন্ধি' পূর্বরাগেরই অবান্তর বিভাগ। এতে কৃষ্ণের পূর্বরাগ এবং রূপবিমুগ্ধতার সৌন্দর্য রসবিষয়। রাধার কৃষ্ণরূপে আসক্তি হ'ল 'রূপানুরাগের' বিষয়, এও পূর্বরাগের গাঢ়তাযুক্ত অনুরাগের অবস্থায় রূপদর্শনে। ঐ অবস্থায় আশ্চর্য কৃষ্ণরূপ শ্রীমতীর চিত্তে মুহুর্মুহু স্ফুরিত হয়। এরই বিবরণ নিয়ে 'রূপোল্লাস'। রাধার অভিসারে যদি রূপসজ্জার বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করে তাহ'লে 'রূপাভিসার'। এবিষয়ে পূর্বে উদ্ধৃত অনন্তদাস বর্ণিত

১. উল্লেখযোগ্য রামগোপাল দাস কৃত 'রসকল্পবল্লী' এবং পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের গ্রন্থন।

'ধনি ধনি বনি অভিসারে' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। শ্রীমতীর অভিসারযাত্রার সংকল্পে কৃষ্ণের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা এবং তদুচিত ভাববিকারসমূহের বর্ণনা নিয়ে 'অভিসারোৎকণ্ঠা'। অভিসারিকা অবস্থার ব্যাপক পদরচনাগুলিকে কালোচিত বিভাগে সাজিয়ে ছোট ক'রে বর্ষাকালোচিত হিমকালোচিত প্রভৃতি পালার গ্রন্থন। নায়িকার উৎকণ্ঠিতা খণ্ডিতাদি প্রকারকেও এইভাবে কালোচিত বিভাগে ফেলা হয়েছে। 'রসালস' হ'ল সম্ভোগ-শৃঙ্গারের পরিণত অবস্থার, সম্ভোগান্ত আনন্দময় তন্দ্রালসাবস্থার পরিচায়ক। ভোজনান্তে উদ্‌গার মোচনের সাদৃশ্যে 'রসোদ্‌গার'। সখীপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতীর সম্ভোগাবস্থার আনন্দময় স্মৃতিচারণ। এ রসোদ্‌গার সংক্ষিপ্ত-সম্পন্ন সম্ভোগেরও হ'তে পারে, পূর্ণ অর্থাৎ সমৃদ্ধিবান্ সম্ভোগেরও হতে পারে। 'ভাবোল্লাস' বা ভাবসম্মিলনোল্লাস দৃশ্যতঃ বিরহেরই অবস্থার অন্তর্গত। এতে কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর মিলন-প্রত্যাশার ও কল্পনায় ভাবে মিলনের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়। বিরহে কৃষ্ণতন্ময়াবস্থার এ এক অপূর্ব কল্পনা। বৈষ্ণবশাস্ত্রকার অবশ্য ভাবসম্মিলনকে সম্ভোগ-শৃঙ্গারের অন্তর্গত ক'রে দেখেছেন। কারণ, এরকম মিলনও রাধাকৃষ্ণ পক্ষে অলৌকিক যথার্থ মিলনই।

'আক্ষেপানুরাগ'ও ঠিক রসশাস্ত্র-নির্দিষ্ট বিষয় নয়, কবিদের রচনা থেকে নামকরণ ও গ্রন্থন। এ হ'ল শ্রীমতীর সদা বিরহাবস্থা, প্রায় অকারণ বিরহ-কাতরতা, কৃষ্ণ প্রবাসে অর্থাৎ মথুরা না গেলেও নিমেষমাত্র বিচ্ছেদের অসহনীয় অবস্থার আক্ষেপই এই শ্রেণীর পদরচনার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। রাধাভাবান্বিতা শ্রীমতীর আত্যন্তিক দুঃখসহনের মহিমা এতে ব্যঞ্জিত। লক্ষণীয় এই যে, বড়ু চণ্ডীদাসই এ শ্রেণীর বিরহের পদের স্রষ্টা, কারণ, কৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ অংশে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার নিতান্ত সাময়িক বিচ্ছেদ প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে শ্রীমতীর প্রবল আক্ষেপ প্রদর্শন করেছেন। পদাবলীতে বিরহ অবস্থার বর্ণনা সম্ভোগ-শৃঙ্গারের বর্ণনাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে গেছে, কী গভীরতায় কী ব্যাপকতায়। এর কারণ শুধু এই নয় যে বিরহ ছাড়া মিলন পুষ্টিলাভ করে না, এর কারণ এই যে, বিরহই এই প্রেমের প্রায় সর্বস্ব। রূপ-গুণ নিয়ে চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্য দর্শন দিয়ে লালসা জাগিয়ে পরে চিরঅদর্শনে প্রেমিকার চিত্তকে উত্তরোত্তর কাতর ও তদভিমুখী ক'রে তোলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এই বিরহ-কাতরতা এবং মিলন-লালসার এক অনির্বচনীয় রম্য ধর্ম।

এই প্রসঙ্গে লৌকিক মানবচিত্তে এবং তদনুযায়ী সাহিত্যেও বিরহভাবুকতার প্রতি সমধিক আগ্রহের বিষয় স্মরণীয়। প্রেমবোধের সঙ্গে বিজড়িত গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার কবি শেলির প্রসিদ্ধ উপলব্ধিতে—Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. এবিষয়ে রবীন্দ্রোক্তি হ'ল—'গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে—সেই ভূমৈব সুখম্।' এবং 'আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে ; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই'। সংস্কৃত ভাষার কবি আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন :

> সংগমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সংগমস্তস্যাঃ।
> সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

অর্থাৎ, 'মিলন-বিরহের মধ্যে একটিকে যদি বেছে নিতে বল, তাহলে আমি বলব, আমি বিরহই চাই, কারণ, মিলনে আমার প্রিয় তো একক হয়ে আমার প্রত্যক্ষে থাকে, আর বিরহে আমি ত্রিভুবনে সর্বত্র তাকেই দেখি'। এরই অপর পিঠে অধ্যাত্মে রয়েছে বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি—যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে। অধ্যাত্ম আকুতিতেই বাউল সাধক গেয়েছেন—'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।' মিলনের অতৃপ্তিতে এবং অতলস্পর্শ বিরহভাবনায় তাই বৈষ্ণব পদাবলী পূর্ণ।

আক্ষেপানুরাগে শ্রীমতীর আক্ষেপকে কয়েকটি ভাগে চিহ্নিত ক'রে পদাবলী-রসিকেরা দেখেছেন, যথা (১) কৃষ্ণের উপর আক্ষেপ (২) মুরলীর উপর (৩) নিজের উপর (৪) সখীর উপর (৫) দূতীর উপর (৬) অদৃষ্টের উপর (৭) কন্দর্পের উপর। এতে পূর্বরাগাবস্থার লালসা, উদ্বেগ প্রভৃতি দশ দশার পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। মুখ্য পালাক্রমের মধ্যে এই আক্ষেপানুরাগ পূর্বরাগ ও মাথুরের কাছাকাছি, প্রেমবৈচিত্ত্যের সঙ্গে সংলগ্ন। অথচ প্রেমবৈচিত্ত্যে মিলনের মধ্যেই বিরহকাতরতার অনুভব, আর ওতে মিলন-নিরপেক্ষ স্থায়ী দুঃখকাতরতা, যে দুঃখের শেষ অনুভূত হবার নয়। বস্তুত আক্ষেপানুরাগের মধ্যেই মহাভাবস্বরূপা রাধার সংসার, সমাজ, অদৃষ্ট এমনকি কৃষ্ণ-প্রদত্ত দুঃখের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রের পরিচয় আমরা লাভ করি।

পদাবলী-কীর্তনের এই সব রসগত সূক্ষ্ম পর্যায়বিভাগ ছাড়া গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা আস্বাদনের ভিন্নতর বৈচিত্র্যও পালাকীর্তনের অঙ্গীভূত হয়েছে দেখা যায়। এর একটি হ'ল অষ্টকালীয় লীলা, অন্যটি দণ্ডাত্মিক লীলার গ্রন্থন। বৈষ্ণব ভক্ত দিবারাত্রির ভগ্নাংশ অবলম্বন করেও কৃষ্ণলীলার বৈচিত্র্য আস্বাদন করতে চেয়েছেন, যেহেতু ক্ষণে ক্ষণে নবতাই লীলার অন্যতম আকর্ষণ। দিবারাত্রিকে আটটি কালবিভাগে পৃথক্ ক'রে অষ্টকালীয় লীলা। এই কালবিভাগ হ'ল (১) নিশান্ত (২) প্রাতঃ (৩) পূর্বাহ্ণ (৪) মধ্যাহ্ণ (৫) অপরাহ্ণ (৬) সায়ম্ (৭) প্রদোষ বা নিশার প্রথম ভাগ (৮) নক্ত বা মধ্যরাত্রি। মধ্যরাত্রির মিলনের পর রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ নিয়ে নিশান্ত বা কুঞ্জভঙ্গ; বিচ্ছেদ দিয়ে পালা শেষ করতে নেই এই সংস্কারে নিশান্ত দিয়েই অষ্টকালীয় লীলার পালারম্ভ। শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলার অনুভবেও মহাজনেরা পদ লিখেছেন। দণ্ডাত্মিক লীলার পদ বা দিবাপরিমাণকে এক এক দণ্ডে বিভাগ ক'রে কৃষ্ণলীলাবৈচিত্র্যও আস্বাদন করেছেন তাঁরা।

এখন '**গৌরচন্দ্রিকা**'। যার আশ্রয়ে মহাজন ও কীর্তনিয়ারা রাধাকৃষ্ণকথার বর্ণন-আস্বাদন করতে ও ভক্তদের সে আস্বাদ দান করতে চেয়েছেন, তার উল্লেখে আমরা এ গ্রন্থের পালা শেষ করছি।

গৌরচন্দ্রস্য ইয়ম্ অর্থাৎ গৌরচন্দ্রের এই লীলা, এই অর্থে গৌরচন্দ্রিকা। গৌরাঙ্গ কৃষ্ণের রাধাভাবমূর্তি, একাধারে রসরাজ ও মহাভাবের প্রকাশ, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। নীলাচল-পরিকর স্বরূপ ও রামানন্দের উপলব্ধ এই তত্ত্ব প্রথমে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা, পরে তাবৎ ভক্তমহাজনেরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা গৌরের নবদ্বীপ-নীলাচলে প্রকাশিত ভাববিকারের মধ্যে কৃষ্ণরাধার ব্রজলীলাবিলাসকেই বিস্ময়সহকারে নানাভাবে অনুভব করেছিলেন এবং পদরচনার মাধ্যমে সেই লীলার ইতিহাস রক্ষা করতেও আগ্রহী হয়েছিলেন। যাঁরা মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করেন নি, তাঁরাও অন্যের দৃষ্টান্তে এবিষয়ে

অভিনিবেশ করেছিলেন। ব্রজলীলার মত নবদ্বীপলীলাতেও কৃষ্ণের দু'টি অভিলাষ ছিল, এক, তিনি রাধাপ্রেমের আশ্চর্য স্বরূপ অনুভব ক'রে নিজে বুঝবেন, দুই, ব্রজলীলার প্রকৃত স্বরূপ ভক্তদের বুঝিয়ে নামাদি কীর্তনের মধ্য দিয়ে নবরাগধর্মের দিকে সকলকে আকর্ষণ করবেন। সুতরাং প্রভুলীলা ব্যতীত ব্রজলীলার স্বরূপ ভক্তদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যেত, গোপীপ্রেমের তাৎপর্য এবং রাধাপ্রেমের আশ্চর্য মহিমা অপ্রকাশিতই থাকত। মহাজন একটি পদে তাই বলেছেন :

মধুর-বৃন্দাবিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী-সার
বরজ-যুবতি-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার?

মহাপ্রভু কৃপা ক'রে দেখালেন তাই ভক্তেরা দেখলেন। মহাপ্রভু তাঁর নিজলীলার অভিব্যক্তিতে ব্রজলীলাকে সুপরিস্ফুট ক'রে তুললেন। এই কারণে ভক্তদের প্রয়োজন হ'ল কৃষ্ণলীলার অনুরূপ গৌরাঙ্গলীলারও আস্বাদন, এবং গৌরলীলার সহায়তায় রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্যে যথাযথভাবে ও সহজে অনুপ্রবেশের অধিকার। গৌরলীলা অনেকে প্রত্যক্ষও করেছিলেন, সুতরাং প্রত্যক্ষে অনিবার্য বিশ্বাস স্থাপনের ফলে অপ্রত্যক্ষও তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষের সমান শ্রদ্ধা অর্জন করলে। গৌরলীলা দৃষ্ট ও বর্ণিত হ'লে দেখা গেল ক্বচিৎ কৃষ্ণের কিন্তু প্রায়শই রাধার বিচিত্র ভাবব্যাকুলতার সঙ্গে তা সহজেই মিলে যাচ্ছে। সুতরাং ব্রজরসপিপাসুরা প্রথমে গৌরলীলা আস্বাদন ক'রে তার আশ্রয়ে ব্রজের রাধাপ্রেমের নিগূঢ়তায় নিমজ্জিত হওয়ার বাসনা পোষণ করতে লাগলেন। এই জন্য পালাবদ্ধ কীর্তনে রাধাকৃষ্ণলীলার যে-ভাবের যে-রসের পালা গাওয়া হবে তার পূর্বে রাধাভাববিগ্রহ কৃষ্ণগৌরের সেই ভাবের সেই অবস্থার পদ কীর্তন ক'রে প্রয়োজনগত এবং রসগত ঔচিত্য রক্ষা করা হয়। এরকম গৌরচন্দ্রিকার ব্যবস্থাকে 'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়। অন্য আর এক দিক দিয়ে, গৌরচন্দ্রিকার সাহায্যে কৃষ্ণলীলার অবতারণা রাধাভাবের জীবন্তবিগ্রহের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতার পরিচয়ও বটে। বলা বাহুল্য, মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষদর্শী বা পরোক্ষদর্শী যাঁরা তাঁর লীলা নিয়ে পদ লিখেছেন তাঁদের সমস্ত পদই যে গৌরচন্দ্রিকারূপে গাওয়ার যোগ্য এমন মনে করা হয়নি। গৌরাঙ্গলীলা নিয়ে লেখা বহু রচনাই তাঁর জীবনের বাহ্যঘটনা নিয়ে, যেমন নবদ্বীপলীলার মধ্যেকার কাজী-প্রবোধ, জগাই-মাধাই উদ্ধার, তাঁর সন্ন্যাস ও শচীদেবীর বাৎসল্য, নবদ্বীপবাসীদের শোক প্রভৃতি। মহাজনদের বর্ণনাগুণে এগুলির কবিকৃতিও হৃদয়গ্রাহী, এবং কেবল গৌরলীলা নিয়ে পালাকীর্তনে এগুলির গ্রন্থন আবশ্যিক, তবু যেহেতু এগুলি মহাপ্রভুর নিগূঢ় নিজ লীলারসের বর্ণনা নয়, সেইহেতু কৃষ্ণলীলার পালাকীর্তনে এগুলি ভূমিকা যথাযথ হবে না, বিশেষতঃ যখন কৃষ্ণগৌরের স্বানুভববিলাস নিয়ে রচনা যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। দেখা গেছে, গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছেন যে, কৃষ্ণলীলার সম্ভোগ-শৃঙ্গার প্রভৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে অশ্লীলতা এসে পড়েছে, সেই অশ্লীলতাকে আবৃত করার জন্যই মহাপ্রভুর লীলাপদ দিয়ে কৃষ্ণকথা আরম্ভ করা। এর থেকে অসমীচীন মন্তব্য আর কিছু হতে পারে না। প্রথমতঃ ঐ মন্তব্যকারীদের প্রশ্ন করা যেতে পারে, ধরা গেল সম্ভোগ-শৃঙ্গারের বর্ণনা অশ্লীল, কিন্তু বিপ্রলম্ভের ক্ষেত্রে তো অশ্লীলতার প্রসঙ্গ নেই, সেক্ষেত্রে কেন মহাপ্রভুর কথা অবতারণার প্রয়োজন? দ্বিতীয়তঃ দেবাদিবিষয়া রতিতে কোনো বর্ণনাকেই তো গ্রাম্য

বলা চলে না। তা ছাড়া বৈষ্ণবশাস্ত্রেই পূর্বনির্দেশ রয়েছে—কামৈব গোপরামাণাং প্রেম ইত্যগমৎ প্রথাম্। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণপ্রণয়ে কামকথার প্রসঙ্গ থাকলেও তাকে প্রেম ব'লেই গ্রহণ করতে হবে। আর "কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।" সুতরাং অবৈষ্ণব ব্যতীত রাধাকৃষ্ণলীলায় গ্রাম্যতা দোষ কেউই উপলব্ধি করেন না। এমনকি দৃশ্যতঃ প্রকট গ্রাম্যতা যাতে আছে, এমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও বৈষ্ণবের কাছে নিন্দনীয় হবে না। মহাপ্রভু স্বচ্ছন্দেই এর পদ আস্বাদন করেছেন।

আসল কথা এই যে, লীলা মানেই ঈশ্বরের নররূপ নরপ্রকৃতি অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকটন। এই নরলীলায় কৃষ্ণের অপরিসীমায় আগ্রহ। এ তাঁর অনির্ণেয় স্বেচ্ছাও বটে, ভক্তদের সুখবিধান ও সাধারণকে যথার্থ ধর্ম অর্থাৎ রাগধর্মপথে আনার জন্যে প্রয়োজনীয়ও বটে। বৈষ্ণবমহাজনেরা লীলাশুক মাত্র। তাঁরা নিজ অনুভব দিয়ে যা যা প্রত্যক্ষ করেছেন, অবিকল তার উচ্চারণও করেছেন। তাঁরা গ্রহণ বর্জন ক'রে অনর্থক বাড়িয়ে রঙ দিয়ে কিছু বলেননি, সে ক্ষমতা বা প্রবণতা তাঁদের নেই। যেমন নেই শুকপক্ষে দৃষ্টবস্তুর ব্যতিক্রম ক'রে বেশি কিছু বলা, বা অমূলক বর্ণনা করা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনেরা রাধাকৃষ্ণের ভিন্ন দেহে লীলা প্রত্যক্ষ করেন নি, একদেহে লীলার আশ্চর্য দর্শন তাঁদের গোচর হয়েছিল, এমনভাবে হয়েছিল যে অপ্রত্যক্ষও তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। আর ষোড়শ সপ্তদশ প্রভৃতি শতাব্দীর যে সব মহাজন এ লীলা প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি পূর্বাচর্যাদের আপ্তবাক্য অনুসারে তাঁরাও কল্পনায় সম্যক্ অনুভব করেছিলেন। তাঁদের কল্পনানেত্রে দর্শনও যে কত বাস্তব তা কি গোবিন্দদাসাদির পদপাঠে ও শ্রবণে আমরা অনুভব করতে পারি না?

নামমূর্তি গৌরচন্দ্রের জয় হোক।

প্রথম-মুদ্রণে সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ। কৃষ্ণনগর, রবিবার, ৩রা বৈশাখ, বঙ্গীয় সন ১৩৭৯।
তৃতীয় মুদ্রণ—বঙ্গীয় সন ১৪০০, বৈশাখ। ১৮ সি, টেমার লেন।

পরিশিষ্ট

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি—পুরাতন নবদ্বীপ বা নদীয়া[১]

বাঙলার ও বাঙালীর সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে চঞ্চল ও পরিবর্তন-প্রবণতার দেশ। এর মানবসমাজের মধ্যে কালে কালে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রজাতি বিমিশ্রিত হয়ে পড়েছে, কী দেহে কী ভাবে। ফলে জীবনচর্যায়, সাহিত্যে ও দর্শনে এই ভূখণ্ড নানান্ মত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত আবর্তিত হয়েছে। যেমন মানসিক উপাদানে, তেমনি এর ভূ-প্রকৃতিতেও পুনঃপুন পরিবর্তন ঘটেছে এবং আজও ঘটছে। নৈসর্গিক পরিবর্তনের মুখ্য কারণ এর নদীগুলির গতি-পথের পরিবর্তন, গতি-অবরোধ, নূতনতর স্রোত-পথের আবির্ভাব প্রভৃতি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনে গঙ্গা-ব্রহ্মাপুত্রসহ করতোয়া, ভৈরব, মাথাভাঙা, ইচ্ছামতী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিকে ভাগীরথী, দামোদর, তিস্তার পথ-পরিবর্তন, শাখা-প্রশাখার বিলোপ ও ভিন্নমুখে বিস্তার মানুষের আর্থনীতিক জীবনযাত্রায় রুচিতে স্বাস্থ্যে, সুতরাং চিন্তাভাবনায় রূপান্তরের সৃষ্টি করেই চলেছে।

এমনই এক নৈসর্গিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে চালিত হয়েছে ভাগীরথী-তীরবর্তী নবদ্বীপ বা নদীয়া—একদা বাঙলার সংস্কৃতির কেন্দ্র ও গৌরবস্থল এবং শ্রীচৈতন্যের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের লীলাভূমি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম প্রকাশ ও বিস্তারের কেন্দ্র। পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে, দেশ ও জাতির পক্ষে এত বড় একটা ঘটনা পরবর্তী ইতিহাস লেখকদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নি। বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনের মধ্যে অবশ্য তা হওয়ার কথা নয়। ফলে জাতীয় চেতনার বিকাশের পর থেকে জাতীয় মানবিক ইতিহাস নোতুন ক'রে গঠনের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে মুখ্যত সাহিত্যিক উপাদানের উপর, আর গৌণভাবে তথাকথিত ইতিহাসের বিবরণের উপর অনুমান প্রয়োগ ক'রে, ভূতাত্ত্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে এবং কিছু কিছু জনশ্রুতির উপরও। অথচ আজকের স্বল্পশিক্ষিত মানুষেরও শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে খুঁটিনাটি ইতিবৃত্ত জানবার আগ্রহ খুবই প্রবল হয়েছে। মধ্যযুগেব নদীয়াই বা কোথায় ছিল আর শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ সেই নবদ্বীপের কোন্ অঞ্চলে হওয়া সম্ভব এটা জানার ঔৎসুক্য কেবল বৈষ্ণব ভক্তদের পক্ষেই নয়, ছাত্রদের ও সাধারণের পক্ষেও সমান স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের ইতিহাসের এত বড় ব্যাপার সম্পর্কে আমরা সচেতন হলেও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসাবে উদ্যোগী

১. ১৯ জুলাই, ১৯৭৫ 'দেশ' পত্রিকা।

২. শহর 'নদীয়া' নবদ্বীপ শব্দেরই প্রাকৃত তদ্ভব রূপ। নবদ্বীপ-ণঅদ্দীঅ-নদীআ।

হতে পারিনি আজও। এখনকার নবদ্বীপ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের মঠনির্মাতা ও সম্প্রদায়বাদীরা নির্ধারিত ইতিহাস-ভূগোলের অভাবে তাঁদের স্ব স্ব মঠমন্দির প্রতিষ্ঠার ভূমিকেই শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার বিভিন্ন অঞ্চল ব'লে চিহ্নিত ক'রে চলেছেন, যার ফলে ধর্ম নিয়েও দলীয়তার প্রসার ঘটছে কম নয়।

এরকম অবস্থায় দেশের প্রকৃত ইতিহাস-ভূগোলকে উদ্ধার ক'রে বাস্তব পরিস্থিতি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা শিক্ষিত গবেষকদের ও স্বদেশী রাষ্ট্রের একটি জাতীয় কর্তব্য বলেই মনে করি। সেকালের দুই-নদী-বেষ্টিত এই দ্বীপ অঞ্চলটির উপর নৈসর্গিক পরিবর্তনের লীলাতরঙ্গ যেভাবে বারংবার আঘাত হেনেছে তাতে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন প্রভৃতি কোন্ কোন্ স্থানে ছিল আজ আর তা সঠিক নির্ধারণ করা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু গঙ্গাতীরবর্তী সেই এলাকাগুলি মোটামুটি চিহ্নিত করা দুরূহ হবে না, যদি ভূতত্ত্ববিদ্, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে অভিজ্ঞ সুধীবৃন্দ একযোগে আন্তরিকভাবে প্রয়াস করেন। এ বিষয়ে ভাগীরথীর পুরাতন প্রবাহপথ নির্ধারণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মহাপ্রভুর নিতান্ত প্রিয়, তাঁর বেগবতী ব্যাকুলতার সমানধর্মা স্নেহময়ী ভাগীরথী মহাপ্রভুর অদর্শনের পর থেকে চঞ্চলা হতে হতে "আর নবদ্বীপের প্রয়োজন কী" এই ব'লেই কি পরিশেষে পুরাতন নদীয়া নগরীর সেই সব লীলাক্ষেত্রগুলি ধুয়ে মুছে অপসারিত করে দিলেন, অথবা পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজের সাম্প্রদায়িক কলহ ও ক্রম-অবক্ষয় দৃষ্টে ক্ষোভে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিপরীতগতি হলেন? মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত সে নদীয়া আর নেই, যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী। সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক প্রয়াসে নবদ্বীপ অধ্যয়ন প্রারব্ধ হবে কি না জানি না। আজকের এই সীমায়িত অবকাশে স্বকীয় পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্যে এ বিষয়ে কী প্রমাণ মিলে তা দেখা যেতে পারে।

সাহিত্য বলতে মুখ্যত বৈষ্ণব জীবনীকাব্যগুলিই এ বিষয়ে আমাদের অবলম্বন। জীবনীকাব্যগুলিতেই বর্ণনা প্রসঙ্গে নবদ্বীপের পথঘাট, শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত ভক্তদের বাসস্থান, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ এবং ভাগীরথীর প্রবাহপথ প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যজীবনী বিষয়ক পদাবলী ইতিবৃত্ত বিষয়ে নিতান্তই কৃপণ, জীবনীগ্রন্থগুলির লক্ষ্যও ইতিবৃত্ত সঞ্চয়ন নয়, লীলাশ্রবণোৎসুক-ভক্তচিত্তের তৃপ্তিসাধন। তবু ইতিহাস-ভূগোলকে জীবনীকারেরা বর্জন করতে পারেন নি, প্রাসঙ্গিকভাবে গ্রন্থমধ্যে স্থান তাঁদের দিতেই হয়েছে। প্রদত্ত প্রমাণের উপর তাঁরা পাঠকদের যথাযথ অনুমানের অবকাশ রেখেছেন ; কেউ কেউ একটু বেশি, কেউ বা অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য এমন চরিতকাব্যও মিলে যার মধ্যে ঐতিহাসিক বর্ণনের মায়া আছে মাত্র, প্রকৃত তথ্য কিছু নেই বললেই চলে। যাই হোক, আমাদের অভিপ্রেত নবদ্বীপ-পরিচয়ের ব্যাপারে চরিতগ্রন্থগুলিকে এইভাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে—

(১) মুরারিগুপ্তের সংস্কৃত চৈতন্যচরিত গ্রন্থ। এটির প্রমাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই গ্রন্থটি লিখিত ও সমাপ্ত হয়। আর মুরারিগুপ্ত শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠ সহপাঠী এবং একান্ত প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-জীবনীর সঙ্গে নদীয়ার ইতিহাস-ভূগোল নির্ধারিত ক'রে যাবেন এমন অভিপ্রায় মুরারির ছিল না। তিনি নিতান্ত ধার্মিক, বিশেষত ভক্তের মতই গ্রন্থ লিখে গেছেন। তবু প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যের পারিবারিক

অবস্থা, প্রথম জীবন ও বিবাহ এবং নবদ্বীপ বিষয়ে ছিটেফোঁটা যেটুকু পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন তারই মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (২) কবি-কর্ণপূরের লেখা সংস্কৃত চৈতন্যচরিত মহাকাব্য এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। নবদ্বীপ প্রসঙ্গে এতে একটি স্মরণীয় সংবাদ পাওয়া যায়, যা চৈতন্যভাগবতেও মিলছে। তা হ'ল নবদ্বীপ নগরীর সন্নিহিত গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়া গ্রাম। (৩) চৈতন্য-ভাগবত নামে বাঙলা গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অন্তত কুড়ি বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়। এটিতেই তুলনামূলকভাবে নবদ্বীপের ইতিহাস ভূগোলের বিশেষ পরিচয় যা কিছু গ্রথিত দেখা যায়। রচনা হিসাবেও এটি খুবই প্রামাণিক। (৪) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল—এর বাস্তব ঐতিহাসিক মূল্য নগণ্য। (৫) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—এই কাব্যটির প্রারম্ভে নবদ্বীপের পীরালিয়া নামক মুসলমান-প্রধান একটি গ্রামকে নবদ্বীপের সন্নিকটবর্তী বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক নয়, বিশ্বাসযোগ্যও মনে হয় না, যেমন জয়ানন্দ পরিবেশিত অন্য বহু তথ্যও বিশ্বাসযোগ্য নয়। (৬) কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত। চৈতন্য-জীবনী এবং বৈষ্ণব ধর্মের দিক থেকে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও নবদ্বীপ-পরিচিতির দিক দিয়ে চৈতন্যভাগবত থেকে নূতনতর কোনো সংবাদ এতে পাওয়া যায় না। (৭) শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বিরচিত ভক্তিরত্নাকর। এটি শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের আনুমানিক দুশ' বছর পরে লেখা গ্রন্থ। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈষ্ণব আন্দোলনে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে নতুন করে বৈষ্ণব সংগঠন প্রারব্ধ হয়। এই সময় নিগূঢ় বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতি ও কীর্তনাদির সূক্ষ্মতা গড়ে উঠতে থাকে। বহু বৈষ্ণব তন্ত্রগ্রন্থও রচিত হয়। এরই উপর নির্ভর ক'রে নিছক ধর্মতন্ত্রের বিস্তারই এই গ্রন্থটির লক্ষ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবমণ্ডলী ও কেন্দ্রগুলির সাধারণ পরিচয় এ থেকে পাওয়া গেলেও প্রকৃত ইতিহাসের দিক দিয়ে গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য নয়, সে দৃষ্টি থেকে এটি লেখাও হয়নি। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, দুশ' বছর আগেকার নবদ্বীপ অঞ্চলের একটি বর্ণনা তিনি তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন, যার মধ্যে নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির পুরানো লৌকিক নাম-পরিচয় বর্জন ক'রে তিনি কাল্পনিক নতুন নামকরণের প্রয়াস নিয়েছেন এবং প্রতিটি অঞ্চলের সঙ্গে একটি ক'রে উদ্ভট অলৌকিক কাহিনী যোগ ক'রে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা পরে বলছি। এখন দেখা যাক, নবদ্বীপ, ভাগীরথী ও নবদ্বীপ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কী পরিচয় মুরারি, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবন দাস এবং নরহরি চক্রবর্তী তাঁদের গ্রন্থে গ্রথিত করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ এবং নবদ্বীপ অঞ্চলের পরিচয় যদি মুরারি দিতেন তাহলে তা-ই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য হ'ত। কিন্তু মুরারি ইতিবৃত্তে অনুরাগী ছিলেন না। দু'-একটি ঘটনার বর্ণনায় তাঁদের অজ্ঞাতসারে অবশ্য ভাগীরথীর অবস্থান সূচিত হয়েছে। যেমন, (১) গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ গঙ্গা পার হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, "ত্যক্ত্বা গৃহং স্বর্গনদীং প্রতীর্য জগ্রাহ সন্ন্যাসম্ অশক্যমন্যৈঃ" (১ম প্রক্রম, ৭ম অঃ)। (২) বাস্তব সন্ন্যাস গ্রহণের কিছু পূর্বেই একদিন শ্রীচৈতন্য মাতার উপর বিরক্ত হয়ে গঙ্গা পার হয়ে উত্তর কূলে গিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে কিছুদূর চলে গিয়েছিলেন। মুরারি ও অন্যান্য সহচরেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন—

তেতো ব্যাট্যাং মুরারে স্তে ঝটিত্যাগত্য সেশ্বরাঃ।
উপবিশ্য ক্ষণং স্থিত্বা বিজয়স্যাশ্রমং যযুঃ॥
উষিত্বা রজনীং তত্র প্রভাতে ভগবান্ পরঃ।
জগামোত্তরকং কূলং জাহ্নব্যা অভ্রমৎ দ্রুতম্॥ (২ প্রঃ ১২ অঃ)

(২) নবদ্বীপের বিপরীত কূলে কুলিয়া (= কূলদ্বীপ) নামে গ্রাম ছিল। অবশ্য মুরারির চৈতন্যচরিত গ্রন্থের শেষের দিকে যে অংশে এই সংবাদ রয়েছে সেই অংশের কাহিনীটি প্রক্ষিপ্ত ব'লে পণ্ডিতেরা মনে করেন। কিন্তু নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে গঙ্গাপারের যে কুলিয়া গ্রাম ছিল সে সংবাদের নিঃসংশয় প্রমাণ দিচ্ছেন বৃন্দাবনদাস ও কবিকর্ণপূর। সুতরাং মুরারির ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত হলেও নবদ্বীপের পশ্চিমে যে গঙ্গা ছিল (এবং মুরারির অন্য বর্ণনায় উত্তরেও ছিল) এ সুনিশ্চিত। নবদ্বীপের পশ্চিমে গঙ্গা এবং প্রায় বিপরীত কূলে 'কুলিয়া' এ সংবাদ কবিকর্ণপূরও দিচ্ছেন। তাঁর মহাকাব্যে তিনি কুলিয়ার নাম করেন নি, শুধু বলেছেন গঙ্গাপারে পশ্চিমে কোনো দেশে গিয়ে শ্রীচৈতন্য উপস্থিত হলেন (নীলাচল থেকে গৌড়ভ্রমণের মধ্যে)। চৈতন্যচরিত মহাকাব্য তাঁর একেবারে প্রথম বয়সের লেখা, কিন্তু শেষ বয়সে তিনি যে নাটক লেখেন (চৈতন্যচন্দ্রোদয়, আনুঃ ১৫৬০-৭০) তাতে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে গঙ্গাপারে নবদ্বীপের পশ্চিমের এই গ্রাম হ'ল 'কুলিয়া'। যেমন—

'প্রতাপরুদ্রঃ। কথয় মে কিয়দ্দূরং ভগবন্তো গতাঃ।
পুরুষাঃ কুলিয়াগ্রামং যাবৎ॥
রাজা। (সার্বভৌমমুখং নিরীক্ষ্যতে)।
সার্বভৌমঃ। দেব, নবদ্বীপপারে পারেগঙ্গং
কশ্চন তন্নামা গ্রামোঽস্তি।

* * *

পুরুষাঃ। ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য
হরিদাসেনাভিবন্দিতঃ তথৈব
তরণি-বর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া
নাম গ্রামে মাধবদাসবাট্যাম্ উত্তীর্ণবান্। (নবম অঙ্ক)

এ হ'ল শ্রীচৈতন্যের নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাবার অভিলাষী হয়ে যাত্রাকালে গৌড়ের পথমধ্যবর্তী ঘটনার বর্ণনা। কবিকর্ণপূর আরও সংবাদ দিচ্ছেন যে, শ্রীচৈতন্যকে দেখার জন্য নবদ্বীপ অঞ্চল থেকে লোকের ভিড় এত বেশি হয়েছিল যে খেয়া-নৌকার ভাড়া এক কাক থেকে এক কাহন পর্যন্ত উঠেছিল, আর জলপথে মাঝে মাঝে যে সব বাঁশের সেতু করা হয়েছিল তা প্রত্যহই ভেঙে যেতে লাগল। শ্রীচৈতন্য সাতদিন কুলিয়ায় থেকে নবদ্বীপের লোকের মনস্কামনা পূর্ণ ক'রে রামকেলি গ্রামে যান।

উক্ত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লেখার বিশপঁচিশ বছর আগেই বাঙলায় লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বিরচিত হয়। এই গ্রন্থটিও মধ্যলীলা পর্যন্ত অত্যন্ত প্রামাণিক আর নবদ্বীপ অঞ্চলের এবং সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলের সমাজস্থিতির ও শ্রীচৈতন্যের পারিবারিক অবস্থার যা কিছু বিশদ বিবরণ এতেই পাওয়া যায়। যদিও শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ

কেমন ছিল, কোন মুখে, গঙ্গা থেকে ঠিক কত দূরে এ সব খুচরো খবর তিনি দেননি। বৃন্দাবনের গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের নবধর্ম প্রকাশের বর্ণনার মধ্যে কাজীর বিরুদ্ধতা প্রশমন বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যে-যে অঞ্চল ও পথ দিয়ে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে সংকীর্তনের দল কাজীর বাড়ি গিয়ে পৌঁছেছিল এবং চক্রাকারে নবদ্বীপ পরিক্রমা ক'রে ফিরে এসেছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তখনকার নবদ্বীপের পরিচয় হিসাবে এই বিবরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবরণ অনুসরণে দেখা যায়, নবদ্বীপে গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধ'রে (পশ্চিম থেকে পূর্বে) একটি পথ চলে গিয়েছিল। এই পথটি তীরবর্তী বসতিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এ ছাড়া গঙ্গার উপর বেশ কয়েকটি স্নানের ঘাটও ছিল। শ্রীচৈতন্য নিজে যে ঘাটে স্নান করতে ও সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত ছিলেন (সম্ভবত তাঁর গৃহের সব থেকে কাছের কোনো ঘাট) সেখান থেকে সংকীর্তনের প্রারম্ভ হয়। তারপর মাধাইয়ের ঘাট এবং বারোকোণা ঘাট প্রভৃতি অতিক্রম ক'রে ঐ পথ ধ'রে তাঁরা 'গঙ্গানগর' অঞ্চলে এসে পৌঁছালেন। গঙ্গার নগরের মধ্য দিয়ে নগরিয়াদের ঘাট অতিক্রম ক'রে এলেন শিমুলিয়া। ঐ শিমুলিয়া গ্রাম এখনও রয়েছে। এর অবস্থিতি বর্তমান নবদ্বীপ শহরের উত্তর-পূর্বে এবং 'মায়াপুর' নামে বর্তমানে কথিত অঞ্চলের ঠিক উত্তরাংশে। শিমুলিয়াতে এসে ঐ পথ ছেড়ে দিয়ে ''কাজীর বাড়ির পথ ধরিলা ঠাকুর''। শিমুলিয়া সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে এটি নবদ্বীপ শহরের প্রত্যন্ত পল্লী ''নদীয়ার একান্ত নগর শিমুলিয়া''। বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে শিমুলিয়া এবং সেখান থেকে কাজীর বাড়ি (যে অঞ্চলকে কাজীপাড়া বলা হ'ত), সংকীর্তনের প্রারম্ভ স্থান থেকে বেশ কিছু দূরের রাস্তা। আর এ অঞ্চলে গঙ্গাও নেই, কোনো ঘাটও নেই। আরও লক্ষণীয় এই যে, নবদ্বীপ থেকে শিমুলিয়া আসতে এবং কাজীর প্রত্যয় উৎপাদনের পর গাদিগাছা, পারডাঙ্গা এবং সম্ভবত 'মাজিদা' (মধ্যদহ) প্রভৃতি দিয়ে অর্থাৎ বর্তমান নবদ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল বেষ্টন ক'রে উত্তর-পশ্চিমে ফিরে আসতে গিয়ে সংকীর্তনের দলকে পথে কোনো নদী বা জলপথ অতিক্রম করতে হয় নি। গাদিগাছা অঞ্চল হ'ল এখানকার গঙ্গা এবং জলঙ্গী নদীর মিলনস্থলের নিকটবর্তী তখনকার গ্রাম। আর পারডাঙ্গা হ'ল এখানকার নবদ্বীপ শহরের মধ্য পূর্ব ভাগ। নবদ্বীপ অর্থে জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ন'টি দ্বীপ নয়। নব উদ্ভূত দ্বীপ, ভাগীরথী এবং জলঙ্গীর প্রবাহ দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপাকৃতি অঞ্চল। পুরাতন মানচিত্রাদি এবং ডাচ ইংরেজ বণিক ও পর্যটকদের বিবরণ থেকে দেখা যায় জলঙ্গী মুহুর্মুহু তার স্রোতপথ পরিবর্তন করেছে। এখন যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে বহু আগে তার উত্তরে মিলিত ছিল। পরে ঐ পথ ত্যাগ ক'রে কিছুদূর আগে থেকেই দক্ষিণমুখী হয়ে বর্তমান নবদ্বীপের ৪/৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রগড়ের কাছে মিলিত হয়েছিল। আর ষোড়শ শতাব্দীর প্রামাণিক বর্ণনা থেকে দেখছি যে, নবদ্বীপের গঙ্গাপারে পশ্চিমকূল যেমন ছিল, তেমনি উত্তরকূলও ছিল অর্থাৎ গঙ্গা উত্তরে ও পশ্চিমে নবদ্বীপকে বেষ্টন করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ছিল। এখনকার নবদ্বীপের পূর্ববাহিনী বর্তমানের গঙ্গা বেশ পরেই আবির্ভূত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে জলঙ্গীর প্রবাহের নাম পাওয়া যায় না। অনুমান, জলঙ্গী তখন বেশ কিছু দূর দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। তবু কিছু দূরের ঐ জলঙ্গী এবং উত্তর-পশ্চিম গঙ্গা মিলিয়ে দ্বীপাকৃতিই হয়ে দাঁড়ায়।

নগর-সংকীর্তনের বর্ণনায় মুরারি বিস্তারিত ব্যাপারে যান নি। তিনি বলেছেন—

হরি-সংকীর্তনং কৃত্বা নগরে নগরে প্রভুঃ।
ম্লেচ্ছাদীনুদ্দধারাসৌ জগতামীশ্বরো হরিঃ॥

এ থেকে বোঝা যায় নবদ্বীপের পূর্বপ্রান্তের মুসলমান পল্লীগুলিকেও তিনি স্পর্শ করেছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলছেন,

"সব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন-রায়।"

পরে তিনি বলেছেন শূদ্রপ্রধান নগর-অঞ্চলের নাগরিয়াদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এ যাত্রায় শঙ্খবণিক ও তন্তুবায়দের সঙ্গে নৃত্যকীর্তন ক'রে "খোলাবেচা শ্রীধরের" গৃহে কিছুক্ষণ কাটিয়ে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমকালীন পদকর্তা উদ্ধবদাসের ভণিতায় একটি পদ পাওয়া গেছে। ঐ পদটিতেও ঐ নগরসংকীর্তনের স্থানগুলির নাম ও পর্যটনের ক্রম উল্লেখিত আছে। বৃন্দাবনদাস থেকে বিশেষ এই যে, শ্রীচৈতন্য রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহ অর্থাৎ তাঁর শ্বশুরালয় হয়ে তবে নিজালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। আর রয়েছে গঙ্গার ও শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহের অবস্থান সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য—

বায়ুকোণে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
নিজ গৃহে গেলা গৌরহরি॥

এ পদটি যদি অতিক্রম হয় তাহলে তৎকালীন গঙ্গার প্রবাহ এবং নবদ্বীপ মধ্যে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহের অবস্থিতির অন্বেষণ অনেকটা সহজ হয়ে আসে। অবশ্য মুরারি এবং বৃন্দাবনদাস সে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও গঙ্গার দক্ষিণ কূলেই যে শ্রীচৈতন্যের 'নিজঘাট' 'মাধাইয়ের ঘাট' 'বারকোণা ঘাট' এবং 'নগরিয়া' ঘাট' ছিল এই তথ্য অনুমিত হয়। সন্ন্যাসের সংকল্প নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে শ্রীচৈতন্য যে-ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে উত্তরকূলে পৌঁছে কাটোয়ার পথ ধরেছিলেন জনশ্রুতিতে তাকে 'নিদয়ার ঘাট' বলে। আমাদের অনুমান এটি তখনকার খেয়াঘাটও ছিল এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অথচ শ্রীচৈতন্য-শ্রীবাসের গৃহ থেকে দূরবর্তী যে-রাজপথের বিবরণ রয়েছে তা ঐ খেয়াঘাট অতিরিক্ত ক'রে গঙ্গার তীর ধ'রে কাটোয়া পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এখন নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া যেতে হলে গঙ্গা অতিক্রম করতে হয় না, তখন হ'ত। নবদ্বীপের আর একটি খেয়াঘাটের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে, যা পার হয়ে জনতা চৈতন্যকে দেখার জন্য বিদ্যাবাচস্পতির গ্রাম বর্তমান বিদ্যানগরে সমবেত হয়েছিল। হুসেন শাহের শাসনকালে 'অম্বুয়া' অর্থাৎ বর্তমান কালনার সংলগ্ন "অম্বিকা"[১] গ্রাম এই অঞ্চলের বা মুল্লুকের প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার ছিল। ঐখানে মুল্লুকপতির নিবাস ছিল। নবদ্বীপের মধ্যবর্তী যে রাজপথের উল্লেখ রয়েছে তা নিশ্চয়ই অম্বুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত এবং বিদ্যানগরের খেয়াঘাট পার হয়ে নবদ্বীপের মধ্য দিয়ে ও কাজীর বাড়ির সন্নিকট হয়ে কাটোয়া যাবার খেয়াঘাট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এ অনুমান অসংগত হবে না। রাজপথ যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবাসের গৃহ থেকে কিছু দূরবর্তী ছিল এ প্রমাণ পাওয়া যায় চৈতন্য-ভাগবত

১. অম্বুয়া বা আম্বুয়া শব্দের অর্থ আমবাগানের জন্য দেয় ট্যাক্স্ যে গ্রামে আদায় করা হত। আম্র—আম্ব + উক। 'অম্বিকা' নাম এখনকার বানানো।

থেকেই। অথচ তা শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ও সুগায়ক মুকুন্দ দত্তের গৃহের নিকটেই ছিল, কারণ—

রাজপথ দিয়া প্রভু আইসে একদিন।

*   *   *

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা স্নান করিবারে। (আদি—সপ্তম)

শ্রীবাস কার্যব্যপদেশে একদিন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, অকস্মাৎ কিশোর গৌরাঙ্গকে সে পথে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি?" (আদি- অষ্টম)। আনুমানিক ১৬৬০ খ্রীঃ প্রস্তুত ফ্যান্‌ডেন্ ব্রোকের নকশায় দেখছি তখনকার একটি প্রশস্ত রাজপথ ও বাণিজ্যপথ মেদিনীপুর থেকে বর্ধমান ও কাটোয়া হয়ে গঙ্গার ওপার থেকে সোজা কাশিমবাজার পর্যন্ত চলে গেছে। আম্বুয়া-নবদ্বীপের এই রাজপথ কাটোয়ায় গিয়ে উক্ত পথের সঙ্গে সম্মিলিত ছিল এই অনুমান হয়। নদীর প্রবাহে বা অন্যভাবে বিনষ্ট না হলে যাতায়াতের পথ কখনও বিলুপ্ত হয় না। ঐ পথের পাশেই শহর গঞ্জ গড়ে ওঠে। আমাদের মনে হয় বর্তমান পোড়োমা-তলার (পড়ুয়া = পোড়ো + মা) পাশ দিয়ে যে পথটি দক্ষিণে উত্তরে বহুদূর প্রসারিত ঐটিই তখনকার রাজপথ।

গৌড়ে আগমনকালে শ্রীচৈতন্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতির বিষয়ে কবিকর্ণপূরের সঙ্গে বৃন্দাবনদাসের কোথাও কোথাও মতানৈক্য থাকলেও শ্রীচৈতন্য বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ থেকে এবং প্রবল জনতার চাপ থেকে বিদ্যাবাচস্পতিকে রক্ষা করতে গিয়ে যে মাঝরাতে লুকিয়ে কুলিয়া গ্রামে চলে আসেন এ তথ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না। বস্তুত কুলিয়া বা 'পাড়পুর-কুলিয়া' যে নবদ্বীপের প্রায় সংলগ্ন এবং গঙ্গার অপর পারে পশ্চিম তীরে ছিল এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য। ফলত এও বোঝা যায় যে গঙ্গা নবদ্বীপকে উত্তরে ও পশ্চিমে বেষ্টন করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ছিল। এ বিষয়ে অন্য নিঃসংশয় প্রমাণও মিলেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ষোড়শ শতাব্দীর গঙ্গার এই অঞ্চলের প্রবাহপথ নির্দিষ্ট হয়েছে। ধনপতির সিংহল যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে মুকুন্দ অজয় ও ভাগীরথীর সংযোগ স্থল থেকে চব্বিশপরগণা পর্যন্ত গঙ্গার পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রাম নগর ও ঘাটের উল্লেখ করেছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণে বর্ণনার ক্রম হচ্ছে এই : অজয় ভাগীরথীর সংযোগস্থলে ইন্দ্রানী, ডাইনে ভাওসিংহের ঘাট, বামে মাটিয়ারি, চণ্ডীগাছা, বেলনপুর। দিনে ও রাত্রে বাহিয়া "পুরধলী", (পুরস্থলী = বর্তমান পূর্বস্থলী) তারপর নবদ্বীপ। সেখানে চৈতন্য বন্দনা ও রন্ধন ভোজন সেরে নিয়ে রাত্রিযাপন ক'রে পরের দিন যাত্রা ক'রে পাড়পুর, সমুদ্রগড়, মির্জাপুর, ডাইনে অম্বুয়া, বামে শান্তিপুর, ডাইনে গুপ্তিপাড়া। পরে উলা, খিসিমা ঘুরে ফুলিয়ার ঘাট ইত্যাদি। এই বর্ণনক্রম মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। অধিকাংশ অঞ্চল এখনও বর্তমান আছে। কয়েকটির নাম পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। আর গঙ্গার প্রবাহ গত চারশ' বছর ধরে এ-পাশ ও-পাশ করেছে ব'লে কয়েকটি গ্রাম বর্তমানে একটু দূরে প'ড়ে গেছে। যেমন মাটিয়ারি গঙ্গা থেকে এখন মাইল তিনেক পূর্বে। বেলনপুরের বর্তমান সংস্কৃতায়িত নাম হ'ল বিল্বগ্রাম—মদনমোহন তর্কালংকারের নিবাস। চণ্ডীগাছা গ্রামটি সম্ভবত ভিন্ন নাম ধারণ করেছে। মুড়াগাছার নিকটবর্তী কোনো গ্রাম হতে পারে। পুরধলী আর কিছুই নয়, বর্তমান পূর্বস্থলী, যার পুরস্থলী নাম প্রাচীনতম পুঁথিতে পাওয়া যায়। লক্ষণীয় পূর্বস্থলীর

পরই নবদ্বীপ, নবদ্বীপের পরেই পাড়পুরের উল্লেখ। পাড়পুর হ'ল পূর্বোক্ত কুলিয়ার সংলগ্ন গ্রাম। কৃত্রিম শুদ্ধরূপে কদাচিৎ পাহাড়পুর। দু'টি গ্রামকে একসঙ্গে চিহ্নিত করা হয় পাড়পুর-কুলিয়া ব'লে। পূর্বেকার নবদ্বীপ শহরের প্রায় বিপরীত কূলে স্বল্প দক্ষিণের ঐ কুলিয়া অধুনা বিলুপ্ত। সমুদ্রগড় বর্তমান রেল স্টেশনের দক্ষিণের গ্রাম। ঐ সমুদ্রগড়ের সন্নিকটে একদা গঙ্গার সঙ্গে জলঙ্গী এবং দামোদরের পূর্ব প্রবাহ "খড়ী" নদী মিলিত ছিল এবং ঐ মিলনস্থলের নাম ছিল "তেমোহানী"। গঙ্গা তখন ফুলিয়ার পাশ দিয়ে প্রায় উত্তর মুখে বাঁক নিয়ে উলা অর্থাৎ বর্তমান বীরনগর এবং উলার পূর্বদিকের খিস্‌মা গ্রাম হয়ে আবার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। গঙ্গার সেই পুরাতন খাতের নিদর্শন আজও স্পষ্ট আর পূর্বতন গঙ্গা (মড়িগঙ্গা) যে বর্তমান নবদ্বীপ শহরের মাইল খানেক পশ্চিমে ও মাইল দুই উত্তরে প্রবাহিত ছিল তারও ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ যথেষ্ট। জলঙ্গী নদী যে মুহুর্মুহু পার্শ্বপরিবর্তন করেছে এবং সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে তা নবদ্বীপ থেকে পূর্বে বেশ কিছু দূরে ছিল তারও প্রমাণ এ অঞ্চলে যাতায়াতের ফলে নিত্যই দেখছি। বৃন্দাবনদাস জলঙ্গীর বর্ণনা দেননি। কিন্তু তাঁর চৈতন্যভাগবতের অন্ত্য খণ্ডে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস নিয়ে উত্তরে পশ্চিমে রাঢ় অঞ্চলে তিন দিন ভ্রমণের পর যখন শান্তিপুরে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁকে দেখার জন্য নবদ্বীপ থেকে ভক্ত ও পার্ষদেরা নৌকায় জলপথ অতিক্রম ক'রে তবে শান্তিপুরে পৌঁছেছিলেন। নবদ্বীপ গঙ্গার যে দিকে শান্তিপুরও সেই দিকে এবং ফুলিয়া শান্তিপুর থেকে গঙ্গার তীর হয়ে নবদ্বীপ পর্যন্ত পথও ছিল। ফলে অনুমান হয়, যে-জলপথ তাঁরা নৌকায় অতিক্রম করেছিলেন, তা এই জলঙ্গী নদীর, যা শান্তিপুরের কিছু উত্তরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হ'ত। জলঙ্গীর এই পুরাতন প্রবাহপথ ১৯১৭ খ্রীঃ প্রস্তুত বঙ্গীয় সার্ভে মানচিত্রে রয়েছে, তা ছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত ফ্যানডেন ব্রোক এবং থরন্‌টনের মানচিত্রে পাওয়া যাচ্ছে। খ্রীঃ ১৭৫০-৫৫ মধ্যে লেখা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের সীমা বর্ণনাকল্পে বলা হয়েছে—"রাজ্যের উত্তর সীমা মুর্শিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথীখাদ॥" ঐ সীমানা এখনও নদীয়া জেলার সীমানা। বর্তমান প্রবাহিত নবদ্বীপপূর্ব গঙ্গা অন্তত ভারতচন্দ্রের কাব্যরচনার সময় পর্যন্ত ছিল না।

এখন অপর বিখ্যাত গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা দেখা যাক। একমাত্র 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বিশেষ উদ্‌যোগ আয়োজন সহকারে নবদ্বীপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর আঠারো শতাব্দীর রচনা। গ্রন্থটি সার্থকনামা এবং সাধনপথের পথিক বৈষ্ণব ভক্তের কাছে মূল্যবান্ নিঃসন্দেহে। কিন্তু গ্রন্থটি যে-পরিমাণে ভক্ত-ভক্তির উৎকর্ষ-বিধায়ক ঠিক সেই পরিমাণেই ইতিবৃত্ত ও বাস্তবের উপর নিষ্ঠুর অবজ্ঞার পরিচায়ক। যেমন বলা যায়, শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরবর্তী তিন বৈষ্ণব মহাপুরুষ শ্রীনিবাস-নরোত্তম- শ্যামানন্দের কীর্তিকলাপ বর্ণনা ভক্তিরত্নাকর রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। অথচ তাঁদের আবির্ভাব তিরোভাব বা তাঁদের বৃন্দাবন গমন, দীক্ষা, প্রত্যাবর্তন, বিখ্যাত খেতুড়ীর মহোৎসব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোন সন-তারিখই নরহর চক্রবর্তী দেননি। কেবল তিথিনক্ষত্র জানিয়েছেন। একমাত্র দেখা যায়, সনাতন গোস্বামীকৃত বৈষ্ণব-তোষণী এবং জীব গোস্বামীকৃত লঘুতোষণীর সমাপ্তির তারিখ তিনি দিয়েছেন। এটি দিতে পেরেছেন, কারণ, লঘুতোষণী' টীকায় পূর্বেই তা দেওয়া রয়েছে। আসলে ভঃ রঃ পুরোপুরি

বৈষ্ণব-সাধন গ্রন্থ। ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা বৈষ্ণবতন্ত্রের থেকে আদর্শ গ্রহণ ক'রে লেখা। এর ঐতিহাসিক মূল্য কিছুমাত্র নেই, তবে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গোবিন্দদাসাদির রচিত কিছু পদের উদ্ধৃতি এর মধ্যে দেখা যায়, আর দেখা যায় সংস্কৃতে লেখা জীবগোস্বামীর কয়েকটি পত্র। ঐতিহাসিকের কাছে ঐটুকুই এর আকর্ষণীয় বস্তু। শ্রীনিবাসাদির জীবন ও কার্যাবলীর যে বর্ণনা এতে পাওয়া যায়, তাও বহুল পরিমাণে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেই তাঁকে গঠন করতে হয়েছে। যাই হোক, শ্রীল নরহরির নবদ্বীপ-পরিকল্পনা দেখা যাক।

শ্রীনিবাসকে নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিদর্শন করাচ্ছেন শচীদেবীর পরিচারক ঈশান। আনুমানিক কাল ১৫৭৫-৮০ খ্রীঃ। তখন ঈশানের বয়ঃক্রম আশি-নব্বই বৎসরের কম হবে না। ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে এই বর্ণনা রয়েছে। এর পূর্বে পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনরহরি অনুরূপভাবে বৃন্দাবনের বর্ণনাও দিয়েছেন। বর্ণনার প্রারম্ভে তিনি নবদ্বীপকে ন'টি পৃথক দ্বীপের সমাহার মনে করেছেন, যা কেউ কোথাও নির্দেশ করেন নি। আবার তিনি এমন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, শ্রবণাদি নবধা ভক্তির উদ্দীপন হয় ব'লে নবদ্বীপ নাম! ঐ ন'টি দ্বীপের তিনি নিম্নলিখিত নাম দিয়েছেন—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, পর্বতাখ্য কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ। আসলে এগুলি হ'ল বাঙ্‌লা নামের কৃত্রিম তৎসমকরণ। মর্যাদা বাড়াবার জন্য কেউ কেউ এরকম হাস্যকর কৃত্রিম শুদ্ধতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। যেমন কলকাতাকে কালীক্ষেত্র[১], বেলেঘাটাকে বিল্বঘৃষ্ট এবং মির্জাপুরকে মৌর্যপুরম ব'লে আভিজাত্যের ছদ্মবেশ পরানো যায়। উক্ত নামকরণের মধ্যে সীমন্তদ্বীপ হ'ল শিমুলিয়ার ছদ্মনাম, গোদ্রুমদ্বীপ গাদিগাছার, মধ্যদ্বীপ, মাজিদার, পার্বতাখ্য-কোলদ্বীপ পাড়পুর-কুলিয়ার, জহ্নুদ্বীপ জাননগর বা জাহাননগরের। এই বাঙ্‌লা নামগুলি ঐ সময়কার সাহিত্যে পাচ্ছি। কিন্তু অন্তর্দ্বীপ = আতোপুর, ঋতু = রাতুপুর, আবার মহৎপুর = মাতাপুর, ভরদ্বাজটিকা = ভারুইডাঙা, এগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। পুরাতন নবদ্বীপের বিলীন হওয়ার পর সম্ভবত চর অঞ্চলগুলি এইসব বাঙ্‌লা নামে চলিত হয়। আদর্শ ভক্ত নরহরি কেবল ঐ অঞ্চলগুলির সংস্কৃত নামকরণ করেই ক্ষান্ত হন নি। প্রত্যেকটি অঞ্চলের একটি ক'রে কল্পিত অলৌকিক কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। যেমন সীমন্তদ্বীপ নামের কারণ—পার্বতী শ্রীচৈতন্যের পদধূলি সীমান্তে ধারণ করেছিলেন। গোদ্রুমদ্বীপের কারণ—ঐখানে অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে সুরভি গাভী থাকতেন এবং সুরভি গৌরদরশনে গৌরমহিমা কীর্তন করেছিলেন। তেমনি গৌরাঙ্গ সপ্তর্ষির কাছে মধ্যাহ্নে দর্শন দিয়েছিলেন, তাই মধ্যদ্বীপ। তারপর ব্রহ্মা হরিদাস হয়ে জন্মাবেন এই কথা ব'লে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করেছিলেন ব'লে নাম হয়েছিল অন্তর্দ্বীপ। এই রকম সর্বত্র, এবং নিতান্ত বিশ্বাসী ভক্তের কাছে এইসব অলৌকিক কল্পিত কাহিনীর মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাস-ভূগোলের দিক থেকে এসব কাল্পনিক ও বিভ্রান্তিকর। নরহরি চক্রবর্তী ভাগীরথী ও জলঙ্গীর অবস্থান বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত কোথাও দেন নি।

১. আসলে কলিকাতা শব্দের মূল হ'ল 'কপিলক্ষেত্র'। প্রাকৃতে 'কইলখেত্ত'—কইলখেতা—কইলকেতা = কলিকাতা। পূর্বে উচ্চারণ হ'ত 'কইল' লেখা হ'ত 'কলি'। যেমন উচ্চারণ হ'ত চাউল লেখা হ'ত চালু অথবা 'মইষ' (= মহিষ) লেখা হ'ত মষি। 'আউশ' ধান লেখা হয়েছে 'আশু' ব'লে।

এইরকম অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গির চরমতা পাওয়া যাবে তাঁর "মায়াপুর" নাম কল্পনায়। শ্রীল নরহরির বিবরণমতে নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অন্তর্দ্বীপের অভ্যন্তরে "মায়াপুর" অবস্থিত এবং ঐ "মায়াপুর"ই হ'ল গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলানিকেতন। বস্তুত এই "মায়াপুর" বাস্তবে কোথাও ছিল না। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কোনও জীবনীকার বা পদকর্তা মহাজন মায়াপুরের উল্লেখ করেন নি। শ্রীল নরহরি কোথায় পেলেন তাও স্পষ্ট নয়, "তথাহি" ব'লে তিনটি সংস্কৃত অনুষ্টুপ অবশ্য তিনি যোজনা কবেছেন, যা তাঁর নিজস্ব রচনা হওয়াই সম্ভব। আসলে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনে ও অন্যান্য অঞ্চলে নিগূঢ় সাধনসংকেতময় বহু বৈষ্ণবশাস্ত্র ও কড়চা লিখিত হয়, যার কয়েকটি থেকে তিনি "তথাহি" ব'লে বহু শ্লোক তুলেছেন। এরকম কয়েকটি নাম হ'ল সাধনদীপিকা, উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্র, বরাহতন্ত্র। এগুলির কোন কোনটিতে বৃন্দাবনের গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, মদনগোপালের মন্দিরাঞ্চলকে "যোগপীঠ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর কামবীজ মন্ত্রে শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে যোগসাধনার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তীও বৃন্দাবন-পরিক্রমায় বৃন্দাবনকে বারংবার যোগপীঠ আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এবং তিনি ভক্তদের, যেমন বৃন্দাবন-যোগপীঠের তেমনি নবদ্বীপের মায়াপুরের ধ্যান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিখ্যাত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও বৃন্দাবনের গোবিন্দদেবের মন্দিরকে যোগপীঠ বলা হয়েছে। তিনি এইভাবে উক্ত যোগপীঠের বর্ণনা দিচ্ছেন—

বৃন্দাবনের কল্পদ্রুমে সুবর্ণসদন।
মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্নসিংহাসন॥
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন॥ (আদি—অষ্টম)

"মায়াপুর" নাম উক্ত যোগপীঠের অনুসরণেই কল্পিত। সম্ভবত বৈষ্ণবশাস্ত্র ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শনের "যোগমায়া" শব্দটি ধরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দুই অঞ্চলে কল্পিত দুই নাম। বৃন্দাবনে যদি যোগপীঠ ধরা হয় তাহ'লে নবদ্বীপে তা হওয়া উচিত মায়াপীঠ, এরকম ধারণা থেকেই মায়াপুর নামের কল্পনা। শ্রীপাদ নরহরি বলছেন—

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নাম স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥
মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধেয়ায়।
মায়াপুর মহিমা কে বা নাহি গায়॥

অন্যত্র তিনি বলেছেন—

দ্বারকার ঐশ্বর্য দেখ রে নদীয়ায়ে।
রত্ন-সিংহাসনে গৌরচন্দ্র বিলসয়ে॥
ভুবনমোহন প্রভু শ্রীগৌরবিগ্রহ।
বিলসয়ে রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মীসহ॥

অতএব মায়াপুর ভক্তের কল্পনা মাত্র এবং সেই অর্থে সত্য, বাস্তব ইতিহাস ভূগোলের

সত্য নয়। ভক্তের দৃষ্টিতে গৌরবিগ্রহ যেমন চিন্ময়, শ্রীধাম নবদ্বীপও তেমনি চিন্ময়। আর সেই চিন্ময়ত্বের প্রতীক শব্দই হ'ল মায়াপুর। এ নিয়ে ভক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু বর্তমান নবদ্বীপ শহরই মায়াপুর অথবা মায়াপুরই যথার্থ নবদ্বীপ এমন কথা বললে ইতিহাস-ভূগোলের বাস্তব সত্যকে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করা হয়, সেই জন্যই নবদ্বীপের বাস্তব অবস্থিতি নিয়ে এই আলোচনা করা গেল। মাত্র কিছুদিন পূর্বে বর্তমান নবদ্বীপেরই উত্তরে প্রাচীন গঙ্গা ও সেই দিকেই মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল এই সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে, অথচ ঐ কাল্পনিক 'মায়াপুর' নামের দ্বারা চালিত হয়ে বর্তমান নবদ্বীপের উত্তরের ঐ অঞ্চলকে কেউ কেউ ''প্রাচীন মায়াপুর'' আখ্যায় অভিহিত করেছেন। আসলে কোনো মায়াপুরই যখন ছিল না এবং বর্তমানে চালু-করা নাম মায়াপুর যখন মৌজা-মানচিত্রে ছিল মেঞাপুর-মিঞাপাড়া (কাজীপাড়ার দক্ষিণ), তখন ঐ 'প্রাচীন মায়াপুর' আখ্যাও সমান ভাবে বিভ্রান্তিকর, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

মধ্যযুগের সাহিত্যে নবদ্বীপের অবস্থানের যে পরিচয় ফুটেছে, তাতে দেখা গেল নবদ্বীপ গঙ্গার দক্ষিণে ও পূর্ব তীর সংলগ্ন নগর এবং পার্শ্ববর্তী বহু 'পাড়া' অঞ্চলে সমৃদ্ধ। বর্তমান নবদ্বীপ শহর পুরাতন নবদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। ভাগীরথীর নবদ্বীপ-পূর্ববাহিনী গতি তখন ছিল না। আর জলঙ্গীও বহুদূরে ছিল। এই হিসাবে বর্তমান নবদ্বীপ রেলস্টেশনের ও পূর্বস্থলী গ্রামের প্রায় সমদূরবর্তী স্থানে তখনকার গঙ্গা (বর্তমান মড়িগঙ্গা)। আর তারই দক্ষিণ ও পূর্ববতীরে নবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বর্তমান বাব্‌লারি এলাকায় বড় রেলসেতুর সন্নিকটে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ হতেও বা পারে। কিছুকাল পূর্বে বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালীও একই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

চৈতন্যভাগবত ও অন্যান্য দু'একটি গ্রন্থের বর্ণনা থেকে অনুমানে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহের একটি বিবরণও প্রস্তুত করা যায়। ছোট রাস্তা বা গলির উপর পূর্বমুখ বাড়ি। একদিকে পূর্বমুখী পূজার ঘর, অন্যদিকে শয়নগৃহ ও সংলগ্ন রন্ধনস্থল। শয়নগৃহ দুই-কুঠরি। পূজার ঘর ও বাসের ঘরের মধ্যে প্রশস্ত উঠান। উঠানে নিমগাছ ও পাশে তুলসী ও ফুলের গাছ। পিছনে পশ্চিম দিকে খিড়কী। গৃহের অবস্থান গঙ্গা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছু দূরে। শ্রীবাস ও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ি গঙ্গার একেবারে উপরেই। ইঁটের পাকাবাড়ি কারোরই ছিল না।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ। তৃতীয়ং সংস্করণম্।
টেমার লেন, কলিঃ। ১৪০০।

সংযোজন

পূর্বরাগ

প্রেমরসের বিস্তার প্রসঙ্গে 'পূর্বরাগ' নামক পর্যায়ের গ্রন্থন এবং সে বিষয়ে গীতিকবিতা রচনা পদাবলীতেই প্রারব্ধ হয় নি, সংস্কৃত সাহিত্যে এবং সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে পূর্বরাগের চমৎকারিতা নির্মিত হয়েছে এবং পূর্বরাগের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারকে যে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে (পূর্বরাগ, মান, প্রবাস এবং করুণ) পূর্বরাগ তার মধ্যে অন্যতম। এই পূর্বরাগ সম্বন্ধে বিশ্বনাথ কবিরাজ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—

'শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়াঃ।
দশাবিশেষো যোহপ্রাপ্তৌ পূর্বরাগঃ উচ্যতে।

অর্থাৎ, পরস্পর শ্রবণ ও দর্শন থেকে জাতরাগ নায়ক-নায়িকার অপ্রাপ্তিজনিত দশাবিশেষই পূর্বরাগ।

সংস্কৃত সাহিত্যে কুমারসম্ভবে হরপার্বতীর প্রণয়ে পার্বতীর পূর্বরাগ উদ্ভূত হয়েছিল তার জন্ম থেকেই। নলোদয় অথবা নলদময়ন্তী মহাকাব্যের দময়ন্তী কর্তৃক নলের গুণ শ্রবণের পর। শকুন্তলা দুষ্মন্তের ক্ষেত্রে পরস্পরের সন্দর্শনের পর 'রত্নাবলী' প্রভৃতিতেও তাই।

বৈষ্ণব মহাজনগণ কবিস্বভাব প্রণোদিত হয়ে অনায়াসেই অথবা লীলাবিস্তারকল্পে পূর্বরাগের চমৎকারিতাকে তাঁদের রচনায় উল্লেখযোগ্য করে গঠন করেছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত অথবা সাহিত্যে প্রদর্শিত পূর্বরাগের বৈশিষ্ট্য তাঁদের সংক্ষিপ্ত গীতাবলীতে আরও রমণীয়ভাবে গ্রথিত হয়েছে বলা যায়। তাছাড়া মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব তত্ত্বে এবং রসচিন্তার যে সূক্ষ্ম এবং নিগূঢ় বৈদগ্ধ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল, ষোড়শ শতাব্দী থেকে রচিত পূর্বরাগের কাব্যে তার প্রকাশ অভিনব রমণীয়তার ও সূক্ষ্ম চারুত্বের রসায়নে মহাজন—পদাবলীকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। মনে করা যেতে পারে যে, কবি বিদ্যাপতি মোটামুটি সংস্কৃত সাহিত্যের ও সংস্কৃত আলংকারিকতার অনুসরণে পূর্বরাগের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনায় রূপদর্শনজাত মুগ্ধতার পরিচয় তিনি নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করেছেন—

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ॥

কি হেরল অপরূপ গোরী।
পেঠল হিয় মাহা মোরি॥

অথবা

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধরে বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

অথবা

সজনি ভাল কত্র পেখ না ভেলি।
মেঘমালা সমেত তড়িত লতা জনু
হৃদয় শেল দয়ি গেলি।

বিদ্যাপতি অপূর্ব রূপের কবি, রমণীয় চিত্রের, নির্মাতা। রাধাকৃষ্ণে পরস্পর সন্দর্শনকে অবলম্বন করে তিনি অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার সাজিয়ে পাঠকের মানসপটে রূপ বিলাস জাগরিত করেছেন কিন্তু এই রূপে আতিশয্যের ভাব তেমন পরিস্ফুট হয়নি। মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস অপেক্ষাকৃত ভাবগত নিবিড়তায় পক্ষপাতী হয়েছেন। তাই কৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণে বিমুগ্ধ রাধার চিত্তে যে বিরহ-ভাবুকতার উদয় ঘটিয়েছেন তা প্রায় মহাপ্রভু পরবর্তী পূর্বরাগের পদাবলীর সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে। যেমন,

পাখি নহোঁ তার পাত্র উড়ি পড়ী যাওঁ।
মেদনি বিদার দেউ পশিআ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

তবু. গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাধাকৃষ্ণলীলার অনুভবের আশ্চর্য সূক্ষ্মতা ও অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উক্ত পূর্বরাগের পদে প্রকাশিত হয়নি। এই অভিনব বৈশিষ্ট্যের একটি হল কৃষ্ণাপেক্ষা রাধার পূর্বরাগের দিকেই মহাজনগণের অধিকতর মনোযোগ। তাছাড়া, সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন প্রভৃতির বর্ণনবৈচিত্র্য। বস্তুতঃ পূর্বরাগের বিষয়টি চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাস প্রভৃতির পদাবলীতে যে ভাবগভীরতা নিয়ে আমাদের চমৎকৃত করেছে তা পূর্বে দেখা যায় না। লক্ষণীয় এই যে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর পূর্বরাগলক্ষণে যদ্যপি প্রচলিত আলংকারিকদের অনুসরণ দেখা যায়। ঐ লক্ষণের বিস্তারে তিনি নামশ্রবণরূপ অভিনবতার দিকে রসিকগণকে অবহিত করেছেন। পূর্বরাগের লক্ষণ নির্ণয়ে তিনি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বর্ণনের থেকে বিশেষ অগ্রসর হননি বলেই মনে হয়। গোস্বামীপাদের লক্ষণ এই--

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।

পূর্বরাগের প্রভাব নায়িকাচিত্তে কতদূর গভীর হতে পারে তার পরিচয় বৈষ্ণব কবিকুলশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস নিম্নলিখিতভাবে দিয়েছেন—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।। ...ইত্যাদি।

এই কবিতা পাঠ বা শ্রবণমাত্রেই চিত্তে নামশ্রবণেই ব্যাকুলতা নিতান্ত করুণ একটি রমণীর সমগ্র ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নামশ্রবণেই যাঁর এই, রূপদর্শনে তাঁর যে কি অবস্থা হবে তা ভাবাই যায় না। চণ্ডীদাস বলছেন—

নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

চণ্ডীদাসের রাধিকা পূর্বরাগের অবস্থাতেই তীব্র বিরহ ভোগ করছেন—কৃষ্ণবর্ণে সাদৃশ্য দেখলেই একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন আর,

বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।

নিঃসন্দেহে রাধিকার এই ভাবাবস্থার মধ্যে মহাপ্রভুর প্রথম কৃষ্ণদর্শনের কাতরতাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মহাপ্রভু যেমন শ্রীবাস-গদাধরাদি ভক্তবৃন্দের কাছে কাকুতি মিনতি করছেন এবং তাঁর অশ্রুসজল তদ্গত ভাবমূর্তিখানি ভক্তদের চিত্তের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানেও রাধিকা তেমনি সূক্ষ্ম মহাভাব-বিলাসের প্রকার নিয়েই আমাদের অধিকতর মুগ্ধ করেছেন।

কবি যদুনন্দনদাস পূর্বরাগের উন্মাদ অবস্থা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করছেন—

খেনে হাসয়ে খেনে রোয়ে।
দিশি দিশি হেরই তোয়ে।।
খেনে আকুল খেনে থীর।
খেনে ধারই খেনে গীর।।

জ্ঞানদাস স্বপ্নে দর্শনের একটি মনোরম চিত্র এবং আত্মসমর্পণের ভাব তাঁর নিম্নলিখিত বিখ্যাত পদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।।
শিয়রে শিখন্ড রোল এপাশে মত্ত দাদুরী বোল
কোয়িল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঞ্ঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেনকালে।।
স্বপন দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
সেহ বিনে মোর কেহ নয়।

জ্ঞানদাসের নির্মিত এই বর্ষায় পরিবেশ শুধু কাব্যবিচিত্রীয় জন্য চিত্রিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। এই পরিবেশ রচনায় স্বপ্নদর্শনের গভীরতর তাৎপর্য এবং 'সঘনঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ কৈলে' প্রিয়ের আগমনের প্রত্যাশা প্রভৃতি ব্যঞ্জিত হয়েছে। বস্তুত অন্যান্য যাবতীয় রসপর্যায়ের ন্যায় পূর্বরাগ পর্যায়ের অভাবনীয় রমণীয়তা সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত

পূর্বরাগকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে উর্ধ্বে নিজ শোভা বিকীর্ণ করেছে।

'রসসিদ্ধান্তে' পূর্বরাগের ভাবুকতাকে দশটি ভাগে বিভক্ত করে দেখা হয়েছে। এগুলি পূর্বরাগবতী নায়িকার বিচিত্র অবস্থার সৌন্দর্য—

লালসোদ্বেগজাগর্যাতানবজড়িমাত্রতু।
বৈয়গ্রাংব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুদশাদশঃ।।

পূর্বরাগের মূল লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, দূতী, বন্দী, সখীর মুখে শ্রবণ, এমনকি নামশ্রবণেও নায়ক নায়িকার চিত্তে রাগ উৎপন্ন হতে পারে। আর দর্শনের বিষয়ে আলঙ্কারিকেরা উপলব্ধি করেছেন যে, সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রে দর্শন, এমনকি স্বপ্নে দর্শনের ফলে রাগোৎপত্তি সম্ভব। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব আলংকারিকগণ অর্থাৎ শ্রীমৎ রূপগোস্বামী ও শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর পূর্বরাগ বিষয়ে এইসব বৈচিত্র্যের পরিচয় পেয়েছিলেন সাহিত্যে—কিছু প্রচলিত পদাবলীতে এবং কিছু সংস্কৃত সাহিত্যের শ্লোকাত্মক গীতিকাব্যগুলিতে। তবু, একথা মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে, এঁদের অলংকারশাস্ত্র রচনায় পরে যে সব বৈষ্ণব মহাজন পদ রচনা করেছিলেন তা ছিল 'উজ্জ্বলনীলমণি' 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং কিছুটা 'অলংকারকৌস্তভে'র নির্দেশে। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, শশিশেখর, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ প্রভৃতির রচনায় আলংকারিকতা ও নবপ্রবর্তিত ভক্তিরসের আনুগত্য স্পষ্ট। কারো কারো মতে পদাবলীর চণ্ডীদাস ও শ্রীরূপের পরবর্তী। যাই হোক মহাজনগণের পদাবলীতে রাগানুগা ভক্তিরসের বিশিষ্ট পর্যায় পূর্বরাগের বৈচিত্র্যসমূহ নিপুণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সে সব পদের গ্রন্থনের স্বাভাবিকতা এবং অনায়াসচারুতা দেখে মনে হয় না যে কোনও নির্দেশ অনুসারে সেগুলি প্রস্তুত হয়েছে।

পূর্বরাগের পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বের সূক্ষ্মতা ও এগুলির অভিনবতা চৈতন্যপূর্ব পূর্বরাগ চিত্র থেকে এদের পার্থক্য প্রমাণ করেছে। বৈষ্ণবীয় পূর্বরাগের মূলে যে অধ্যাত্মভাবুকতা বিদ্যমান তা হল এই যে লীলারসিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বভাব অনুসারে এবং কৃপাপরবশ হয়ে নানা উপায়ে ভক্তের চিত্ত তাঁর প্রতি প্রলুব্ধ করেন। কখনো ক্ষণিক সাক্ষাৎ দেন কখনো স্বপ্নে, আবার দর্শন না দিয়ে শুধু নামের মাধ্যমেই নিজের প্রতি অনুরক্তি ভক্তের চিত্তে উৎপন্ন করেন। নামমাত্র শ্রবণে নায়িকার মূর্ছাভঙ্গের বিবরণ সংস্কৃত কবিতায় থাকলেও নাম থেকে আসক্তির বিষয়টি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে এত সূক্ষ্ম বিস্তার-বৈচিত্র্য লাভ করেনি। সুতরাং চণ্ডীদাসের পদে যখন পাই,

নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়...ইত্যাদি

তখন স্পষ্টতাই এই বর্ণনাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমশতদলের দ্বারা সুরভিত বলে অনুভব করতে পারি এবং পদটি আরও গভীরতা নিয়ে আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে।

পূর্বরাগের মূল কথা হল 'রাগ'। সেই রূপ রাগানুগা ভক্তির রসোপানে প্রথম পদক্ষেপ। সে রাগ অহেতুক—বহ জন্মার্জিত সুকৃতি এবং কৃষ্ণকৃপা থেকে সমুৎপন্ন। লীলার বারিধিরূপ কৃষ্ণের আঘাত থেকে গোপীদের বা ভক্তের চিত্তে এই অননুভবনীয় লীলার লালসা এবং আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হওয়ামাত্রই বিরহবোধ ভক্তের চিত্তে জাগ্রত হয়। মিলন বা মিলনের আভাস অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী হয়ে পড়ে। বিরহই প্রবল হয়ে প্রায় অনন্ত হয়ে দাঁড়ায়। কবি

গোবিন্দদাস বলেছেন,

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটী কুসুমশরে জরজর
রহত কি শত পরাণ।।

নায়িকার এই আশ্চর্য অবস্থার বর্ণনাই সমস্ত বিষয়টিকে সাধারণ থেকে অসাধারণে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষী প্রণয়কে ছাড়িয়ে রাগানুগা প্রণয়ের আশ্চর্য বিহ্বলতাকে প্রকাশ করছে। বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদ যতই অলংকৃত এবং কাব্যসৌন্দর্যে রমণীয় হোক না কেন, এই গভীরতা, যা অধ্যাত্মের দ্বারা পুষ্ট, তা বিদ্যাপতির পদে অবিদ্যমান। বস্তুতঃ বৈষ্ণব ভক্তিরসের নিগূঢ় ভাবটি হল বিরহের। কারণ, রাধাকৃষ্ণ দুই দেহে যখন পৃথক হয়ে পড়লেন তখন পরস্পরের দর্শন বা নামশ্রবণে আশ্চর্য ব্যাকুলতার উদ্ভব হল কিন্তু মিলনের কোন উপায় রইল না—বিরহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। এই আভ্যন্তরীণ বিষয়টিকে লক্ষ্য করে বলরামদাস তাঁর আক্ষেপানুরাগের একটি পদের ভণিতায় বলেছেন—

আমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঁই বলরামের পঁহু চিত নহে থির।।

অভিসার

মহাজনগণের পদরচনায় একটি উল্লেখযোগ্য অবলম্বন এবং পালাকীর্তনের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীবিভাগ হল অভিসার। সংস্কৃতের কবিগণ নায়ক-নায়িকার বিশেষতঃ নায়িকার অভিসার অবলম্বনে বহু উত্তম কবিতা বা পদ রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণব মহাজনগণ অভিসারের কাব্যসৌন্দর্য বিষয়ে কোথাও তাঁদের অনুগামী হয়েছেন, আবার কোথাও তাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। এর কারণ রাগানুগা ভক্তিভাবে অভিসারের বিশেষ সংকেতময় তাৎপর্য। কিন্তু কেবল আধ্যাত্মিক দিক থেকেই নয়, কাব্যগত চমৎকারের দিক থেকেও বৈষ্ণব কবিগণের অভিসার পাঠকের কাছে অধিকতর লোভনীয় হয়েছে।

লক্ষণীয় এই যে, মহাজন—পদাবলীতে সর্বত্র অলৌকিক ভক্তিভাবের সঙ্গে কাব্যের রমণীয়তা আশ্চর্যভাবে একত্র-মিশ্রিত হয়েছে। অভিসারপক্ষেও বলা যায় এর একটি হল অধ্যাত্মের দিক অন্যটি হল লৌকিক মাধুর্যময় কাব্যের দিক। অভিসার সম্পর্কে অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হয়েছে, যে নায়িকা তীব্র প্রণয়বশে নিজে কান্তসমীপে অভিসার করেন বা কান্তকে নিজ অভিমুখী করান, তাঁরই নাম অভিসারিকা। অবস্থাভেদে নায়িকার আটপ্রকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অভিসারিকা অন্যতম। অভি + সৃ (সরতি) ধাতুর যোগে 'অভিসার' শব্দের একটি অর্থ হল সম্মুখে গমন। সংস্কৃত কাব্য-নাটক দিতে অভিসারের বিচিত্র বর্ণনা আমাদের মুগ্ধ করে। কবি কালিদাস একটি শ্লোকে উজ্জয়িনীর অভিসারিকাদের অমরত্ব দিয়ে গেছেন। বর্ষার দুর্যোগপূর্ণ নিশীথে 'রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচীভেদ্যৈস্তমোভিঃ' দুর্দমনীয় আবেগ নিয়ে যে অভিসারিকারা যাত্রা করেছেন, কবি মেঘকে অনুনয় করেছেন বিদ্যুতালোকের দ্বারা তাঁদের পথ দেখিয়ে দিতে এবং বজ্রনাদের দ্বারা তাঁদের ভীত ও সচকিত করে না তুলতে। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত গীতিকবিরা 'অভিসার' নিয়ে ভাবে ও ভাষায় অপরূপ বহু কবিতা রচনা করেছেন। একজন কবি বলেছেন—

> মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং।
> বাসঃ পিধেহি বলয়াববলিমঞ্চলেন॥
> মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত।
> দন্তাংশয়স্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি॥

মন্দগমনে যাও, নীলবাস পরিধান কর, আর অঞ্চল দ্বারা বলয়াদি ভূষণকে আবৃত কর। তোমার দন্তসমূহের শুভ্র কিরণে অন্ধকার দূর হয়ে যেতে পারে। এ হল তিমিরাভিসারিকার বর্ণনা। জ্যোৎস্নায় অভিসারের বর্ণনাও রয়েছে—মল্লিকামালায় ভূষিত হয়ে এবং সর্বাঙ্গ চন্দনে অনুলেপিত করে ঐ যে অভিসারিকা যাচ্ছেন জ্যোৎস্নার মধ্যে তাঁকে লক্ষ্যই করা যাচ্ছে না—এই বর্ণনা দিচ্ছেন দণ্ডী।

অর্বাচীন সংস্কৃতের আর একজন কবি দুর্যোগময় নিশীথের যাত্রী অভিসারিকার প্রস্তুতির একটি অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন—

মার্গে পঙ্কিনি তোয়াদন্ধতমসে নিঃশব্দসঞ্চারকং।
গন্তব্যা দয়িতস্য মেহদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।।
আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্যনেত্রে ভৃশং।
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি।।

বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস এই পদটির অনুসরণে অভিসারের একটি বিখ্যাত পদ রচনা করেছেন। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবও অভিসারের র্বনায় কৃতিত্ব কম দেখান নি। তাঁর রতিসুখসারেগতমভিসারে প্রভৃতি গীতটি বাঙালী রসিকমাত্রেরই পরিচিত। কিন্তু এ হল সংস্কৃতের নিজ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত এবং কতকটা নিয়মানুগ অভিসারের কবিতা। সংস্কৃতে প্রাকৃতিক পরিবেশ হিসাবে অভিসার মোটামুটি দ্বিবিধ। জ্যোৎস্না এবং তিমির। অবশ্য বর্ষার বর্ণনাও কোথাও কোথাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অপরপক্ষে বাংলার বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায় যে কোন সময়কেই অভিসারের সময় বলে নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন রীতিতে অভিসারের পদ তাঁরা লিখেছেন—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দারুণ গ্রীষ্মে নায়িকা অভিসার করছেন, মধ্যাহ্নে এমনকি প্রাতেও রাধিকা কৃষ্ণাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন এমন বর্ণনা যথেষ্ট—এ হল পূর্বেকার থেকে বৈষ্ণব কবিদের অভিসার-বর্ণনের বহিরঙ্গ বৈচিত্র। কিন্তু অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যও এমন রয়েছে যাকে অবলম্বন করে এঁদের রচনা পূর্বেকার গতানুগতিক কাব্যনির্মাণ থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে। তার কারণ বুঝতে গেলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রাগানুগা ভক্তিভাবের এবং এই ভক্তিভাবের শ্রেষ্ঠ সাধিকা শ্রীরাধা সম্পর্কে বৈষ্ণবগণের ধারণার সঙ্গে একাত্ম হওয়া প্রয়োজন।

বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ের মধ্যে যে অলৌকিকতার বিকাশ দেখিয়েছেন, তা-ই তাঁদের যাবতীয় প্রণয়মূলক পদরচনাকে একপ্রকারের অতিশায়িত রূপ দান করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারণায় রাধা কৃষ্ণেরই প্রণয়-বিকৃতি এবং হ্লাদিনী শক্তি বলে উভয়ের প্রণয়ে মিলন অপেক্ষা বিরহের আধিক্য ঘটেছে। সে বিরহ পূর্বরাগ, অভিসার, প্রেমবৈচিত্ত্য, মান, মাথুর প্রভৃতি প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য পালার মধ্যেই বিস্তৃত। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণের কোন মিলনই যথার্থ মিলন নয়। কারণ, অন্তরঙ্গ একাত্ম অবস্থা থেকে যাঁরা পৃথক হয়েছেন, বহিরঙ্গ কোন মিলনেই তো তাঁদের তৃপ্তি হতে পারে না। এই অধ্যাত্ম-অনুগত বিরহ-ভাবুকতার জন্যই প্রণয় এত অধিক মাহাত্ম্য লাভ করেছে। মিলনের জন্য ব্যাকুলতা অলোকসামান্য হয়ে উঠেছে। ‘অভিসার’ এই বিরহ-সমুদ্রের মধ্যে মিলনের আশায় তরণীচালনা। সংস্কৃতের লৌকিক সাহিত্যের অভিসারে তাই নিতান্ত আত্মবিসর্জনের ভাবটি তেমন করে ফোটে নি। তিমিরাভিসারে প্রথমে শ্রীমতীকে কুলভয় এবং লোকভয় ত্যাগ করতে হয়েছে, পরে দুর্যোগ এবং পথের বিপদকে অবহেলা করতে হয়েছে এমনকি মৃত্যুভয় পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়েছে। নিতান্ত আত্মবিলোপের এই দৃষ্টান্ত প্রাচীনতর সাহিত্যে নেই। মহাজনগণের অভিসারের পদে নায়িকা অর্থাৎ রাধার চরিত্রের যে দুরূহ সাধনার ভাবটি ফুটে উঠেছে তাও পূর্বেকার রচনায় দুর্লভ। এমনকি চৈতন্যপূর্ব বিখ্যাত মৈথিলী বা ব্রজবুলির কবি

বিদ্যাপতি প্রাচীন সাহিত্যিক বা আলংকারিক মতেই তাঁর অভিসারদৃশ্য চিত্রিত করেছেন। বৈচিত্র্য এনেছেন এবং মৌলিকত্ব রক্ষা করেছেন নিঃসন্দেহে, তবু তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবসাধনার অত্যাশ্চর্য গভীরতা ও সূক্ষ্মতা থেকে বঞ্চিত। দেহ ও গেহের মমতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন এবং কৃচ্ছ্রসাধনার দুরূহতাকেই ব্রতরূপে পালনের সিদ্ধান্ত বিদ্যাপতির রাধা গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে তাঁর ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে বহুদূর অতিক্রম করেছেন।

বস্তুতঃ অভিসারের পদরচনায় সমস্ত পদকারদের মধ্যে গোবিন্দাসই শ্রেষ্ঠ। শুধু ভাবসংকেতের দিক থেকেই নয়, কবিত্বের দিক থেকেও তাঁর রচনা অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্যের সন্ধান দেয়। এ বিষয়ে প্রখ্যাত কবি চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের একটি বিখ্যাত পদের আরম্ভ এইরকম—

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।

বলা যায়, এ চিত্র সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী কিন্তু বোধহয় সর্বোত্তম নয়। কারণ পরক্ষণেই চণ্ডীদাসের নায়িকা শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারণায় 'লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম' প্রভৃতি উপেক্ষা করার কথা নিবেদন করেছে—

ঘরে গুরুজনে ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।

চণ্ডীদাসের একটি জ্যোৎস্নাভিসারের পদে আমর অনুরূপভাবে বৈষ্ণব রসসিদ্ধান্তগত আলংকারিকতার প্রকাশ দেখতে পাই—

এ কূলে বিচ্ছেদ ভয় ও কূল নহিলে নয়
বল দূতী কি করিবে রাধা।।

এ কেবল বাংলা এবং ব্রজবুলির রমণীয়তার পার্থক্যই নয় প্রগাঢ় কবিত্বের পার্থক্যও রয়েছে। দুর্যোগের কথা এবং পথের দূরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে সখীরা তাঁদের প্রিয় সহচরীকে এই অভিসাররূপ দুঃসাহসিক কর্ম থেকে বিরত করতে চেষ্টা করছেন, তখন রাধিকা যে ভাবে সখীদের প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন তার মধ্যে এরকম কোনও তাত্ত্বিকতা বাহ্যতঃ প্রভাব বিস্তার করে নি। অথচ এর অন্তঃস্থলে সূক্ষ্মভাবে মহাভাবস্বরূপতার অন্তরের প্রকাশ চিহ্নিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীমতীর অন্তরাত্মা থেকে খুব সহজভাবেই প্রণয়ের অসাধারণত্বের সংকেত বিনির্গত হয়েছে—

কুল মরিযাদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা।। ... ইত্যাদি

এখানে গোবিন্দদাস রূপকময় বাক্যগ্রন্থনের মধ্য দিয়ে অনায়াসে কুলত্যাগের অসম সাহসিকতা এবং আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেওয়ার অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের ভাবটি কত

সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন! জ্ঞানদসের অভিসারের পদেও এই দীপ্তি এবং ভাবব্যাকুলতা নেই। জ্ঞানদাস বরং অভিসারিকা রাধিকাকে একেবারে সংকীর্তনানন্দে অগ্রসর মহাপ্রভুর ছাঁচে ঢালতে গিয়ে বাহ্যতঃ অবিশ্বাস্য কৃত্রিমতারই সঞ্চার করেছেন। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদে অগ্রবর্তিনী নায়িকার চিত্রটি একেবারে জীবন্ত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বেশভূষায় অবিন্যস্ত দেহসজ্জায়, ইতস্ততঃ চকিত দৃষ্টিপাতে গোবিন্দদাস শুধু শব্দবিন্যাসেই সমস্ত কবিকে ছাড়িয়ে গেছেন, অভিসারের ব্যাপারটিকে একেবারে প্রত্যক্ষ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ পদ 'কন্টক গাড়ি...' ইত্যাদির সাহায্যে তাঁর সূক্ষ্ম কলাকৌশল দেখা যাক। 'কন্টক গাড়ি' এই কঠোর ধ্বনির মধ্যে কন্টকের অতি-কঠোরতা এবং পরমুহূর্তেই 'ল' এবং 'ম' এর অনুপ্রাসের মধ্যে (কমলসম পদতল) এবং কমলের সঙ্গে উপমায় দুই বৈপরীত্যের সমন্বয়ে শ্রীমতীর অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা দেখা গেছে। 'মঞ্জীর চীরহি' শব্দের ব্যবহারে আভরণের মাধুর্য ধ্বনিত। 'গাগরি বারি' ইত্যাদির 'র' এর অনুপ্রাসে শ্রীমতীর রূপ এবং সজ্জার মাধুর্য ও অতি-কোমলত্ব ব্যঞ্জিত হয়েছে। প্রথমেই চিত্রটির অবতারণা করে পরে 'অভিসার' সম্বন্ধে উল্লেখ করায় শ্রোতার চমকের সৃষ্টি করা হয়েছে। 'দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে...' ইত্যাদির মধ্যেও অনুরূপভাবে একদিকে দুরূহতা এবং অন্যদিকে দুঃখ সহনের অযোগ্যতায় বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে। গোবিন্দদাস সমস্ত পদটির মধ্যে কোথাও আমাদের ভুলতে দেন নি যে, এই দারুণ অভিসার এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতী নারীর। এমনি কবির কাব্যনির্মাণ বিষয়ে দক্ষতা। 'মণিকঙ্কণপণ ফণিমুখ বন্ধন' ('করকঙ্কণ' পাঠ ভ্রমাত্মক। ছন্দে, অনুপ্রাসে এবং অতিশয়োক্তির রমণীয়তা সৃষ্টির জন্য গোবিন্দদাস নিশ্চয়ই 'মণিকঙ্কণ' শব্দই ব্যবহার করেছিলেন।) —এই কথার দ্বারা নারীর প্রিয়বস্তু অলংকার দান করার কথা তিনি বলেছেন। এহেন নারীর আত্মবিস্মৃত ভাবমূর্তিখানি অঙ্কন করে তবেই গোবিন্দদাস চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করেছেন—'আন শুনই কহ আন'। যে সংস্কৃত মূল থেকে এই পদটি রচিত সেই শ্লোকটি কাব্যের দিক দিয়ে এই পদটির কাছে কতই না হীন। সংস্কৃত শ্লোকটিতে প্রস্তুতির ব্যাপারে যে একটা বিস্ময়কর অভিনবতা আছে, মাত্র তাই ফুটে উঠেছে। 'মণিকঙ্কণ পণ ফণিমুখ বন্ধন' অংশটি মূলে নেই। তাছাড়া, নায়িকার অন্তরের এই চিত্র 'গুরুজন বচন বধির সম মানই' ইত্যাদি মূল থেকে ভাবানুবাদটিকে অধিকতর রমণীয় করে তুলেছে।

গোবিন্দদাসের আর একটি আশ্চর্য পদ লক্ষ্য করা যায়, পদটি হল,

> নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন'
> নীলিম হার উজোর।
> নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
> পহিরণ নীল নিচোল।।
> তুয়া অভিসারক লাগি
> নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী
> কুহু যামিনী ভয় ভাগি।। ... ইত্যাদি।

এর মূলেও একটি সংস্কৃত শ্লোক বিদ্যমান, কিন্তু এখানে প্রায় প্রতি পংক্তিতে 'নীল' এই শব্দের বিন্যাসে যে আতিশয্য দ্যোতনা করা হয়েছে এবং তিমিরাভিসারের বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে কৃষ্ণের সঙ্গে একত্বের ভাবটি যেভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে এবং সর্বোপরি অনুপ্রাস-মাধুর্যে যে অপরূপ রূপলোক উন্মোচন করা হয়েছে তা ঐ সংস্কৃত শ্লোকটিতে নেই। এইভাবে, গোবিন্দদাস যেখানে বিদ্যাপতির ভাবানুসরণ করেছেন সেখানে নিজ মৌলিকতাকেই তিনি পরিস্ফুট করেছেন।

বস্তুতঃ অভিসারের পদে রূপ এবং ভাবসংকেত কাব্য এবং অধ্যাত্মের যে বিস্ময়কর মিলন গোবিন্দদাস দেখিয়েছেন, তার তুলনা অন্য কোন কবির লেখায় পাওয়া যাবে না। গোবিন্দদাস ব্যক্তিগতভাবে আচার, আচরণ, চারিত্র্যে সংসার-বিরাগী উদাসীন সন্ন্যাসী ছিলেন। রাগানুগা ভক্তির মধ্যে যে একটি দুরূহ সাধনার ভাব রয়েছে তাও নিশ্চয়ই অন্তরে অনুভব করেছিলেন তাই অভিসারিকা রাধিকাকে তিনি অন্য কবিদের থেকে একটু পৃথক ভাবে গঠন করেছেন। পূর্ববর্তী ও সমকালীন কবিদের থেকে এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রেমবৈচিত্ত্য

শ্রীমৎ রূপগোস্বামী প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণনির্দেশে বলেছেন।

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়াতিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।

অর্থাৎ প্রিয়তম অত্যন্ত নিকটবর্তী হলেও প্রেমের একান্ত প্রগাঢ়তার জন্য 'হায় আমি বিরহিত হলাম' এইরকম ভাবনায় যে আক্ষেপ তারই নাম প্রৈমবৈচিত্ত্য। এর টীকায় শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন—অতিরিক্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তি অতিরিক্ত ভোজনের পরও আমি কিছুই খেলাম না—এরকম মনে করে যে অতৃপ্তি বোধ করেন।

স্পষ্টই দেখা যায়, প্রেমবৈচিত্ত্যের মধ্যে যে একটি পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাপার রয়েছে কোন বর্ণনাতেই তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অথচ, বিষয়টি অত্যন্ত সত্য, যিনি উপলব্ধি করেন তাঁর কাছে নিতান্ত প্রত্যক্ষ। বৈষ্ণব রসিক ও আলংকারিক মহাজনেরা প্রেমবৈচিত্ত্যকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার অর্থাৎ বিরহের একটি বিশেষ বিভাব বলে গ্রহণ করেছেন। এই প্রেমবৈচিত্ত্য পূর্ববর্তী আলংকারিকগণের দ্বারা নিষিদকধ হয়নি। রাগানুগ ভক্তির বিকাশের ফলেই বিরহ যখন প্রাধান্য লাভ করেছে তখন তার সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যগুলিও রসিকগণের কাছে অপরিসীম সৌন্দর্যের আধার বলে পরিগণিত হয়েছে। তাই দেখা যায়. চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে মিলনের মধ্যে বিরহানুভূতি্ বিস্তৃত পদরচয়িতা নগণ্য। অন্ততঃ জয়দেব-বিদ্যাপতি এই পথ প্রদর্শন করছেন না। অথচ, সাহিত্যে এই প্রেমভাবুকতার প্রকাশ ঘটেচিল এবং বৈষ্ণবেরা সেখান থেকেই এই বিশেষ ভাবটি সমাহরণ করে তাঁদের অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমের বৈচিত্র্যের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন।

কবি কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যে যক্ষের বিরহ প্রসঙ্গে বিষয়টি এইভাবে বিবৃত করেছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষ : প্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও ঐ মহাকবি চিত্তের অকারণ ব্যাকুলতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান।
পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোহপি জন্তুঃ।। ... ইত্যাদি।

এই যে প্রাপ্তির মধ্যেও অপ্রাপ্তিবোধ, মিলনের মধ্যেও বিরহবোধরূপ মানসিক অবস্থা কবিরা বর্ণনা করেছেন, তাকেই অলৌকিক ভাবমন্ডিত করে আরও বিস্তার এবং চাতুর্যসহকারে

বলেছেন বৈষ্ণব কবিরা। বস্তুতঃ প্রেমবৈচিত্ত্যের ব্যাপারটি' যে নিতান্ত রোমান্টিক মনোভাবসঞ্জাত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আধুনিক গীতি-মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়টি তাঁর প্রেম ও সৌন্দর্য উপলব্ধি বিষয়ক বহু কবিতায় নানাভাবে বিবৃত করেছেন। যেমন, মানসীর নিষ্ফল কামনা' কবিতায় তিনি বলছেন,

দুটি হাতে হাত দিয়ে
তৃষার্ত নয়নে।
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে
খুঁজিতেছি কোথা তুমি
কোথা তুমি?
যে অমৃত লুকানো তোমায়, সে কোথায়?

নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতার উপসংহারে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, সৌন্দর্যময়ীর সঙ্গে একত্রে যাত্রা করলেও পরিপূর্ণ মিলন সম্ভব হচ্ছে না—

গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর
কোথা আছ ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি।

'মেঘদূত' নামক প্রবন্ধে কবি মানবাত্মার এই রহস্যময় চিরবিরহের বিষয়টির একটি পূর্ণ ব্যাখ্যা সন্নিবেশ করেছেন। সেখানে ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতার ভাব উদ্ধৃত করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, মানবাত্মার মধ্যে মিলন কোনকালেই সম্ভব না—একান্ত সন্নিকটবর্তী হলেও একটা অতৃপ্তি এবং কামনা সদাজাগ্রত থাকে। ''আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানস সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে। সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনও পথ নাই।"

পদাবলীর প্রেমবৈচিত্ত্য সম্পর্কিত পদ কবি চন্ডীদাসের (ইনি কোন চন্ডীদাস?)

—এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি।। ... ইত্যাদি।

কবি বলছেন, নরলোকে জীবনের অত্যন্ত সাধারণ প্রণয়ের মধ্যে প্রেমের এই আশ্চর্য স্ফূর্তি দুর্লভ। কারণ, সাধারণ প্রণয়ে পরস্পর প্রাপ্তিকেই মহামূল্য বলে গণনা করে, মিলনের মধ্যেও যে অপ্রাপ্তির ভাব নিহিত রয়েছে তা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা মিলনকে সুখ বলেই অনুভব করে, বিষবিকার বলে অনুভব করতে পারে না। কবি গোবিন্দদাস এই ব্যাপারটিকেই একটি পদের মধ্যে ব্যক্ত করছেন—

সুনয়নী কহত কানু ঘন শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতী তাক পরশরসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি।।

'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি' কিন্তু সেই ভূমাকে কি সীমিত মনপ্রাণ দিয়ে ধরা যায়?

রাধাকৃষ্ণ যখন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, 'একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ' তখন থেকেই তাঁরা চিরবিরহের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেছেন। দৈবে, যোগমায়ার প্রভাবে যদ্যপি তাঁদের মিলন ঘটায় তবু সে মিলন ক্ষণিকের এবং তাতে বিরহকেই ঘনীভূত করে। রাধিকা কৃষ্ণের হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে বাইরে বিনির্গত হয়ে পড়েছেন, পুনরায় সেই মিলনের ব্যাকুলতাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কিন্তু সেই নিঃশেষ মিলনের আর উপায় নেই। তাই, কবি বলরামদাস বলেছেন,

আমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঁই বলরামের পঁহু চিত নহে থীর।।

কবিশেখর বিদ্যাপতি তাঁর চিরস্মরণীয় কি পুছসি অনুভব মোয় ... ইত্যাদি পদটিতে এই চিরবিরহের বা মিলন-মধ্যবর্তী বিরহের বিষয়টিকে একান্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন,

কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু?
তব হিয়া জুড়ন না গেল।।

লক্ষ লক্ষ যুগ যাঁরা একত্রযাপন করেছেন, আজও তাঁদের চিত্তে অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে, এ অতৃপ্তির আর শেষ নেই, এ বিরহের সীমা নেই। এই চিরন্তন অতৃপ্তিবশেই বৈষ্ণব মহাজন গেয়েছেন,

কোটী নেত্র নাহি দিল দিল শুধু দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুই।।

কৃষ্ণপ্রেমের নিতান্ত সূক্ষ্মতা এবং অলৌকিক তাৎপর্য এভাবেই 'প্রেমবৈচিত্ত্য' রসপর্যায়ে বিধৃত হয়েছে।

নির্দেশিকা

ভ

ম

য

র